জুল ভের্ন রচনাবলী

ষষ্ঠ খণ্ড



অনুবাদ ও সম্পাদনায়ঃ অদ্রীশ বর্ধন

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ বৈশাখ : ১৩৬৭

প্রকাশক :

ময়ূখ বসু

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট

কলিকাতা ১২

মুদ্রক :

অজিত কুমার সামই

ঘাটাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস

১/১এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট

কলিকাতা-৬

দাম : ষোল টাকা

॥ জুল ভের্ণ ॥

জন্ম নানতেস-য়ে ; ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮২৮। পড়লেন আইন, হলেন সাহিত্যিক। আমেরিকা গেলেন ১৮৬৭ সালে। মারা গেলেন অ্যামিয়েন্সয়ে ; ২৪শে মার্চ, ১৯০৫।

আধুনিক সায়ান্স-ফিকশনের জনক বিশ্ববিখ্যাত কাহিনীকারের সবচাইতে চাঞ্চল্যকর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির স্বচ্ছন্দ অনুবাদ··· বিজ্ঞান-সুবাসিত রোমাঞ্চকর কল্পকাহিনী···ফ্যানটাসটিক অ্যাডভেঞ্চার,···কল্পনারঙীন ভবিষ্যদর্শন···প্রতিটি উপন্যাস বিভিন্ন ভাষায় বহুলক্ষ কপি বিক্রীত। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, পাতালে, এমন কি পৃথিবীর বাইরেও দুঃসাহসিক অভিযানের বিস্ময়কর শ্বাসরোধী কাহিনী। পরিবারের প্রত্যেকের হাতে তুলে দেওয়ার মত, বারবার পড়ার মত অনুপম রচনা সংগ্রহ।

বিষয় সূচী

কার্পেথিয়ান কাস্‌ল্‌

জার্নি টু দি সেণ্টার অফ দি আর্থ

অ্যাডভেঞ্চার্স অফ ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস (দুই খণ্ড একত্রে)

কারপেথিয়ান কাস্‌ল্‌

মূল: জুল ভের্ন ॥ অনুবাদঃ অদ্রীশ বর্ধন

হট্টমেলার অট্টরোল শুনতে যদি চাও,
লম্ফ দিয়ে গাছে চড়ে কাসলগড়ে যাও!

....

[ভুতুড়ে গড় নাকি? কাউন্ট ড্রাকুলার নিভৃত নিবাস? জুল ভের্ন কি ভূতপ্রেত নিয়েও গল্প লেখেন?

জুল ভের্নের বাধাহীন কল্পনা পৃথিবীর কেন্দ্রে পৌঁছেছে, সৌরজগতকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। অসম্ভব কল্পনাকেও তিনি সম্ভাব্য করে তুলেছেন লেখার গুণে। 'কারপেথিয়ান কাস্‌ল্‌' এমনি একটা পিশাচ-পুরীর কাহিনী। পাহাড়ের ওপর একটা প্রাসাদ-দুর্গ। পোড়ো কেল্লা। কেউ থাকে না সেখানে। হঠাৎ আরম্ভ হল পৈশাচিক কাণ্ডকারখানা। ড্রাকুলার মতই শরীরী বিভীষিকার অলৌকিক কাহিনী। অথচ সায়ান্স-ফিকশনের জনক জুল ভের্ন এ-হেন রোমাঞ্চকর ফ্যানটাসিকেও সায়ান্স-ফিকশনের আওতায় এনে ফেলেছেন।

'কারপেথিয়ান কাস্‌ল্‌' জুল ভের্নের অন্যতম অনবদ্য সৃষ্টি! এই তার প্রথম বাংলা অনুবাদ]

১॥ ধোঁয়া! ধোঁয়া! ধোঁয়া! জাগায় গায়ের রোঁয়া!

এ-কাহিনী ফ্যানটাসটিক নয়—রোমান্টিক, মান্ধাতা আমলের কিংবদন্তী নয়—এই সেদিনের ঘটনা।

উনবিংশ শতাব্দী শেষ হতে চলেছে। কিংবদন্তী নিয়ে মাথা ঘামানোর শতাব্দী এটা নয়। অনেক অদ্ভুত অথচ বাস্তব ঘটনা ঘটেছে এই শতাব্দীতে। খাস ট্রান্‌সিলভানিয়াতেও গাঁজা-গল্প নিয়ে মাথা ঘামানোর ফুরসৎ কারো নেই। অথচ কিনা কার্পেথিয়ান কাস্‌ল্‌ নিয়ে যত কিছু অলৌকিক কল্পনা এই খানেই ডালপালা মেলে ছড়িয়ে পড়েছে। ট্রানসিলভানিয়া জায়গাটা অবশ্য কুসংস্কারের ঘাঁটি বললেই চলে। মান্ধাতা আমলের অনেক রকম গা-ছমছমে গল্প লোকের মুখে মুখে ফেরে এই অঞ্চলে।

উনত্রিশে মে। দিগন্ত জোড়া সবুজ মালভূমিতে ভেড়া চড়ছে। নির্নিমেষে সেদিকে চেয়ে রয়েছে মেষপালক। উর্বর উপত্যকার শেষে মেঘ ছোঁয়া রিটিযাট পাহাড়। বড় বড় গাছ সোজা দাঁড়িয়ে আছে শ্যামল বনভূমিতে। খেত-খামারের অভাব নেই শস্যশ্যামল এই মালভূমিতে।

জায়গাটা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেক উঁচু। চারদিক খোলা। তাই ঝড় এলে আর রক্ষে নেই। ঝড় থেকে গাছপালা আগলে রাখার মত প্রাকৃতিক পাহারা তো নেই। কাজেই কচু কাটা হয়ে যায় বনভূমি! নাপিতের ক্ষুরে মাথা কামানোর মত উত্তর-পশ্চিমের ঝঞ্ঝা মুড়িয়ে দি'য় যায় উপত্যকার গাছ-পালা। ন্যাড়া করে যায় ঘন সবুজ অরণ্য অঞ্চলকে।

মেষপালকের নাম ফ্রিক। বার্স্ট গাঁ-য়ে তার বাড়ী। ভেড়াদের মতই নোংরা চেহারা। জামাকাপড়ের ছিরি ছাঁদ নেই। ছেঁড়া, ময়লা চটের মত পোশাক। গাঁ-য়ে ঢোকবার মুখেই একটা নোংরা খোঁদলে তার নিবাস। ভেড়ার পালও বাত কাটায় একই গর্তে। গা ঘিনঘিনে পরিবেশে থেকেই সে অভ্যস্ত।

মাঠের মধ্যেই এক চোখ খুলে শুযে থাকে ফ্রিক। মুখে থাকে পাইপ। ফুক-ফুক করে ধোঁযা বেরোয মুখ থেকে। নজর থাকে কিন্তু ভেড়ার পালের ওপর। ঘাস খেতে খেতে দূরে গেলেই শিস দিয়ে ওঠে তীক্ষ্ণ তীব্র শব্দে। অমনি দৌড়ে যায় কুকুর। নয়তো ফুঁ দেয শিঙেতে। কানফাটা আওযাজের প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে যায় দিকে দিকে।

বিকেল এখন চারটে। সূর্য অস্তাচলে। পূবের পাহাড় ভাসমান কুয়াশায় ঢেকে যাচ্ছে। দক্ষিণ-পশ্চিমের পর্বত শ্রেণীর দু'জায়গায় দুটো ফাঁক আছে। সূর্যরশ্মি প্রদীপ্ত জেটের মত সেই ফাঁক দিযে মালভূমিতে প্রবেশ করছে। যেন আধ খোলা দরজা দিযে বাইরের আলো ঢুকছে ভেতরে।

ট্রানসিলভানিয়ার খানিকটা জায়গা খুবই দুর্গম পাহাড় আর বনের জন্যে। এ-পাহাড়ও সেইখানে। নাম, ক্লসেনবার্গ বা কোলোসভার। ছত্রিশ জাতের লোক থাকে এখানে। কিন্তু মিলে মিশে কেউই নিজের জাত খোয়াতে চায় না। এ-অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান ঐ রকমই। রুমানিয়ান, হাঙ্গারিয়ান, জিগানিস (জিপসী), জেকলার, স্যাক্সন প্রত্যেকেই নিজের নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলেছে।

ফ্রিক তাহলে কোন্ জাতের? সুপ্রাচীন ডেসিয়ানদের অপোগণ্ড বংশধর? বলা কঠিন। অন্ততঃ চেহারায় সে-রকম ছাপ নেই। জট পাকানো চুল, কাদামাখা মুখে দাড়ির জঙ্গল; ঝাঁকড়া মাকড়া ভুরু। নীলচে সবুজ ভিজে-

ভিজে চোখের কোণে বয়সের রেখা। বয়স বলা অবশ্য খুবই মুস্কিল। পঁয়ষট্টি হতে পারে, কম-ও হতে পারে। শরীর মজবুত, শিরদাঁড়া সিধে। পরনের হলদেটে আলখাল্লা লোমশ বুকের তুলনায় কম কর্কশ। মাথায় খড়ের টোপরের মত ঘাসের টুপী। এ-হেন মূর্তি বেঁকা লাঠিতে ভর দিয়ে পাথরের মূর্তির মত যখন দাঁড়িয়ে থাকে, তখন সে-দৃশ্য সত্যিই দেখবার মত। কোনো শিল্পীই লোভ সামলাতে পারতেন না। সঙ্গে সঙ্গে রঙ-তুলি নিয়ে ছবি এঁকে ফেলতেন।

পশ্চিমের পর্বত-রন্ধ্র দিয়ে আলো আসছে কুয়াশা ফুঁড়ে। ক্রিক তীক্ষ্ণ চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে আশেপাশে। মুখের সামনে হাত জড়ো করে শিঙে ফোঁকার মত হাঁক ডাক শেষ হয়েছে এই মাত্র। এখন টেলিস্কোপের মত দুহাত চোখের সামনে চোঙা পাকিয়ে রেখে তন্ময় হয়ে কি যেন দেখছে সে।

মাইলখানেক দূরে দেখা যাচ্ছে কতকগুলো সৌধ। পুরোনো প্রাসাদ-দুর্গ। ওরগাল প্লেটোর সবচেয়ে উঁচুতে নির্মিত সুপ্রাচীন একটা গড়। এতদূর থেকেও সবকিছুই যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ক্রিক। চোখের জোর-ও আছে বটে!

আচম্বিতে বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে উঠল প্রৌঢ় মেষপালক—"বুড়ো কাস্‌ল্! বুড়ো কাস্‌ল্!... দিন তোমার ফুরিয়ে এসেছে! যত মজবুতই হোক না তোমার ভিত, আর মোটে তিন বছর! মাত্র তিনটে ডাল বাকী রইল বীচ গাছে! তিন বছরে তিনটে ডাল খসবে—তুমিও মরবে!"

কেল্লা-প্রাসাদের কোণে একটা মস্ত গম্বুজ। গম্বুজের ওপর কে যেন পুঁতেছিল একটা বীচ গাছ। নীল আকাশের পটভূমিকার কালো গাছটা এতদূর থেকেও দেখতে পাচ্ছে ক্রিক। অন্যের চোখে অদৃশ্য হলেও ক্রিক-য়ের চোখ বড় ধারালো—তাই গাছের অবশিষ্ট তিনটে শাখা নিয়ে ওর এত চিন্তা, এত গবেষণা!

"বুড়ো কাস্‌ল্!...বুড়ো কাস্‌ল্! ..কালকেও দেখেছি চারটে ডাল। রাত্রে খসেছে একটা—বাকি রইল তিন। তিন বছরে খসবে তিন-টেই—অমনি ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে তোমার পাথুরে দেহ! বুড়ো কাস্‌ল্! বুড়ো কাস্‌ল্! আর মোটে তিনটে বছর তোমার আয়ু! তার বেশি নয়!"

মেষপালকদের মনের গতি বোঝা ভার। কুসংস্কারে ঠাসা তাদের মন। আকাশ-পাতাল কল্পনা, উদ্ভট চিন্তা, অলীক গালগল্প নিয়েই ব্যস্ত তাদের চিত্ত। ক্রিক এদের ব্যতিক্রম নয়। সে নাকি তারাদের কথা বুঝতে পারে, তারারাও তার কথা শুনে জবাব দেয়। ফাঁপরে পড়লে গ্রহ-উপগ্রহর সঙ্গে শলাপরামর্শ করতে বসে। আকাশের চেহারা দেখে ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারে। আসলে

ফ্রিক ডাহা-বোকা। মাথায় বুদ্ধির ছিটেফোঁটাও নেই। জ্ঞানগম্যিও নেই। সাধারণ মানুষ কিন্তু গাঁজাগল্প গোগ্রাসে গেলে। সব কিছুতেই তাদের বিশ্বাস। তারাই ফ্রিককে যা নয় তাই বানিয়ে তুলেছে। ফ্রিকের নাকি অলৌকিক ক্ষমতা আছে। ফ্রিক নাকি ভেল্কী জানে। ঝাড়ফুঁক তন্ত্রমন্ত্রে সে মস্ত ওস্তাদ। মানুষ পশু প্রত্যেকেই কাবু তার জাদুবিদ্যের কাছে। এইসব কারণেই পাঁচমিশেলী পাঁচন বা চূর্ণ বেচে দু'পয়সা রোজগার করে ফ্রিক। সেইসঙ্গে মাদুলি তাবিজ কবচ বিক্রি তো আছেই। ফ্রিক নাকি ইচ্ছে করলে মন্ত্রপূত নুড়ি ছুঁড়ে আবাদী জমিকে বন্ধ্যা করে দিতে পারে। প্যাট-প্যাট করে ভেড়াদের দিকে চাইলেই তাদের বাচ্চা হয়ে যায়। জনপদ যত সুসভ্যই হোক না কেন, কুসংস্কার থাকবেই। মেষপালকদের সমীহ করা হয় এইসব কারণেই। পথ চলতে চলতে পথিক কোনো মেষপালকের মুখোমুখি হলে আর রক্ষে নেই। তক্ষুনি তার মন ভেজাতে হবে নানান কৌশলে। মেষপালকের অভিসম্পাত নাকি বড সাংঘাতিক জিনিস। 'পাস্টর' নামে ডাকলেই নাকি অতিবড় কুটিল মেষপালকেরও মন গলে যায়। তখন সে পথিকের টুপী ছুঁয়ে এমন আশীর্বাদ করে যে পথে কোনো বিপদ-আপদ দেখা যায় না। বিঘ্ন থাকলেও তা কেটে যায়। ট্রানসিলভানিয়ার সব রাস্তাতেই দেখা যায় এই একই দৃশ্য। মেষপালকদের চটিয়ে পথ চলা নাকি বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

ফ্রিক ম্যাজিক জানে। ভূত-প্রেত পিশাচদের কান ধরে খাটিয়ে নিতে পারে। কিম্ভূতকিমাকার অপচ্ছায়াদের চোখের সামনে বাঁদর-নাচ নাচাতে পারে। ভ্যামপায়ার অর্থাৎ রক্তপায়ী পিশাচরা নাকি ওঠবোস করে ফ্রিকে-র হুকুমে। যখন-তখন ফ্রিকে-র দেখা পাওয়া ভার। তার সঙ্গে দেখা করার উপযুক্ত সময় নাকি রাত দুপুরে চাঁদ ডুবে গেলে। ময়দাপেষার কলে যে বিরাট পাখাগুলো হাওয়ায় বন বন করে ঘোরে, ফ্রিক বসে থাকে সেই পাখার ওপর মাটি থেকে অনেক ওপরে। নেকড়েদের সঙ্গে গল্প করে নয় তো নক্ষত্রদের নিয়ে স্বপ্ন দেখে।

এমনি ধরনের অনেক আজগুবী গুজব শোনা যায় ফ্রিককে ঘিরে। ফ্রিক বাধা দেয় না। বলুক না। লোকে যত তাকে নিয়ে কানাঘুসো করে, ততই তো তার লাভ। ততই বেশি বিক্রি হবে তাবিজ মাদুলি কবচ আংটি। তবে হ্যাঁ, ফ্রিক নিজেও তন্ত্রমন্ত্র ভূতপ্রেতে বিলক্ষণ বিশ্বাসী। নিজের ডাকিনী বিদ্যের ওপর আস্থা থাকুক আর না থাকুক, দেশের কিংবদন্তীগুলো বিশ্বাস করে অক্ষরে অক্ষরে।

অবাক হবার কিছু নেই। দেশ পাড়াগাঁয়ে এ-ধরনের কুসংস্কার আর অমূলক ভীতি সব দেশেই আছে। ফলে ক্রিকে-র হয়েছে পোয়াবারো।

বীচ গাছের ডালের সংখ্যা যত, পোড়ো কেল্লার পরমায়ু তত বছর—এই গল্প মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে ক্রিকের রচনার জন্যেই। বীচ গাছের ডালের সংখ্যা আর মোটে তিন—সুতরাং আর তিন বছর পরেই ধুলোয় বিলীন হবে গড় কাবপেথিয়ান—এ খবরটা গাঁয়ে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে তাই ব্যস্ত হল ক্রিক।

তুলে নিল কোমরের সাদা কাঠের শিঙে। ফুঁ দিতেই কানফাটা ধ্বনি ছড়িয়ে গেল দিকে দিকে। সচকিত হল ভেড়া আর কুকুরের দল। সদলবলে গাঁয়ে ফেরার রাস্তা ধরল ক্রিক। ভেড়াদের তাড়িয়ে নিয়ে চলল দু'দুটো কুত্তা। কুকুর না বলে তাদের আধা-রাক্ষস বললেই চলে। পৌরাণিক গ্রিফিন অর্থাৎ অর্ধেক-পক্ষী অর্ধেক-সিংহের মত বিকট আকার তাদের। প্রহরী তো নয়—খাদক বললেই চলে। ভেড়াদের আগলাবে কি। খেয়ে ফেললেও অবাক হবার কিছু নেই। চেহারা দেখলেই ভয় লাগে—এমন ভয়ংকর তাদের আকৃতি।

ক্রিকেব ভেড়ার সংখ্যা সব মিলিয়ে শ'খানেক। গোটা বারো নেহাৎ বাচ্চা—মায়ের দুধ খায়। বাকিগুলো বছর তিন-চার বড়।

ক্রিক অবশ্য মাইনে করা চাকর—ভেড়ার মালিক গাঁয়ের ধর্মাবতার। নাম বিরো কোলজ। ভদ্রলোকের জমিজমা অঢেল। খাজনা দেন মোটা টাকা। ক্রিক সম্বন্ধে তাঁর ধারণা খুবই উঁচু। ক্রিক নাকি একাধারে জাদুকর এবং কোবরেজ। শুধু মানুষ কেন পশুপাখির অসুখ-বিসুখ চম্পট দেয় তার দাওয়াই পড়লে।

গায়ে গা ঘেঁসে চলেছে একশো ভেড়া। টিং-টিং করে বাজছে গলার ঘণ্টা। ম্যা-ম্যা রব ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে একশো ঘণ্টা ধ্বনি।

তৃণভূমি ছাড়িয়ে ক্ষেত-খামারের কিনারায় এসে পড়ল ক্রিক। আল বেয়ে চলেছে গজেন্দ্রগমনে। দু'পাশে শস্য ক্ষেত। দীর্ঘ পাতা আর ডাঁটির ওপর দুলছে ফসলের দানা। এ-অঞ্চলের ভুট্টা অতি বিখ্যাত। ভুট্টাক্ষেতের পরেই পায়ে চলা পথটা বেঁকে গিয়েছে, ফার আর স্প্রুস বনের তলা দিয়ে। ওপরে বৃক্ষপত্রের চন্দ্রাতপ। তলায় ঝরাপাতায় ছাওয়া বনভূমি। নিস্তব্ধ, শীতল এবং প্রশান্ত। আধা-অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে আরো কিছুদূর গেলে সিল নদী। সূর্যালোকে ঝকঝক করছে টলটলে জল-ধারা। তলার নুড়িগুলো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। নদীর স্রোতে ভেসে আসছে করাত-কল থেকে ভাসিয়ে দেওয়া গাছের গুঁড়ি।

নদীর দক্ষিণ পাড়ে পৌঁছল কুকুর আর ভেড়ার পাল। খাগড়া আর নলবন সরিয়ে মুখ ডুবিয়ে জল খেতে লাগল চকচক শব্দে।

গাঁয়ে 'গানশট' বলে একটা কথা চলতি আছে। বন্দুকের গুলির পাল্লা যতখানি। এক 'গানশট' হল ততখানি পথ। ফ্রিক যেখানে পৌঁছল, সেখান থেকে বার্স্ট গ্রাম আর মোটে তিন 'গানশট' দূরে। পথে পড়বে উইলোর আবাদী জমি। বেশি ডালপালা ছড়ানোর আশায় মাথা-ছাঁটা উইলো নয় বেশ ঝাঁকড়া-মাকড়া গাছ। ভলকান পাহাড় পর্যন্ত গিয়েছে উইলোর সারি। ভলকান গ্রামটা সেই পাহাড়েরই তলায়।

ক্ষেত-খামার এখন জনশূন্য। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটার পর চাষীরা বাড়ি গিয়েছে। 'শুভরাত্রি' জানানোর মতও কেউ নেই পথে ঘাটে। ভেড়া আর কুকুরদের তেষ্টা মিটিয়ে উপত্যকার মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছে ফ্রিক, এমন সময়ে গজ পঞ্চাশেক দূরে নদীর পাড়ে আবির্ভূত হল একটা মূর্তি।

"কি খবর, বন্ধু!" হেঁকে বলল আগন্তুক।

কিছু ফেরিওয়ালা দেখা যায় যারা টো-টো করে ঘুরতে পছন্দ করে পণ্যের পসরা নিয়ে। এ লোকটা-ও সেই জাতের ফেরিওয়ালা। দেশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত টহল দেয়, সব বাজারেই মাল বেচাকেনা করে। এমন কি গণ্ডগ্রামেও মালের বোঝা নিয়ে যায়। সব ভাষায় সমান দখল থাকায় কোথাও অসুবিধে হয় না। কিন্তু এ-লোকটা কোন জাতের? ইটালিয়ান? স্যাক্সন? না, ওয়ালাচিয়ান? চেহারা দেখে জাত ধরা সহজ নয়। কেননা, আসলে সে ইহুদী। পোল্যাণ্ডের ইহুদী। তালঢ্যাঙা রোগা ডিগডিগে চেহারা। নাকটা আঁকশির মত বাঁকানো। দাড়ি ছুঁচের মত ছুঁচোলো। ঠেলে বার করা কপাল। চোখ জীবন্ত—যেন কথা বলছে।

টেলিস্কোপ, থার্মোমিটার, ব্যারোমিটার আর ছোটখাট ঘড়ি ফিরি করে বেড়ায় লোকটা। মালপত্র কাঁধের ঝোলায় থাকে। ঝোলায় যা ধরে না, তা ঝোলানো থাকে গলায়। কাঁধে আর কোমরের বেল্টে। ঠিক যেন একটা চলন্ত দোকান।

ভ্রাম্যমাণ ফেরিওয়ালা মেষপালক দেখলেই খাতির করার চেষ্টা করবে, এ-আর আশ্চর্য কি। তন্ত্রমন্ত্রকে কে না ভয় পায়। তাই ফ্রিক-য়ের সঙ্গে করমর্দন করল বিদেশী ফেরিওয়ালা। ল্যাটিন আর স্লাভ মিশানো জগাখিচুড়ি রুমানিয়ান ভাষায় বললে বিদেশী উচ্চারণে:

"বন্ধুর সব খবর ভালো তো?…"

"তা ভালোই। আবহাওয়া যে রকম থাকবে, আমিও সেই রকম থাকব," জবাব দিল ক্রিক।

"তার মানে আজ তুমি তোফা আছ। আকাশ তো পরিষ্কার।"

"কাল তোফা থাকব না। বৃষ্টি হবে।"

"বৃষ্টি হবে কি হে?" আকাশের পানে তাকিয়ে চোখ কপালে তুলে বলল ফেরিওয়ালা। "বিনা মেঘে বৃষ্টি হয় বুঝি তোমাদের দেশে?"

"রাত্রে মেঘ করবে। ঐ পাহাড়টা দেখছ, ওর ওদিক থেকে মেঘ তেড়ে আসবে রাত নামলেই।"

"তুমি জানলে কি করে?"

"ভেড়ার গা দেখে। শুকনো চামড়ার মত ভেড়ার লোম শুকিয়ে শক্ত হয়ে গিয়েছে।"

"সেকি হে! খোলা আকাশের তলায় যাদের কারবার, পথেই যাদের ঘর-বাড়ি, তাদের ভোগান্তির যে শেষ থাকবে না বৃষ্টি নামলে!"

"কিন্তু মজা মারবে গেরস্তরা!"

"ভেড়া নিয়ে তোমাকেও ছাদের তলায় থাকতে হবে যে।"

"ছেলেপুলে ক'টি?" শুধোল ক্রিক।

"নেই।"

"বিয়ে করেছ?"

"না।"

গাঁয়ের পথে দেখাসাক্ষাৎ হলে এই সব কথাই জিজ্ঞেস করতে হয়।

তাই ফের শুধোল ক্রিক—"কোত্থেকে আসছ?"

"হারমান্সটাড থেকে।" হারমান্সটাড ট্রানসিলভালিয়ার অন্যতম প্রধান পল্লীগ্রাম।

"যাচ্ছ কোথায়?"

"কোলোস্‌ভার।"

থার্মোমিটার, ব্যারোমিটার আর সস্তা গয়না ফেরি করাই এদের পেশা। দেখলে কিন্তু মনে হয় যেন অন্য জগতের মানুষ। কথাবার্তা, জামাকাপড়—সবই সৃষ্টিছাড়া। সময় আর আবহাওয়ার সরঞ্জাম* বিকিকিনি করে এরা যেন

---

* মূল ফরাসীতে Temps শব্দটা ভের্ণ লিখেছেন। এ-শব্দের ঠিক বাংলা বা ইংরেজী প্রতিশব্দ পাওয়া মুস্কিল। Temps-এর মানে সময় আর আবহাওয়া।

আমূল পালটে গিয়েছে। যে-সময় ফস্কে যায়, উড়ে পালিয়ে যায়—তাকে কৌটোয় পুরে নাকি এরা জলের দরে বেচে দেয়। আবহাওয়ার গোপন গতিবিধিও নাকি ফাঁস করে দিতে পারে। ঝুড়িভর্তি সওদা কেনার মত আবহাওয়া কিনলেই নাকি জানা যাবে দিনটা কিরকম যাবে আজ-কাল-পরশু। এক কথায়, এদের আকাশের ব্যবসাদার বলা যায়। শুধু ব্যবসাদার নয়—টেঁা-টেঁা কোম্পানী ব্যবসাদার।

ইহুদি ফেরিওয়ালাকে দেখেও ফ্রিক এইসব উদ্ভট কথা ভেবে নিল মনে মনে। লোকটার চেহারা এমনিতেই কিম্ভূতকিমাকার। তার ওপর কোমরে গলায় কাঁধে ঝুলছে কত কি বিদঘুটে কলকব্জা।

ত্বই-চোখ ছানাবড়ার মত করে তাকিয়ে রইল ফ্রিক। অবাক তো হবেই। এসব জিনিস এই প্রথম সে দেখছে। কোনটার কি কাজ, তাও জানে না।

বললে—"ওহে ফেরিওয়ালা, কোমরের বেল্টে ওসব কি ঝুলিয়েছ? মড়ার হাড় নাকি?"

"না হে না। এ-সব জিনিসের দাম অনেক। কত উপকারে লাগে, হেন লোক নেই যার কাজে লাগে না।"

"সব্বার? মেষপালকদেরও?"

"নিশ্চয়। মেষপালকদেরও উপকার হয় বইকি।"

"কি ওগুলো?"

একটা থার্মোমিটার এগিয়ে দিল ফেরিওয়ালা। বলল—"এ দিয়ে ঠাণ্ডা গরম জানা যায়।"

"আরে গেল যা! পাতলা জামা পরেও কেন ঘামি আর ওভারকোট পরেও কেন ঠকঠক করে কাঁপি—সে-তো আমিও বলতে পারি!"

বিজ্ঞানের কিছুই জানে না মেষপালক। কে, কি, কেন, কবে, কোথায়—এসব প্রশ্নের জবাব বিজ্ঞানই দিতে পারে। কিন্তু নিরক্ষর মেষপালকের সেসব নিয়ে মাথা ঘামানোর ফুরসৎ কোথায়?

"এটা কি? প্রকাণ্ড ঘড়ি—কাঁটাটাও নেহাৎ ছোট নয়। এ আবার কি রকম ঘড়ি!" শুধোল ফ্রিক।

"ঘড়ি নয়, ঘড়ি নয়। এ-যন্ত্র তোমাকে বলে দেবে দিনটা আজ ভাল যাবে কি বৃষ্টি হবে।"

"তাই নাকি?"

"আরে হ্যাঁ। তাহলে আর বলছি কি!"

"রাখো তোমার যন্তর," বলল ফ্রিক। "কাণাকড়িও যদি দাম হয়, তবু

চাইনা অমন যন্তর। মেঘের দিকে তাকালেই আমি বলতে পারি রোদ উঠবে কি বৃষ্টি নামবে। পাহাড়ের ওপর মেঘ ঘনালে বা মাঠের ওপব দিয়ে মেঘের ছুটোছুটি আরম্ভ হলেই আমি জানতে পারি আজ-কাল পরশু কেমন যাবে। অত কথায় দরকাব কি। চেয়ে ছ্যাখ। কি দেখছ? মাটি থেকে কুয়াশা উঠছে, তাই তো? কেন? না, আগামীকাল বৃষ্টি হবে।"

কথাটা সত্যি। প্রকৃতিব নাড়ি নক্ষত্র জেনে বসে আছে ফ্রিক। মাঠেঘাটে ঘুরে আর প্রকৃতিব হালচাল দেখে অনেক কিছুই তার জানা হয়ে গিয়েছে। আবহাওযাব খবব জানবাব জন্যে তার ব্যাবোমিটারেব দবকাব হয় না।

"ঘড়ি চাই?" শুধোল ফেবিওযালা।

"ঘড়ি। ঘড়ি নিয়ে কি কবব হে? ঘড়ি তো আমাব মাথার ওপবেই ঝুলছে। সূর্য নিজেই সময বলে দিচ্ছে। বন্ধু, রোডাক পাহাড়ের চূড়োয় সূর্য পৌছোলেই বুঝতে পাবি ভর-দুপুর হল। ইজেন্টের ফাঁক দিয়ে রোদ উঁকি দিলেই বুঝি ছটা বাজল। শুধু আমি কেন, আমার ভেড়া-কুকুররা পযন্ত সূয দেখে সমযেব হিসেব রাখে। তোমার কলের ঘড়ি তুলে রাখো হে, আমার দরকার নেই।"

"তোমার মত মেষপালক-খদ্দের আরো জুটলে দেখছি পাততাড়ি গুটোতে হবে আমাকে। তাহলে কিছুই চাইনা তোমার?"

"কিস্সুনা।"

জিনিসগুলো অবশ্য সবই খেলো। সস্তার তিন অবস্থা বলতে যা বোঝায়, তাই। ব্যারোমিটারের যা অবস্থা, থার্মোমিটাবেরও তাই। সঠিক আবহাওযা বা তাপমাত্রা মেলা ভাব। ঘড়ি তো নয়, ঘোড়া, নয়তো কচ্ছপ। কখনো দোড়দৌড় করছে। কখনো চলতেই চাইছে না। ঘোড়েল ফ্রিক তা আঁচ কবেই কেনাকাটাব মধ্যে গেল না। বাঁকানো লাঠিটা মাটি থেকে কুড়িয়ে নিতে যাচ্ছে ফের রওনা হবে বলে, এমন সময়ে চোখ আটকে গেল একটা নলেব ওপর। নলটা ঝুলছে ফেবিওয়ালাব কোমর থেকে।

"ওটা কিসের নল?"

"নল নয়।"

"তবে কি ঘোড়া-পিস্তল?"

"মোটেই না!"

"তবে?"

"টেলিস্কোপ।"

খুবই মামুলি দূরবীন। দূরের জিনিসকে পাঁচ-ছ গুণ বাড়িয়ে ততখানি কাছে নিয়ে আনবার মত সস্তা দরে ফক্কিকারি টেলিস্কোপ।

বেল্ট থেকে দূরবীন টেনে নিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখল ক্রিক, টেনেটুনে দেখল নলটা।

তারপর মাথা নাড়তে নাড়তে বললে—"টেলিস্কোপ কি জিনিস?"

"অনেক দূরের জিনিস দেখতে পাবে।"

"ওঃ! তাই বললেই হয়! দূরের জিনিস দেখবার সঙ্গে আমার চোখজোড়া তো রয়েছে। আকাশ পরিষ্কার থাকলে রিটিযিসার্ট পাহাড়ের সবচাইতে দূরের চূড়ো থেকে আরম্ভ করে ভলক্যান উপত্যকার বন জঙ্গল পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পাই।"

"চোখ জ্বালা করে না?"

"কেন করবে? সারারাত তারাদের তলায় ঘুমোই যে। রাতের শিশির চোখের মণি পরিষ্কার করে দেয়, চোখের জ্যোতি বাড়িয়ে দেয়।"

"শিশির!" আঁৎকে উঠল ফেরিওয়ালা। "বল কি হে! অন্ধ হয়ে যাবে যে।"

"মেষপালকরা অন্ধ হয় না, বন্ধু।"

"কি দুঃসাহস! যাই হোক, তোমার চোখের জোর যতই হোক না, আমি আমি আমার টেলিস্কোপ দিয়ে ঢের বেশি দেখতে পাই।"

"ও রকম সবাই বলে।"

"নিজেই ছাখ না!"

"আমি?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাচাই করে নাও।"

"দেখলে পয়সা লাগবে না তো?" ক্রিক সন্দিগ্ধ হল।

"আরে না! না কিনলে পয়সা দেবে কেন?"

আশ্বস্ত হল ক্রিক। বাঁ-চোখ টিপে ডান চোখ লাগাল টেলিস্কোপে।

প্রথমে দেখল ভলক্যান পাহাড়। তারপর পাহাড়ের ওপর দিয়ে চোখ নিয়ে তাকালো বার্স্ট গ্রামের দিকে।

"সত্যিই তো! খালি চোখে তো এতদূর দেখতে পাই না। ঐ তো বড় রাস্তা। লোকগুলোকে পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পারছি। ঐ তো নিক ডেক। জঙ্গলের পাহারাদার। কাঁধে বন্দুক, পিঠে ঝোলা। জঙ্গলে টহল দিয়ে বাড়ি ফিরছে।"

"কেমন, বলিনি আমি?" বলল ফেরিওয়ালা।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিক, সত্যিই নিক! কোলজ-য়ের বাড়ি থেকে একটা মেয়ে বেরিয়ে আসছে দেখছি! লাল পেটিকোট আর কালো জামা পরে আছে।"

"ভালো করে তাকাও, চিনতে পারবে।"

"মিরিওটা! মিরিওটা! সুন্দরী মিরিওটা! ভাবী বরের কাছে চুপি চুপি এসেছে! কিন্তু আমি দেখে ফেলেছি! দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি তোমার! বিয়ের আগে লুকিয়ে চুরিয়ে দেখা করা বের করছি!"

"এই তো মুখে খই ফুটছে! বলি, টেলিস্কোপকে আর হেনস্থা করবে?"

"হে-হে-হে! ওরে বাসরে! নল দিয়ে অ্যাদ্দুর দেখা যায় কি করে জানব বল!"

বার্স্ট গ্রামটা অজ-পাড়া-গাঁ বলতে যা বোঝায়, তাই। সভ্যতার সুবিধে অতদূর পৌঁছোয় না। টেলিস্কোপ জিনিসটা জীবনে প্রথম দেখে তাই মুণ্ডু ঘুরে গেল ফ্রিকের।

"তাকাও! তাকাও! আরো দূরে তাকাও! গ্রাম এমন কিছু দূরে নয়। আরো দূরে তাকাও! প্রাণ ভরে দেখে নাও। শুধু চোখে যা দেখা যায় না!" উৎসাহ দিল ফেরিওয়ালা।

"পয়সা লাগবে না তো?"

"একদম না।"

"এই তাকালাম আরো দূরে। ঐ তো হাজারিয়ান সিল··লিভাড জেলের ঘড়ি-ঘর! চূড়োর ক্রুশটার একটা ডাঁটি ভাঙা দেখেই চিনতে পারছি· আরও দূরে উপত্যকার মাঝে পাইনের জঙ্গলে পেট্রোসেনির ছুঁচোলো মিনারটা পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে! সাবাস! মিনারের চূড়োয় টিনের মোরগটা এমন ভাবে ঠোঁট ফাঁক করে রয়েছে যেন কোঁকর-কোঁ করল বলে!· আরও দূরে জঙ্গলের মাঝে আর একটা টাওয়ার দেখতে পাচ্ছি পেট্রিলা টাওয়ার!· পেট্রিলা টাওয়ার! হ্যাগো ফেরিওয়ালা—একদর তো?"

"একদর!"

টেলিস্কোপ ঘুরিয়ে ওরগাল প্লেটের দিকে তাকাল ফ্রিক। দেখল কুয়াশা ধূসর অরণ্যভূমির ওপাশে প্লেসা-র ঢালু অঞ্চল। বহুদূরের প্রাসাদ-দুর্গ ক্যানভাসে আঁকা ছবির মত ফুটে রয়েছে বন্য-সৌন্দর্যের পটভূমিকায়।

"ঠিক দেখেছি!" সোল্লাসে বলল ফ্রিক। "একটা ডাল ভেঙে পড়ে রয়েছে মাটিতে! বীচ গাছে রয়েছে মাত্র তিনটে ডাল। কারও সাধ্যি নেই ভাঙা ডাল কুড়িয়ে নেওয়ার না, আমারও নেই· ইহকাল পরকাল গোল্লায়

যাবে ও-ডাল ছুঁলে ·আজ রাতেই অবশ্য ডাল আর ওখানে থাকবে না··· কুড়িয়ে নিয়ে যাবে চর্ট নরকের আগুন জ্বালানোর জন্যে !·

গ্রাম্য ভাষায় শয়তানের নাম 'চর্ট'! ফ্রিক বলতে চাইছে, ভাঙা ডাল দিয়ে নরকে আগুন জ্বালায় শয়তান স্বয়ং! মানুষ, তুমি লোভ করতে যেও না! মারা পড়বে!

ইহুদী বেচারার মাথা ঘুরছিল এইসব উল্টোপাল্টা দুর্বোধ্য কথাবার্তা শুনে। গাঁয়ের লোক হলে প্রবাদ জানা থাকত। মানে বুঝত। কিন্তু এ গ্রামে তো নয়ই, ধারে কাছেও তার নিবাস নয়। তাই ভ্যাবাচাকা মুখে বেচারা চেয়ে রইল ফ্রিকের দিকে।

ফ্রিকের মুখের কিন্তু বিরাম নেই—"একি! একি! একি! দুর্গের ঠিক মাঝখানে প্রধান আশ্রয়-মন্দির থেকে কুয়াশা বেরোচ্ছে কেন?···· কুয়াশাই তো?··· উঁহু ·এযে ধোঁয়া! অসম্ভব! অসম্ভব! এ দুর্গের চিমনীতে বহু শতাব্দী ধোঁয়া দেখা যায় নি! আমি ভুল দেখছি!"

"বন্ধু," বলল ফেরিওয়ালা। "তুমি ঠিকই দেখছ! ধোঁয়া দেখে থাকলে ধোঁয়াই দেখেছ—অন্য কিছু নয়।"

"বললেই হল? তোমার যন্তরের কাচে নোংরা জমেছে।"

"বেশ তো। কাচ সাফ করে নাও।"

"নিয়ে?"

"ফের চোখ লাগাও।"

তাড়াতাড়ি কাচটা মুছে নিয়ে ফের চোখে লাগাল ফ্রিক। ফের দেখা গেল, কুণ্ডলি পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে আশ্রয়-মন্দিরের ছাদ থেকে। অনেক উঁচুতে উঠে মিশে যাচ্ছে মেঘের সঙ্গে।

স্তব্ধ বিস্ময়ে চেয়ে রইল ফ্রিক। ভুলে গেল চোখের পাতা ফেলতে। জিবটাও বুঝি অসাড় হয়ে গেল। কথা আর বেরোল না বিকল বাকযন্ত্রে!

নির্বাক নিশ্চুপ নিথর দেহে সে দেখল, ধোঁয়া উঠছে উঠছে·· উঠছে! আর, কার্পেথিয়ান কাস্‌ল্‌-এর সুদীর্ঘ ছায়া সরে এসে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যাচ্ছে ওরগাল প্লেটোর সমতল ভূমি।

আচম্বিতে দূরবীন নামাল ফ্রিক। আলখাল্লার ভেতরে হাত পুরে খামচে ধরল টাকা পয়সার থলি।

বলল—"কত দাম তোমার নলের?"

"দেড় ফ্লোরিন!"

এক ফ্লোরিন পেলেই বর্তে যেত ফেরিওয়ালা। ফ্রিক দরাদরি করলেই

দাম নামিয়ে আনত। কিন্তু ফ্রিকের তখন দর কষাকষি করবার মত মনের অবস্থা নয়। ধোঁয়া-রহস্য তখনো তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। অভিভূত অন্তরে তাই থলি থেকে দেড় ফ্লোরিন তুলে নিয়ে গুঁজে দিল ফেরিওয়ালার হাতে।

"বলি, কার জন্যে কেনা হল টেলিস্কোপটা? নিজের জন্যে তো?"

"মোটেই না। আমার মনিব ধর্মাবতার কোল্জ-য়ের জন্যে।"

"দাম পাবে তো?"

"দু ফ্লোরিন তো বটেই!"

"অ্যাঁ! দু ফ্লোরিন?"

"নিশ্চয়! বেশীও হতে পারে। গুভ ইভনিং, বন্ধু।"

বলেই শিস দিয়ে উঠল ফ্রিক। সংকেত বুঝল পোষা কুত্তাদুটো। তাড়িয়ে নিয়ে চলল ভেড়ার পাল-কে গাঁয়ের দিকে।

"পাগল নাকি!" ফ্রিকের অপস্রিয়মান মূর্তির দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল ইহুদি ফেরিওয়ালা। "আগে জানলে আরো চড়া দর হাঁকা যেত।"

বলে, জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে কাঁধ আর বেল্টের মালপত্র ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নিয়ে ফেরিওয়ালাও পা চালাল সিল নদীর দক্ষিণ পাড় বেয়ে!

কোথায়? কি লাভ জেনে? এ-কাহিনীতে আর তো সে আসছে না।

২॥ ভূত পেত্নী-দত্যি দানা মামদোছানা গলা খোনা!
ছায়ায় গড়া বিকট দেহ ভয় পায়না আছে কেহ?

দূর থেকে সব একাকার দেখায়। প্রকৃতির হাতে গড়া শৈল-সৌধ, কি, মানুষের হাতে তৈরি প্রস্তর-প্রাসাদ, কিচ্ছু বোঝা যায় না। ভূ-স্তরে প্রচণ্ড আলোড়ন দেখা দিলে গিরিমালা কুঁচকে বেঁকে তেউড়ে এই চেহারা নিতে পারে। আবার, বহুবছরের প্রচেষ্টায় সভ্য মানুষেও এমনি রুক্ষ প্রাসাদ বানিয়ে নিতে পারে। দূর থেকে কিন্তু কোনটা আসল, বোঝা মুস্কিল। একই রেখা একই আদল, একই রূপ, একই রঙ। শতাব্দীর পর শতাব্দী রোদে জলে পড়ে থাকলে যে কোনো পাহারের রঙ কালচে ধূসর হয়ে ওঠে। দূরের ঐ প্রস্তর-পিণ্ডতেও মানুষের হাত পড়েছে কিনা বোঝা যায় না কাছে না গেলে।

বিরাট ঐ প্রাসাদের নাম কার্পেথিয়ান কাস্ল্। ওরগাল প্লেটো কোথায় শেষ হয়েছে এবং প্রাসাদ-দুর্গ কোনখান থেকে শুরু হয়েছে, ধরা যায় না। যেহেতু ভলক্যান পাহাড়ের বাঁ দিকের মুকুট মণি বললেই চলে ওরগ্যাল

প্লেটোকে, সুতরাং পাথরের ঐ মস্ত গড়টা নাকি প্রকৃতিই বানিয়ে রেখেছেন। আশ্রয়-মন্দিরের উঁচু চুড়োটা আসলে নাকি পাথরের টিলা, সুউচ্চ প্রাচীর গুলো নাকি খাড়াই পাহাড়। সবটাই আসলে মরীচিকা, চোখের ধোঁকা। এত অস্পষ্ট, ভাসমান, অনিশ্চিত দৃশ্যকে বাস্তব বলা চলে না কোন মতেই। টুরিস্টরা এই সব কারণেই বলে, কার্পেথিয়ান কাস্‌লের আদৌ কোনো অস্তিত্ব নেই। ভীতু গেঁইয়াদের মনের বিকার ছাড়া কিছুই নয়।

ফক্কিকারি টেলিস্কোপ দিয়ে ফ্রিক যা দেখতে পেয়েছিল। তার চাইতেও অনেক কিছু অবশ্য দেখা যেত আরো ভালো টেলিস্কোপের মধ্যে দিয়ে। খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যেত এই রকম একটা দৃশ্য :

ভলক্যান পাহাড়। কয়েকশো ফুট পেছনে ধোঁয়াটে রঙের ঘেরবন্দী খানিকটা জায়গা। চারপাশে মহীরুহের পাহারা। উঁচুনিচু মালভূমিব কয়েকশো ফুট দখল করে রয়েছে রহস্যধূসর এই প্রাসাদপুরী। চার কোণে চারটে গম্বুজের গোড়া থেকেই উঠেছে বিখ্যাত বীচগাছটা। বাঁদিকে দেওয়াল এগিয়ে গিয়েছে—অনেকটা উড়ুক্কু পোস্তার আকারে মস্ত গির্জের চূড়োকে ঠেস দিয়ে ধরে রেখেছে। গির্জের ঘণ্টা ফেটে ফুটিফাটা হয়েছে অনেকদিন। ঝড উঠলে বা হাওয়ার তেজ বাড়লেই ঘণ্টা দোলে ঢংঢং। শব্দটা ভুতুড়ে ঘণ্টা ধ্বনির মত ছড়িয়ে যায় দিক হতে দিগন্তে। শুনে আঁৎকে ওঠে গ্রামবাসীরা। মাঝখানে একটা ডোনজোন অর্থাৎ সেপাইদের আশ্রয়-মন্দির। বিরাট ডোনজোন। দেখলে বুক কেঁপে ওঠে। রাক্ষুসে ডোনজোনের জানলা গুলোও তেমনি প্রকাণ্ড। সবশুদ্ধ তিনসারি জানলা। একতলায় বৃত্তাকার ছাদ। মাঝে সূক্ষ্মশীর্ষ ধাতুর গম্বুজ। চূড়ায় আড়ষ্ট একটা কারুকাজ করা ধাতুর মোরগ। সামন্তযুগীয় মোরগ। হাওয়ার গতি নির্দেশ করা তার কাজ। কিন্তু মরচে পড়ে আড়ষ্ট হয়ে গিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে দক্ষিণ পুবদিকে।

প্রাসাদ-কেল্লার ভেতরে মানুষ থাকে কিনা জানা নেই। খিড়কির দরজা বা টানাপুল দিয়ে গড়ের ভেতরে প্রবেশ করা যায় কিনা, তাও জানা নেই। পাঁচিলের ওদিকে প্রাসাদ পুরীর চেহারা কিরকম, সে বর্ণনাও দিতেও সবাই অক্ষম। অনেক · অনেক বছর ও তল্লাট কেউ মাড়ায় না। এক কালে নিশ্চয় মধ্যযুগীয় কামান বন্দুক দিয়ে সুরক্ষিত রাখা হয়েছিল কাস্‌লকে। বম্বার্ড, কালভেরিন, থানডারার দেখলেই রক্ত হিম হয়ে যেত আগন্তুকের—কাছে এগোনোর সাহস হত না। এখন কিন্তু সেসব না থাকলেও কার্পেথিয়ান কাস্‌লকে আগলে রেখেছে সীমাহীন আতংক। কুসংস্কারের বেড়াজালে

বন্দী গ্রামবাসীরা। কার্পেথিয়ানরা কাস্‌লে ছায়া মাড়ানোর সাহস কারো নেই।

গাঁয়ের লোক ভয়ে কাঠ হয়ে থাকুক। কার্পেথিয়ান কাস্‌ল্‌ কিন্তু পর্যটক আর পুরাতত্ত্ববিদদের দেখার মত জায়গা। মালভূমির ওপরে নির্মিত হওয়ায় বেশ খোলামেলা জায়গা। ডোনজোনের ছাদে উঠলে দূরের পাহাড় পর্যন্ত দেখা যায়। তরঙ্গায়িত গিরিমালার ওদিকে ওয়ালাচিয়ান সীমান্ত চোখের সামনে ভাসে। সামনে ভলক্যান পাহাড় আর উপত্যকা—পাশাপাশি দুটো প্রদেশে যাতায়াতের একমাত্র পথ! সিল নদীর অববাহিকার ওপাশে এক থোকা শহর—কয়লা সমৃদ্ধ অববাহিকার কয়লা লুণ্ঠনের জন্যেই গজিয়ে উঠেছে জনপদের পর জনপদ। আরও দূরে দিগন্তজোড়া ধূসর পর্বত শ্রেণী। সানুদেশ গাছপালায় কালো, ঢালু অঞ্চল ঘাস-সবুজ, শিখর দেশ বিলকুল ন্যাড়া। রিটিযাট আর প্যারিং-এর এবড়ো খেবড়ো শীর্ষ পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায় সেখান থেকে। দৃষ্টির শেষসীমায় কুয়াশার ঘোমটায় আবছা একটা রেখা—মধ্য ট্রানসিলভানিযার আল্পস্‌ পাহাড়।

এককালে এখানে একটা হ্রদ ছিল। সিল নদী দুদিক থেকে এসে হুড় হুড় করে জল ঢালত হ্রদে। তারপর বেরিয়ে যেত পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে। এখন হ্রদ নেই। বাটির মত সুগভীর অঞ্চল খুঁড়ে কয়লা তুলে আনা হচ্ছে। তাতে সুবিধে যেমন হচ্ছে, অসুবিধেও হচ্ছে বইকি। ধোঁয়ার মস্ত চিমনীগুলো তালঢ্যাঙা পপলার, পাইন, বীচগাছের ভিড়ে গা ঢাকা থাকলেও ধোঁয়ার বিষে বাতাস বিষিয়ে যাচ্ছে। ফল আর ফুলের সুগন্ধ পর্যন্ত মাটি হতে বসেছে।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয় কার্পেথিয়ান কেল্লা-প্রাসাদ। তখনকার প্রথা অনুসারে শহর বা গ্রাম বানানোর মতই অশেষ যত্নসহকারে নির্মাণ করা হত প্রাসাদ, কেল্লা, মঠ আর গির্জে। বাইরের উৎপাত যেন ঘরে ঢুকতে না পারে, হানাদার যেন চৌহদ্দি মাড়াতে না পারে,—তৈরির সময় থেকেই প্রখর দৃষ্টি রাখা হত সে ব্যাপারে। এই কারণে গড়ের প্রাচীর আর গম্বুজ দেখে মনে হয়েছিল মধ্যযুগীয় কেল্লাবিশেষ—প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থায় পুরোপুরি নিখুঁত।

কিন্তু মনটা তবুও খুঁত খুঁত করে। এত উঁচুতে, মালভূমিতে এসে প্রাসাদ-দুর্গ বানাবার সখ হল কোন স্থপতির? নামটা আজও তমসাবৃত। ওয়ালাচিয়ান পৌরাণিক গানে গল্পে একজন বিখ্যাত স্থপতির গৌরব-গাথা শোনা যায়। নাম তাঁর রুমানিয়ান ম্যানোলি। রুডলফ দি ব্ল্যাক-য়ের

বিখ্যাত কাসল কোর্ট অ্ আর্জিস ইনিই বানিয়েছিলেন। কে জানে কার্পেথিয়াল কাসল্ও তাঁর সৃষ্টি কি না।

স্থপতি নিয়ে সন্দেহ থাকে থাকুক, গড়ের বাসিন্দাদের ইতিবৃত্ত জানতে কারো বাকি নেই। স্মরণাতীত কাল থেকে গর্তস্ ব্যারনরা এ-তল্লাটের শাসনকর্তা। অনেক লড়াই লড়েছেন তাঁরা। ট্রানসিলভানিয়ার মাঠঘাট রক্তে লাল করে দিয়েছেন এক-একটা যুদ্ধের পর। হাঙ্গারিয়ান, স্যাক্সন, সেকলার—কাউকে রেয়াৎ করেন নি। 'ক্যানটিস' আর 'ডোনি'তে দেশের সেই দুর্দিনের কথা সবিস্তারে লেখা আছে। গর্তস্ ব্যারনদের শৌর্যবীর্যের কাহিনীও বাদ যায় নি।

ওয়ালাচিয়ান প্রবাদবাক্য অনুসারে ওঁদের জীবনের ধর্মই ছিল 'দেশের জন্যে রক্ত পর্যন্ত দিতে হবে'। সত্যিই তাঁরা রক্ত ঢেলে দিয়েছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামে। রোমানদের বংশধর তাঁরা। বীরের মতই তাই জীবন দিয়েছেন—রোমান রক্ত মাটিতে মিশিয়ে ছেড়েছেন।

কিন্তু এত শৌযবীয সত্ত্বেও পরদেশীর পদানত হতে হল রুমানিয়ানদেব। বীরপুরুষদের বংশধরদের এমন হাল হবে কে জানত! অযোগ্য শাসকের রক্তচক্ষুর সামনে মাথা হেঁট করল দেশবাসী। শুরু হল উৎপীড়ন। কিন্তু তক্কে তক্কে রইল ওয়ালাচিয়ানরা। সুযোগ এলেই মাথা চাড়া দিতে হবে। বিদেশী শাসককে দেশ থেকে তাড়াতে হবে। মুখে মুখে ফিরতে লাগল মূল মন্ত্র—"রুমানিয়ানরা কক্ষণো নিশ্চিহ্ন হবে না—হতে জানে না!"

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি গর্তস্ পবিবারের শেষ বংশধর বলতে রইলেন একজনই—ব্যারন রুডল্ফ্। গডের মধ্যেই তাঁর জন্ম। অল্প বয়েসেই আত্মীয়স্বজনদের মরতে দেখেছেন একে একে। বাইশ বছর বয়েসে ত্রিসংসারে আপন বলতে আর কেউ রইল না। রহস্যাবৃত বীচগাছের পাতা ঝরে যাওয়ার মতই বছরে বছরে তাঁর আপনজনেরা বিদায় নিল ধরাধাম থেকে।

আত্মীয়স্বজনহীন নিবান্ধব ব্যারন রুডলফ মৃত্যুপুরীতে আর টিঁকতে পারলেন না। তাঁর রুচি, প্রবৃত্তি, কর্মকুশলতা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা না গেলেও একটা খবর সবাই জানত। ব্যারন গানবাজনার ভীষণ ভক্ত। গান বলতে তিনি পাগল। সুরসুধায় তিনি নিমগ্ন থাকতে পারলে আর কিছুই চাইতেন না।

তাই একদিন বুড়ো চাকরদের হাতে ভাঙাচোরা কাসল্ সঁপে দিয়ে দেশত্যাগী হলেন ব্যারন। টাকার অভাব ছিল না তাঁর। শোনা যায় ইউরোপের বহু সংগীত-কেন্দ্র আর ইটালী, জার্মানী, ফ্রান্সের নাটকমহলে সেই টাকা তিনি

বিলিয়ে দিয়েছিলেন। ব্যারন রুডলফ বদ্ধ উন্মাদ ছিলেন কিনা জানা নেই। ছিটগ্রস্ত ছিলেন সন্দেহ নেই। ভদ্রলোকের কাণ্ডকারখানা দেখে অন্ততঃ তাই মনে হয়।

জন্মভূমিকে কিন্তু ভুলতে পারেন নি ব্যারন। বাইরে বাইরে ঘুরলেও একবার ফিরে এসেছিলেন স্বদেশে। রুমানিয়ান চাষারা অস্ত্র ধরেছিল হাঙ্গারিয়ান শাসকদের বিরুদ্ধে। ব্যারন রুডলফ অস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন কৃষকদের পাশে।

কিন্তু শোচনীয় পরাজয় ঘটল কৃষকবাহিনীর। বিজয়ী সেনারা ভাগাভাগি করে নিল সাধের জন্মভূমিকে। ক্ষোভে দুঃখে জন্মের মত দেশ ছেড়ে চলে গেলেন ব্যারন।

কারপেথিয়ান কাস্‌ল্‌ আস্তে আস্তে জনশূন্য হয়ে এল। মনিব চলে যেতেই চাকরবা কেউ পালিয়ে গেল, কেউ মারা গেল। প্রাসাদ দুর্গের বহু জায়গা তখন ধ্বসে পড়ছে। পোড়ো কেল্লায় মানুষ বলতে শেষে কেউ আর রইল না।

ব্যারন রুডলফ সম্পর্কে অনেক গুজব ছড়িয়ে পড়ল। ব্যারন নাকি ডাকাতদলে যোগ দিয়েছেন। রোসজা স্যানডর এককালে ডাকাতি করে নাম কিনেছিল। নামডাক আরো ছড়িয়ে পড়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামে শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করায়। ব্যারন নাকি এই রোসজা স্যানডরের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন এবং রোসজা ফের ডাকাতি আরম্ভ করেছে। পুলিশের সঙ্গে টক্কর দিতে গিয়ে ব্যারন ধরা পড়েছেন এবং জেলে পচছেন।

কেউ কেউ বললে, রোসজার সঙ্গে শুল্ক অফিসারদের দারুণ যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে সীমান্ত অঞ্চলে। ব্যারন রুডলফ প্রাণ হারিয়েছেন সেই যুদ্ধে। কথাটা সত্যি কি মিথ্যে, তা যাচাই করা যায় নি। তবে, সেই থেকে কার্পেথিয়ান কাস্‌লের অধিপতিও আর গড়ে ফিরে আসেন নি। তাই ধরে নেওয়া হল, ব্যারন রুডলফ আর বেঁচে নেই।

বিধ্বস্ত প্রাসাদ-দুর্গ একাকী দাঁড়িয়ে রইল পাহাড়ের মাঝে। ঠিক যেন একটা ভুতুড়ে কেল্লা। পরিত্যক্ত, রহস্যাবৃত। ক্রমে ক্রমে অনেক কাহিনী ছড়িয়ে পড়ল ভুতুড়ে কেল্লাকে কেন্দ্র করে। জনহীন গড়ে নাকি ভূতের নাচ দেখা যায়। সারারাত ধরে অশরীরীরা অট্টহাসি হাসে, কায়াহীনের দল আসর জাঁকিয়ে বসে। ইউরোপের নানান অঞ্চলে এমনি আজগুবী গল্প হামেশা শোনা যায়। কুসংস্কার জিনিসটা ইউরোপেও আছে বইকি। সব চাইতে বেশি আছে ট্রানসিলভানিয়ায়।

বার্স্ট গ্রামের কথাই বলা যাক। এ গাঁয়ের পুরুত থেকে আরম্ভ করে

স্কুল মাস্টাররা পর্যন্ত রসিয়ে রসিয়ে ভূতপ্রেতের গল্প বলতে লাগল পথেঘাটে স্কুলে। স্কুলে লেখাপড়ার বদলে আর ধর্মমন্দিরে ধর্মাচরণের পরিবর্তে এই সব গল্পই শোনা গেল বেশি করে।

বানিয়ে গল্প বলেও ক্ষান্ত হলেন না পুরুৎ আর শিক্ষকরা। ঝুড়ি ঝুড়ি প্রমাণ হাজির করলেন। পিশাচ-নেকড়েদের নাকি সারা রাত মাঠে ঘাটে টহল দিতে দেখা গেছে। নিশুতি রাতে নাকি রক্তপায়ী পিশাচরা কবর থেকে উঠে এসে ঘুমন্ত মানুষের টুঁটি কামড়ে রক্ত পান করে তেষ্টা মেটাচ্ছে। ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ঘুর-ঘুর করছে 'স্টাফি'রা, রোজ রাতে পানভোজনের ব্যবস্থা না থাকলে গেরস্তের বাড়ি পর্যন্ত চড়াও হচ্ছে। কিছু দুষ্ট আত্মা পরী সেজে হামলা জুড়েছে মাঠে ঘাটে, বুধবার আর শুক্রবারে তাদের দেখে ফেললে আর রক্ষে নেই। দানবিক ড্রাগন 'বেলোরি'রা জঙ্গলের মাধ্যে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে আর মুখ তুলে মেঘের গা চাটছে। বিশাল ডানা মেলে 'জেমি' ভূতেরা খানদানী ঘরের মেয়ে দেখলেই উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে—গরীব গেরস্তর সুন্দরী মেয়েদেরও রেহাই দিচ্ছে না। আগুনের চুল্লীর পেছনে সাপ-ভূতদের নাকি দুধ খাইয়ে ভুলিয়ে রাখছে ভীতু চাষীরা।

সবচেয়ে ভয়ংকর হল, এত ভূতপ্রেত একযোগে নাকি আড্ডা গেড়েছে কার্পেথিয়ান কাস্‌ল্‌-য়ে। জনহীন ভাঙা কেল্লা পেয়ে তাদের হয়েছে পোয়াবারো। মালভূমি থেকে, পাহাড় থেকে, জঙ্গল থেকে ভূতপ্রেত দত্যিদানো পিশাচ ডাইনীরা এসে নরক গুলজার করছে ভাঙা গড়ে। কবর থেকে গর্ত্‌স্‌ পরিবারের ব্যারন-ভূতরাও নাকি উঠে এসেছেন মওকা বুঝে।

ভয় জিনিসটা সংক্রামক। সুতরাং পিলে চমকানো গল্পকথা শোনবার পর ভুতুড়ে কেল্লার ছায়াও মাড়ায় না কেউ।

তবে হ্যাঁ, ভূতপ্রেতদের আড্ডা একদিন ভাঙবেই। বীচগাছের ডালগুলো যেদিন ভেঙে পড়বে, কেল্লার সব পাথরও সেদিন খসে পড়বে। ভূতেরা সেদিন ফিরে যাবে যে-যার জায়গায়।

বীচ গাছ নিয়ে ভুতুড়ে কাহিনীর সূত্রপাত সেই থেকেই। ব্যারন রুডলফ অন্তর্হিত হওয়ার পর থেকেই নাকি ফি-বছরে একটা করে ডাল খসে পড়েছে বীচ গাছের। ছিল আঠারোটা ডাল, এখন রয়েছে মোটে তিনটে। তার মানে আর তিনটে বছর পরে শুধু গুঁড়িটাই দাঁড়িয়ে থাকবে। প্রেতপুরীও ভূমিসাৎ হবে।

কল্পলোকের গল্পকথায় সবই সম্ভব। ফি-বছরে ডাল খসার দৃশ্য সত্যিই কেউ দেখেছে কি? ফ্রিক ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে বলবে—"আলবৎ দেখেছে।

আমি দেখেছি। রোজ মাঠে শুয়ে ঐ দিকেই তো তাকিয়ে থাকি আমি।"

তার মানে, শুধু ফ্রিকই দেখেছে। দেশের বাকি লোক তার মুখেই শুনেছে ডাল খসার লোমহর্ষক বৃত্তান্ত। অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করেছে। দিন গুনছে শেষের সে দিনের।

তাই হন হন করে গাঁয়ে ফিরছিল ফ্রিক। খালি চোখে যা দেখা যায় নি, টেলিস্কোপের দৌলতে তাই দেখা গিয়েছে। ধোঁয়া উঠছে! সত্যিকারের ধোঁযা মেঘলোক পর্যন্ত উঠে যাচ্ছে—বাষ্প নয়! কিন্তু ধোঁয়া তো আগুন থেকে বেরোয়! আগুন জ্বালায় মানুষ। ভাঙা কেল্লায় মানুষ তো থাকে না। টানা পুল নামিয়ে, ফটক পেরিয়ে কেউ ঢোকেনি ও কেল্লায় বহু বছর। তবে কি অ-মানুষরা হানা দিয়েছে পোড়ো গড়ে? কায়াহীনের দল এসে কাঠকুটো পোড়াচ্ছে? কেন? অলৌকিক আগুন কে জ্বালাচ্ছে? আগুনটা রান্নাঘরে জ্বলছে কিনা, তাই বা কে বলতে পারে?

হন হন করে গাঁয়ে ফিরে চলল ফ্রিক। একজন কৃষক হাসিমুখে বলল—গুড ইভনিং। শুনেও শুনল না ফ্রিক। জবাবও দিল না। অথচ জবাব দেওয়াটাই রেওয়াজ। 'গুড ইভনিং' শোনবার পর মেষপালকও শুভেচ্ছা জানাবে—এই হল গাঁয়ের নিয়ম। কিন্তু আজ হল কি ফ্রিকের? খারাপ খবর আছে মনে হচ্ছে।

জাজ কোল্জ-য়ের কানেই সবার আগে পৌঁছাল দুঃসংবাদ। দূর থেকে তাঁকে দেখেই হেঁকে উঠল ফ্রিক—

"মাস্টার! মাস্টার! কাস্‌ল্-যে আগুন জ্বলছে।"

"বলছ কি!"

"ঠিকই বলছি!"

"মাথা খারাপ হল নাকি?"

কার্পেথিয়ান কাসল মানেই তো পাথরের স্তূপ। পাথরে আবার আগুন লাগবে কি?

ফের শুধোলেন মাস্টার কোল্জ—"কাস্‌ল্‌যে আগুন লেগেছে?"

"আগুন নয় মাস্টার, ধোঁযা!"

"নিশ্চয় কুয়াশা।"

"না, ধোঁয়া। নিজেই দেখুন না কেন।"

বড় রাস্তা দিয়ে দুজনে হেঁটে পৌঁছোল মালভূমির একটা ঢিপির ওপর কার্পেথিয়ান কাস্‌ল্‌কে স্পষ্ট দেখা যায় এখান থেকে।

মাস্টার কোল্‌জের হাতে টেলিস্কোপ তুলে দিল ফ্রিক।

বোকার মত তাকিয়ে রইলেন মাস্টার কোল্‌জ। তিনিও গাঁয়ের মানুষ; টেলিস্কোপ কি জিনিস, জানেন না।

শুধোলেন—"এটা আবার কি ?"

"দু' ফ্লোরিন দিয়ে কিনেছি মাস্টার। দাম হওয়া উচিত চার ফ্লোরিন।"

"কার কাছ থেকে কিনেছ ?"

"একটা ফেরিওয়ালার কাছ থেকে।"

"কি হয় এ দিয়ে ?"

"চোখে লাগান, কাস্‌ল্‌-য়ের দিকে তাকান।"

তাই করলেন জজসাহেব। দেখলেন ডোনজোনের চিমনী দিয়ে সত্যিই ধোঁয়া বেরোচ্ছে। হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে পাহাড়ের ওপর দিয়ে।

"ধোঁয়া!" এর বেশি আর কিছু বলতে পারলেন না মাস্টার কোল্‌জ। এ কি কাণ্ড! পোড়ো কেল্লায় ধোঁয়া ?

ইতিমধ্যে মিরিওটা আর নিক ডেক-ও এসে দাঁড়াল ওদের পাশে। টেলিস্কোপ হাতে নিয়ে বলল নিক—"কি এটা ?"

"অনেক দূর পর্যন্ত দেখবার যন্তর।" বলল ফ্রিক।

"ঠাট্টা করছ নাকি ?"

"ঠাট্টা! এক ঘণ্টাও হয়নি, দেখলাম তুমি জঙ্গল থেকে বেরোচ্ছ। একটু পরেই তোমার সঙ্গে—"

কথাটা শেষ করল না ফ্রিক। কিন্তু লজ্জায় মাথা হেঁট করল মিরিওটা। বিয়ের আগে ভাবী বরের সঙ্গে দেখা করা দোষের কিছু নয়। কিন্তু সবার সামনে ফাঁস করে দিলে লজ্জা হবে না ?

দুজনেই টেলিস্কোপে চোখ লাগিয়ে পালাক্রমে তাকাল কাস্‌ল-য়ের দিকে।

ইতিমধ্যে জনাছয়েক চাষী ঘিরে দাঁড়াল ওদের।

একজন আঁৎকে উঠে বললে—"সেকী কথা! ধোঁয়া উঠছে কাস্‌ল্‌ থেকে।"

"ধোঁয়া! বাজ পড়ে নি তো ?"

"কই, আওয়াজ তো শুনি নি।" বললেন মাস্টার কোল্‌জ।

"সাতদিনের মধ্যে বৃষ্টিবাদলা হয় নি।" সায় দিল ফ্রিক।

হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইল ভীরু চাষীরা। সেই মুহূর্তে পাহাড় জ্বালামুখ হয়ে অগ্ন্যুৎপাত আরম্ভ হয়ে গেলেও বুঝি এতটা অবাক হত না কেউ।

৩॥ ভুত-ভুতুড়ে কেল্লায়—কেরে অমন চিল্লায়? গাঁ মাতল হল্লায়—দেশটা গেল গোল্লায়!

বার্স্ট গ্রামটা গ্রাম হিসেবে মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাই সব ম্যাপে এ গাঁয়ের চিহ্ন পর্যন্ত দেখানো হয় না।

গ্রাম বলতে তো একটাই রাস্তা। চওড়া রাস্তা। একটু একটু করে উঁচু হয়ে পাহাড়ের দিকে এগিয়েছে। চড়াই উৎরাইয়ের জন্যে এ-রাস্তায় হাঁটতে একটু কষ্ট হয় বইকি। বুকে লাগে। অথচ ট্রানসিলভানিয়ান আর ওয়ালাচিয়ান সীমান্ত পেরোতে গেলে এ-ছাড়া আর পথ নেই। বন্ধুর পথ মাড়িয়ে পর্যটকরাও আসে। কোলোস্‌ভার আর ম্যারোস্ উপত্যকার রেলরাস্তা যাদের পছন্দ হয় না, পিঠে ঝোলা নিয়ে তারা এই রাস্তা দিয়েই পেরিয়ে যায় সীমান্ত। টাটকা তরিতরকারী, মাংস, ফসল, ফল নিয়ে হাটে-বাজারে যায় দোকানদার। গরু ভেড়া শুয়োরের পালও সকাল সন্ধ্যা ধুলো উড়িয়ে যাতায়াত করে একই রাস্তা দিয়ে। প্রকৃতি অঢেল হাতে গাঁয়ের চারিদিকে নিজের পসরা সাজিয়ে বসে থাকলেও এখানকার লোকজন জানে না কিভাবে প্রকৃতির ভাঁড়ার লুঠ করে দু'পয়সা কামাতে হয়।

গাঁয়ে সব মিলিয়ে গোটা ষাটেক বাড়ি। রাস্তার দু'ধারে খাপছাড়াভাবে গড়ে উঠেছে বাড়িগুলো। কোনো বাঁধাধরা নক্সা নেই। এলোমেলোভাবে ছড়ানো ছিটিয়ে নানান ঢঙের নানান গড়নের বাড়ি। যে যার খুশি মত তৈরি করে এক একটা বাড়ির ছাদ। কার্নিশ ঝুলছে মাটির দেয়ালের ওপর। সামনে দালান। ওপরতলায় স্কাইলাইট লাগানো চিলেকোঠা। পাশে উঁকিঝুঁকি মারে গোলাঘর। খড়ের চালা দেওয়া আস্তাবল। এদিক-সেদিকে খুঁটির মাথায় ইঁদারা। আড়াআড়িভাবে লাগানো বরগা থেকে দড়ি বাঁধা বালতি ঝুলছে পাতকুয়োর মধ্যে। দুটো তিনটে পুকুর অবশ্য আছে। কিন্তু বাড় উঠলেই পুকুরের জল উপছে উঠে ভাসিয়ে দেয় পাশের ঘরবাড়ি—তারপর নদীর মত বয়ে যায় খানাখন্দ দিয়ে।

এই হল বার্স্ট গ্রাম! মাঝে রাস্তা। পাহাড়ের ঢালে তৈরি ষাটখানা বাড়ি। গাঁয়ে ঢুকলে কিন্তু মন তাজা হয়ে যায় ফুল আর ফলের সৌরভে। দরজায় জানলায় হরেকরকম ফুলের বাহার, খড়ের চালে লতাগাছের বিনুনী, মাটির দেওয়ালে সর্পিল লতার কারুকাজ, পপলার-এল্‌ম-বীচ-পাইন-মেপ্‌ল্ গাছের মেঘছোঁয়া সাজগোজ—সব মিলিয়ে বার্স্ট গ্রামের নিজস্ব একটা

আকর্ষণ আছে! একবার এলে ফের না এসে পারা যায় না। গাঁয়ের বুকে দাঁড়িয়ে পশ্চাৎপটের দৃশ্য দেখলে মন জুড়িয়ে যায়। পাহাড় নেচেকুঁদে হেলে-দুলে উঠছে, নামছে। আরো দূরে পাহাড়ের শ্রেণী নীলাভ রূপে মিশে গেছে নীলাকাশের সঙ্গে।

গ্রামবাসীদের ভাষা জার্মান-ও নয়, হাঙ্গারিয়ান-ও নয়—রুমানিয়ান। এমন কি যে-সব ভবঘুরে জিপসী মৌরসীপাট্টা গেড়ে বসেছে গাঁয়ের মধ্যে—তারাও কথা বলে এই ভাষায়। অন্যান্য জিপসীদের মত অস্থায়ী তাঁবু পাতে নি এরা। দিব্বি ঘরবাড়ি বানিয়ে নিয়েছে। নিজেদের ছোট্ট এলাকা গড়ে তুলেছে। গাঁয়ের ধর্মকেই নিজেদের ধর্ম করে নিয়েছে। সব জিপসীই অবশ্য তাই করে। বার্স্ট গ্রামের জিপসীরাও একপাল ছেলেপুলে নিয়ে দিব্বি আছে। গ্রীক চার্চে যায় নিয়মিত। মেনে নিয়েছে খৃস্ট ধর্মকে। গাঁয়ের পুরুৎ ভদ্রলোক থাকেন ভলক্যান গ্রামে—মাত্র আধ মাইল দূরে। দু-গাঁয়ের যজমানদের একাই সামলান তিনি।

সভ্যতার ধর্ম হল ফাঁক ফোকর পেলেই তা দিয়ে ঝিরঝির করে ঝরে পড়া এবং অনুন্নত দেশকে জ্ঞানের আলোয় প্লাবিত করা। বার্স্ট গ্রাম কিন্তু তার ব্যতিক্রম। সভ্যদেশের সর্বশেষ খুঁটি এই গ্রাম। এখানকার মানুষ বাইরের সভ্যতা দেখেনি। দেখবে কি করে? গাঁয়ের বাইরে কোনোদিন পা বাড়ালে তো? জন্ম-মৃত্যু সবই গাঁয়ের মধ্যেই। তাই কোলোস্‌ভার অঞ্চলে সব চাইতে পেছিয়ে পড়া গ্রাম যদি কোথাও থাকে, তবে তা এই বার্স্ট গ্রাম।

তবে কি গ্রামে স্কুল মাস্টারও নেই? আছে বই কি। জজসাহেবও আছেন একজন। কিন্তু দুজনেরই বিদ্যের দৌড় অতি সামান্য। মোল্লার দৌড় যেমন মসজিদ পর্যন্ত, এঁদের জ্ঞানের বহরও তেমনি গাঁয়ের মধ্যেই সীমিত। ম্যাজিস্টার হার্মড শুধু অক্ষর চিনতে পারেন এবং সামান্য কিছু লিখতে পারেন। ঐ বিদ্যে নিয়েই তিনি বনগাঁয়ে শেয়াল রাজা হয়ে বসে আছেন। বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্যের ধার ধারেন না—নামও শোনেন নি কোনোকালে। গ্রামের লোকগীতি ছাড়া আর কিছুই জানেন না। এ-ব্যাপারে জ্ঞান তাঁর টনটনে। জীবন্ত রূপকথার বই বললেও চলে। যত কিছু উদ্ভট উপকথা, লোমহর্ষক রূপকথা, গা ছমছমে প্রেতকথা নিরন্তর গজগজ করছে তাঁর মগজের মধ্যে এবং অসীম উৎসাহে ছাইপাঁশ শিখিয়ে চলেছেন সরল শিশুদের।

গাঁয়ের চীফ জাস্টিস অর্থাৎ প্রধান বিচারপতির নাম আগেই বলেছি। মাস্টার কোল্‌জের বয়স পঞ্চান্ন থেকে ষাট। বেঁটেখাটো চেহারা। বাপ

পিতামহ খাঁটি রুমানিয়ান। কদম-ছাঁট ধূসর চুল। গোঁফজোড়া কিন্তু কুচকুচে কালো। দুই চোখ অতিশয় প্রশান্ত—রক্তচক্ষু হওয়া তাঁর ধাতে নেই।

পাহাড়ি মানুষদের মতই মাস্টার কোল্‌জের ভরাট স্বাস্থ্য। লোহাপেটা মজবুত শরীর। মাথায় মস্ত ফেল্ট টুপী। কারুকাজ করা চওড়া কোমরবন্ধনী। হাতাবিহীন ওয়েস্টকোট। হাঁটু পর্যন্ত উঁচু চামড়ার বুটে গোঁজা ঢিলে পাৎলুন।

বিচারপতি না বলে তাকে গাঁয়ের মেয়র বললেই যেন বেশি মানায়। ঝগড়াবিবাদ যেখানে, মাস্টার কোল্‌জ সেখানে। এ-গেল তাঁর অবসর সময়ের কাজ। আসল কাজটা দাঁড়িয়েছে ট্যাক্স আদায় করা। বিচার যত না করেন, শাসন করেন তার চাইতে বেশি। ফলে দু'পয়সা আসে পকেটে। গাঁয়ের মধ্যে দিয়ে যেই যাক না কেন, খাজনা গুনে দিয়ে যেতে হবে শাসন কর্তাকে। বেচাকেনা হলে ট্যাক্স দিতে হবে, পর্যটক হলেও কড়ি গুণতে হবে। ছাড়ান নেই কারো।

মোট কথা, বেশ দু'পয়সা করে নিয়েছেন মাস্টার কোল্‌জ। হঠাৎ টাকার টানাটানি দেখা গেলে ইসরায়েলের সুদখোর মহাজনের খপ্পরে সব জমি বাঁধা পড়বে—কিন্তু মাস্টার কোল্‌জয়ের কিছু হবে না। দেদার টাকা জমিয়ে ফেলেছেন তিনি। গরীবকে শোষণ না করেও হেসেখেলে চলে যাবে বৈকি জীবনটা। ধার করার দরকার হবে না। বরং ধার দিতে পারেন দরকার মত। নগদ টাকা ছাড়াও তাঁর আবাদী জমি আছে বিস্তর, আছে ঘাস জমি পশুপালনের জন্যে, আছে আঙুরের চাষ। পেট ভরে খেয়েও ফুরোয় না আঙুর। মোটা লাভ রেখে আঙুর বেচে দেন খদ্দের পেলেই।

মাস্টার কোল্‌জের বাড়িটিও বড় সুন্দর। মালভূমি যেখানে ছাদের মত উঁচু হয়ে উঠেছে, সেইখানে, বড় রাস্তার কোণে তাঁর পাথরের বাড়ি দেখলে দু'চোখ জুড়িয়ে যায়। চারপাশে বাগান। দরজার ওপরে লতাপাতা ফুলের বাহার। দুটো বিশাল বীচ গাছ চাঁদোয়ার মত পাতার ঝালর ঝুলিয়ে রেখেছে লতায় ছাওয়া ছাদের ওপর। বাড়ির পেছনে ফলের বাগান তো নয় যেন দাবার ছক—পরিপাটিভাবে সাজানো। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে অনেক দূর পর্যন্ত উঠে গেছে সারবন্দী ফলের গাছ।

বাড়ির মধ্যে ঝকঝকে তকতকে ঘরের সংখ্যা কম নয়। খাবার ঘর আর শোবার ঘরে রঙীন আসবাব, টেবিল, খাট, বেঞ্চি, টুল। কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে ফিতে দিয়ে সাজানো ফুলদানী। ধবধবে সাদা দেয়ালে রুমানিয়ান দেশপ্রেমিকদের প্রতিকৃতি। পঞ্চদশ শতাব্দীর সব চাইতে জনপ্রিয় নেতা ভেডাহুনিয়াডের ছবিটা সত্যিই দেখবার মত।

এ-বাড়ি একবার দেখলে আর ভোলা যায় না। বাড়িতে প্রাণী বলতে মাত্র দুজন। মাস্টার কোল্‌জ এবং তাঁর সুন্দরী মেয়ে মিরিওটা। বারো বছর আগে বিপত্নীক হন মাস্টার কোল্‌জ। আর বিয়ে করেন নি। মিরিওটাকে ভালবাসে দুই গ্রামের প্রত্যেকেই। মিরিওটা কথাটার মানে কিন্তু 'ছোট্ট মেষ'।

'ছোট্ট মেষ' কিন্তু আর ছোট্টটি নেই। বড় হয়েছে। এখন তার বয়স কুড়ি। হাল্কা বাদামী চোখ, নরম চাহনি, নিখুঁত অবয়ব, জামার গলায়, কব্জিতে, কাঁধে লাল সুতোর এমব্রয়ডারী, কোমরে রুপোর বাক্‌লস লাগানো বেল্ট দিয়ে বাঁধা পেটিকোট, লাল-নীল ডোরাকাটা অ্যাপ্রন পিঁট দিয়ে বাঁধা কোমরে, পায়ে হলদে চামড়ার ছোট্ট জুতো, মাথার লম্বা চুল কারুকাজ করা ফিতে বা ধাতুর ক্লিপ দিয়ে আটকানো।

মিরিওটা সুন্দরী, মিরিওটা ধনবতী, মিরিওটা শিক্ষিতা। ম্যাজিস্টার হারমডের পাঠশালায় সে লিখতে শিখেছে, পড়তে শিখেছে, আঁক কষতে শিখেছে। যেটুকু শিখেছে, ভালভাবেই শিখেছে। যা শেখেনি, তার জন্যে তাকে দায়ী করা যায় না।

ট্রানসিলভানিয়ার কোনো কিংবদন্তীই জানতে বাকি নেই তার। এ-ব্যাপারে গুরুকেও টেক্কা মারতে পারে মিরিওটা। কুমারী পাহাড়ের উপকথা তার মুখস্ত। 'ড্রাগনের গুহা', 'বাজের হাততালি' ইত্যাদি রূপকথা তার মত রসিয়ে বলার সাধ্য কারো নেই। অসুর পাহাড়ের ওপর ঝোড়ো-রাতে ভূতের নাচ শুনলে গা ছম ছম করে না এমন লোক এ তল্লাটে নেই। বিটিয়াট পাহাড়ের মাথা কাটা গেল কিভাবে ডাইনীর হাতে, কিভাবে সন্ত ল্যাডিসলাস ভরোয়ালের এক কোপে থোরডা উপত্যকা চিরে দু' ফালা করে দিয়েছিল—মিরিওটার মুখে না শুনলে যেন মজা পাওয়া যায় না। যত উদ্ভট অলীকই হোক না কেন, মিরিওটা কিন্তু অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করত প্রতিটি উপকথা।

এ-হেন মেয়েকে বিয়ে করার জন্যে গাঁয়ে ছেলের অভাব ছিল না। মিরিওটার সঙ্গে কিন্তু বিয়ে ঠিক হয়েছিল জঙ্গলের অফিসার নিক ডেকের। বয়স তার পঁচিশ, বেশ লম্বা সুপুরুষ চেহারা। চুল কালো, চাহনি সরল। পায়ে ভেড়ার চামড়ার আঁটসাঁট প্যান্ট। প্রতি পদক্ষেপে আত্মবিশ্বাস এবং সুগভীর প্রত্যয়। শুধু জঙ্গল পাহারা দেওয়া নয়। চাষবাস আর লড়াইতেও সমান পোক্ত নিক ডেক।

আর দিন পনেরো পরেই বিয়ে হবে দুজনের। সেদিন গাঁয়ের কেউ কাজ

করবে না—ছুটির মজা লুটবে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত। মাস্টার কোলজ কিপটে নন। মেয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে দেদার টাকা খরচ করবেন। বিয়ের পর মেয়ে-জামাইকে কাছেই রাখবেন। তাঁর অবর্তমানে নিক ডেকই বাড়ির মালিক হয়ে বসবে। তখন আর দরজার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ শুনসে, অথবা শীতের রাতে জানলায় ছায়া দেখেও চমকে-চমকে উঠবে না ভীতু মিরিওটা।

বার্স্ট গ্রামের আরও দুজন নামী লোকের বৃত্তান্ত দেওয়া দরকার। এঁরা কেউই কম কেউকেটা নন।

প্রথম জন গাঁয়ের মাস্টারমশাই ম্যাজিস্টার হারমড। বিরাট বপু, চোখে চশমা। বয়স পঁয়তাল্লিশ, মুখে পোর্সিলেন পাইপ, চুল পাতলা, মুখ দাড়ি-গোঁফহীন। যখন তখন খিকখিক করে বাঁ গালের মাংসপেশী কাঁপানো তার মুদ্রাদোষ এবং অষ্টপ্রহর পাইপ কামড়ে থাকার ফলে ঠোঁট দুটোও কেমন জানি বাঁকানো। ভদ্রলোক একটা মস্ত কাজ নিয়ে সব সময়ে ব্যস্ত থাকেন। ইস্পাতের কলমে লিখলে নাকি হাতের লেখার বারোটা বেজে যায়। তাই উনি নিজের হাতে ছুরী দিয়ে কাঠ কেটে কলম বানিয়ে দেন ছাত্রছাত্রীদের জন্যে। অসীম ধৈর্য নিয়ে কলমের মুখ ছুঁচোলো করেন এবং কুচ করে নিবটা মাঝখান থেকে চিড়ে দেন।

দ্বিতীয় জন গাঁয়ের ডাক্তার—ডক্টর পাটাক। ভদ্রলোক বেঁটে এবং মোটা। বয়স পঁয়তাল্লিশ। পয়লা নম্বর বাক্যবাগীশ—মুখে যেন খই ফুটছে। ফলে, ফ্রিকের মতই দাপট তাঁর গাঁয়ের লোকদের ওপর। ওষুধ দেওয়া আর জ্ঞান দেওয়া এই হল তাঁর পেশা। ওষুধে কাজ না হলেও কিছু এসে যায় না। বার্স্ট গ্রামের লোকজন স্বাস্থ্যবান। অসুখ বিসুখ কাছে ঘেঁষে না। একটু আধটু ব্যারাম হলেও আপনিই সেরে যায়—দাওয়াই না খেলেও চলে। স্বাস্থ্যকর অঞ্চল বলেই মড়ক কি জিনিস, তা গাঁয়ের বাসীরা জানে না। মৃত্যু আসে জরা এলে—রোগে ভুগে মৃত্যুর কথা কেউ ভাবতেও পারে না।

ডক্টর পাটাককে ডাক্তার বললেও আসলে ভদ্রলোক হাতুড়ে ডাক্তার। পশু চরা ফেরাতে গাঁয়ে যারা আছে, তাদের খবরদারি করাই তাঁর কাজ। ডাক্তারি তিনি পড়েন নি, দাবাখানায় হাতেনাতে ওষুধ তৈরির বিদ্যে শেখেননি। কিন্তু এই বিদ্যে নিয়েই বার্স্ট গাঁয়ের কেষ্টবিষ্টু হয়ে বসেছেন ভদ্রলোক। গাঁয়ের লোক তাঁকে খাতির করে। ডক্টর পাটাক জ্ঞানী না হোক, চালাক এবং বিলক্ষণ সজাগ মানুষ। কিছুই চোখ এড়োয় না তাঁর। এ ধরনের লোকদের বচন শুনতেই ভালবাসে সাধারণ লোক।

ডক্টর পাটাক নাকি দুর্দান্ত সাহসী। দারুণ বড়াই করেন নিজের সাহস

নিয়ে। কুসংস্কারমুক্ত বলে ভূতপ্রেতের গল্পকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেন। কার্পেথিয়ান কাস্‌ল্‌য়ে ভূত আছে? ছোঃ! ছায়া মাড়ানোও বিপজ্জনক?-রাবিশ! ডক্টর পাটাককে চ্যালেঞ্জ করলেই তিনি এক্ষুনি হাওয়া খেয়ে আসতে পারেন ভুতুড়ে কেল্লায়!

কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ চ্যালেঞ্জ করেনি ডক্টর পাটককে। ফলে তাঁকে কষ্ট করে গড়ের পাঁচিল পেরোতে হয় নি।

তাই, রহস্য-তিমিরে আজও ঢাকা রয়েছে গড় কার্পেথিয়ান।

৪॥ লক্ষ লক্ষ রক্ষ যক্ষ অট্ট অট্ট হেসে, আকাশপথে ছুটে এল—কাসলগড়ের দেশে!

দাবানলের মত খবরটা ছড়িয়ে পড়ল সারা গাঁয়ে! ধোঁয়া উঠছে, ধোঁয়া! কার্পেথিয়ান কাসল-য়ে আগুন জ্বলছে!

মহামূল্যবান টেলিস্কোপটা বগলে নিয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন মাস্টার কোল্‌জ, পেছনে নিক আর মিরিওটা।

মালভূমির ছাদে গালগল্প ছাড়তে লাগল ফ্রিক একা। জনা বিশেক গ্রামবাসী চোখ বড় বড় করে ঘিরে ধরল তাকে। জিপসীরাও ছিল তাদের মধ্যে। তারাও কম অবাক হয় নি।

হাত-পা নেড়ে বিজ্ঞের মত বলল ফ্রিক—"ধোঁয়া! ধোঁয়া! কার্পেথিয়ান কাসল-য়ের দিন ঘনিয়ে এসেছে। ভিতের পাথর পর্যন্ত গড়িয়ে না পড়া পর্যন্ত ধোঁয়া উঠবে।"

"কিন্তু আগুনটা জ্বালল কে?" শুধোল এক বুড়ি।

"কে আবার, চর্ট! শয়তান স্বয়ং! আগুন নেবাতে সে জানে না, জ্বালাতে জানে!"

শুনেই একসঙ্গে সবাই তাকাল গড় কার্পেথিয়ানের দিকে। চোখ পাকিয়ে কত কসরৎই না করা হল ধোঁয়া দেখার আশায়। কিন্তু এতদূর থেকে ধোঁয়া দেখা যায় না। খালি চোখে তা অদৃশ্য। তা সত্ত্বেও সবাই নাকি ধোঁয়ার কুণ্ডলি দেখতে পেল গড়ের ওপরে।

ফলটা হল সাংঘাতিক! নিরক্ষর কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামবাসীদের আর দোষ কি! অত শত তারা বোঝে না। বহু বছর তারা দেখেছে কার্পেথিয়ান কাসল খাঁ-খাঁ করছে। কাকপক্ষীও ওদিক মাড়ায় না। শুনেছে পিলে চমকানো অনেক কাহিনী—যা শুনলে গায়ের লোম থেকে মাথার চুল পর্যন্ত

সবই খাড়া হয়ে যায়। তার পরেই কিনা ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে ভৌতিক গড়ের মাথায়! ওরে বাবা! খোদ পিশাচ-পুরী নাকি! সীমাহীন আতংকে রক্ত হিম হয়ে এল গ্রামবাসীদের!

গাঁ-য়ে সরাইখানা একটাই। দিনের শেষে পানাহারের জন্যে লোকজন জড়ো হয় সেখানে। কিছু লোক আসে স্রেফ গুলতানি করতে। সরাইখানা তো নয়, যেন আড্ডাখানা। যারা খায় না, তারাও আসে গল্পগুজব করতে।

সরাইখানার মালিক জাতে ইহুদি। বয়স ষাট। নাম জোনাস। সেমিটিক চেহারা—দেখলে ভাল লাগে। মিশমিশে চোখ, আঁকশি নাক, লম্বা ঠোঁট, মসৃণ চুল আর সনাতনী দাড়ি। ধার দিতে তার কোনো আপত্তি নেই, বাঁধা রাখবারও কোনো গরজ নেই, সুদ আদায় নিয়েও তার দুশ্চিন্তা নেই। টাকা ধার দেওয়ার সর্ত তার একটাই—ঠিক যেদিন ফেরৎ দেওয়ার কথা, সেইদিনই ফেরৎ দিতে হবে—দেরী হলে চলবে না! আহা রে, ট্রানসিলভানিয়ার সব ইহুদিরাই যদি জোনাসের মত হত! স্বর্গে যাওয়া তাদের রোখে কে!

জোনাসের জাতভাইরা কিন্তু প্রত্যেকই অন্য ধাঁচের মানুষ। ধর্মে তারা এক, কাজকারবারেও তাই। প্রত্যেকেই সরাইখানা আর মুদীখানা খুলে বসে আছে। চাইলেই ধার পাওয়া যায়। তবে সেরা জমি বাঁধা রাখতে হয়। যথা সময়ে সুদ আর আসল টাকা ফেরত দিতে না পারলেই বন্ধকী জমি হাতিয়ে নেয়। এইভাবে একটু একটু করে দেশের জমিজমা ইহুদী মহাজনদের হাতে চলে যাচ্ছে। কিছুদিন পরে আর একটা প্যালেস্টাইন ট্রানসিলভানিয়ার মাটিতে গড়ে উঠলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

সাধু জোনাসের সরাইখানার নাম 'কিঙ ম্যাথিয়াস'। মাস্টার কোল্‌জের বাড়ির ঠিক উল্টোদিকে বড় রাস্তার মোড়ে মালভূমির ওপরে একতলা একটা বাড়ি। পুরোনো বাড়ি। পলস্তারার পটি সারা গায়ে। কিন্তু ফুলে ফুলে ঢাকা। লতাপাতায় মোড়া। ভাঙা বাড়িও তাই দেখতে অত ভাল লাগে।

বিরাট কাচের দরজা দিয়ে মালভূমির দিক থেকে ঢুকতে হয় সরাইখানায়। প্রথমেই একটা পেল্লায় ঘর। টেবিলে টেবিলে সাজানো গেলাস। বেঞ্চি পাতা টেবিলের চারধারে খদ্দেরদের জন্যে। বার্নিশকরা ওক কাঠের সাইডবোর্ডে থরে থরে সাজানো চকচকে ডিস, পাত্র, বোতল। কালো কাঠের একটা কাউণ্টার। জোনাস সেখানে দাঁড়ায়। আপ্যায়ণ করে অতিথিদের।

মালভূমির দিকে দুটো জানালা দিয়ে আলো আসে প্রচুর। উল্টো দিকের দেয়ালেও দুটো জানলা আছে। তার একটা লতাপাতার পর্দায় ঢাকা—আলো

আসে অতি সামান্য। আর একটা খুললেই চোখে পড়ে ভলক্যান উপত্যকা। নীচে দিয়ে সগর্জনে ছুটছে নিযাড য়ের জলরাশি। কার্পেথিয়ান কাসল-যের দিক থেকে ওরগাল প্লেটোর ওপর দিয়ে নাচতে নাচতে নেমে এসেছে এই জলধারা—মিশেছে ওয়ালাচিয়ান সিল নদীর সঙ্গে।

ডানদিকে ছোট আকারের ছটি ঘর। বহিরাগত পর্যটকদের রাত কাটানোর আস্তানা। সীমান্ত পেরোনোর আগে বার্স্ট গাঁয়ে কেউ জিরিয়ে নিতে চাইলে জোনাস তাদের জামাই-আদরে রেখে দেয় এই সব ঘরে। সেবা তামাক এনে দেয় ধূমপানের জন্যে—দাম নেয় অতি সামান্য।

জোনাস নিজে থাকে ছোট্ট একটা প্রকোষ্ঠে। জানলা খুললেই ফুলে ছাওয়া ছাদের ওপর দিয়ে দেখা যায় মালভূমির দিগন্ত বিস্তারী রূপ।

উনত্রিশে মে রাত সাড়ে আটটা নাগাদ সরাইখানার বড় ঘরে জমায়েৎ হয়েছেন বার্স্ট গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। মাস্টার কোল্‌জ, ম্যাজিস্ট্রেট হারমড, জঙ্গল পাহারাদার নিক ডেক, জনাছয়েক বর্ধিষ্ণু গ্রামবাসী তো আছেনই, সেই সঙ্গে আছে ফ্রিক। কেননা, ফ্রিকও এখন কেউকেটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নেই কেবল ডক্টর পাটক। গাঁয়ের এক বৃদ্ধ পরলোকে যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছেন। ডক্টর তাঁর পাশে বসে আছেন। তাঁকে রওনা করিয়ে দিয়ে এসে বসবেন সরাইখানায়।

প্রত্যেকেই মুখ আর হাত দুটোই সমানে চালাচ্ছেন। অর্থাৎ বকর বকর করছেন, গব-গব করে গিলছেন এবং ঢকঢক করে পানীয় দিয়ে খাবারকে পেটে চালান করছেন। জোনাস নিজে টেবিলে টেবিলে 'মামালিগা' পুডিং দিয়ে যাচ্ছে, ছোট ছোট গেলাসভর্তি কড়া পানীয় 'স্নাপ্স' হাতে ধরিয়ে দিচ্ছে (গেলাস পিছু দাম মোটে এক ফার্দিং), নয়তো অতিশয় কড়া তালের ব্রাণ্ডি 'র‍্যাকিও' রেখে যাচ্ছে প্রত্যেকের সামনে। চা খাওয়ার মতই সুরাপান করে এখানকার মানুষ—দোষের কিছু নয়। 'স্নাপ্স' বা 'র‍্যাকিও' তরল আগুন বিশেষ—কিন্তু রুমানিয়ানরা তা উদরস্থ করে নির্বিকার ভাবে।

প্রথা অনুযায়ী টেবিলে যারা বসে আছেন, তাঁদের খাদ্যপানীয় যুগিয়ে যাচ্ছে জোনাস নিরস ভাবে। সে জানে, বসে খেলে বেশি খাওয়া যায়—দাঁড়িয়ে খেলে অতটা হয় না। বিশেষ করে সেদিন পানভোজন যেন মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে। জগভর্তি সুরা হাতে টেবিলে টেবিলে ছুটোছুটি করে কিছুতেই যোগান দিয়ে উঠতে পারছে না।

গোধূলি থেকে আরম্ভ হয় গুলতানি। রাত সাড়ে আটটা নাগাদ সবাই একমত হলেন একটা বিষয়ে। বাইরের লোক যদি কারপেথিয়ান

কাস্‌ল্‌ দখল করে বসে থাকে, তাহলে বিপদ বাড়ল বই কমলো না। ঘরের সামনে বারুদের ডিপো নিয়ে বসে থাকা যা, গড় কারপেথিয়ানে বাইরে লোক ঢুকে বসে থাকাও তাই।

"ব্যাপারটা গুরুতর" বললেন মাস্টার কোল্‌জ্‌।

"খুবই গুরুতর," সায় দিলেন ম্যাজিস্টার। কথার আগে পিছে দু'তাল ধোঁয়া ছাড়লেন নিত্যসঙ্গী পাইপ থেকে।

"দারুণ গুরুতর," একমত হলেন বাকি সকলে।

জোনাস বললে—"কুখ্যাত কার্পেথিয়ান কাস্‌ল্‌-য়ের জন্যে কিন্তু ক্ষতি হচ্ছে আমাদের সকলেরই।"

ম্যাজিস্টার বললেন "গোদের ওপর বিষফোড়ার মত ঘটল এই নতুন অঘটন।"

মাস্টার কোল্‌জ বললেন—"বাইরের লোক এমনিতেই বড় একটা আসতে চায় না গাঁয়ে।"

"এরপর থেকে কেউই আসতে চাইবে না।" বলল জোনাস।

"গাঁ থেকেও অনেকে পাততাড়ি গুটোবে" বলল একজন চাষী। "আমার আঙুর ক্ষেতের খদ্দের পেলেই আমি ভাগব আগে।"

"খদ্দের পেলে তো।" বলল জোনাস।

কথার স্রোত একদিকেই বয়ে চলেছে। আগে ছিল গড় কার্পেথিয়ান সম্বন্ধে আতংক, এখন তার সঙ্গে মিশল ট্যাকখালি হওয়ার উৎকণ্ঠা।

বাইরের লোক বার্স্ট গ্রাম বর্জন করলে ক্ষতি প্রত্যেকেরই। প্রত্যেকের রোজগার কমছে। শুল্ক পাবেন না মাস্টার কোল্‌জ, খদ্দের পাবে না জোনাস, জমি কেনার লোক পাবে না চাষী ভাইরা। বছরের পর বছর এই অবস্থা চলবে, বরং আরো খারাপ হবে। গোরস্থান হয়ে যাবে বার্স্ট গ্রাম!

এতক্ষণ চুপ করেছিল ফ্রিক। এবার মুখ খুলল।

বলল—"মাস্টার, আমার মনে হয়—"

"কি মনে হয়?" শুধোলেন মাস্টার কোল্‌জ।

"কারপেথিয়ান কাস্‌ল্‌-য়ে গিয়ে দেখে আসা উচিত।"

শুনেই চমকে উঠলেন সবাই। মুখ চাওয়া চাওয়ি করে চোখ নামিয়ে নিলেন। জবাব দিলেন না।

এবার হেঁকে উঠল জোনাস। বলল চড়া গলায়—"ফ্রিক খাঁটি কথা বলেছে।"

"ও তো বলছে কার্পেথিয়ান কাস্‌ল্‌-য়ে গিয়ে দেখে আসা দরকার!"

"ঠিক কথাই বলেছে। ধোঁয়া মানেই আগুন, আগুন মানেই কেউ তা জেলেছে। আগুন জলল কার হাতে, চাক্ষুস দেখা দরকার বইকি।"

"হাত!" ঢোক গিলে বলল একজন বুড়ো চাষী। "হাত না বলে থাবা বলুন না! নখওলা থাবা!"

"হাত কি থাবা সেটা চোখে দেখলেই তো ল্যাটা চুকে যায়," অসহিষ্ণু কণ্ঠ জোনাসের। "ব্যারন রুডলফ অদৃশ্য হওয়ার পর এই প্রথম ধোঁয়া দেখা দিয়েছে পোড়ো কেল্লায়—"

"প্রথম কিনা কি করে জানলে? এর আগেও হয় তো ধোঁয়া উঠত, আমরা দেখিনি," বললেন কোল্‌জ।

"আমার তা মনে হয় না!" খ্যাঁক করে উঠলেন ম্যাজিস্টার হারমড।

"কিন্তু অ্যাদ্দিন তো টেলিস্কোপ ছিল না।" বললেন কোল্‌জ।

কথাটা সত্যি। টেলিস্কোপ তো হালে এল, গড়ের ভেতর পর্যন্ত দেখা গেল। এতদিন গড়ের কাণ্ডকারখানা খালি চোখে কিছুই দেখা যায়নি। কে জানে, কত বছর ধরে মানুষ জন সেখানে গ্যাঁট হয়ে গুলতানি চালিয়ে যাচ্ছে।

ভাবতেই গা শিরশির করে উঠল প্রত্যেকের! পোড়োকেল্লায় মানুষ? আগন্তুক? সর্বনাশ!

স্কুল মাস্টারের অস্থি মজ্জায় কিন্তু কুসংস্কার রয়েছে। সুতরাং এ-কথা তিনি মানবেন কেন? তেড়েমেড়ে তিনি বললেন—"অসম্ভব! অসম্ভব! অসম্ভব! মানুষ, না, কচু! মানুষ ওখানে ঢুকবে কিভাবে শুনি? ঢুকবেই বা কেন? খেয়েদেয়ে কাজ নেই ভুতুড়ে কেল্লায় যাবে?"

"তবে ওরা কারা?" শুধোলেন মাস্টার কোল্‌জ।

যেই না বলা, অমনি গাঁ-গাঁ করে বললেন হারমড—"ভূত, প্রেত, দত্যি, দানো, পিশাচ, রাক্ষস, ডাইনী, মামদো! পরলোক থেকে, নরক থেকে, অদৃশ্য লোক থেকে এসেছে! সুন্দরী মেয়েছেলে সেজে ডাইনীরাও এসে বসে আছে কিনা কে জানে!"

ওরে বাবা! শুনেই তো হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল সকলের। আড় চোখে চাইল চিমনীর দিকে—কেলে ভূত থাপ্পা হয়ে সেখান দিয়ে সর্‌ সর্‌ করে নেমে আসছে না তো? জানলায় টোকা মেরে কবন্ধরা খলখল করে হাসছে না তো? চৌকাঠে ডানাকাটা পরীর মত পেত্নীরা এসে মুখ টিপে হাসছে না তো?

জোনাস গলা খাঁকরি দিয়ে বললে—"ভাল রে ভাল! ডাইনী পিশাচরা আগুন জ্বালাতে যাবে কেন? রান্না করা ঝোল ছাড়া বুঝি তাদের চলেনা?"

"তুকতাক করতে গেলে আগুন দরকার বইকি? টিকটিকির ঠ্যাং,

চামচিকের চোখ, বাদুড়ের নখ, ব্যাঙের আঁচিল, সাপের খোলস দিয়ে পাঁচন বানাতে গেলে উনুন জেলে কড়া চাপাতে হয় না?" পরম জ্ঞানীর মত খেঁকিয়ে উঠলেন ম্যাজিস্টার হারমড।

নিক ডেক চুপচাপ বসে শুনছিল এতক্ষণ। কোনো কথা বলে নি। তার মানে এই নয় যে গাঁয়ে প্রচলিত ভূতপ্রেত কাহিনীতে সে অবিশ্বাসী। বিশ্বাস তার সব কিছুতেই। তবে পয়লা নম্বরের ডানপিটে তো—তাই যাচাই করে নিতে চায় সব কিছুই। দুর্গপ্রাকারের বিশালতা, কেল্লার বিকট গঠন কৌশল, এবং বহু বছর ধরে শোনা রক্ত হিম করা অনেক কাহিনী তার তরুণ মনকে উৎসুক করেছে। কেল্লার প্রতি সম্ভ্রম বোধ জাগিয়েছে। গড়ের অন্দরে ঢোকার বাসনা তার অনেক দিনের। সুযোগ সুবিধে কখনো হয় নি।

মিরিওটাও জানে নিক ডেকের গোপন অভিলাষ। মনে মনে তাই তার অত ভয়। না জানি কখন গোঁ ধরে বসে ভুতুড়ে কেল্লায় যাওয়ার জন্যে। মুখ থেকে কথা খসলে আর তো রক্ষে নেই—ভয়ানক এক রোখা নিক ডেক। গিয়ে তবে ছাড়বে।

কিন্তু কই, ডাকাবুকো নিক ডেক তো বুক ঠুকে উঠে দাঁড়াল না? এত দুঃসাহস আর কারো তো নেই! মাস্টার কোল্‌জ বুড়ো হয়েছেন, ম্যাজিস্টারকে স্কুল দেখতে হয়, জোনাস সরাইখানা নিয়ে ব্যস্ত, ফ্রিক ভেড়া সামলেই গেল, চাষীরা গরুবাছুর আর চাষবাস নিয়ে নিঃশ্বাস ফেলবার সময় পায় না।

তবে যাবেটা কে? না, কেউ নেই! মনে মনে প্রত্যেকেই ভাবছে একটাই কথা—"কার্পেথিয়ান কাস্‌ল্‌-য়ে যাওয়া যায়, কিন্তু ফেরা যায় না!"

ঠিক এই সময়ে দড়াম করে দুহাট হয়ে খুলে গেল দরজা! ধড়াস করে উঠল ঘরশুদ্ধ লোকের হৃৎপিণ্ড!

না, গড়ের বিভীষিকা নয়—ডক্টর পাটাক। পরীর মত সুন্দরী ডাইনী নয়, মূলোর মত দাঁতওয়ালা রাক্ষস নয়, এক চক্ষু দানবও নয়—বচনবাগীশ ডক্টর পাটাক।

ওষুধের গুণে বৃদ্ধ রুগী এইমাত্র পরলোক রওনা হলেন। পাটাক তাই দৌড়ে এসেছেন সরাইখানায়।

"এসে গেছে!" হাঁফ ছেড়ে বললেন মাস্টার কোল্‌জ।

ঝটপট প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্দন করে নিলেন ডক্টর। ভাবখানা যেন হাতে হাতে ওষুধের পুরিয়া বিলি করছেন। তারপর বললেন বিদ্রুপতীক্ষ্ণ কণ্ঠে—

"বলি, এত গুলতানি কি নিয়ে?...ওহো, শয়তানের গড়! কার্পেথিয়ান

কাস্‌ল্ দেশশুদ্ধ লোকের আত্মারাম খাঁচাছাড়া করে দিয়েছে দেখছি! যেখানে যাচ্ছি, যার কাছে যাচ্ছি, সেইখানেই কেবল শয়তানের গড়! শয়তানের গড়! শয়তানের গড়! কি জ্বালা! শয়তানের কি সখ হয় না ধূমপান করার? এই যে আমাদের হারমড মাস্টার, সে তো দিনরাত পাইপ মুখে দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে। আর গড় ধোঁয়া ছাড়ছে শুনেই ভয়ে কাঠ হয়ে গেল গাঁ-শুদ্ধ লোক! ভাল রে ভাল!·· পোড়ো কেল্লায় নাকি ভূতে বাসা নিয়েছে ··নিয়েছে তো নিয়েছে! আগুন জ্বেলেছে!·· কেন জ্বালবে না? ভূতেদের ঠাণ্ডা লাগে না বুঝি? মাথায় সর্দি বসলে আগুন জ্বালাতে ইচ্ছে হয় না? যে মাসের ঠাণ্ডায় ভোনজোনের স্যাঁতসেঁতে ঘরে রাতের পর রাত নাচানাচি করলে ঠাণ্ডা তো লাগবেই!···কাপুরুষের দল কোথাকার!···তা ছাড়া পরলোকে পৌঁছেও কোনো ভূতবাবাজীর হয়ত নোলা ঝরছে রুটি খাওয়ার জন্যে·· প্রেতলোকের রুটিওলা তাই শুনে রুটি সেঁকতে বসেছে উনুন জ্বেলে · ছেলেবুড়ো সকলেরই ধাত ছেড়ে গেল তাই দেখে!"

চলল কথার ফুলঝুরি! ঘরশুদ্ধ লোককে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে সে কি টিটকিরি! বিছুটির জ্বালাও বুঝি এর চাইতে ভাল!

কেউ কিন্তু টুঁ শব্দটি করলেন না।

বাক্যস্রোত একটু কমতেই বললেন মাস্টার কোল্‌জ—"তুমি তাহলে বলছ কাস্‌ল্ নিয়ে খামোকা মাথা ঘামানোর কোনো মানে হয় না?"

"মিছে সময় নষ্ট।"

"তুমি কিন্তু প্রায় বল,চ্যালেঞ্জ করলেই এক চক্কর ঘুরে আসতে পার কাস্‌ল্-য়ে।"

"আমি?" থতমত খেলেন ডাক্তার! অলুক্ষুণে সময়ে হঠাৎ কথাটা মনে করিয়ে দেওয়ায় ব্যাজারও হলেন।

"হ্যাঁ, তুমি," ধুয়ো ধরলেন স্কুল মাস্টার। "একবার নয়, একশবার একই কথা বলেছ।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলেছি! মনে করিয়ে দেবার কি দরকার?"

"দরকার হয়েছে বই কি।"

"অ্যাঁ!"

"না, না, চ্যালেঞ্জ করছি না। শুধু যেতে বলছি।"

"আমি·· ইয়ে···আপনারা বন্ধু মানুষ···কিন্তু···"

ফস করে বলে উঠল জোনাস –"অত আমতা-আমতা কিসের ডাক্তার? তাহলে আর বলাবলি নয়, চ্যালেঞ্জ করছি আপনাকে!"

"কি! আমাকে চ্যালেঞ্জ!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ! চ্যালেঞ্জ! সাহস আছে যাওয়ার?"

"জোনাস," বললেন মাস্টার কোল্‌জ। "মিছিমিছি তাতাচ্ছো ডাক্তারকে। ওর কথার খেলাপ হয় না। গাঁয়ের স্বার্থে, সারা দেশের স্বার্থে, ও যা বলেছে তা করবেই।"

"কিন্তু··ব্যাপারটা গুরুতর· ," ডাক্তারের লাল মুখ ততক্ষণে চাইয়ের মত সাদা হয়ে এসেছে। "কার্পেথিয়ান কাস্‌ল্‌-য়ে যেতে বলছেন কেন?"

"আর বেরোতে পারবে না বলে," হৃষ্টচিত্তে বললেন কোল্‌জ।

"আপনারা বন্ধুমানুষ তাই অনুরোধ করছি, যুক্তিসঙ্গত কথা বলুন।"

"তাই তো বললাম," বলল জোনাস

"তাহলে ন্যায়সঙ্গত কথা বলুন। গড়ে গিয়ে লাভটা কি? কিছু সাধুসজ্জন লোক হয়ত ঠাঁই নিয়েছে। কারো ক্ষতিও করেছে না—"

"তাহলে আর অত ভয় কিসের? তোমার তো কোনো ক্ষতি হবে না? বরং ডাক্তারি বিদ্যে ফলানোর সুযোগ পাবে।" বললেন স্কুল মাস্টার।

"ছোঃ! না ডাকলে কোথাও যাই না আমি।"

"গেলে পয়সা পাবে।" বললেন কোল্‌জ। "মোটা দক্ষিণা মিলবে।"

"কে দেবে?"

"আমি অথবা আমরা।" সমস্বরে বললেন কোল্‌জ এবং সাঙ্গোপাঙ্গরা।

চালিয়াত পাটাকের চালিয়াতি ধরা পড়ে গিয়েছে। মুখোস খসে গিয়েছে! আর পাঁচজনের মত তিনিও যে পয়লা নম্বরের ভীতু, তা ফাঁস হয়ে গিয়েছে। এতদিন গাঁয়ের কিংবদন্তী নিয়ে কম ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেন নি। আজ পালটা শোধ তুলছে বন্ধুরা। কার্পেথিয়ান কাসল-যের ত্রিসীমানা মাড়ানোর অভিপ্রায় তাঁর নেই—ট্যাঁকে টাকা গুঁজে দিলেও নয়। অথচ মুখে সে কথা বলা যাচ্ছে না। কাজেই অন্য রাস্তা ধরলেন ডাক্তার। বললেন গড়ে গিয়ে পণ্ডশ্রম হবে, কোনো লাভই হবে না—উল্টে প্রতিবেশীরা হাসবে।

শোনার পর স্কুল মাস্টার বললেন—"ওহে পাটাক, তুমি তো ভূত বিশ্বাস কর না। অত ভয় কেন?"

"ভয়? ছোঃ! ভূত থাকলে তো ভয় করব।"

"সাবাস! ভূত যখন নেই। গড়েও কেউ নেই। তুমি গিয়ে দেখবে আমাদের মতই কিছু মানুষ রান্নাবান্না করছে।"

"মানলাম। কিন্তু যদি ফিরতে দেরী হয়? ওরা যদি না ছাড়ে?"

"জানব জামাই আদরে আছেন। খানাপিনা করছেন।" বলল জোনাস।

"যদি গাঁয়ে কারো অসুখ-বিসুখ হয়—"

"হবে না। দিব্যি আছি সবাই, একজনেরই টিকিট কাটার দরকার ছিল, তাকে তো পরলোকে পাঠিয়ে দিলে।" বললেন কোল্‌জ।

সোজা শুধোল জোনাস "ঝেড়ে কাশুন মশায়। যাবেন কিনা বলুন!"

"না, যাব না! কেন যাব শুনি? না, না, ভয়-ডর আমার নেই! ভূত-প্রেতকে আমি থোড়াইকেয়ার করি! কিন্তু ভাঙা চিমনী থেকে ধোঁয়া উঠেছে বলেই ছুটতে হবে? লোকে হাসবে, টিটকিরি দেবে! তাছাড়া ডোনজোনের চিমনীতে সত্যিই ধোঁয়া উঠেছে কিনা কে জানে? ধোঁয়া না হয়ে অন্য কিছুও তো হতে পারে? না, আমি যাব না!"

"আমি যাব!"

নিক ডেক। এতক্ষণ চুপ করে থাকার পর মুখ খুলেছে।

"তুমি?" চোখ কপালে উঠল ভাবী শ্বশুরের।

"হ্যাঁ, আমি, তবে একটা সর্তে। পাটাক আমার সঙ্গে যাবেন।"

তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন পাটাক—"কি···কি বললে? তুমি যাবে?·· বেশ তো, যাও না···খোলা হাওয়ায় ঘুরে এলে মনটা ভাল হবে। কিন্তু যাবে কি করে বাবা? রাস্তা কোথায়? গড়ে যাওয়ার রাস্তা তো নেই!"

"যাব যখন বলেছি তখন যাবই।" অবিচল কণ্ঠ নিকডেকের।

"কিন্তু আ—আমি তো বলিনি।"

"একশবার বলেছেন!" চেঁচিয়ে উঠল জোনাস।

"বলেছেন! বলেছেন!" সমস্বরে বললেন বাকি সকলে।

ফাঁপরে পড়লেন হামবড়াই ডাক্তার। এতদিন আস্ফালন করেছেন, কিন্তু এখন নিজের জালেই জড়িয়ে পড়েছেন। বেরোবার পথ আর নেই। কে জানত বড়াই করতে গিয়ে এমন ফ্যাসাদে পড়তে হবে! এখন তো পালানোরও পথ নেই! গাঁয়ে ঢি-ঢি পড়ে যাবে। সারা তল্লাটে মুখ দেখানো যাবে না। যা কপালে থাকে থাকুক, জান যায় যাক—মান দেওয়া চলবে না! যেতেই হবে শয়তানের গড়ে।

বললেন পাটাক—"বেশ, আপনাদের সবার যখন ইচ্ছে, তখন যাব!"

"সাবাস! সাবাস! সাবাস!" হল্লোড় উঠল সরাইখানায়।

"কখন রওনা হব? এখুনি?"

"না। কাল ভোরে।" বলল নিক ডেক।

সঙ্গে সঙ্গে নিশ্ছিদ্র নীরবতা নামল ঘরময়। ছুঁচ পড়লেও যেন শোনা যায় এমনি টুঁটিটেপা স্তব্ধতার মধ্যে বিমূঢ় বিস্ময়ে বসে রইলেন যে যাঁর

জায়গায়। গেলাস খালি—পান করার ইচ্ছে নেই। প্লেট খালি—খাবার ইচ্ছেও নেই। এমন কি খাদ্যপানীয় পরিবেশন করার কথাও যেন ভুলে গেল জোনাস। রাত ফুরোলেই শুরু হবে দুঃসাহসিক অভিযান—কার্পেথিয়ান কাস্‌ল্‌ অভিমুখে!

আচম্বিতে রন্ধ্রহীন নৈঃশব্দ্য খানখান হয়ে গেল গুরু গম্ভীর একটা কণ্ঠস্বরে। মন্থর, কিন্তু ভারি উচ্চারণে কে যেন বলছে:

"নিকোলাস ডেক, কাস্‌ল্‌-য়ে কাল যেও না, যেও না, যেও না! গেলে তোমার কপাল ভাঙবে! সর্বনাশ হবে!"

কার কণ্ঠ? অদৃশ্য লোকের বাণী নাকী? প্রেতলোক থেকে উড়ে এসে প্রেতকণ্ঠ কি হুমকি দিয়ে গেল ডানপিটে নিক ডেককে? অমানুষিক কণ্ঠ ধ্বনিত হল কিন্তু এই ঘরেই। কিন্তু কোথায় সে? কেউ তো নেই?

আতংক চরমে উঠল। ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে রইলেন ঘরশুদ্ধ লোক। কেউ কারো দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেও পারলেন না। কথা বলা তো দূরের কথা।

দুঃসাহসী নিক ডেক কিন্তু ঘাবড়ানোর পাত্র নয়! পৈশাচিক কণ্ঠস্বর শোনা গেছে ঘরের মধ্যেই। সুতরাং সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে গেল আলমারীর সামনে। একটানে খুলল পাল্লা।

কেউ নেই।

দরজা খুলে ছুটে গেল বাইরে। বড় রাস্তা ধরে ছুটে গেল অনেক দূর।

কিন্তু কেউ নেই। রাস্তা ফাঁকা।

মিনিট কয়েক পর। সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে মাস্টার কোল্‌জ বিদায় নিলেন। দরজার ডবল তালা ঝুলিয়ে ঠক-ঠক করে কাঁপতে লাগল জোনাস।

ঘরে-ঘরে তালা, হুড়কো, ছিটকিনি পড়ল সে-রাতে। কবর-খানার মত নিথর নিস্তব্ধ হয়ে রইল বার্স্ট গ্রাম। সারা রাত ঘর থেকে কেউ বেরোল না। দরজা জানলা বন্ধ করে ঠাকুর-দেবতার নাম স্মরণ করল বিনিদ্র চোখে।

স্বয়ং শয়তান হানা দিয়েছে বার্স্ট গ্রামে। আর রক্ষে নেই!

৫ ॥ পাহাড় বনের উৎপাত—পাটাক হল চিৎপাত!

পরের দিন সকাল হতে না হতেই গোছগাছ আরম্ভ করল নিক ডেক। শর্টকাট রাস্তায় কাস্‌ল্‌ পৌঁছতেই হবে। তাই ঠিক করল, ভলক্যান পাহাড়ের ওপর দিয়ে পৌঁছোবে রহস্য-কেল্লায়।

ডোনজোনের মাথায় ভৌতিক ধোঁয়া আর 'কিঙ ম্যাথিয়াস'-য়ের হলধরে অপদেবতা-কণ্ঠ কিং-কর্তব্য-বিমূঢ় করে ছেড়েছে গ্রামবাসীদের। কিছু জিপসী এর মধ্যেই নাকেকান্না শুরু কবেছে। এ-গ্রামে আর না। ভূতের হাতে প্রাণ খোয়াতে কেউ রাজি নয়। অন্দরমহলে পর্যন্ত গুজুর-গুজুর-ফুসুর-ফুসুর চলছে —বার্স্ট গ্রামে ছেলেপুলে নিয়ে থাকা কি সমীচীন?

সরাইখানার ঘটনাটায় রঙ চড়ানো হয়েছে ঠিকই। কিন্তু কম করেও জন পঞ্চাশেক লোক স্বকর্ণে শুনেছে ভূতের হুমকি। গুরুগম্ভীর গলায় একটুও তাড়াহুড়ো না করে নিক ডেককে শাসিয়েছে অদৃশ্য প্রেত। বলেছে, কারপেথিয়ান কাসল-যের চৌকাঠ মাড়ালেই সর্বনাশ হয়ে যাবে নিক ডেকের।

নিক ডেক তাতে ভয় পায়নি। মুখ একটুও কালো হয়নি। চোখের পাতা পযন্ত কাঁপেনি। কার্পেথিয়ান কাসল-রহস্য ভেদ করে মাস্টার কোল্‌জের অথবা গ্রামবাসীদের স্বার্থসিদ্ধি হবে ঠিকই, কিন্তু মিরিওটা তা শুনবে কেন? হাপুসনয়নে সে কেঁদেছে, নিক ডেক-কে কাকুতি মিনতি করেছে। কিন্তু অরণ্যে রোদনই সার হয়েছে। একটুও টলেনি ডানপিটে জঙ্গল-অফিসার।

বন্ধুবান্ধবরা পর্যন্ত বুঝিয়েছে নিক ডেককে—লাভ হয় নি।

কেউ অবাকও হয়নি। নিক ডেককে চিনতে কারো বাকি নেই। চিরকালই গোঁয়ার-গোবিন্দ সে। ভাঙবে তবু মচকাবে না ভীষণ জেদী আর একরোখা। যাবে যখন বলেছে, গিয়ে তবে ছাড়বে। ভূতের হুমকিতেও টসকায়নি। গিয়ে যদি আর নাও ফিরতে হয়, তাহলে সে যাবে।

ডক্টর পাটাক বেচারী শুধু কাঁদতে বাকি রেখেছেন। অনুরোধ-উপরোধ কাকুতি মিনতি সবই বৃথা গিয়েছে। শেষকালে হালে পানি না পেয়ে ভূতের হুমকির ওজুহাত তুলেছেন। বলেছেন—খোদ শয়তান যখন যেতে মানা করছেন, তখন গোঁয়ার্তুমি করাটা কি ঠিক হবে?

নিক ডেক চলেছে—"যেতে মানা করা হয়েছে আমাকে—আপনাকে নয়।"

"আহা-হা! তুমি চোট পেলে আমিও তো পাব।"

"অত ভাবি না। যাবেন যখন বলেছেন যেতেই হবে। আমি গেলে আপনিও যাবেন।"

কি গোঁয়ার ছেলেরে বাবা! পাটাকের অবস্থা তখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি! কিন্তু মুখে তা বলতেও পারছেন না। গাঁ-শুদ্ধ লোকের কাছে তিনি ভীষণ সাহসী হিসেবে পরিচিত। এখন যদি তার উল্টোটা দেখা যায়, তাহলে এ গাঁয়ে আর টেঁকা যাবে না। শেষকালে ঠিক করলেন, সবার চোখের ওপর দিয়ে বেরোনো তো যাক। পথে তাল বুঝে সটকান দিতে হবে।

শুরু হল অভিযান। সদলবলে মাস্টার কোল্জ ওদের সঙ্গে এলেন গাঁয়ের সীমান্ত পর্যন্ত। টেলিস্কোপটা সঙ্গেই ছিল। বার করে চোখে লাগালেন।

একি! ধোঁয়ার লেশমাত্র নেই গড়ের ওপর। আকাশ অমলিন। দিনটাও দিব্যি পরিষ্কার। বসন্তকাল। নির্মেঘ আকাশে ঝকঝকে আলোয় অনেকদূর পর্যন্ত দেখা গেল সুস্পষ্ট।

ধোঁয়া নেই।

তাহলে কি কাস্ল্-বাসিন্দারা চম্পট দিয়েছে? আপন আলয়ে ফিরে গিয়েছে শরীরী বিভীষিকা অথবা অশরীরী আতংকরা? কার্পেথিয়ান কাস্ল্ কি আবার জনহীন প্রেতহীন নিশ্চিন্ত পুরীতে পর্যবসিত হয়েছে? তাহলে আর ভয় কিসের? বুক ফুলিয়ে সরেজমিন তদন্ত করে ফিরে আসুক নিক ডেক।

পাটাককে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে পা বাড়ালো নিক ডেক। ধোঁয়া আছে কি নেই, তা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাল না। পরনে তার পুরোদস্তর জঙ্গলের পোশাক। মাথায় পালক-গোঁজা টুপী, কোমরে খাপসমেত বড় ছুরী, লোহার নাল লাগানো ভারী বুট, টোটার বেল্ট, কাঁধে লম্বা বন্দুক। নিক ডেকের গুলি কখনো ফসকায় না। ভূত-ভালুক ডাকাত-মানুষ—ওর গুলির আওতার মধ্যে পড়লে জ্যান্ত ফিরতে হবে না।

ডক্টর পাটাককেও গোদা জুতো, মোটা আলখাল্লা পরিয়েছে নিক। কাঁধে চাপিয়েছে ভারী ঝোলা। মান্ধাতার আমলের একটা চকমকি পিস্তলও আছে সঙ্গে। পাঁচবার ঘোড়া টিপলে দুবার গুলি ছোটে সে পিস্তলে। ধড়াচূড়ো পরে জঙ্গলে হাঁটতে সুবিধে হবে ঠিকই, কিন্তু অসুবিধে হবে পালাবার সময়ে। লোহা দিয়ে ভারি করা ঐ বুট পরে দৌড়োনো যায়? বড় ভাবনায় পড়লেন পাটাক।

গাঁ থেকে বেরিয়ে প্রথমে নিয়াড নদীর পাড় বরাবর কয়েক শো গজ এগোল নিক। নদীর পাড় বেয়ে শেষ পর্যন্ত গেলেই সবচেয়ে ভাল হত। কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পর দেখা গেল, সে পথ পথচারীর পক্ষে প্রশস্ত নয়। কোথাও খাড়াই পাথর সিধে মাথার ওপর উঠে গেছে। কখনো গভীর খাদ পায়ের তলায় মুখব্যাদান করে রয়েছে। নিরুপায় হয়ে তাই নিক মোড় নিল বাঁ দিকে—প্লেসা জঙ্গলের মধ্যে দিয়েই যেতে হবে শেষ পর্যন্ত।

এককালে কিন্তু এই পথেই বার্স্ট গ্রাম, ভলক্যান পাহাড় আর সিল উপত্যকার সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখেছিলেন গর্তস্ ব্যারনরা। তারপর বিশ বছর সে পথে কেউ যায়নি। জঙ্গল নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে পায়ে চলা

রাস্তা। ঘন ঝোপ আর গহন অরণ্যের মধ্যে বিশ বছর আগের পথ খুঁজে বার করাও আর সম্ভব নয়।

দুজনেরই পিঠে খাবার দাবার বোঝাই। কে জানে কদ্দিন পাহাড় জঙ্গলে ঘুরতে হবে। তৈরি থাকা ভাল।

নিয়াডের বিপুল জলধারায় ক্ষয়ে গর্ত হয়ে যাওয়া গিরিখাত আর দেখা যাচ্ছে না। জলের আওয়াজও শোনা যাচ্ছে না। কার্পেথিয়ান কাস্‌ল্‌ ঢাকা পড়েছে জঙ্গলের আড়ালে। পাহাড়ের চাল বেয়ে গাছের জটলা উঠে গেছে অনেক দূর পর্যন্ত। কার্পেথিয়ানের সর্বত্রই বনভূমি সাজানো এইভাবে। পথে এমন কিছু চোখে পড়ছে না যা দেখে নিশানা রাখা চলে। সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে দক্ষিণ পশ্চিমের পাহাড়চুড়ো। কাস্‌ল্‌ এখন অদৃশ্য -জঙ্গল পেরোলে ফের দেখা যাবে। পথ চিনতে হবে মাথার ওপরকার সূর্য দেখে।

পাটাক বললেন—"ওহে ফরেস্টার, রাস্তা কোথায়?"

"বানিয়ে নেব।"

"বলা সহজ।"

"কাজেও সহজ।"

"এখনো ঘাড় বেঁকিয়ে আছো দেখছি। যাবেই শেষ পর্যন্ত?"

জবাব দিল না নিক। পা বাড়াল জঙ্গলের দিকে।

সেই মুহূর্তে পেছন ফিরেই ভোঁ দৌড় দেওয়ার ইচ্ছে হল পাটাকের। কিন্তু নিকের চোখে চোখ পড়তেই রক্ত হিম হয়ে এল। ওরে বাবা! কঠিন জেদ, কঠোর চাহনি! ফেরার নামগন্ধ নেই! বেশি ঘ্যানঘ্যান করলে একাই এগোবে—ফেলে যাবে ডাক্তারকে!

সুতরাং পা বাড়াতে হল পাটাককেও। ক্ষীণ আশা রইল মনে—জঙ্গলে ঢুকে নির্ঘাৎ রাস্তা গুলিয়ে ফেলবে নিক। গাছের গোলকধাঁধায় পথ খুঁজে পাবে না।

কিন্তু জঙ্গলের মানুষ নিক ডেকের আরেক মূর্তি দেখা গেল জঙ্গলে ঢোকার পর। শ্যাওলার বর্ণ, বাকলের রঙ, জমির উচ্চাবচ অবস্থা, ডালের খোঁচ দেখে দেখে জঙ্গল-মানবের মতই এগিয়ে চলল ক্ষিপ্র গতিতে। জন্তুর মতই প্রখর প্রাণশক্তি আর সহজাত অনুভূতি তার জঙ্গলে জঙ্গলে ঘোরাফেরা করাই তার পেশা এবং নেশা। অচেনা বনভূমিও তাই তার কাছে দুর্ভেদ্য নয়। ফেনিমোর কুপারের লেদার স্টকিং বা চিংগাচুকের সঙ্গে টক্কর দেওয়ার মত জঙ্গল-মানুষ যদি কেউ থাকে, তবে সে এই নিক ডেক।

জঙ্গল ক্রমশঃ ঘন হচ্ছে। পথ চলা দুষ্কর হয়ে উঠছে। জড়ামড়ি করে.

রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে এল্ম, বীচ, মেপল আর দানবিক ওক গাছ। তারপরেই শুরু হয়েছে বার্চ, পাইন, স্প্রুসের জটলা। জমকালো চেহারা তাদের, তাজা রসে ভরপুর প্রকাণ্ড কাণ্ড বিলক্ষণ উষ্ণ। পাতার বিনুনী নিশ্ছিদ্র চন্দ্রাতপ রচনা করেছে মাথার ওপর—সূর্যরশ্মিও পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

নিচে অন্ধকার। মাথা হেঁট করে হাঁটতে হচ্ছে নিচু ডালের তলা দিয়ে। তাতেও শতেক বাধা। কাঁটা ঝোপ বল্লম উঁচিয়ে রয়েছে সামনে। লতাপাতার জটিল জটাজালে পা বেধে যাচ্ছে পদে পদে। নিক ডেক কাঁটার পরোয়া করে না। গা রক্তারক্তি হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই। বিকেল নাগাদ কাস্‌ল্ না পৌঁছলে রাত্রে গাঁয়ে ফেরা মুস্কিল হবে।

হাতের ছুরী সমানে চলছে। কচাকচ করে ঝোপঝাড় কেটে পথ বানিয়ে নিচ্ছে নিক। উদ্ভিদ-সাম্রাজ্যের অতন্দ্র প্রহরীর মত বেয়োনেট উঁচিয়ে রয়েছে অগুন্তি কাঁটাঝোপ—ছুরী হাতে একাই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে সে। শুধু কি কাঁটা, পায়ের তলায় হাজার বাধা। কখনো শেকড়ে পা আটকে যাচ্ছে, কখনো ঢিবির মত জমা পাতায় হেঁটে যেতে হচ্ছে, কোথাও রাশিকৃত ঝরা পাতায় দিব্যি ঢাকা গর্তের মধ্যে বাবাগো বলে তলিয়ে যাচ্ছেন ডাক্তার। কখনো ডালের খোঁচায় জামা আটকে গেলেই দম আটকে আসছে বিষম আতংকে—ভূতে জামা খামচে ধরেনি তো?

বেচারা! সাহসী মরে একবার, ভীতু মরে বারবার! পাটাকের অবস্থা হয়েছে তাই! পিছিয়ে পড়তেও পারছেন না। হাপরের মত হাঁপাতে হাঁপাতে লেগে থাকতে হচ্ছে নিকের পেছনে।

মাঝে মাঝে খোলা চত্বর পড়ছে। বিঘ্ন বাড়ছে বই কমছে না। ঝড়ে ভেঙে পড়া প্রকাণ্ড মহীরুহ পথ অবরোধ করে পড়ে আছে সেখানে! উই আর পোকায় খেয়ে ঝাঁঝরা করে ছেড়েছে ভাঙা গাছের গুঁড়ি। যেন অসুর-কাঠুরের কুড়ুল ধরাশায়ী করেছে অগুন্তি বৃক্ষ—কুপিয়ে কেটেছে চাকলা চাকলা অংশ। পর্বত প্রমাণ এই গাছপালা টেনে নিয়ে যাওয়ার মত মানুষজন নেই ধারে কাছে। কে আসবে এ তল্লাটে? গাছের গুঁড়ি জলে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার মত দুঃসাহস কারো নেই। নিস্তব্ধ নিথর বনভূমি রৌদ্রবিহীন অন্ধকারে আবৃত হয়ে পড়ে আছে যুগ যুগ ধরে। ওদের পদশব্দে হঠাৎ কয়েকটা মিশমিশে বক চমকে উঠল। বিশাল ডানা মেলে ঝটপট শব্দে আকাশে উড়ল। ভাবখানা যেন, একি উৎপাত! কোত্থেকে এল আপদ দুটো!

অনুযোগের সুরে বললেন ডাক্তার,—"ফরেস্টার, নির্ঘাৎ হাত পা ভাঙবে আমার।"

"জুড়তে তো জানেন।"

"মাথাটা একটু ঠাণ্ডা কর। অসম্ভবের সঙ্গে লড়া যায় না!"

কিন্তু নিক ডেক ততক্ষণে অনেক এগিয়ে গিয়েছে। জবাব না পেয়ে হুম-হাম করে ফের দৌড়োলেন পাটাক।

জমি ক্রমশঃ ওপর দিকে উঠছে। বেলা তিনটে নাগাদ শেষ হল জঙ্গল।

সামনে ওরগাল প্লেটো সবুজ গাছে ছাওয়া। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে নিয়াড নদীকে ফের দেখা যাচ্ছে। আড়াআড়ি ভাবে জঙ্গল পেরিয়ে ফের তার পাড়ে এসে পৌঁছেছে নিক। ভালই হল। নিয়াডের তীর বরাবর গেলেই ওরগাল প্লেটোর কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছোনো যাবে।

পাটাকের বিশ্রাম দরকার। ঠ্যাং টন টন করছে। পেটও জ্বলছে ক্ষিদের জ্বালায়। তাই নদীর ধারে বসল নিক। পায়ের কাছ দিয়ে ছল ছল করে বইছে জলধারা। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে গোল-গোল নুড়ি। তেষ্টা পেলে ঐ জল খাওয়া যাবে, ফ্লাস্কে আছে গ্রাম্যসুরা, ব্যাগে খাবার। আর কি চাই?

এতক্ষণ ভালভাবে কথা বলতে পারেন নি পাটাক। এইবার সেই সুযোগ পাওয়া গেল। কিন্তু কথা বলে জুৎ করা গেল না। শত কথার জবাব এক কথায় সারতে লাগল নিক।

"ফরেস্টার, গুরুতর কথা আছে," বললেন পাটাক।

"শুনছি," জবাব দিল নিক।

"দম নেওয়ার জন্যে বসেছি তো?"

"হ্যাঁ।"

"এবার গ্রামে ফিরব?"

"না।"

"তবে? কাসল-য়ের দিকে ফের এগোবে নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"নিক, ছ'ঘণ্টা হল সমানে হাঁটছি। অর্ধেক পথও আসিনি।"

"অর্থাৎ আর দেরি করা ঠিক হবে না!"

"কিন্তু রাত হয়ে যাবে যে! ফিরব কখন?"

"ফিরব না।"

"অ্যাঁ! রাত দুপুরে কাসল গিয়ে করবে কি?"

"রাত ফুরোনোর অপেক্ষা।"

"কোনো মানে হয়? শরীর আর বইছে না। এখন পেট ঠেসে খেয়ে লেপমুড়ি দিয়ে ঘুমোনোর সময়। পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরতে ভাল লাগে?"

"গড়ে ঢোকবার রাস্তা না পেলে ঘুরতে হবে বইকি।"

"সারা রাত?"

"হ্যাঁ।"

"যদি ঢোকবার রাস্তা পাও?"

"ডোনজোনের ঘরে ঘুমোব।"

আঁৎকে উঠলেন পাটাক—"কি বললে? ডোনজোনের ঘরে ঘুমোবে?"

"হ্যাঁ। ইচ্ছে হলে আপনি বাইরে থাকতে পারেন।"

"কিন্তু সে-রকম তো কথা ছিল না, ফরেস্টার। কেউ কারো কাছ ছাড়া হব না এই সর্তে বেরিয়েছি।"

"পয়লা নম্বর সর্ত হল, আমার পেছনে লেগে থাকবেন।"

"সে তো দিনের বেলা। রাত হলে কোনো সর্ত নেই!'

"তবে যান না যেখানে খুশি। জঙ্গলে রাস্তা হারাবেন না যেন।"

রক্ত জল হয়ে গেল ফরেস্টারের কথাবার্তা শুনে। প্লেসী জঙ্গলের মত গহন অরণ্য এ-অঞ্চলে আর নেই। রাস্তা হারালে কি ইহজন্মে আর বেরোনো যাবে? রাতের আঁধারে খানাখন্দে পড়ে নির্ঘাৎ প্রাণটা যাবে।

না, ডানপিটে ফরেস্টারের সঙ্গ ছাড়া চলবে না কিছুতেই। কিন্তু শেষ চেষ্টা করতে দোষ কি? এখনো ফেরবার সময় আছে।

বললেন কাষ্ঠ হেসে—"তাহলে ঐ কথাই রইল। দুজনের মধ্যে ছাড়াছাড়ি যেন না হয়, কেমন?"

"তাহলে লেগে থাকুন পেছনে।"

"তাতো থাকবই। তোমাকেও ঢুকতে দেব না গড়ের ভেতর, আমিও ঢুকব না।"

"ও কথা তো দিই নি। কথা আছে, আমি গড়ের কাণ্ডকারখানা দেখব তবে ফিরব। আপনিও থাকবেন আমার পেছনে।"

ধৈর্যচ্যুতি ঘটল ডাক্তারের—"কি দেখবে শুনি? দেখবার আছেটা কি? জানো না কি কাণ্ড চলছে ওখানে?"

"না জানি না। যাব যখন বলেছি তখন যাবই।"

কথায় না পেরে ফের কাঁদুনি শুরু করলেন ডাক্তার—"কিন্তু যেতে যেতেই তো রাত হয়ে যাবে।"

"নাও হতে পারে। এল্ম, মেপল, বীচ গাছের মত পাইন গাছের তলায় এত ঝোপঝাড় আগাছা থাকে না।"

"কিন্তু পাথর টপকানো কি চাট্টিখানি কথা?"

"অসম্ভব তো নয় ?"

"প্রেটোতে কিন্তু ভালুক আছে--তোমার মুখেই শুনেছি।"

"আমার বন্দুক আছে—আপনার পিস্তল।"

"কিন্তু রাত নামলে দেখবে কি করে ?"

"গাইড যখন পেয়েছি। তখন ভয় কিসের ? পথ হারাবো না "

"গাইড ! সে আবার কে ?'

নিয়াডের জলধারা দেখাল নিক—"ঐ আমার গাইড। ওর পাড বরাবর পাহাড় বেয়ে উঠলেই পৌঁছে যাব কাসল-য়ে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে।"

"দু' ঘণ্টা ! তার মানে সন্ধ্যে ছটা !"

"আপনি তৈরি কিনা বলুন।"

"এর মধ্যে ?" কাতরে উঠলেন ডাক্তার। "বল কি ? এই তো ক'.মিনিট হল ঠ্যাং ছড়িয়ে বসলাম !"

"ক' মিনিটেই আধ ঘটার জোর পাওয়া গিয়েছে। শেষবার জিজ্ঞেস করছি—তৈরি ?"

"নিক, নিক, নিষ্ঠুর হয়ো না। দেখতে পাচ্ছ না আমার গোড়ালী ফুলে ঢোল হয়ে গেছে ? পা সীসের মত ভারি হয়ে গেছে ? নিক, আমার পা কি ফরেস্টারের পা যে—"

"খামোকা মাথা গরম করে দিচ্ছেন ! যেখানে খুশি যান্। আমি চললাম," বলে উঠে দাঁড়াল নিক।

"দাঁড়াও ! দাঁড়াও" ককিয়ে উঠলেন ডাক্তার। "কথাটা শুনে যাও !"

"বাজে কথা শোনবার সময় নেই।"

"বাজে নয়। কাজের কথাই বলছি বাবা ! রাতটা গাছের তলায় ঘুমোলে হয় না ? ভোর হলেই—'

"এক কথা আর কতবার বলতে হবে ? বলছি না রাতটা কাসলের মধ্যে ঘুমোব ?"

"না, না, না ! আমি তা হতে দেব না !"

"আপনি ? আমাকে আটকাবেন ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ ! তোমাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসব ! মেরে পাট করে দেব !"

বেচারা পাটাক ! ভয়ের চোটে হুঁশ নেই কি বলছেন !

জবাব না দিয়ে বন্দুক কাঁধে ঝোলাল নিক। পা বাড়াল সামনে।

"সবুর ! সবুর !" বলতে বলতে ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়ালেন ডাক্তার।

"কি শয়তান ছেলেরে বাবা! গোড়ালীর যন্ত্রণায় মরতে বসেছি মায়া-দয়াও নেই?"

কিন্তু ফরেস্টার ততক্ষণে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে। যন্ত্রনায় মুখ বেঁকিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পেছন-পেছন ছুটলেন ডাক্তার। তখন বিকেল চারটে। পড়ন্ত রোদ ঝিল-মিল করছে প্লেসা অরণ্যের মগডালে। রোদ সরে যাচ্ছে ক্রমশঃ। একটু পরেই আরও ওপরে রোদ উঠে যাবে—আলোকিত হবে পাইন জঙ্গলের শীর্ষদেশ। এর মধ্যেই কিন্তু অন্ধকার ঘনিয়ে উঠছে নিচের বনভূমিতে—দ্রুত এগিয়ে আসছে ঘনায়মান অন্ধকার।

অদ্ভুত, সত্যিই ভারি অদ্ভুত এই জঙ্গলের চেহারা। মামুলী আল্‌পাইন গাছ ছাড়া অন্য গাছ চোখে পড়ছে না। গুঁড়িগুলো কিন্তু তেড়াবেঁকা, বক্র, কুব্জ নয়—সটান উঠে গেছে পঞ্চাশ ষাট ফুট ওপরে। ঠিক যেন খাড়াই খুঁটি। তারপর চিরসবুজ ছাদ রচনা করেছে মাথার ওপর। পায়ের তলায় আগাছা নেই। কিন্তু সর্পিল শেকড় আছে। কনকনে ঠাণ্ডায় হিমশীতল বৃক্ষমূল সাপের মত এঁকে বেঁকে এগিয়ে গিয়েছে দিকে দিকে। আর আছে হলদেটে শ্যাওলা—যেন মখমল কোমল কার্পেট পাতা বনতল জুড়ে। ছোট ছোট ডাল পড়ে রয়েছে হলদে গালচের ওপর—মড় মড় করে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে পায়ের তলায়। স্ফটিকের মত কুচোকাচা পাথর ফুটছে শুকতলায়—ধাবালো পাথর—জুতোর মধ্যে দিয়েও খোঁচা লাগছে পায়ে।

সিকি মাইল উঠতেই জিভ বেরিয়ে গেল ডাক্তারের। দুর্গম এ-পথ পাড়ি দিতে হলে চাই মজবুত দেহ, কঠিন সংকল্প আর দুর্জয় সাহস। দুঃখের বিষয়, পাটাকের কোনোটাই নেই। একা হলে এক ঘণ্টার মধ্যেই পথটুকু পেরিয়ে যেত নিক। কিন্তু লাগল তিন ঘণ্টা। অপদার্থ সঙ্গীর জন্যে বাধা পেতে হচ্ছে পদে পদে। দাঁড়াতে হচ্ছে, হাত ধরে পাথরের ওপর টেনে তুলতে হচ্ছে। ভয়ে প্রাণ উড়ে গিয়েছে ডাক্তারের। শরীর আব বইছে না। অথচ কালো দৈত্যের মত অন্ধকার চেপে বসছে ধীরে ধীরে। নিষ্ঠুর নিক যদি তাঁকে ফেলে পালায়? তাই মরতে মরতেও ওপরে উঠছেন ডাক্তার।

কিন্তু আর বুঝি ওঠা যাবে না। পাথর এবার দেওয়ালের মত খাড়াই হয়ে নিয়েছে জায়গায় জায়গায়। লম্বা লম্বা গাছ আর চোখে পড়ছেনা। কাটা গুঁড়ির মত এলোমেলো কিছু খোঁটা। ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে বহুদূরের পর্বতশ্রেণী—সন্ধ্যার কুয়াশায় আবছা, অস্পষ্ট।

নিয়াডের সে চেহারা আর নেই। সে প্রতাপও নেই। ঝিরঝিরে ঝর্ণার মত জলধারা নেচে নেচে নামছে পাহাড় বেয়ে। কয়েক শো ফুট ওপরে

ওরগাল প্লেটো। ঠিক মাঝখানে শয়তানের মুকুটের মত ভয়াল ভয়ংকর কার্পেথিয়ান কাস্‌ল্‌।

পাটাকের শরীরে আর শক্তি নেই। নিক ডেক তাঁকে টানতে টানতে তুলে নিয়ে এল প্লেটোর ওপর। সঙ্গে সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন ডাক্তার। পড়ে রইলেন মড়ার মত। আর বিশগজও বুকে হেঁটে যাওয়ার ক্ষমতা তাঁর নেই। নিস্পন্দ দেহ দেখে মনে হল যেন প্রাণহীন বলীবর্দ—এইমাত্র জবাই হয়ে গেল কশাইয়ের ছুরিতে।

নিক ডেক কিন্তু একটুও হাঁপায় নি। সটান দাঁড়িয়ে নিষ্কম্প দেহে একদৃষ্টে চেয়ে আছে কার্পেথিয়ান কাস্‌ল্‌য়ের দিকে, এত কাছ থেকে বহু প্রবাদ, বহু কিংবদন্তী, বহু ভয়ংকর কাহিনীর কেন্দ্র গড় কার্পেথিয়ানকে দেখছে সে এই প্রথম।

দৃষ্টিপথ অবরোধ করে দাঁড়িয়ে প্রাকার পরিবেষ্টিত বিরাট কেল্লা। প্রাচীরের এপাশে সুগভীর পরিখা। টানাপোল তোলা রয়েছে প্রস্তর-তোরণের মাঝে।

চারদিক নিঝুম, নিস্তব্ধ। কীটপতঙ্গরাও বুঝি চম্পট দিয়েছে তল্লাট ছেড়ে। খাঁ-খাঁ করছে ওরগাল প্লেটো। গোধূলির আলোয় আরো ক্রুর, আরো কুটিল আরো করাল দেখাচ্ছে কেল্লা-প্রাসাদকে। ডোনজোনের ছাদে জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। পাঁচিলের ওপরেও নেই কোনো ছায়া মূর্তি। মর্চেধরা চিমনীর ওপর ধোঁয়ার চিহ্নও তো নেই?

ঘনায়মান তমিস্রার মাঝে জমাট আতংকের মত দাঁড়িয়ে কার্পেথিয়ান কাস্‌ল্‌। কৃষ্ণকায় প্রস্তরপিণ্ড তো নয় যেন মৃত্যুলোকের তোরণ পথ!

হাড় হিম হয়ে গেল ডক্টর পাটাকের।

বললেন কাষ্ঠ হেসে—"নিক, খাল পেরোবে কি করে? টানাপুল নামাবে কি করে? গেট টপকাবে কি করে?"

জবাব দিল না নিক ডেক। অন্ধকার রাতে গভীর খালে নামা সত্যিই সম্ভব নয়। দুর্গের পাঁচিলে ওঠার প্রশ্নই ওঠে না। রাত ভোর না হওয়া পর্যন্ত সবুর করা ছাড়া আর পথ নেই। কেরদানি দেখাতে হলে চাই ফুটফুটে দিনের আলো।

সিদ্ধান্ত শুনে আনন্দে আটখানা হলেন ডাক্তার। আর খামোকা দেরি হওয়ার জন্যে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল নিক ডেক।

৬। নিক ভেংক, তঁবুও এঁলি বাঁরণ কঁরার পর, শ"াস্তি তোঁকে পেঁতেই হঁবে— অঁতি ভ য়ংকর !

রুপোর কাস্তের মত ফালি চাঁদ মিলিয়ে গেল সূর্য অস্ত যেতেই। পশ্চিম থেকে উড়ে এল মেঘের পর মেঘ—গোধূলির শেষ আলোটুকুও যেন নিবিয়ে দিল এক ফুৎকারে। নিচের বনতল থেকে অন্ধকার ঠেলে উঠছে ওপরে· · আসছে আঁধার ·আসছে তমিস্রা। দেখতে দেখতে দুর্নিরীক্ষ্য অবগুণ্ঠনে আবৃত হল চরাচর। পর্বতবলয়ের আবছা আদল পর্যন্ত বুঝি ফুসমন্তরে মিলিয়ে গেল ফুস করে। কাস্‌ল্ গড় কার্পেথিয়ান নিমেষ মধ্যে ডুব দিল আঁধার-সাগরে।

অমানিশা যত গাঢই হোক না কেন, ঝড়বাদলা উৎপাত শুরু করবে বলে মনে হয় না। খোলা আকাশের তলায় রাত কাটাতে হবে তো। আকাশ জোড়া ঝর্ণা নামলে, তুফান উঠলে মুস্কিল বৈকি।

খাঁ-খাঁ করছে ওরগাল প্লেটো। ঝাঁকড়া মাকড়া মহীরুহের চিহ্নমাত্র নেই। মামুলী গাছও নেই। পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মত দেখা যাচ্ছে দু'একটা নিঃসঙ্গ ঝোপ। আশ্রয় নেবার মত নয়। আর রয়েছে বিস্তর পাথর। কোনোটা আধ-পোঁতা, কোনোটা টলমলে। জোর হাওয়ায় দুলে ওঠে। কড়ে আঙুলের ঠেলায় গড়িয়ে পড়তে পারে বহু নিচে পাইনের শীর্ষে।

রাত বাড়ছে। অন্ধকার ঘন হচ্ছে। সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পাচ্ছে হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা। এত উঁচুতে ঠাণ্ডা তো পড়বেই।

"সুখে থাকতে ভূতে কিলোনো! না জানি কপালে আরো কত দুর্গতি আছে," যেন হাওয়াকে লক্ষ্য করে বললেন পাটাক

"ফের গজগজ করছেন ?" ধমকে উঠল নিক।

"বেশ করছি! আলবৎ করব! একশবার করব! বুকে যদি সর্দি বসে, তুমি দেখবে ? রাতে যদি গোড়ালী ফোলে, জীবনে আর সারাতে পারব ?"

বেচারা! ভয়ের চোটে বেফাঁস কথা বেরিয়ে পড়েছে হাতুড়ের মুখে! তাঁর আর দোষ কি। বারবার মনে পড়ছে গাঁয়ের কথা। নরম বিছানা, উষ্ণ ঘর আর প্লেট ভর্তি খাবার! শ্রান্তিতে ক্লান্তিতে খসে গেছে মুখের লাগাম।

দক্ষিণ পশ্চিমের হাওয়া আড়াল করতে পারে, এমনি একটা পাথর খুঁজে বার করতে হবে সবার আগে। হাওয়ার বেগ ক্রমশঃ বাড়ছে—পাটাক তো

এর মধ্যেই হি-হি করে কাঁপতে শুরু করেছে। দেখে মায়া হল নিক-য়ের খুঁজে পেতে বার করল একটা চ্যাটালো পাথর।

এ-ধরনের পাথরওয়ালা চিমনি রাস্তাঘাটের মোড়ে মোড়ে ঝোপঝাড়ের মধ্যে দেখা যায়। ফুলদানীর মত ছোট্ট একটা পাত্র বসানো থাকে তার ওপর। গাঁয়ের লোক রোজ জল ঢেলে দিয়ে যায় তাতে। পথ ক্লান্ত পর্যটক পাথরে বসে বিশ্রাম নেয়, জল পান করে তেষ্টা মেটায়। এ-পাথরটাও হুবহু সেই রকম। পাত্রটা অবশ্য ধাতুর তৈরি। এককালে গর্ভস্ ব্যারনরা কেল্লা থেকে হাওয়া খেতে আসতেন এদিকে। বসতেন পাথরে। চাকরবাকররা নিয়মিত কানায় কানায় ভরে রাখত জলাধার। সেদিন আর নেই। তাই জলাধার আজ খটখটে শুকনো। ধুলোময়লায় নোংরা। সবুজ শ্যাওলায় ছাওয়া। টোকা মারলেই জং-ধরা জলাধার গুঁড়িয়ে যাবে নিমেষ মধ্যে।

শিলাসনের পাশে গ্র্যানাইট পাথরের একটা খুঁটি। আগে সেখানে ক্রশ ঝুলত। এখন নেই।

ডক্টর পাটাক নাস্তিক মানুষ। সুতরাং পবিত্র ক্রশের সান্নিধ্যে রাত্রিবাস করলে নিরাপদে থাকা যাবে, এ-বিশ্বাসও তাঁর নেই। তবে অবিশ্বাসী মানুষরা সাধারণতঃ ঈশ্বরে বিশ্বাসী না হলেও ভূতপ্রেতকে বিশ্বাস করে—শয়তানকে সমীহ করে। ডক্টর পাটাক এই দলের মানুষ। দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দুতে তখন তাঁর শিহরণ জেগেছে। প্রতিটি লোমকূপে রোমাঞ্চ দেখা দিয়েছে। মন বলছে, চর্ট অর্থাৎ শয়তান আর বেশি দূরে নেই। পিশাচপুরী অতি সন্নিকটে। ঘাঁটির বাইরে আসতে হলে তাকে টানা পুল নামাতে হবে না, পরিখা পেরোতে হবে না, পাঁচিল লঙ্ঘন করতে হবে না—সোজা উড়ে আসবে শূন্য পথে কল্পনাতীত বেগে—চক্ষের নিমেষে দুজনের ঘাড় মটকে ফিরে যাবে আপন আলয়ে!

না, না, না! এ-অবস্থায় খোলা আকাশের নিচে রাত কাটানো সমীচীন হবে না মোটেই!

আচম্বিতে আর একটা ভয়ংকর কথা মনে পড়ে গেল ডাক্তারের। কি আশ্চর্য! গ্রাম থেকে রওনা হওয়ার সময়ে এ-কথা মনে হয় নি কেন? আজ যে মঙ্গলবার!

"আজকে রাতে,
ভূতরা ছাদে,
নাচবে তা-ধিন-ধিন!"

মঙ্গলবার রাতে গাঁয়ের কেউ রাস্তায় বেরোয় না। পথেঘাটে পথচারী

দেখা যায় না। কেন না, মঙ্গলবার ভূতপ্রেতরা পালে পালে প্রেতলোক থেকে নেমে আসে নরলোকে। অদৃশ্য বিভীষিকা হানা দেয় আনাচে কানাচে পথে-ঘাটে মাঠেবাটে। এ-রাত ভূতেদের রাত। পিশাচ ডাইনীদের মহোৎসব হয় ফি-মঙ্গলবারে!

ভাবতেই রক্ত জমে কুলপী বরফ হয়ে এল ডাক্তারের! আজ সেই ভয়ংকর মঙ্গলবার! গ্রাম এখান থেকে তিন মাইলের কম নয়। ভয়াল কার্পেথিয়ান কাস্‌ল্‌ কিন্তু সামনেই দাঁড়িয়ে রক্তহীন অন্ধকারে কালান্তক বিভীষিকার মত! এ-হেন পরিবেশে রাত্রিবাস করতে হবে ডাক্তারকে ভোর না হওয়া পর্যন্ত! কিন্তু শয়তান কি লোভ সামলাতে পারবে? ভ্যাম্পায়ার শানিত দন্ত খিঁচিয়ে তেড়ে আসবে তাজা নররক্তের স্বাদ নিতে, উড়ে আসবে কবরের নামহীন বিভীষিকারা ধক্‌ধকে চক্ষু মেলে!

এই সময়ে চোখ পড়ল ফরেস্টারের ওপর। আশ্চর্য ছেলে বটে! ধীরে-সুস্থে একটা প্রকাণ্ড মাংসের টুকরো বার করেছে ঝোলার ভেতর থেকে। ঠাণ্ডা মাংস। কিন্তু তাই চিবুচ্ছে পরমানন্দে এবং চুক চুক করে মদ্যপান করছে ফ্লাস্ক থেকে।

দেখেই জিভ রসিয়ে উঠল ডাক্তারের। ভাবনা শিকেয় তোলা থাকুক। পেটে কিছু না দিলেই নয়।

সুতরাং তাঁরও ঝোলা থেকে বেরোলো হাঁসের ঠ্যাং, পাতলা রুটি আর র‍্যাকিও সুরা। খিদেটা কব্জায় এল বটে, কিন্তু ভয়কে বাগে আনা গেল না।

"নিন, শুয়ে পড়ুন," ঝোলা নামিয়ে রেখে বলল নিক।

"শোব?"

"ঘুমিয়ে নিন।"

"বলা সহজ, নিক।"

কিন্তু কাকে বলছেন ডাক্তার? নিক ডেক ততক্ষণে টান টান হয়ে শুয়ে পড়েছে শিলাসনে এবং শোনা যাচ্ছে ধীর স্থির শ্বাসপ্রশ্বাসের নিয়মিত ছন্দ। দেখতে দেখতে অকাতরে ঘুমিয়ে পড়ল জঙ্গলের মানুষ। বনেজঙ্গলে পাহাড়ে পর্বতে ঘুমোনোর অভ্যেস তার অনেকদিনের।

কিন্তু পাটাক? কি করবেন এখন তিনি? কান আর চোখ দুটোকে যদি কিছুক্ষণের জন্যেও বন্ধ রাখা যেত, স্বস্তি মিলত, ভয় ভাঙত। কিন্তু তা তো হবার নয়। অনিদ্রারুগীরা নাকি সারা রাত অদ্ভুত শব্দ শুনতে পায়, উদ্ভট ছায়া দেখতে পায়। সমস্ত রাত চমকে চমকে ওঠে। ডক্টর পাটাকের অবস্থাও হয়েছে তাই।

অথচ বড় বড় চোখ মেলে কি যে দেখতে চাইছেন তিনি নিঃসীম অন্ধকারের মধ্যে, তা নিজেও জানেন না। তিনি জানেন না কেন বার বার সীমাহীন শূন্যতার মধ্যে কাকে খুঁজছেন, কি দেখতে চাইছেন, কি শুনতে ব্যগ্র হয়েছেন। মাথার ওপর জমাট মেঘ আর অদূর তমাল কালো কাস্‌ল্‌-গড়। প্লেটোর টলমলে পাথরগুলো অলৌকিক ফৌজের মত টলে-টলে কুচকাওয়াজ শুরু করেছে নাকি? চোখের ভুল না তো? হাওয়ায় টলটলায়মান শিলাখণ্ড যদি গড়িয়ে নেমে আসে, তাহলে আর দেখতে হবে না। দৈত্যাকার কাস্‌ল্‌-গড়ের অতিকায় তোরণদ্বারে দুই অভিযাত্রীকে আছড়ে ফেলবে স্খলিত পাথর—চিঁড়ে চ্যাপ্টা করে ছাড়বে মুহূর্তের মধ্যে!

বিশাল টেবিলের মত প্রকৃতির সুউচ্চ পাথুরে ছাদ খাঁ-খাঁ করছে। ঠিক যেন মরুভূমি। তবুও উঠে দাঁড়ালেন ডাক্তার। কানে ভেসে এল অদ্ভুত একটা শব্দ। কারা যেন ফিস ফিস করে কথা বলছে, গুঙিয়ে গুঙিয়ে কাঁদছে, পাঁজর ভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। নিশাচর পক্ষীরা যেন একনাগাড়ে ডানা ঘসছে কর্কশ পাথরে, আকাশপথে নৈশবিহার শুরু করেছে স্ট্রাইজি দানোরা এবং দু'তিন জোড়া নিশীথ-পেঁচা হু-হু করে যেন ককিয়ে কাঁদছে আত্যন্তিক যন্ত্রণায়। নিমেষমধ্যে হাতে পা-য়ে খিঁচ ধরল ডাক্তারের, শিউরে উঠল সর্বাঙ্গ, হিমেল ঘাম দরদর করে ঝরে পড়ল কনকনে রাতেও।

রাত কি আর ফুরোবে না? এক-একটা মিনিট এত দীর্ঘ হয়, তা তো জানা ছিল না ডাক্তারের। দুটো কথা বলতে পারলে ভয়টা কমত। কিন্তু বলবেন কার সঙ্গে? ফরেস্টার অকাতরে ঘুমোচ্ছে।

রাত বারোটা! অশরীরীদের মাহেন্দ্রক্ষণ! অশুভ শক্তিসমূহের শ্রেষ্ঠ লগ্ন! লক্ষ লক্ষ যক্ষরক্ষর অট্টহাসি শোনা যায় রাত ঠিক বারোটায়! ত্রিভুবন জুড়ে দাপাদাপি মাতামাতি নরক-গুলজার আরম্ভ হয় রাত ঠিক বারোটায়!

রাত বারোটা! ভয়াল ভয়ংকর করাল কুটিল রাত বারোটা!

না জানি এবার কি অসম্ভব ঘটনা ঘটে!

ফের উঠে দাঁড়িয়েছেন ডাক্তার। দুঃস্বপ্ন দেখছেন না তো? ভুল শুনছেন না তো? অলীক মরীচিকা দর্শনে মোহাবিষ্ট হচ্ছেন না তো?

মাথার ওপর এ কি ভাসছে? কারা এরা?…অদ্ভুত, বিদঘুটে, কিম্ভুত-কিমাকার! বিচিত্র আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত দিক হতে দিগন্ত। উড়ন্ত মেঘের তালে তাল মিলিয়ে ভৌতিক দ্যুতির সাথে উঠছে, নামছে, ভাসছে, দুলছে দুঃস্বপ্নের ছায়ামূর্তিরা! ভাসছে বিকট দর্শন রাক্ষস, কুটিল দন্ত ড্রাগন, বিশাল

পক্ষ হিপোগ্রিফ,* দানববপু ক্র্যাকেন,* পর্বতসমান ভ্যামপায়াড়। ল্যাজ আছড়ে, নখ উঁচিয়ে, দাঁত বার করে ওরা একযোগে যেন তেড়ে আসছে এই দিকেই!

পরমুহূর্তেই যেন জীবন্ত হল সারা ওরগান প্লেটো। যেন পাথর প্রাণ পেল, শিলাস্তূপ নড়ে উঠল, ঝোপঝাড় বাঙ্ময় হল। গাছ গাছালি পর্যন্ত তিড়বিড়িয়ে উঠল রক্ত জলকরা সেই শব্দ-লহরী শুরু হতেই।

ঘণ্টা বাজছে। ঘণ্টাধ্বনি উঠে আসছে যেন পাতালের বুক চিড়ে!

"ঘণ্টা! ঘণ্টা!" ককিয়ে উঠলেন ডাক্তার। "কাস্‌ল্ গড়ের ঘণ্টা!"

সত্যিই তাই! বহুদিন নিশ্চুপ থাকার পর মুখরিত হয়েছে কাস্‌ল্-য়ের সুবৃহৎ ঘণ্টা। বুড়ো গির্জে যেন ঢং-ঢং-ঢং শব্দে বলতে চাইছে—আমি জেগেছি! আমি আছি! আমি থাকব! না! এ-ঘণ্টা ভলক্যান চার্চের ঘণ্টা নয়। হাওয়া ঐ দিকে বইছে। আওয়াজ ভেসে আসার কথা নয়।

কিন্তু স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে ঢিমেতালের ঘণ্টাধ্বনি। সমতল প্রস্তর ভূমির ওপর দিয়ে ঢেউয়ের পর ঢেউ আসছে···কাজের ঢেউ···নিশুতি রাত্রি মথিত করে বাজছে জনহীন প্রস্তর প্রাকাব পরিবেষ্টিত প্রেতপুরীর ঘণ্টা :

ঢং······ ·· ঢং····· ·· ঢং··· · · ঢং

আচম্বিতে বৃদ্ধি পেল ঘণ্টার তাল। দ্রুতছন্দে গুরু গম্ভীর নিনাদ আছড়ে পড়ছে কর্ণরন্ধ্রে। অদৃশ্য হস্ত যেন ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ঘনঘন নাড়া দিচ্ছে সুবৃহৎ ঘণ্টাকে · মুহুর্মুহু ঘণ্টাধ্বনি করে বলতে চাইছে পাষাণ পুরীর সবাইকে—"জাগো·· জাগো·· তোমরা জাগো! হানাদার এসেছে তোমাদের নীরব আলয়ে! জাগো তোমরা! সুপ্তি ভাঙা বিকট চাহনি মেলে ভস্ম করো দুর্বিনীত আহাম্মকদের!"

ঢং·· ঢং·· ঢং·· ঢং ঢং !

যেন পাগলা ঘণ্টা বাজছে! রাত দুপুরের প্রেত-নাটিকা চরমে পৌঁছেছে! অদৃশ্যলোকের প্রত্যন্ত প্রদেশেও আহ্বান পৌঁছে যাচ্ছে—"ওরে তোরা আয় ··আয়···আয় · ! বাদুড়ের ঘুম ভাঙিয়ে, প্যাঁচাকে চমকে দিয়ে কবর থেকে উঠে আয়!"

দিকে দিকে ধ্বনি আর প্রতিধ্বনির তরঙ্গ বয়ে গেল। সীমান্ত পর্যন্ত শিউরে উঠল অ্যালার্ম-বেল শুনে!

হিপোগ্রিফ—পৌরাণিক দৈত্য। মাথাটা ঈগল পাখীর, দেহটা পক্ষীরাজের।
ক্র্যাকেন—কিংবদন্তীর সমুদ্র-রাক্ষস।

"হুশিয়ার! সবাই হুঁশিয়ার!"

ডক্টর পাটাকের গায়ের লোম থেকে মাথার চুল পর্যন্ত দাঁড়িয়ে গেল সেই শব্দ শুনে, নিঃসীম আতংকে অবশ হয়ে এল হৃৎপিণ্ড, প্রতিটি লোমকূপে জাগল কল্পনাতীত শিহরণ!

ঘণ্টার আওয়াজে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল ফরেস্টারের। উঠে বসে শুনছিল বিস্মিত অন্তরে মুহুর্মুহু ঘণ্টাধ্বনি। বিস্ফারিত চোখে দেখতে চাইছিল অন্ধকারে অন্তরালে কোন্ বিভীষিকা সৃষ্টি করেছে এ-হেন রক্ত জমানো ঘণ্টা রহস্য!

"গড়ের ঘণ্টা! গড়ের ঘণ্টা!" ফের ককিয়ে উঠলেন ডাক্তার। "চর্ট খেপে গিয়েছে!"

রাত দুপুরের নাটিকা শুনেই অবিশ্বাস ছুটে গিয়েছে ডাক্তারের। ভূত-প্রেতে তার এখন পুরো বিশ্বাস।

সটান দাঁড়িয়ে উঠল ফরেস্টার। চোখের পাতা পড়ল না। জবাব ও দিল না। নিথর দেহে চেয়ে রইল সামনের দিকে।

সহসা যেন ফগহর্ণ বেজে উঠল তীক্ষ্ম তীব্র শব্দে। কানের পরদা ফাটানো আওয়াজ আচমকা আছড়ে পড়ল কানের পরদায়। কুয়াশায় পথ হারিয়ে বন্দরের প্রবেশ মুখে এমনি করে ভোঁ বাজায় দিশেহারা জাহাজ। ফগহর্ণ! কর্ণপটহবিদারী আতীব্র আওয়াজে মহাশূন্যের অশরীরীদেরও বুঝি এবার আমন্ত্রণ জানালো হল শরীরী-লোকের মরণ-নাটকে!

"আয়·· আয়···তোরা ছুটে আয়·· নিশার আতংক তোরা নেমে আয়!"

পরমুহূর্তেই একটা চোখ ধাঁধানো আলোকদ্যুতি দপ করে ঠিকরে এল মাঝের ডোনজোন-শীর্ষ থেকে। একটা অতি তীব্র আলোকচ্ছটা তমিস্রা-রাজ্যকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে ধেয়ে এল শয়তানের শিখর থেকে!

এ কিসের আলো? কোন্ অগ্নিকুণ্ডে উৎপত্তি এই ভীষণ দ্যুতিময় বজ্রের শিখা? লক্ষ বজ্রের ঝলকানিও বুঝি এর সমান নয়! নরকাগ্নি বুঝি মূর্ত হল অত্যাশ্চর্য সেই আলোকরশ্মির মধ্যে! শয়তান কি তার মশাল জ্বেলেছে? নরক-কুণ্ড থেকে অগ্নিস্রোত মর্ত্যের আকাশেও কেউ ছড়িয়ে পড়ছে? পাহাড়, ঝোপ সব কিছুই যেন জীবন্ত, প্রাণবন্ত হয়ে উঠল বিচিত্র সেই আলোকচ্ছটায়!

কান্নার মত কাতরে উঠলেন ডাক্তার—"নিক! নিক! আমিও কি তোমার মত মড়া হয়ে গেছি?"

বাস্তবিকই, নরক-মশালের অলৌকিক দীপ্তি যেন চেহারা পালটে দিয়েছে দুজনের। কেউ কাউকে চিনতে পারছে না। একি চেহারা তাদের?

রক্তহীন ফ্যাকাসে মুখ···ছাইয়ের মত পাংশু শুষ্ক দেহ···দুই চোখ যেন নিপাত্তা —পড়ে আছে শূন্য অক্ষিকোটর···গাল দুটো যেন সবুজাভ-ধূসর শ্যাওলায় ছাওয়া—ফাঁসির দড়িতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত কংকালের হাড়ে নাকি এমনি কদাকার শ্যাওলা গজায়!

স্তম্ভিত হয়ে গেল নিক ডেক। শ্রবণ-যন্ত্র কি বিকল হয়েছে? চোখ কি মরীচিকা দেখেছে?

ডক্টর পাটাক অনেক ভয় পেয়েছেন। এখন ভয় পাওয়ার বাইরে চলে গিয়েছেন। সারা দেহ তাঁর সম্মোহিতের মত শিথিল, মন অসাড়, চক্ষু-তারকা বিস্ফারিত, দেহ রোমাঞ্চিত। এই অবস্থাকেই ভিক্টর হুগো এক কথায় বর্ণনা করেছেন তাঁর 'কনটেমপ্লেশনস্' কবিতায়। "নিঃশ্বাসে তার আতংক!"

বড় জোর এক মিনিট—তার বেশি স্থায়ী হল না এই নরক দৃশ্য। লোমহর্ষক আলোকরশ্মি মিলিয়ে গেল তমাল কালো অমানিশায়, গুরু-গুরু নিনাদ গুম-গুম শব্দে উধাও হল পাহাড় বনের মাথা দিয়ে। নিশ্ছিদ্র নীরবতা আর নিরন্ধ্র অন্ধকার ফের জাঁকিয়ে বসল ওরগাল প্লেটোয়।

ঘুমের কথা আর ভাবা যায় না। আচ্ছন্নের মত বসে রইলেন ডাক্তার। আর অতন্দ্র নয়নে বিস্ময়াহত অন্তরে ভোরের প্রতীক্ষায় প্রহর গুণে চলল নিক ডেক।

কি করবে এখন সে? ডোনজোন-রহস্য স্বচক্ষে দেখবে বলেই পাহাড় বন ঠেঙিয়ে এসেছে এতদূর—কার্পেথিয়ান কাসল্‌য়ের পাদমূলে। আসতে না আসতেই শুরু হয়েছে নারকীয় নাটিকা··শয়তান নাকি রেগে টং হয়েছে সামান্য দুই মানুষের পাহাড়-প্রতিম ধৃষ্টতা দেখে!

এইমাত্র যে কাণ্ড ঘটল এরপর কি আর এগোনো সমীচীন হবে? ভয়ংকর দুর্গের ভেতর না দেখেই ফিরে যাবে? গাঁয়ে গিয়ে কি বলবে ভূতের তাড়া খেয়ে জান-মান নিয়ে পালিয়ে এসেছে?

আচমকা সম্বিৎ ফিরে এল ডাক্তারের। হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠে খামচে ধরল নিককে—"না, না! তুমি যেওনা!"

"না," দৃঢ় কণ্ঠ নিক ডেকের। বলে, দুহাতে আলুথালু ডাক্তারকে ধরে এমন ঝাঁকুনি দিল যে ঘোর কাটতে বেশি দেরি হল না।

অবশেষে রাত ফুরোল। কি করে বাকি রাত কাটল, সে হিসেব রাখবার মত মনের অবস্থা কারোই ছিল না। পূবদিগন্তে দেখা দিল উষার আভা। মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্যরশ্মি ছড়িয়ে গেল কৃষ্ণ নীল আকাশে। ঠিক যেন জেব্রার চামড়া—সাদা কালো ডোরাকাটা।

কাসল গড়ের দিকে ফিরে চাইল নিক। রাতের কুয়াশা সরে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে ডোনজোনের শিখরদেশ, সুউচ্চ প্রাকার, প্রস্তর ধূসর কেল্লা। ভলক্যান ঢাল বেয়ে কুয়াশা নেমে যাচ্ছে গড়িয়ে গড়িয়ে। কোণের বীচ গাছটা পর্যন্ত এবার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পূবের হাওয়ায় দুলে-দুলে উঠছে ডাল আর পাতা। পত্র মর্মর তো নয়, মুমূর্ষুর দীর্ঘশ্বাস!

ডোনজোনের মাথায় ধোঁয়ার লেশমাত্র নেই। পুরোনো ঘণ্টা স্থিরভাবে ঝুলছে বুড়ো গির্জের ঘণ্টাঘরে। সব কটা জানলা যেমন তেমনি বন্ধ। দু' একটা পাখি উড়ছে কালো কুটিল কেল্লার মাথার ওপর।

প্রবেশ পথের চেহারাও পালটায়নি। টানাপুল যেমন তেমনি তোলা রয়েছে পাথর-ফটকের মাঝে। তোরণের মাথায় গর্তস্ ব্যারনদের বংশ প্রতীক।

না, ফরেস্টারের মনোভাব পালটায়নি। পণ করেছে গড়ের রহস্য দেখবেই। না দেখে ফিরবে না। ম্যাথিয়াস-য়ের হলঘরে পৈশাচিক হুমকি তাকে নিরস্ত করতে পারে নি। একটু আগেই আলো আর শব্দের রক্ত জল করা কাণ্ড কারখানা দেখেও সে ভয় পায়নি। ঘণ্টাখানেক মেহনৎ করলেই পাঁচিল টপকে ভেতরে ঢোকা যাবে। তারপর ধীরে সুস্থে পরিত্যক্ত দুর্গের বর্তমান চেহারা দেখে নিয়ে ফিরে যাবে বার্স্ট গ্রামে।

ডাক্তার তখন ঠিক একটা ন্যাকড়ার পুঁটলির মত অসহায়। নিয়ে গেলে যাবেন, ফেলে গেলে পড়ে থাকবেন। ভয় জিনিসটা বড় সাংঘাতিক জিনিস। স্নায়ুর দফা রফা করে দেয়। একরাতের আতংক পাটাককেও শেষ করে এনেছে। স্বইচ্ছায় বেলসা অরণ্য পেরিয়ে গ্রামে ফেরবার ক্ষমতা তাঁর নেই। তাই নিকের হ্যাঁচকা টানে উঠে দাঁড়ালেন কাঠের পুতুলের মত। হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল নিক—বাধা দিলেন না।

নিক কিন্তু বিব্রত ঢোকবার সমস্যা নিয়ে। টানাপুল ভেতর থেকে তোলা। সুতরাং তোরণ পথে প্রবেশ সম্ভব নয়। পাঁচিল টপকানো আরো অসম্ভব। পরিখা থেকে চল্লিশ ফুট ওপরে পাঁচিলের শীর্ষ। টিকটিকির মত এই চল্লিশ ফুট দেয়াল বেয়ে ওঠার প্রশ্নই ওঠে না। দেয়ালে ভাঙচোর নেই, ফাটাফুটো নেই কে পা রেখে রেখে উঠবে। আশ্চর্য! এ মান্ধাতার আমলের কাস্‌লের প্রাচীর দেয়াল এত অযত্নের মধ্যেও এমন সুদৃঢ় কে জানত! তবে কি কেল্লার তলায় এসেও মুখ চুণ করে ফিরে যেতে হবে?

কিন্তু কপাল ভাল নিক ডেকের। খিড়কির দরজার ওপরে ঘুলঘুলির মত একটা ছেঁদা দেখা যাচ্ছে। বেশ বড় ছেঁদা। এককালে কামানের নল বেরিয়ে

থাকত সেখানে। এখন তার পাশ দিয়ে টানাপুলের লোহার শেকলটা ঝুলছে মাটি পর্যন্ত। হাতে পায়ে যার জোর আছে, অনায়াসে সে শেকল বেয়ে উঠে যেতে পারে ঘুলঘুলি পর্যন্ত। ঘুলঘুলির ওদিক যদি গরাদ দিয়ে বন্ধ না থাকে, কেল্লার ভেতরে ঢুকতে বেগ পেতে হবে না।

অর্ধ-অচৈতন্য অবস্থাতেও ডাক্তার বুঝলেন, ঐ পথেই কেল্লা জয় করতে চলেছে নিক। হিড় হিড় করে ভারি বস্তার মত তাই তাঁকে টেনে নিয়ে চলেছে ঢালু পাড় বেয়ে পরিখার তলায়।

পরিখার মাটিতে পা রাখে কার সাধ্যি। ঝোপঝাড় আগাছায় মাটি দেখা যাচ্ছে না—পা ফেলবার জায়গাও নেই। পাথর দিয়ে বাঁধানো—তবুও আগাছা গজিয়েছে বিস্তর। বিষধর সাপ আর কাঁকড়া-বিছে পায়ের তলায় কিলবিল করছে কিনা ভগবান জানেন।

নিক ডেকের কোনো দিকে লক্ষ্য নেই। অর্ধ-মূর্চ্ছিত ডাক্তারকে টানতে টানতে পৌছোলো পরিখার ঠিক মাঝখানে। পাঁচিলের সমান্তরাল রেখায় একটা সুগভীর ট্রেঞ্চ কাটা রয়েছে সেখানে। জল প্রায় নেই বললেই চলে। অনায়াসেই পেরিয়ে গেল নিক। সম্মোহিতের মত পেছন পেছন এল পাটাক, ঠিক যেন দড়িবাঁধা নিরীহ মেষ!

ট্রেঞ্চ টপকে এসে পাঁচিলের গা ঘেঁসে বিশ গজ হাঁটবার পর টানাপুল থেকে ঝুলন্ত শেকলের তলায় পৌছোল নিক। মাথার ওপর দেখা যাচ্ছে পাথরের কারুকাজ করা মস্ত ঘুলঘুলিটা। ঠিক পাশ দিয়ে নেমে এসেছে মোটা শেকল।

পাটাককে টেনে তোলা যাবে না। উচিতও নয়। তাই একাই তৈরি হল নিক। হুঁশিয়ার করে দিল ডাক্তারকে—ভয়ের চোটে যেন পরিখায় নামতে না যান।

শুরু হল শেকল বেয়ে ওঠা। পাহাড় বেয়ে উঠতে অভ্যস্ত সে। মাংসপেশীও তৈরী রয়েছে তেমনিভাবে। শেকল বেয়ে ওঠা তার কাছে ছেলেখেলা ছাড়া কিছুই নয়। দেখতে দেখতে উঠে গেল বারো ফুট ওপরে।

কিন্তু যেই ডাক্তার দেখলেন দুলতে দুলতে অক্লেশে শূন্যে উঠে যাচ্ছে নিক এবং তিনি একলা পড়ে আছেন বিজন কেল্লার পাদদেশে, সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলেন দম আটকানো গলায়:

"নিক…নিক… নেমে এসো!"

জবাব দিল না নিক।

"নিক · নেমে এসো বলছি! নইলে আমি চলে যাব!"

"যান!" বারো ফুট ওপর থেকে হেঁকে বলল নিক এবং সঙ্গে সঙ্গে উঠে গেল আরো এক ফুট।

বিষম আতংকে যেন উন্মাদ হয়ে গেলেন ডাক্তার পাটাক। এই মুহূর্তে পরিখা টপকে ওরগাল প্লেটো থেকে পালাতে হবে। ঢের হয়েছে! আর না!

কিন্তু একি দুর্দশা হল তাঁর! নিশীথ রাতের দুঃস্বপ্ন-নাটিকাও যে সহনীয় ছিল এর তুলনায়!...পা তুলতে গেলেন পাটাক, পারলেন না! কে যেন বজ্রমুষ্টিতে আঁকড়ে ধরেছে জুতোসমেত পদযুগল!

ভয়ে কি পাগল হয়ে যাচ্ছেন ডাক্তার? সহসা একি বিপত্তি? পাতাল থেকে কোন্ শয়তান লৌহমুষ্টিতে টেনে ধরেছে তাঁকে মাটির সাথে?...অন্য পা তোলবার চেষ্টা করলেন পাটাক—পারলেন না!

কুলকুল করে ঘাম বেরিয়ে এল সারা গায়ে...খাড়া হয়ে গেল মাথার চুল... পেরেক মারা লোহার নাল-লাগানো দুটো জুতোই কে যেন চেপে ধরেছে! অদৃশ্য সে! কিন্তু অমিত শক্তি তার গায়ে! সর্বশক্তি দিয়েও পা ছাড়াতে পারলেন না ডাক্তার!

নিশ্চল পদযুগল নিয়ে অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন ডাক্তার। চেঁচাতে চাইলেন—শুকনো গলা দিয়ে শব্দ বেরোল না। দুটো পা-ই যেন পেরেক-ঠোকা হয়ে আটকে গিয়েছে মাটিতে। যেন থাবা দিয়ে আঁকড়ে ধরেছে পাতাল ড্রাগন—এবার বিকট হাঁ করে গিলবে নধরকান্তি ডাক্তারকে!

ঠিক এই সময়ে আর একটা ভয়ানক নাটক ঘটে গেল মাথার ওপর।

শেকল বেয়ে খিড়কি দরজার মাথায় উঠে এসেছে নিক। টানাপুলের কব্জা লোহার পাতে আটকানো ছিল দেওয়ালের গায়ে। হাত বাড়িয়ে সেই পাতটা যেই ধরেছে...

তীব্র যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল আর্তস্বরে! হাত ছিটকে গেল দেওয়াল থেকে...চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে এলেও শেকল ছেড়ে দিল না—শিথিল মুঠির মধ্যে দিয়ে সরসর করে পিছলে গেল শেকল—ধড়াস্ করে মাটিতে এসে পড়ল নিক। গড়গড়িয়ে ঢাল বেয়ে নেমে গেল পরিখার তলদেশে।

চেতনা পুরোপুরি লোপ পাওয়ার আগে শুধু একটা কথাই ঝলসে উঠল মগজের আকাশে—"সরাইখানার পৈশাচিক কণ্ঠ মিথ্যে বলেনি! সর্বনাশ হয়ে গেল আমার!"

৭॥ বাপ্‌রে সেকী
কাণ্ড রে ভাই
কে যেন যেই
ধরল ঠ্যাং—
কাঠের মত
দাঁড়িয়ে পাটাক,
না পারে হতে
চিৎপটাং!

অসীম উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটল মঙ্গলবার!

সেকি উত্তেজনা সারা গাঁয়ে! নিক আর পাটাককে রওনা করিয়ে দেওয়ার পর থেকেই শুরু হল গাঁ-শুদ্ধ লোকের ছটফটানি।

মাস্টার কোল্‌জ ছাদে উঠে বসে রইলেন দূরবীন নিয়ে। এমনিতে তিনি হিসেবী, কিন্তু ফ্লোরিন খরচ করার জন্যে মোটেই অনুতপ্ত নন। মাত্র ফ্লোরিনের বিনিময়ে এমন খাসা যন্ত্র ক'জন পায়?

সারাদিন তাই চোখে টেলিস্কোপ এঁটে বসে রইলেন মাস্টার কোল্‌জ। চোখ টনটন করতে লাগল, কিন্তু কৃষ্ণকুটিল কার্পেথিয়ান কাসলের মাথায় নতুন ধোঁয়ার চিহ্নমাত্র দেখতে পেলেন না। স্কুলমাস্টার হারমড আর সরাইওলা জোনাসও পালাক্রমে চোখ লাগাল দূরবীনে। কিন্তু বৃথাই।

দুপুর সাড়ে বারোটার সময়ে মাঠ থেকে ফিরে এলে মেষপালক ফ্রিক। তক্ষুণি তাকে জেরা শুরু করলেন মাস্টার কোল্‌জ। কিন্তু মনের মত উত্তর পাওয়া গেল না। ধারে কাছে কাউকেই দেখতে পায়নি সে।

জোনাসের মনের অবস্থা খুবই খারাপ। বে-আক্কেলে ভূতটা তার সরাইখানায় গলাবাজি করে যাওয়ার পর থেকে গাঁয়ের লোক 'কিং ম্যাথিয়াস'য়ের ত্রিসীমানায় ঘেঁসছে না। তাহলে কি হোটেল তুলে দিতে হবে? পাততাড়ি গুটোতে হবে? অথচ গাঁয়ের লোকের সন্দেহ ঘুচানোর জন্যে চেষ্টার ত্রুটি করেনি জোনাস। শয়তানের শয়তানি মাতব্বররা শুনে লম্বা দিতেই সে রাতে দরজা জানলা বন্ধ করে সারারাত ভয় কেঁপেছে বটে, কিন্তু ভোর হতেই তন্নতন্ন করে খুঁজেছে টেবিলের তলায়, আলমারীর আড়ালে, মাচার ওপরে। এমনও তো হতে পারে কোনো ফচ্‌কে ছোকরা ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে কোথাও?

আড়ালে থেকে হেঁড়ে গলায় ইয়ার্কি করে গেছে মাতব্বরদের সঙ্গে? কিন্তু সরাইখানার আগাপাশতলা খুঁজেও কাউকে দেখতে পায়নি জোনাস।

ফলে, ভয়ে আধমরা গাঁয়ের লোক ছায়া মাড়ানো ছেড়ে দিয়েছে 'কিং ম্যাথিয়াস' সরাইখানার। এ-হোটেলের দরজা-জানলা-দেওয়ালে নাকি শয়তানের কান আছে। বেফাঁস কথা বললেই 'চট' মহাশয় ঠিকই শুনে ফেলবে। তারপর? ঘাড় মটকাতে ক'সেকেণ্ড লাগবে তার?

সুতরাং হানাবাড়ির মত খাঁ-খাঁ করতে লাগল একদা জমজমাট সরাইখানা। মনে মনে ভেঙে পড়ল জোনাস। ঈশ্বর জানেন কতদিনে ভয় ভাঙবে গ্রামবাসীদের। ফের চালু হবে সরাইখানা।

কে জানত তখন যে দিন কয়েক পরেই ফের মাতব্বরদের আড্ডা বসবে সরাইখানায়? ফের শুরু হবে জল্পনা-কল্পনা আর গুলতানি? সে কথা এখন থাকুক।

মোট কথা, অনেক চেষ্টা করেও গ্রামবাসীদের সাহস ফিরিয়ে আনতে পারেনি জোনাস। বিছানার তলা, চোরকুঠরী দেখার পরেও নিয়াডের দিকের জানলাগুলোও পরীক্ষা করে ছিল। না সেদিক দিয়ে মানুষের ওঠার ক্ষমতা নেই। জমি থেকে অত উঁচুতে টিকটিকিরাই দেওয়াল বেয়ে সর সর করে উঠে আসতে পারে—মানুষ নয়।

সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা হয়েছে বেচারা মিরিওটার। নিকের সঙ্গে তার আলাপ ছেলেবেলা থেকে। একসঙ্গে কত খেলা করেছে মাঠেঘাটে।

এ-তল্লাটে বিয়ে উপলক্ষ্যে বিয়ের মেলা হয় ফি-বছর। সেণ্ট-পিটার উৎসবকে কেন্দ্র করে বসে স্বয়ংবর সভার ঠিক উল্টো সভা অর্থাৎ 'স্বয়ংকনে' সভা। বহুদূর থেকে কাতারে কাতারে হবু বর-রা আসে সেজেগুজে গাড়ি চেপে। হবু কনে-রাও আসে সাজগোজ করে যৌতুক সঙ্গে নিয়ে। তারপর বসে বিয়ের হাট। হবু-বর হবু-কনেকে দেখেশুনে পছন্দ করে নেয়। বিয়ে হয় পরের বছর বিয়ের সভায়।

মজাদার এই বিয়ের বাজারে কিন্তু চেনাজানা হয়নি দুজনের। বিয়ের দিনও ঠিক হয়ে গিয়েছে। এই সময়ে একি বিপত্তি? সমস্ত রাত কেঁদে ভাসিয়ে দিল মিরিওটা। ঘুমোতে পারল না। ঠায় দাঁড়িয়ে রইল জানলায়। প্রতি মুহূর্তে মনে হল, এই বুঝি নিস্তব্ধ রাত খান-খান করে দিয়ে গর্জে উঠবে শয়তান স্বয়ং। বলবে ভীষণ হেঁড়ে গলায়—"কেমন, বলিনি নিক ডেককে সর্বনাশ হয়ে যাবে কাসলগড়ের চৌকাঠ মাড়ালে?" কিন্তু না, শয়তান নতুন করে হানা দিল না মাস্টার কোল্‌জের সাজানো কুঠিতে।

বিকেল থেকে তীব্র উত্তেজনায় অস্থির হয়েছিল মিরিওটা। বাবাকে নিয়ে গ্রামের শেষ পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ওদের ফেরার প্রতীক্ষায়। নিক যে কথা দিয়ে গিয়ে ছিল সন্ধ্যা নাগাদ! তবুও ফিরছে না কেন? আজ যে মঙ্গলবার। মঙ্গলবারের রাতে পারত পক্ষে কেউ রাস্তায় বেরোয় না ভূতের হাওয়া গায়ে লাগবে বলে। তা সত্ত্বেও মাস্টার কোল্জ মাতব্বরদের নিয়ে বেরিয়েছেন ভাবী জামাইয়ের খোঁজে। কিন্তু কোথায় সে? কোথায় বেঁটে মোটা বচনবাগীশ ডাক্তার? তবে কি শয়তান তার কথা রেখেছে? সর্বনাশ করে ছেড়েছে ডানপিটে নিক ডেকের?

বুক দুর-দুর করে উঠল মিরিওটার। কিন্তু কেউ ভাবতেও পারল না যে জঙ্গল পেরোতেই দেরি করে ফেলেছে নিক। রাত কাটাচ্ছে খোলা চত্বরে—ক সলগড়ের অদূরে।

ভোরের আগেই উদ্বিগ্ন ফ্রিক বেরিয়ে পড়েছিল গাঁযের বাইরে। বেশি দূর যাযনি। নিকোলাস ডেক আর ডাক্তার পাটাক যদি এসে যায়, এই আশায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল মালভূমির ছাদে। ফিরে এল মুখ চুণ করে।

কাছে আসতেই শুধোলেন মাস্টার কোল্জ—"কি দেখলে?"

"কিচ্ছু না।"

"কিচ্ছু না?" দু'চোখ জলে ভরে এল মিরিওটার।

"খুব ভোরে মাইল খানেক দূরে দুজন লোককে দেখেছি। প্রথমে ভেবেছিলাম নিক আর ডাক্তার।"

"চেনো তাদের?"

"টুরিস্ট। ওয়ালাচিয়ান সীমান্ত পেরিয়ে এল।"

"কথা বলেছ?"

"হ্যাঁ।"

"এ গাঁয়ে আসছে বুঝি?"

"না। রিটিযাট যাচ্ছে—চূড়োয় উঠবে।"

"টুরিস্ট?"

"দেখতে টুরিস্টের মত।"

"রাত্রে ভলক্যানের দিয়ে এসেছে। অথচ কাসল-যের ধারেকাছে কিচ্ছু দেখেনি?"

"না। তখন ওরা ছিল সীমান্তের ওপারে।"

"নিকের কোনো খবর পাওনি?"

"না।"

"হা ঈশ্বর!" ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল মিরিওটা।

ফ্রিক বললে—"টুরিস্ট দুজন কিন্তু গাঁয়ে আসবে দু-তিনদিন পরে। এখানে রাত কাটিয়ে তবে কোলোসভার যাবে।"

ফোঁস করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল জোনাস—"আমার সরাইখানায় কি আর থাকবে? সবাই বয়কট করেছে শুনলে তারাও পালাবে!"

একটানা ছত্রিশ ঘণ্টা এই দুশ্চিন্তা নিয়েই নাওয়া-খাওয়া ভুলেছে জোনাস। কিঙ ম্যাথিয়াস হানাবাড়ি হয়ে গেল। কেউ আসবে না। খেতে চাইবে না। ঘরও চাইবে না।

সারাদিন গেল, সারারাত গেল—ফিরল না নিক। আর কি ফিরবে? কার্পেথিয়ান কাসল কি সত্যিই তাকে গ্রাস করে ফেলেছে? কিন্তু ডাক্তার কই? সে নিপাত্তা কেন?

এ-অবস্থায় স্থির থাকা যায় না। মিরিওটার বুকভাঙা হাহাকার আর শোনা যায় না। শুরু হল শলাপরামর্শ। এখুনি কয়েকজনের বেরিয়ে পড়া দরকার কাসলগড় অভিমুখে। কিন্তু কে যাবে? যাওয়ার কথা উঠতেই ককিয়ে উঠলেন স্কুলমাস্টার। তার নাকি গেঁটেবাত হঠাৎ বেড়েছে। অগত্যা তৈরি হলেন মাস্টার কোল্‌জ এবং ফ্রিক্। তোড়জোড় শেষ করতেই গেল কিছুটা সময়। নটা নাগাদ বেরিয়ে পড়লেন দুজনে কাসলগড়ের দিকে।

আরম্ভ হল আর এক দফা উৎকণ্ঠার পালা। নিক গেছে, পাটাক গেছেন; এখন গেলেন মোড়ল আর মেষপালক। ফিরবেন তো?

ফিরলেন বই কি। দুশ্চিন্তার অবসান ঘটিয়ে বেলা দুটোর সময়ে ফিরে আসতে দেখা গেল দুজনকে। সঙ্গে পাটাক এবং ডালপাতার স্ট্রেচারে শোয়ানো অসাড় একটা মূর্তি—নিকোলাস ডেক!

ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল মিরিওটা। এতক্ষণ মড়ার মত পড়েছিল নিক। দেহ আড়ষ্ট। মুখ নিরক্ত। বুক উঠছে কি পড়ছে বোঝা যাচ্ছে না। মাস্টার কোল্‌জের বাড়িতে স্ট্রেচার নামানোর পরেই মিরিওটার কান্নায় আচ্ছন্ন অবস্থাটা একটু কাটল। চোখ মেলল। উঠতে চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না।

পারবেও না! নিক ডেকের শরীরের একদিক একদম অসাড় হয়ে গিয়েছে!

অন্যথা হয় নি শয়তানের হুমকির!

কি অবস্থায় ওদের ফিরিয়ে আনলেন মাস্টার কোল্‌জ?

প্লেসা জঙ্গল তখনো শেষ হয় নি। আর আধ মাইলটাক গেলেই জঙ্গলের

সীমানা পেরোনো যায়, এমন সময়ে দেখা গেল দুটো বিধ্বস্ত মূর্তি মাটি ঘসটে ঘসটে আসছে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে।

নিকোলাস ডেক এবং ডাক্তার পাটাক!

গাঁ থেকে রওনা হওয়ার সময়ে পাটাককে প্রায় ঠেলে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল নিক। এখন দেখা গেল ঠিক তার উল্টো দৃশ্য। নিক প্রস্তর মূর্তির মত মাটিতে বারবার আছড়ে পড়ছে। সর্বাঙ্গ থেঁতলে যাচ্ছে। কেটে যাচ্ছে। ছড়ে যাচ্ছে। পাটাক কোন মতে তাকে টেনে হিঁচড়ে ঠেলেঠুলে নিয়ে আসছেন এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে। তাঁর নিজের অবস্থাও শোচনীয়। উদভ্রান্ত চাহনি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল, জিহ্বা অসাড়, কণ্ঠ স্তব্ধ। যেন ঘোরের মধ্যে দিয়ে চলেছেন···চলেছেন·· চলেছেন!

ডালপালা কেটে স্ট্রেচার বানিয়ে শোয়ানো হল নিককে। তক্ষুণি শুরু হল গাঁ-য়ে ফেরার পালা।

কিন্তু কি হয়েছিল নিকের?

বলতে পারে একজনই—ডক্টর পাটাক। কিন্তু তাঁর অবস্থাও কম শোচনীয় নয়। পা ফুলে ঢোল, দেহ রক্তাক্ত, বুদ্ধি বিভ্রান্ত এবং বাকশক্তি প্রায় নেই বললেই চলে। কিন্তু চুপ করে থাকলে তো হবে না! কাসলগড়ের ভয়ংকর রহস্য তিনি ছাড়া আর কে বলবে? নিক তো মুমূর্ষু!

শুরু হল পীড়াপীড়ি। এখন আর ভয় কিসের? গ্রামবাসীরা ভিড় করে বসে চারিদিকে।

মাস্টার কোল্‌জ নিজেও চাপ দিতে লাগলেন—"ডাক্তার, মুখ খোলো, কথা বলো! এই তো আমরা রয়েছি! কি হয়েছিল বল। কোনো ভয় নেই। বল।"

"অঁ · অঁ·· অঁ!" গুঙিয়ে উঠলেন ডাক্তার। বিকট গোঙানি আর মুখের বীভৎস চেহারা দেখে আঁৎকে উঠল গ্রামবাসীরা।

"পাটাক· পাটাক···আমি মাস্টার কোল্‌জ। কি হয়েছে তোমার? কথা বলছ না কেন?"

"ব-বলব? কি···কি বলব?" আড়ষ্ট জিভে অতিকষ্টে উচ্চারণ করলেন ডাক্তার।

"কাসলগড়ে ঢুকেছিলে?"

"কাসলগড়!" অমনি চোখ ঠেলে বেরিয়ে এল পাটাকের। "না! না! না!"

"কেন ?"

"চর্ট ! চর্ট ! চর্ট !"

"খুলে বল !"

"নিককে কত বারণ করলাম…শুনল না…জোড় করে টেনে নিয়ে গেল আমাকে·· পৌছোতেই সন্ধ্যে হয়ে গেল…খোলা আকাশের নিচে ঘুমিয়ে পড়ল নিক…সামনে কাসলগড় !" বলতে বলতে শিউরে উঠল পাটাক।

ঘরশুদ্ধ লোকও শিউরে উঠল তাঁর গা-শিউরোনো দেখে।

"তারপর ?"

"তারপর ?…ছায়ার মত রাক্ষসখোক্কস ভূত-পেত্নী পিশাচ-ডাইনীরা উড়ে এল মাথার ওপর…অঁ…অঁ…অঁ !"

ঘরশুদ্ধ লোক চাইল মাথার ওপর। সত্যিই যেন অশরীরীরা মূর্তিধারণ করেছে মাথার ওপর।

"তারপর ?" কাঁপা গলায় শুধোলেন মাস্টার কোল্ক্স।

"ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজল·· ঘণ্টা…ভূতের ঘণ্টা ··প্রথমে আস্তে…তারপর খুব জোরে… !" বিকট গলায় ফের গুঙিয়ে উঠলেন পাটাক। খাড়া হয়ে গেল দেহের লোম, ছাই হল মুখ।

ঘরশুদ্ধ লোকের দশাও হল একই রকম। প্রত্যেকেই কান খাড়া করল এবং সত্যিই যেন শুনতে পেল ঢং…ঢং…করে ঘণ্টা বাজছে অনেক দূরে পোড়ো কেল্লার মাথায় !

রোমাঞ্চিত কলেবরে তবুও সবাই উৎকর্ণ হয়ে রইল পরের ঘটনা শোনবার জন্যে।

বললেন পাটাক—"হাজার হাজার বাজ পড়ল—না…না…শব্দ শোনা গেল না…চোখ ধাঁধিয়ে গেল…পষ্ট দেখলাম আমি আর নিক দুজনেই মরে গেছি ··মড়ার মত বসে আছি !"

ওরে বাবা ! চাষাভুষোদের রক্ত জল হয়ে গেল এই কথা শুনে ! পাটাক মরে গেছেন ! এ লোকটা তাহলে কে ? দানোয় পাওয়া পাটক ? শয়তান কি ছদ্মবেশে স্বয়ং উপস্থিত ?

পাটাক তখন বলছেন থেমে থেমে ভাঙা ভাঙা স্বরে—"সকাল হল…নিককে বারণ করলাম…শুনল না…হিড় হিড় করে আমাকে টেনে নিয়ে গেল কেল্লার ধারে…খাল পেরিয়ে ওপরে উঠল…শেকল বেয়ে উঠে গেল ওপরে…তারপর হাত বাড়িয়ে পাঁচিল চেপে ধরতেই বিকট গলায় চেঁচিয়ে সরসর করে নেমে এল শেকল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল খালের মধ্যে !"

"তারপর ?"

"আমি পালাতে চেয়েছিলাম···পারিনি·· চর্ট আমার পা টেনে ধরেছিল ·· নিক পড়ে যেতেই আচমকা চর্ট ছেড়ে দিলে আমাকে···পা নাড়তে পারলাম···পকেটে জলে ভেজা রুমাল ছিল·· নিংড়ে নিকের চোখে মুখে জল দিলাম···ওর জ্ঞান ফিরে এল···তারপর যে কি করে ওকে টানতে টানতে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকেছিলাম, তা জানি না।·· চর্ট ওর বাঁ দিকটা অসাড় করে দিয়েছে···পক্ষাঘাত···পক্ষাঘাত···চিকিৎসা নেই এ রোগের· জঙ্গলে ঢোকার পর আর পারছিলাম না···এমন সময়ে দেখলাম আপনারা আসছেন···"

"ডাক্তার ! ডাক্তার !" পাটাককে দুহাতে ধরে প্রবলবেগে ঝাঁকুনি দিতে দিতে শুধোলেন কোল্জ "নিক ভাল হবে কিনা বলো !"

অভিভূত কণ্ঠে বললেন ডক্টর—"ওকে চর্ট মেরেছে ! চর্ট-ই ওকে ভাল করতে পারবে ! আমার ক্ষমতা নেই !"

ডুকরে কেঁদে উঠল মিরিওটা।

৮। শাসায় যখন শয়তান,
পারে কি নিক মস্তান ?
প্রাণে বাঁচল নিক ডেক,
শরীর হল আধ্‌খেক্ !

শয়তান তাহলে মিছিমিছি চোখ রাঙায় নি ? "অন্ধকারের দূত" বজ্রকণ্ঠে সতর্ক করেছিল নিকোলাসকে। কিন্তু সে শোনেনি। লাভটা কি হল ? আধখানা দেহ পক্ষাঘাতে অবশ হল। কি ভাগ্যিস পাঁচিলের বাইরে থেকেই ঠেলে ফেলে দিয়েছে শয়তান। যদি ভেতরে ঢুকত ? প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারত কি ?

নাঃ, নিক তার আহাম্মুকির যোগ্য শাস্তি পেয়েছে। ভূতপ্রেত নিয়ে ফষ্টিনষ্টি করলে এমনি হাল হয়। এ-থেকে একটা শিক্ষাই পাওয়া যাচ্ছে। সারা গাঁয়ের তাবৎ লোক একবাক্যে বললে—আর নয় ! কার্পেথিয়ান কাস্‌ল্ অভিমুখে যাওয়া আজ থেকে নিষিদ্ধ হোক। এবার যে যাবে, তাকে আর জ্যান্ত ফিরে আসতে হবে না। বেয়াদবি বরদাস্ত করবে না চর্ট !

আতংক বড় সংক্রামক ব্যাধি। বার্স্ট গ্রামের ছেলেবুড়ো তো বটেই, আশপাশের গাঁ-য়ে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল দাবানলের মত। চর্ট ! চর্ট ! চর্ট ! হানা দিয়েছে খোদ শয়তান ! মরণ-মার মারে নি—আলতো ধাক্কা দিয়েছে—

তাইতেই নিক ডেক আধমরা। উপদেবতা অধিদেবতা নিয়ে অনেক রগড়, অনেক বিদ্রুপ, ঠাট্টা তামাসা করেছিল মুখফোঁড় ডাক্তার পাটাক। তার অবস্থাও কাহিল করে ছেড়েছে অদৃশ্য প্রেত—শুধু ঠ্যাং আঁকড়ে ধরেছিল। তাইতেই আধপাগল অবস্থা ডাক্তারের!

দেশ পাড়াগাঁয়ে গুজব জিনিসটা বেশি মাত্রায় ছড়ায়। মুখরোচক খবর পেলেই তাতেই রঙ চড়ানো হয়। কয়েকটা জিপসী পরিবার ভয়ে মমে চম্পট দিল বার্স্ট গ্রাম ছেড়ে। কার্পেথিয়ান কাস্‌ল্‌-য়ের ত্রিসীমানায় থাকতে তারা আর রাজি নয়।

তবে কি বার্স্ট গ্রামে কেবল ভূতেরা থাকবে? আস্তে আস্তে জনশূন্য হয়ে যাবে এমন সোনার গ্রাম? ভূতপ্রেত দত্যি দানো খল্‌খল্‌ হাসি হেসে চৌপর দিনরাত তাণ্ডব নাচ নাচবে পথে ঘাটে, বাজার হাটে, ঘরে বাইরে? না, না, না! তার আগেই হাঙ্গারিয়ান গভর্ণমেণ্টকে খবর দেওয়া দরকার। কার্পেথিয়ান কাস্‌ল্‌কে ভেঙে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া দরকার। তারপর? গড় গুঁড়ো হলেই কি শয়তান ভয় পাবে? না, ফের রুদ্রমূর্তি ধরবে?

প্রথম সাতটা দিন আতংকে কাঠ হয়ে রইল গাঁয়ের আবাল বৃদ্ধ বনিতা। ঘর থেকে রাস্তায় বেরোনোর সাহসও হল না। খিল এঁটে ছিটকিনি তুলে দিনরাত সেকি গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর! জোরে কথা বলারও সাহস কারো নেই! যদি শয়তান শুনে ফেলে? চাষবাস শিকেয় উঠল। লাঙল দেবে কে? ফালের ডগায় যদি বামন ভূত উঠে আসে? পাতালপুরীটাই তো শয়তানের আসল আস্তানা। মাটি কুপোলে যদি সে রেগে কাঁই হয়? পিল্‌পিল্‌ করে সুন্দরী ডাইনীরা যদি মাটির গর্ত দিয়ে বেরিয়ে এসে মোহিনী হেসে ভুলিয়ে নিয়ে যায়? যদি কাঠকাটার খটাস্‌ খটাস্‌ শব্দে গাছ-ভূতরা গাছের তলা থেকে সুর-সুর করে বেরিয়ে ঘাড়ে চেপে বসে? ভয়ের চোটে তাই কাজ কারবার বন্ধ রইল দিন সাতেক। এমন কি মেষপালক ফ্রিক-ও ভেড়া নিয়ে মাঠে যেতে চাইল না।

মহা ফাঁপরে পড়লেন মাস্টার কোল্‌জ। গাঁয়ের মোড়ল তিনি। অথচ তিনি মুস্কিল আসান করতে পারছেন না। ভয় ভাঙাবেন কি, নিজেই ভয়ে কাঠ হয়ে রয়েছেন। গাঁ সুদ্ধ লোক তাই ঝাঁপ ফেলে বসে রইল দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। নাঃ, এ-অবস্থা বেশিদিন চলতে দেওয়া ঠিক হবে না। তবে কি 'কোলোসভা'রে গিয়ে কর্তাদের ডেকে আনবেন মাস্টার কোল্‌জ? খবরটা তাঁদের কানে তুলবেন কি?

সবচেয়ে বড় কথা, কেল্লার মাথা থেকে ধোঁয়া কি বিদায় নিয়েছে? মোটেই

না! পুরোদমে ধোঁয়া উঠতে দেখা গিয়েছে টেলিস্কোপের মধ্যে দিয়ে। তাল তাল ধোঁয়া মেঘ হয়ে হারিয়ে গেছে দিগন্তে!

আগুন? আগুনও কি চোখে পড়েছে? আলবৎ পড়েছে! রাত্রি নিশীথে দেখা গেছে আকাশ লাল হয়ে গিয়েছে আগুনের আভায়। নরকের আগুন জ্বলছে যেন কার্পেথিয়ান কাস্‌ল্‌-য়ে! টেলিস্কোপ ছিল বলেই দেখা গেল আগুনের আঁচের করাল চেহারা।

শব্দ? একশবার! গুরুগুরু গুমগুম ধ্বনি নাকি গাঁয়ের লোকেও শুনতে পাচ্ছে। যেন মাটি কাঁপছে, পাতাল পুরীতে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড চলছে! ব্যাপার কি? শয়তানের সঙ্গে ওয়ালাচিয়ান আগ্নেয়গিরির যোগ-সাজস আছে নাকি? নিভন্ত আগ্নেয়গিরিকেও জাগানোর ক্ষমতা আছে বুঝি শয়তানের? ডক্টর পাটাক ঠিক এইরকম গুমগুম আওয়াজ শুনেছিলেন মঙ্গলবারের রাতে। হাওয়ায় ভেসে আসা সেই শব্দ নাকি প্রতিরাতেই শোনা যাচ্ছে। পাহাড়ে পাহাড়ে ধ্বনি আর প্রতিধ্বনির খেলা শুরু হয়েছে।

ডালপালা মেলে ছড়িয়ে পড়ল এমনি কত অলীক কাহিনী। অতিরঞ্জন ছাড়া গুজব হয় না। গুজব ছাড়া নিষ্কর্মা গ্রামবাসীদের দিন চলে না। সুতরাং যা না ঘটল, তার লক্ষগুণ বেশি খবর ছড়াল। ধোঁয়া আর আগুন টেলিস্কোপে দেখা গেল সামান্যই, কিন্তু গুজবের ঠেলায় আগ্নেয়গিরির আসন্ন উৎপাত পর্যন্ত কল্পনা করে বসল ভয়ার্ত গ্রামবাসীরা।

জোনাসের মনের অবস্থা কহতব্য নয়। 'কিঙ ম্যাথিয়াস' খাঁ-খাঁ করছে। কেউ আসবে বলেও আর মনে হয় না। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। শয়তানের কণ্ঠ যেখানে একবার শোনা গিয়েছে। সেখানে কে আসবে? জোনাস তাই বিষণ্ণ। সত্যিই বুঝি এবার কারবার গুটোতে হল।

৯ই জুন রাত আটটার সময়ে আচমকা খটাখট শব্দে নড়ে উঠল 'কিঙ ম্যাথিয়াস্‌'-য়ের সদর দরজা। গাঁয়ের প্রথা অনুযায়ী দরজার ভেতর বাইরে দুদিকেই খিল তোলা থাকে। বাইরের খিল খোলার শব্দ পাওয়া গেল। কে যেন খটাংখট শব্দে খিল খুলে ভেতরে ঢুকতে চাইছে। কিন্তু পারছে না। ভেতর থেকেও যে খিল এঁটে বসে রয়েছে জোনাস।

জোনাস তখন ওপরতলায়। খিল খোলার আওয়াজ পেয়েই রক্ত হিম হয়ে গেল তার। অসময়ে কে এল সরাইখানায়? চর্ট নয় তো? দানোয় পাওয়া পিশাচ নয় তো? সরাইখানার দখল নিতে আসছে শয়তানের হুকুমে?

ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে জোনাস নেমে এল নিচে। নিস্তব্ধ সরাইখানায় শুধু ঐ একটা শব্দ—ঠক! ঠক! ঠক!

কে যেন প্রাণপণে দরজা খুলতে চাইছে!

যা থাকে কপালে, এক ইঞ্চির মত দরজা ফাঁক করল জোনাস। বীভৎস ভূত দেখলেই হুড়কো তুলে চম্পট দেওয়ার জন্যে তৈরি হয়ে রইল।

অন্ধকারে কিচ্ছু দেখা গেল না। তাই হেঁকে উঠল ভয় বিকৃত কণ্ঠে—

"কে?"

"আমরা।"

"আমরা মানে?"

"দুজন টুরিস্ট।"

"জ্যান্ত?"

"দারুণ জ্যান্ত।"

"ঠিক জানেন তো?"

"আরে গেল যা! জ্যান্ত থাকার আবার জানাজানি কি? তবে বেশিক্ষণ আর জ্যান্ত থাকা যাবে না। ক্ষিদেতেষ্টায় নিঘাৎ মরে যাব আরো কিছুক্ষণ বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখলে।"

হুড়কো পুরোপুরি নামিয়ে আনল জোনাস। সত্যিই দুজন মানুষ ঢুকল ঘরের মধ্যে—ভূত নয়।

মানুষের মত মানুষ! রীতিমত খানদানী চেহারা।

চৌকাঠ পেরিয়েই প্রথমে হুকুম হল—"দুখানা ঘর চাই। রাতটা এখানেই থাকব।"

লণ্ঠনের আলোয় পর্যটকদের চেহারা দেখে মাথা ঘুরে গেল জোনাসের! ফাটা কপাল জোড়া লাগল তাহলে? প্রেত নয়, ফের মানুষ নিয়ে বেচাকেনা শুরু হবে 'কিঙ ম্যাথিয়াসে'?

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল জোনাস। দু'জনের মধ্যে একজনের বয়স কম। বড়জোর বত্রিশ বছর। মাথায় বেশ লম্বা, মার্জিত অভিজাত চেহারা। সুদর্শন। মিশমিশে চোখ, ঘন গাঢ় বাদামী চুল, নিখুঁতভাবে ছাঁটা বাদামী দাড়ি, বিষাদমাখানো অহংভাবে আচ্ছন্ন চাহনি। নিঃসন্দেহে উঁচুমহলের মানুষ। এক নজরেই মালুম হয়।

খাতায় নামধাম লিখতে হল প্রথমে। তরুণ পর্যটক গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বললেন—"কাউণ্ট ফ্রাঞ্জ ডি টেলেক আমার নাম। রোজকো আমার সঙ্গী।"

"নিবাস?"

"ক্রাজোয়া।"

ক্রাজোয়া রুমানিয়ার আরেকটি শহর, ট্রানসিলভানিয়ার প্রতিবেশী। অর্থাৎ কাউন্ট ফ্রাঞ্জ ডি টেলেক রুমানিয়ার বাসিন্দা।

রোজকো-র বয়স প্রায় চল্লিশ। গাঁট্টাগোট্টা বপু। পুরু গোঁফ। কদমছাঁট চুল। মিলিটারী চালচলন। কাঁধে ফিতে দিয়ে বাঁধা সৈনিকের ঝোলা, হাতে হাল্কা পেঁটরা।

এ ছাড়া আর মালপত্র নেই সঙ্গে। তরুণ কাউন্টের চেহারা দেখলেই বোঝা যায় পাকা পর্যটক। কাঁধে ভাঁজ করা আলখাল্লা, মাথায় হালকা টুপী, খাটো কোটের বেল্ট থেকে ঝুলছে চামড়ার খাপে ঢাকা ওয়ালাচিয়ান ছোরা, পায়ে ভারি জুতো—শুকতলা বিলক্ষণ পুরু এবং মজবুত।

দিন দশেক আগে এঁদেরই ফ্রিক দেখেছিল রিটিঝাট পাহাড়ের দিকে যেতে। পাহাড়ে চড়া শেষ হয়েছে। এখন এসেছেন বার্স্ট গ্রামে একটু জিরিয়ে নিতে। তারপর যাবেন সিল নদীর অববাহিকা দেখতে।

শুধোলেন ফ্রাঞ্জ ডি টেলেক—"ঘর আছে তো ?...দুটো ঘর চাই।"

"দুটো কেন, দশটাও নিতে পারেন।"

"দুটোতেই চলবে। কাছাকাছি হওয়া চাই," বলল রোজকো।

বড় ঘরের লাগোয়া ছোট ঘর দুটো খুলে দিল জোনাস—"চলবে ?"

"হ্যাঁ" বললেন কাউন্ট।

জোনাসের ভয় ভেঙ্গে গেছে। আগন্তুকরা রাজারাজড়া মানুষ—গোরস্থানের প্রেত নয়। 'কিঙ ম্যাথিয়াসে"-র দুর্নাম এবার বোধহয় ঘুচবে। আবার শুরু হবে গ্রামবাসীদের গুলতানি।

"কোলোসভার এখান থেকে কদ্দূর ?" শুধোলেন কাউন্ট।

"মাইল পঞ্চাশেক—পেট্রোসেনি আর কার্লস্‌বার্গের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে।"

"পথকষ্ট খুব বেশি কি ?"

"খুবই। দিনকয়েক জিরিয়ে গেলে অবশ্য—"

"খাবার দাবার কিছু আছে ?"

"আধ ঘণ্টার মধ্যে বানিয়ে দেব যা চাইবেন।"

"রুটি, মদ, ডিম আর ঠাণ্ডা মাংস হলেই চলবে।"

"এখুনি আনছি।"

"দেরি করবে না।"

"না, না।" বলেই রান্নাঘরের দিকে ছুটল জোনাস।

পেছন থেকে ভেসে এল কাউন্টের প্রশ্ন—"সরাইখানা ফাঁকা কেন ? লোকজন আসে না এখানে ?"

"না…মানে…রাত হয়ে গেছে তো!"

"এমন কি রাত হয়েছে! এখনই তো আড্ডা মারবার সময়।"

"এ-গাঁয়ে এ-সময়ে বাচ্ছাকাচ্ছা সবাই ঘুমিয়ে পড়ে।"

আর কি বলবে জোনাস? আসল কথা বললেই তো খদ্দের পালাবে? সুতরাং অভিশপ্ত সরাইখানার কাহিনী চেপে যাওয়া ছাড়া উপায় কি?

"গাঁয়ের লোকসংখ্যা কত? তিন চারশ হবে?"

"তা হবে।"

"তা সত্ত্বেও রাস্তায় লোক দেখলাম না কেন?"

"ইয়ে ··আজ শনিবার তো…কাল রবিবার…ছুটির দিন· ·তাই।"

কাউন্ট আর পীড়াপীড়ি করলেন না। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল জোনাস। ভুতুড়ে গাঁয়ের ভৌতিক কাহিনী সে বলবে না প্রাণ গেলেও। একদিন না একদিন টুরিস্টরা সবই জানবে। জানুক। কিন্তু জোনাসের মুখ দিয়ে টুঁ শব্দটিও বেরোবে না।

সে না হয় মুখে কুলুপ এঁটে রইল। কিন্তু বেল্লিক শয়তানটা যদি ফের হেঁড়ে গলায় গিটকিরি ছাড়ে রাতবিরেতে? খদ্দের ভড়কাতে কতক্ষণ?

খাবার এল। মামুলী খাবার। টেবিলে সাদা কাপড পাতা হল। মুখোমুখি বসলেন কাউন্ট এবং রোজকো। খেলেন গোগ্রাসে। খাওযা শেষ হতেই মুখ মুছতে মুছতে উধাও হলেন যে-যাঁর ঘরে।

হাঁ করে চেয়ে রইল জোনাস। ভেবেছিল খেতে বসে এ-কথা সে-কথা হবেই। কথার ফাঁকে অনেক খবর বের করে নেওয়া যাবে। কিন্তু কাউন্ট অন্য ধাতের মানুষ। বাজে কথা একদম বলেন না। রোজকো লোকটাও কম কথার মানুষ। কাউন্ট ফ্যামিলির মুখরোচক খবরাখবর তার পেট থেকে বেরোবে না।

কাজেই মুখ চুণ করে অতিথিদের শুভরাত্রি জানাল জোনাস। ভাবল, খাওয়াদাওয়ার পাট তো চুকল। রাতটা এখন ভালোয় ভালোয় কাটলে হয়!

রাতটাও নির্বিঘ্নে কাটল। নতুন উপদ্রব ঘটল না।

সকাল হতে না হতেই খবর চাউর হয়ে গেল গ্রামময়। কোত্থেকে দুজন টুরিস্ট এসেছে নাকি গাঁয়ে। উঠেছে ভুতুড়ে সরাইখানায়। সুতরাং রগড় দেখতে ভিড় করে এল লোকে।

কাউন্ট আর রোজকো তখন ঘুমে অচেতন। সারাদিন ধকল গিয়েছে। তাই অঘোরে ঘুমোচ্ছেন দুজনেই। সাতটা আটটার আগে ঘুম ভাঙবে বলে

মনে হয় না। তাঁর খাওয়ার ঘরে না বলা পর্যন্ত কেউ ঢুকতেও সাহস পাচ্ছে না। অধীর আগ্রহে তাই সবাই দাঁড়িয়ে দরজার বাইরে।

আটটা নাগাদ টুরিস্ট দুজনকে ঘুর ঘুর করতে দেখা গেল বড় ঘরে। উঁকি ঝুঁকি মারাই সার হল। আজব ব্যাপার তো? কিছুই ঘটছে না! দূর থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সুদেহী সুপুরুষ দুজন বিদেশী পায়চারি করছেন ঘরময়।

তবে আব ভয় কিসের? জোনাস হাত কচলাতে কচলাতে এসে দাঁড়াল বাইরে। মুখে হাসি, চোখে আমন্ত্রণ। সাদর অভ্যর্থনা জানালো সবাইকে। এবার আসা হোক সরাইখানায়! পায়ের ধূলো পড়ুক 'কিঙ ম্যাথিয়াসে' পুরোনো দিনের মত। ঐ তো দুজন রুমানিয়ান ভদ্রলোক খাওয়াদাওয়া করছেন। রাত-ও কাটালেন নিশ্চিন্ত মনে। কারো গায়ে আঁচড়টি লাগেনি। দুজনেই খানদানী ঘরের মানুষ। তবে আর দ্বিধা কেন? আসুন। সবাই আসুন!

তবুও দ্বিধা কি যায়? অবশেষে মোড়লি করার লোভ সামলাতে পারলেন না মাস্টার কোল্‌জ। সুট করে ঢুকে পড়লেন সরাইখানায়।

সঙ্গে সঙ্গে পিছু নিল বেশ কয়েকজন মাতব্বর। স্কুল মাস্টার রইলেন তাদের মধ্যে। ফ্রিক-ও গুটি গুটি এল ভেতরে।

কিন্তু কিছুতেই বাগে আনা গেল না ডাক্তার পাটাককে। অভিশপ্ত সরাইখানায় তিনি আর আসতে রাজি নন। দু ফ্লোরিন ঘুষ দিলেও নাকি আর এমুখো হবেন না।

বলে রাখা ভাল, টুরিস্টদের দেখে কৃতার্থ হবার জন্যে মাস্টার কোল্‌জ সরাইখানায় আসেননি। তিনি এসেছেন নিজের স্বার্থে। গাঁয়ে নবাগত ঢুকলেই খাজনা দিতে হয়। খাজনার পুরো টাকাটাই যায় মাস্টার কোল্‌জের পকেটে। উনি এসেছেন সেই ট্যাক্স আদায় করতে।

কাজেই সটান গেলেন কাউন্টের সামনে। বিনীত কণ্ঠে দাবি করলেন টুরিস্ট ট্যাক্স।

প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিলেন কাউন্ট। পরক্ষণেই মিটিয়ে দিলেন পাওনাগণ্ডা। উপরন্তু সাদর আমন্ত্রণ জানালেন স্কুল মাস্টার আর মাস্টার কোল্‌জকে এক টেবিলে বসে খানাপিনা করার জন্যে।

কথাটা এত মিষ্টি করে বললেন কাউন্ট যে এড়াতে পারলেন না মাস্টার কোল্‌জ। বসলেন টেবিলে। আহ্লাদে গদগদ হয়ে সব সেরা পানীয় এনে হাজির করল জোনাস। সরাইখানার অভিসম্পাত এবার বুঝি কেটে গেল। পয়মন্ত অতিথিদের খাতির করতে তাই ব্যস্ত হল সে।

ট্যাক্সের টাকা পুরো মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাউন্ট এবার জানতে চাইলেন, ট্যাক্স দিয়ে টুরিস্টের কোনো লাভ হচ্ছে কি?

ঢোক গিলে বললেন মাস্টার কেল্যাজ—"ইচ্ছে তো আছে। কিন্তু সে রকম সুবিধে দিতে পারছি কই।"

"গাঁয়ে বাইরের লোক বেশি আসে না বুঝি?"

"খুব কম। অথচ এ রকম জায়গা বড় একটা দেখা যায় না।"

"তা ঠিক রিটিযাট পাহাড়ের মাথায় চড়ে তো চারদিক দেখলাম, সত্যিই চোখ জুড়িয়ে যায়।" বললেন কাউন্ট। "টুরিস্টদের স্বর্গভূমি হওয়ার মতই জায়গা বটে সিল উপত্যকা, গ্রাম আর পাহাড়ের সারি দেখলে আর ভোলা যায় না।"

"স্যার," উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন হারমড। "প্যারিং পাহাড়েও একবার উঠুন। আরো ভাল লাগবে।"

"সম্ভব নয় সময় নেই।"

"একদিনের বেশি তো লাগছে না।"

"কিন্তু কাল সকালেই রওনা হচ্ছি—কার্লস্‌বার্গ যাবো।"

"অ্যাঁ!" চমকে উঠল জোনাস। "হুজুর কি রাত ফুরোলেই চলে যাবেন?"

"উপায় নেই তা ছাড়া থেকেই বা করব কি? দেখবার মত কিছু আছে কি?" শুধোলেন কাউন্ট।

"বলেন কি স্যার!" চোখ কপালে তুলে বললেন হারমড। "এই গাঁ-খানাই তো দেখবার মত জায়গা।"

"মানলাম কিন্তু কেউ তো ছায়াও মাড়ায় না। তার মানে দারুণ কিছু নেই।"

"তা হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন দারুণ কিছু নেই।" ঢোক গিলে বললেন মাস্টার কোল্‌জ—মনের চোখে ভেসে উঠল কার্পেথিয়াল কাস্‌ল্‌ ভয়াল ভয়ংকর!

আমতা আমতা করে সায় দিলেন স্কুল মাস্টারও—"তা ঠিক তা ঠিক দারুণ কিছু নেই।"

ঠিক এই সময়ে রাসভ-কণ্ঠে "হে-হে হুম্" করে উঠল ফ্রিক।

চকিতে সবার চোখ গিয়ে পড়ল মেষপালকের ওপর। সরল মানুষের পেটে কথা থাকে না। কি যেন বলতে গিয়েও বলতে পারছে না বেচারি। মাস্টার কোল্‌জ কটমট করে চেয়ে আছেন তার পানে। আচ্ছা আহাম্মক তো! ভেড়া চরিয়ে বুদ্ধিটাও ভেড়ার মত হয়ে গিয়েছে! অভিশপ্ত গ্রামের কাণ্ড-

কারখানা বিদেশী টুরিস্টের কানে তোলা মানেই খাজনা আদায়ের পথ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাওয়া। ভুতুড়ে গ্রামে আর কি কেউ আসতে চাইবে? যাঁরা এসেছেন, তাঁরাও এখুনি ভেগে পড়বেন!

মনিবের জলন্ত দৃষ্টির সামনে এতটুকু হয়ে গেল ফ্রিক।

মাথা নিচু করে চাপা গলায় ধমকে উঠলেন মাস্টার কোলজ—"বোকা গাধা কোথাকার! মুখে চাবী দিয়ে থাক্! ..."

কিন্তু সরল মানুষরা বড় একরোখা হয়। ফ্রিক যা বলেছে তা ফিরিয়ে নিতেও রাজি নয়। সত্যি কথা বলবে তো ভয়টা কিসের?

কাউন্ট চকিতে বুঝলেন এ-গাঁয়ে এমন একটা রহস্য আছে য তাঁর সামনে ফাঁস করতে এরা রাজি নয়। জেদ চেপে গেল তাঁর।

শুধোলেন ফ্রিককে—"কি বলছিলে বল তো?"

"বললাম, 'হে-হে হুম'। আর তো কিছু বলিনি?"

"তাতো শুনেইছি। মানেটা কি? তুমি কি বলতে চাও এ-গাঁয়ে সত্যিই দারুণ কিছু আছে যা না দেখলে দেশ দেখা বৃথা হবে?"

"হে-হে হুম!" অপাঙ্গে মনিবের দিকে চাইল ফ্রিক।

"অপার্থিব অলৌকিক কিছু নাকি?"

"অপার্থিব অলৌকিক!" থ হয়ে গেলেন মাস্টার কোলজ

"না না না!" সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল সব ক'জন মাতব্বর। কাস্‌ল্ গড়ে হানা দিতে গিয়ে না জানি আবার কি দুর্ঘটনা ঘটে ভাবতেই হাত-পা হিম হয়ে এল তাদের।

"ব্যাপার কি? এত চাপাচাপি কিসের?" বিস্মিত হলেন কাউন্ট। ভয়ে পাংশু সারি সারি মুখ দেখে বেশ বুঝলেন এ-গাঁয়ে সাংঘাতিক একটা রহস্য আছে।

রোজকো বললে—"ব্যাপারটা আমি জানি।"

"কি বল তো?"

"এখানে একটা কাস্‌ল্ আছে—কার্পেথিয়ান কাস্‌ল।"

"কে বলল তোমাকে?"

"এই লোকটা," ফ্রিককে দেখিয়ে বলল রোজকো। "এইমাত্র বলল আমার কানে কানে।"

নীরবে ঘাড় নাড়ল ফ্রিক—সাহস হল না মনিবের দিকে তাকানোর।

কিন্তু চিড় ধরেছে বার্স্ট গ্রামের রহস্য-প্রাচীরে। আর লুকোচাপা চলবে না, আর কিছুই গোপন থাকবে না। হুড় হুড় করে গোপন কথা ফাঁস হবে ঐটুকু ছেঁদা দিয়েই।

মনস্থির করে ফেললেন মাস্টার কোলজ। যা বলবার, তিনি নিজেই বলবেন।

এবং বললেনও। সাজিয়ে গুছিয়ে শোনালেন কার্পেথিয়ান কাস্‌ল্‌-য়ের অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা। অপার্থিব···অদ্ভুত···বিচিত্র!

শুনে প্রথমে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন কাউণ্ট। হেসেই খুন হলেন কাহিনী শেষ হবার পর। রুমানিয়ার অন্যান্য কাউণ্টদের মত বিজ্ঞান তিনি তেমন জানেন না ঠিকই, কিন্তু বুদ্ধি খুবই স্বচ্ছ। কাস্‌ল্‌গড়ের ধোঁয়া আর ঘণ্টাধ্বনি আত্মারাম খাঁচাছাড়া করে ছেড়েছে ভূত-কাতুরে গেঁইয়াদের। অথচ দুটো ঘটনার মূলেই মানুষ থাকা সম্ভব। আলোর ঝলকানি আর গুরু গুরু ধ্বনি? স্রেফ পাগলামি। ভয়ের চোটে চোখ আর কান গোলমাল হয়ে গিয়েছিল কিছুক্ষণের জন্যে। ভয় পেলে ওরকম হয়।

মাতব্বররা তাই শুনে ক্ষুব্ধ হল। এখনো অবিশ্বাস? পড়োনি তো চর্টের খপ্পরে! দেয়ালেও কান আছে শয়তানের। না জানি আবার কি ঘটে! কাঠ হয়ে বসে রইল সকলে।

মাস্টার কোলজ ছাড়বার পাত্র নন। বললেন—"কিন্তু কাউণ্ট, এ ছাড়াও আরো সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছে।"

"যথা?"

"সেই ঘটনা থেকেই প্রমাণ পাওয়া গেছে—কার্পেথিয়ান কাস্‌ল্‌-য়ে ঢোকা যায় না।"

"তাই নাকি? তাই নাকি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। দিনকয়েক আগে গাঁয়ের ফরেস্টার আর ডাক্তার কেল্লার পাঁচিল টপকাতে গিয়েছিল। প্রাণ নিয়ে কোনমতে ফিরেছে।"

"খুলে বলুন," উৎসুক হলেন কাউণ্ট।

খুলেই বললেন মাস্টার কোলজ। শুনতে শুনতে ফের গা ছমছম করে উঠল ঘরসুদ্ধ লোকের। পাটাকের পা আটকানোর বর্ণনা শুনতে শুনতে প্রত্যেকেরই পা যেন মেঝের সঙ্গে আটকে গেল।

কাউণ্ট হাসলেন—"কি যে বলেন! ডাক্তারের পা-য়ে কাঁটা-জুতো ছিল। মাটিতে কাঁটা বসে যাওয়ায় উনি ভেবেছিলেন নিশ্চয় কেউ পা ধরে টেনে রেখেছে।"

"কিন্তু নিক ডেক? তাকে যে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে চর্ট? টানাপুলে হাত দিতে না দিতেই থর থর করে কেঁপে উঠেছিল সর্বাঙ্গ—"

"টানাপুলে হাত দিতেই?"

"তবে আর বলছি কি ! এক ধাক্কাতেই ডাকাবুকো ছেলেটাকে প্রায় মেরে এনেছে।"

"সে কি !"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। নিক ডেক এখন শয্যাশায়ী। বাঁদিক অবশ হয়ে গেছে।"

"প্রাণে বাঁচবে তো ?" উদ্বিগ্ন হলেন কাউন্ট।

"তা বাঁচবে। কিন্তু কবে যে সেরে উঠবে," ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মাস্টার কোল্‌জ।

এবার আর জবাব দিতে পারলেন না কাউন্ট। তাঁর বুদ্ধিতে কুলিয়ে উঠল না এই একটি হেঁয়ালীর ব্যাখ্যা। বড় জবর হেঁয়ালী! অদৃশ্য ধাক্কায় অবশ হল আদ্ধেক শরীর ? তোবা! তোবা!

মুখে কিন্তু বললেন—"একটু খোঁজ খবর নিলে দেখবেন এটাও মানুষের কারসাজি—ভূতের নয়।"

"মানুষের !" চোয়াল ঝুলে পড়ল মাস্টার কোল্‌জেরই।

"আমার তাই বিশ্বাস। কারপেথিয়ান কাস্‌ল্‌-য়ে যারা আছে, তারা মানুষ। আপনার আমার মতই মানুষ। তাদের ইচ্ছে নয় কাস্‌ল্‌গড়ে কেউ পা বাড়াক।"

খাবি খেলেন মাস্টার কোল্‌জ—কিছু বলতে পারলেন না।

কাউন্ট বলে চললেন—"খুব নীচ ধরনের কিছু লোক ঘাঁটি বানিয়েছে কাস্‌ল্‌গড়কে। খুনে গুণ্ডা বদমাস বলেই মনে হয়।"

"খুনে গুণ্ডা বদমাস !" পুনরাবৃত্তি করলেন মোড়লমশায়।

"তা ছাড়া আর কি ? ভূতপ্রেতের খেয়েদেয়ে কাজ নেই খামোকা কাস্‌ল্‌-গড়ে গিয়ে নাচানাচি করবে ? যত্তো সব! গাঁয়ের কুসংস্কারের খবর তারা রাখে। তাই নিজেরাই ভূত সেজে ভয় দেখাচ্ছে আপনাদের, যাতে কেউ কাস্‌ল্‌গড়ের ধারে কাছে না যান।"

এ ছাড়া আর কি হতে পারে ? কথাটায় যুক্তি আছে। কিন্তু বার্স্ট গ্রামের মাতব্বররা মোটেই খুশি হল না প্রেত-রহস্যের সহজ ব্যাখ্যায়।

কাউন্ট বুঝলেন, কেউ বিশ্বাস করেনি তাঁর কথা। অবিশ্বাস প্রকট হয়ে রয়েছে সারি সারি মুখে। বিশ্বাস করানোরও চেষ্টা করলেন না। শুধু বললেন —"আমি যা বলবার বললাম। বিশ্বাস করা না করা আপনাদের অভিরুচি। কার্পেথিয়ান কাস্‌ল্‌ নিয়ে অষ্টপ্রহর ভয়ে জুজু হয়ে থাকতে চান, থাকুন।"

মাস্টার কোল্‌জ বলে উঠলেন—"চোখের দেখাকে অবিশ্বাস করি কি করে ?"

"সত্যি কি কখনো মিথ্যে হয়?" বিজ্ঞের মত বললেন স্কুল মাস্টার।

"কোনটা সত্যি, হাতে সময় থাকলে হাতেনাতে দেখিয়ে দিতাম। নিজেই ঢুঁ মারতাম কার্পেথিয়ান কাস্‌ল্-য়ে—"

"অ্যাঁ!" সমস্বরে আঁৎকে উঠল ঘরশুদ্ধ লোক।

"আবার কার্পেথিয়ান কাস্‌ল্-য়ে!" দুই চোখ প্রায় ঠেলে বেরিয়ে এল মাস্টার কোল্‌জের।

"হ্যাঁ হ্যাঁ! আপনাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতাম, স্বয়ং শয়তানেরও ক্ষমতা নেই আমার পথ আটকানোর!"

শুনেই তো শিউরে উঠল মাতব্বররা! নাস্তিক কাউন্টারের লম্ফঝম্প শয়তান কি শুনছে না? ঠিকই শুনছে। সে রাতেও নিক ডেক-কে শাসিয়েছিল শয়তান। এক্ষুনি হয়ত ফের শোনা যাবে তার হেঁড়ে গলায় অপার্থিব হুমকি· · গম্‌গম্ করে উঠবে 'কিও ম্যাথিয়াস'!

কাষ্ঠ হেসে মাস্টার কোল্‌জ তখন সবিনয়ে নিবেদন করলেন কি হাল হয়েছিল নিক ডেকে-র এই ঘরেই কিছুদিন আগে। তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছিল শয়তানকে। সঙ্গে সঙ্গে হেঁকে উঠেছিল চর্ট।

কাউন্ট উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—"ও সব মনের খেয়াল। কানের ভুল।"

মাতব্বররাও উসখুস করছিল এতক্ষণ। আর থাকতে রাজি নয় কেউ। বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না? ঝটপট চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল প্রত্যেকেই।

কাউন্ট তীক্ষ্ণ চোখে দেখছিলেন ওদের মুখের অবস্থা।

এখন বললেন—"আপনাদের মনের অবস্থা খুবই শোচনীয়। দেখছি এ অবস্থায় আমার সাহায্য করা দরকার। পরশুদিন আমি কার্লস্‌বাগ পৌঁছোব। যদি বলেন তো কর্তাদের কানে কথাটা তুলে দিয়ে পুলিশ পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারি। ভুতুড়ে কেল্লায় পুলিশ ঢুকলেই ভূতবাবাজীদের চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যাবে।"

খুবই যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব। কিন্তু তবুও খুঁতখুঁত করতে লাগল মাতব্বররা। কি জানি বাবা! হিতেবিপরীত না হয়! শয়তানের ওপর শয়তানি করতে যাওয়াটা আহাম্মুকি ছাড়া কিছুই নয়। পুলিশ দিয়ে কি শয়তানকে টিট করা যায়? উল্টে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি। পুরো গাঁ-খানাকে শেষ পর্যন্ত না জ্বালিয়ে দেয় চর্ট!

হাল ছেড়ে দিলেন কাউন্ট।

বললেন—"আপনারা কিন্তু এখনো বলেন নি কার্পেথিয়ান কাস্‌ল্ কাদের কাস্‌ল্?"

"গর্ড্‌স্‌ ফ্যামিলির ব্যারনদের," বললেন মাস্টার কোল্‌জ।

"গর্ড্‌স্‌ ফ্যামিলি!" ভীষণ চমকে উঠলেন কাউণ্ট।

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"ব্যারন রুডলফের ফ্যামিলি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"ব্যারন এখন কোথায় জানেন?"

"আজ্ঞে না। বহু বছর আগে তিনি কেল্লা ছেড়ে চলে গেছেন—আর ফেরেন নি।"

ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন কাউণ্ট ফ্রাঞ্জ ডি টেলেক। নিমেষ মধ্যে যেন সমস্ত রক্ত নেমে গেল মুখ থেকে। যন্ত্রবৎ বললেন অবরুদ্ধ কণ্ঠে:

"রুডলফ্‌ ডি গর্ড্‌স্‌!"

৯॥ অতি কদাকার দেহ,
চোখ তার কানা—
মুখেতে বিকট হাসি,
গলাটিও খোনা।

রুমানিয়ায় সবচাইতে প্রাচীন আর প্রখ্যাত বংশ যে কটি আছে, টেলেকের কাউণ্টরা তাদের অন্যতম। ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ায় রুমানিয়া স্বাধীন হয়। তার আগে দেশজোড়া নাম ডাক ছিল এই পরিবারের। রুমানিয়ার রাজনৈতিক উত্থানপতনের ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে গৌরবোজ্জ্বল এই বংশের নাম।

কার্পেথিয়ান কাস্‌ল্‌-যের অদূরস্থ বিখ্যাত সমুদ্র সৈকতের মত অত বিখ্যাত না হলেও টেলেকদের নিবাস স্থানটিও কম নামজাদা নয়। কালক্রমে সব গিয়েছে। টেলেক-ভবন বলতে এখন বোঝায় ক্রাজোয়া-র টেলেকদের। এই বংশের শেষ বংশধর কাউণ্ট ফ্রাঞ্জ ডি টেলেক।

ছেলেবেলা থেকেই বাবা আর মায়ের সঙ্গে কেল্লার মধ্যে মানুষ হয়েছেন ফ্রাঞ্জ। নামী পরিবার, অর্থও প্রচুর। কাস্‌ল্‌-য়ের ভোগবিলাস খাতির যত্ন ছেড়ে তাই পারতপক্ষে বাইরে বেরোতেন না কাউণ্ট এবং কাউণ্টেস অফ টেলেক। বছরে একবার মাইল কয়েক দূরে ক্রাজোযা শহরে যেতেন কার্যসূত্রে।

এই পরিবেশে মানুষ হয়েছেন ফ্রাঞ্জ। শিক্ষক বলতে ছিল একজন ইটালিয়ান পুরুৎ। তার বিদ্যে যতটুকু কুলিয়েছে, ফ্রাঞ্জকে শিখিয়েছে।

বিজ্ঞান, শিল্প, সমসাময়িক সাহিত্য কি জিনিস, জানবার সুযোগ পায়নি ফ্রাঞ্জ। বনেবাদাড়ে ঘুরে বেড়াতেন খোলা ছুরি হাতে। টক্কর দিতেন হিংস্রশ্বাপদের সঙ্গে। শিংওলা হরিণ আর বুনো ভালুক শিকার করতেন অক্লেশে। পাহাড়ে, তেপান্তরে, অরণ্যে দিবারাত্র কাটিয়ে মজবুত হয়েছিল শরীর, সাহস হয়েছিল দুর্দান্ত। জগতের কাউকে ভয় পেতেন না ফ্রাঞ্জ।

পনেরো বছর বয়েসে মাতৃহীন হলেন ফ্রাঞ্জ। একুশ বছরে মারা গেলেন বাবা। মৃগয়া করতে গিয়েছিলেন—মারা গেলেন শ্বাপদের নখরঘাতে।

ত্রিসংসারে আপন বলতে আর কেউ রইল না। বুড়ো শিক্ষকও মারা গিয়েছিল। বন্ধুবান্ধবও নেই। নিজেকে বড় একা মনে হল ফ্রাঞ্জের।

তিনটে বছর কাটল এইভাবে। কাস্‌ল্ ছেড়ে বাইরে বেরোনোর ইচ্ছে হত না। বুখারেস্টে যেতেন মাঝে মাঝে। ফিরে আসতেন দুদিন যেতে না যেতেই।

কিন্তু এভাবে তো বেশিদিন চলে না। হাঁপিয়ে উঠলেন ফ্রাঞ্জ। মন চাইল অনেক দূরে যেতে। রুমানিয়ার পাহাড়ঘেরা অঞ্চল ছাড়িয়ে দূরে·· অনেক দূরে··· !

তেইশ বছর বয়েসে মনস্থির করে ফেললেন তরুণ কাউণ্ট ফ্রাঞ্জ ডি টেলেক। ঠিক করলেন দেশ দেখতে বেরোবেন। টাকার তো অভাব নেই। দৌলতখানা ভাঙিয়ে সারা ইউরোপ ঘুরে আসবেন। বড় বড় শহরে মাসের পর মাস থাকবেন। ক্রাজোয়া কাস্‌ল্-য়ে যা শেখা যায় নি—দেশভ্রমণের মধ্যে দিয়ে তা শিখবেন। জ্ঞানের পরিধি বাড়াবেন। মনে সাহস আর শরীরে শক্তির অভাব নেই। সুতরাং ভয়টা কিসের ?

সঙ্গে নিলেন রোজকো নামে একজন প্রাক্তন সৈনিককে। দশ বছর কাস্‌ল্-য়ে রয়েছে সে। কাউণ্টের সঙ্গে বনেবাদাড়ে ঘুরেছে বহু মৃগয়া অভিযানে।

চাকরবাকরদের হাতে ক্রাজোয়া কাস্‌ল্ ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন সুদূরের অভিযানে।

প্রথমেই গেলেন ইটালীতে। কারণ, গৃহশিক্ষকের কাছে থেকে ইটালিয়ান ভাষাটা ভালই রপ্ত করেছিলেন। ভেনিস, ফ্লোরেন্স, রোম, নেপল্‌স্ দেখলেন এবং ভালবাসলেন সেখানকার শিল্প সৌন্দর্যকে। ঠিক করলেন আরও একটু বড় হলে যাবেন ফ্রান্স, জার্মান, স্পেন, রাশিয়া ইংল্যাণ্ডে।

চার বছর কাটল ইটালীতে। বিজ্ঞানে মাথা ছিল না ফ্রাঞ্জের। কিন্তু ঝোঁক ছিল সঙ্গীত শিল্প সাহিত্যের দিকে। ইটালীর আর্ট-গ্যালারিগুলো

যেন মন্ত্রমুগ্ধ করল তাঁকে। মোহিত হলেন কাব্যজগতের আঙিনায়। তৈল-চিত্র দেখে বিস্মিত হলেন। যা কিছু সুন্দর, শাশ্বত, সনাতন—সবকিছুই যেন আবিষ্ট করল তাঁকে। রঙ-রূপ-রসের দুনিয়ায় আত্মহারা হয়ে কাটিয়ে দিলেন দীর্ঘ চারটে বছর।

এবার বাড়ি ফিরবেন। ক্রাজোয়া কাস্‌ল্-য়ে একবছর বিশ্রাম নেবেন। তারপর আবার শুরু হবে অভিযান। ফেরার আগে শেষবারের মত গেলেন নেপল্‌স্-য়ে।

ফলে, সমস্ত প্ল্যান ভণ্ডুল হয়ে গেল। এমন একটা ঘটনা ঘটল যে ওলোট পালোট হয়ে গেল ফ্রাঙ্ক ডি টেলেকের জীবনধারা।

ঠিক সেই সময়ে লা স্টিলা গান গাইছিলেন সান কার্লো থিয়েটারে। লা স্টিলা নামী অভিনেত্রী। এরকম সুরেলা গলাও কারো নেই। তিনি ভুবন বিখ্যাত নন। কিন্তু ইটালীর যে কোনো সঙ্গীত রসিক তাঁর নামে পাগল। লা স্টিলা-র গলা যেন রুপো দিয়ে বাঁধানো। অভিনয়কে অভিনয় বলে মনে হয় না। ইটালীর বাইরে তিনি কখনো যায় নি। যাওয়ার বাসনাও তাঁর নেই। অপেরা অর্থাৎ গীতিনাট্যর যা কিছু উন্নতি এই ইটালীতেই। সুতরাং ইউরোপের অন্যান্য শহরে গিয়ে লাভ কি? তাই তাঁকে পর্যায়ক্রমে দেখা যায় টুরিনের কারিগনান থিয়েটারে, মিলনের স্কালা থিয়েটারে, ভেনিসের ফেনিস থিয়েটারে, ফ্লোরেন্সের আলফেরি থিয়েটারে, রোমের অ্যাপোলো থিয়েটারে এবং নেপলসের সান্ কার্লো থিয়েটারে।

লা স্টিলা সুন্দরী। পরমা সুন্দরী বলতে যা বোঝায়, তাই। কালো-কালো চোখ। সোনা-সোনা চুল। চোখ মুখ নিখুঁত। ধবধবে ফর্সা রঙ। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত যেন প্লরমায়েস দিয়ে তৈরি প্রতিমা। শিল্পীর হাতেও বুঝি এমন নিখুঁত মূর্তি নির্মাণ সম্ভব নয়।

লা স্টিলা কিন্তু গান ছাড়া আর কিছু ভালবাসেন না। অগণিত ভক্ত স্তাবককে বাড়ীতে ঢুকতে দেন না। কারো সঙ্গে আলাপ করেন না। গান·গান·· গান! সুরের জগতেই তিনি বন্দিনী থাকতে চান—বেরোতে চান না।

এ-হেন লা স্টিলার গান শুনলেন ফ্রাঙ্ক ডি টেলেক এবং মুগ্ধ হলেন। একবার অভিনয় দেখেই মুণ্ড ঘুরে গেল তাঁর। পালটে গেল ভবিষ্যতের প্ল্যান। দেশে ফেরা শিকেয় উঠল। নেপলস্ ছেড়ে নড়বেন না ঠিক করলেন। প্রতিরাত্রে হাজিরা দিতে লাগলেন সান্ কার্লো থিয়েটারে। মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে রইলেন সামনের সারিতে।

লা স্টিলার সঙ্গে আলাপ করার চেষ্টা করলেন ফ্রাঞ্জ। পারলেন না।

ফ্রাঞ্জ একা নন। আরও একজন সঙ্গীত-উন্মাদ প্রতিরাতে হাজিরা দিয়ে চলেছিল লা স্টিলার গান-অভিনয়ের আসরে। ফ্রাঞ্জ তো এলেন সেদিন। ইনি কিন্তু দীর্ঘ ছ'বছর ধরে ঘুরছেন ইটালীর প্রতিটি থিয়েটারে। যেখানে লা স্টিলা, সেখানে তিনি। রহস্যময় চেহারা তাঁর। তালঢ্যাঙা বপু, কালো আলখাল্লায় পা পর্যন্ত ঢাকা, মাথার টুপী দিয়ে মুখ লুকোনো। কেউ তাঁর মুখে দেখেনি কোনো দিন। দেখেছে কেবল রহস্যধূসর মূর্তির নিয়মিত আবির্ভাব। অনুষ্ঠানের শুরু থেকেই নিভৃত বক্সে একলা বসে থাকেন। অনুষ্ঠান শেষ হলেই ভিড়ের মধ্যে সাঁৎ করে হারিয়ে যান। আর কারো গান বা অভিনয় তাঁকে ধরে রাখতে পারেনা।

লা স্টিলার সঙ্গে আলাপ করারও ব্যগ্রতা নেই তাঁর। গান শুনেই তৃপ্ত, অভিনয় দেখেই হৃষ্ট। তার বেশি কিছু চান না।

কে ইনি? ইনি কি একেবারেই নিঃসঙ্গ? মোটেই না। বক্সের মধ্যে একাকী বসে থাকলেও বাইরে এঁর একজন নিত্য সহচর আছে। অদ্ভুত মূর্তি তার। মড়ার খুলি মার্কা মুণ্ড। ডান চোখে কালো ঠুলি—বাঁ চোখ সবুজাভ চশমায় ঢাকা। খুব ঢ্যাঙা নয়, খুব বেঁটেও নয়। বয়স? বলা মুস্কিল। লোকটা বকবক করতে ওস্তাদ। গলার স্বর খোনা। মুখে যেন খই ফুটছে। সে নাকি মস্ত বৈজ্ঞানিক। ফিজিক্স কেমিস্ট্রির এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে ডান চোখটি কানা হয়েছে। লোকে তার বারফট্টাই শুনত এবং মুচকি হাসত। আড়ালে বলত, বড়লোকের পোষা সখের বৈজ্ঞানিক!

সখের বৈজ্ঞানিক কিন্তু পথ চললেই তাক লাগত অন্য পথচারীদের। আপন মনে হাত মুখ নেড়ে কার সঙ্গে যেন কথা বলত সে ·যেন তার সঙ্গে সঙ্গেই হাঁটছে এমন একজন যাকে চোখে দেখা যায় না!

উদ্ভট এই বৈজ্ঞানিকের নাম অরফানিক।

লা স্টিলা অনেক চেষ্টা করেছিলেন অরফানিকের সঙ্গী ভদ্রলোকের নাম ধাম জানবার জন্যে। পারেন নি। তিনি কোথেকে আসছেন, কোন বংশে তাঁর জন্ম, কোন মহলে তাঁর যাতায়াত—কিছু জানা যায় নি। অথচ নিদারুণ অস্বস্তিতে ভুগেছেন প্রতিটি অভিনয়-রজনীতে। রহস্যময় লোকটা এসে বসত সামনের বক্সে। প্রাইভেট বক্স। স্টেজ থেকে তাকে দেখা যেত না। কিন্তু বেশ বোঝা যেত, অন্ধকারের মধ্যে থেকে দুটো চোখ অপলকে চেয়ে আছে তাঁর পানে। সীমাহীন সঙ্গীত ক্ষুধায় বুভুক্ষু সেই চাহনি লা স্টিলার সঙ্গীত

প্রতিভাকে যেন আত্মসাৎ করে নিতে চাইছে। অনেক চেষ্টা করেও মানুষটাকে কোনো দিন দেখতে পায়নি লা স্টিলা। অথচ না দেখা চাহনিও সহ্য করতে পারেন নি। নামহীন আতংক পেয়ে বসত লা স্টিলাকে স্টেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে। গলা ছেড়ে গান গাইতে-গিয়েও শিউরে উঠতেন। প্রাণ খোলা অভিনয় করতে গিয়েও চমকে চমকে উঠতেন। প্রতিমূহূর্তে মনে হত একজন পলকহীন চোখে চেয়ে আছে তাঁর পানে। হল শুদ্ধ ভক্ত চেয়ে আছে ঠিকই। চোখ দিয়ে যেন গিলতে চাইছে তাঁকে। কিন্তু তা নিয়ে কক্ষনো মাথা ঘামাতেন না লা স্টিলা। গায়ে মাখতেন না লক্ষ লোকের পলকহীন চাহনিকে। কিন্তু কিছুতেই সইতে পারতেন না অসামান্য একজোড়া চাহনি—যে চাহনি আজ পর্যন্ত তিনি স্বচক্ষে দেখেন নি—অন্তরে অনুভব করেছেন, ভয়ে কাঠ হয়ে থেকেছেন।

অথচ রহস্য ধূসর মানবটি লা স্টিলার সঙ্গে অন্যান্য স্তাবকদের মত আলাপ করতে ব্যগ্র নয়। স্বনামধন্য শিল্পী মাইকেল গ্রিগেরিও ভারি চমৎকার একটা ছবি এঁকেছিলেন লা স্টিলার। সঙ্গীত শিল্পী, অভিনয় শিল্পী লা স্টিলার শিল্পময় অন্তর যেন বাঙময় হয়ে ফুটে উঠেছিল সেই অনবদ্য প্রতিকৃতির মধ্যে।

মুখঢাকা রহস্যাবৃত লোকটি স্বর্ণমূল্যে কিনে নিয়েছিল সেই ছবি। ছবির যত ওজন, তত ওজনের সোনা ধরে দিয়েছিল মাইকেল গ্রিগেরিওকে।

ব্যস, তার বেশি কিছু না। কোনো দিন লা স্টিলার দরজার কড়া নাড়তে দেখা যায় নি অদ্ভুত লোকটাকে। কোনোদিনও বিরক্ত করেনি গানের রাণী লা স্টিলাকে।

অরফানিক আর এই বিচিত্র মানুষকে নিয়ে সারা ইটালীতে তাই জল্পনা কল্পনা হত প্রতিটি থিয়েটারে, গানের আসরে। সাংবাদিকরা ছেঁকে ধরত বিচিত্র মানুষটাকে। কিন্তু কেউ পাত্তা পেতনা।

তবে কানা ঘুসোয় একটা নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রকাশ্যে কেউ বলতে সাহস পেত না। আড়ালে সভয়ে উচ্চারণ করতে নামটা।

কাউন্ট ফ্রাঞ্জ ডি টেলেক এইভাবেই জেনেছিলেন আশ্চর্য লোকটার ভাবহ নাম।

"ব্যারন রুডলফ্ ডি গর্তস্!"

পাক্কা দু'মাস সান কার্লো থিয়েটার হাজিরা দিয়ে চললেন ফ্রাঞ্জ। কোনো দিনই আসর ফাঁকা রইল না। জমজমাট হলে কিন্তু দুটি মূর্তিকে দেখা গেল প্রতিটি অভিনয় রজনীতে। অর্কেস্ট্রা-স্টলে মন্ত্রমুগ্ধ কাউন্ট ফ্রাঞ্জ ডি

টেলেক এবং প্রাইভেট বক্সে আঁধার ঘেরা একটা ছায়া মূর্তি—ব্যারন রুডলফ ডি গর্ডস্‌!

ছমাস শেষ হতে চলল। তারপর একটা গুজব নিয়ে কানাকানি আরম্ভ হল স্তাবকদের মধ্যে। ভয়ানক গুজব! অবিশ্বাস্য গুজব! অথচ নাকি ভীষণ সত্যি!

লা স্টিলা গান বাজনা অভিনয় ছেড়ে দিচ্ছেন!

স্তম্ভিত হয়ে গেল ভক্তরা, লা স্টিলা মঞ্চ থেকে বিদায় নিচ্ছেন? কিন্তু কেন? বয়স তো মোটে পঁচিশ! অমন রূপবতী সারা ইটালীতে এখনো দুজন নেই। গানের গলা এখনও অমৃত ঝরা। খ্যাতির শিখরে আসীন তিনি। গৌরব সূর্য মধ্য গগনে—অস্তাচলের অনেক দেরি। এখনই তিনি বিদায় নেবেন কেন?

থেপে গেল ভক্তরা। অনেক রকম গুজব শোনা গেল। তার মধ্যে একটা গুজবে খানিকটা সত্যি আছে। লা স্টিলার শরীর ভেঙে পড়েছে। ভেতরে ভেতরে তিনি কাহিল হয়ে পড়েছেন। কারণ একজনই। প্রাইভেট বক্সে আসীন রহস্য ধূসর ঐ ব্যক্তির চাহনি তাঁকে তিলতিল করে শেষ করে আনছে। উৎকণ্ঠা আর সইতে পারছেন না। অকারণ উদ্বেগ আর বহন করতে পারছেন না। ইটালীর যেখানেই গিয়েছেন, অদৃশ্য চাহনি কিন্তু পাছু নিয়েছে প্রতিটি থিয়েটারে। পালিয়ে তিনি যাবেন কোথায়? ইউরোপের হেন জায়গা নেই যেখানে বিচিত্র এই মানুষটার যাতায়াত নেই। তবে? একমাত্র উপায় হল রঙ্গজগৎ পরিত্যাগ করা।

সেই সঙ্গে শোনা গেল আর একটা সত্যি গুজব।

বিয়ে করছেন লা স্টিলা। কাকে?

কাউন্ট ফ্রাঞ্জ ডি টেলেককে। লা স্টিলা মঞ্চ থেকে বিদায় নিচ্ছেন শুনেই অভিভূত অন্তরে তাঁর বাড়ি গিয়েছিলেন ফ্রাঞ্জ। লা স্টিলাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করেছিলেন।

ফ্রাঞ্জের মনের অবস্থা জানতেন লা স্টিলা। কাউন্টেস ফ্রাঞ্জ ডি টেলেক হয়ে বিশ্বের নিভৃত একটি অঞ্চলে সুখে ঘরকন্না করা যাবে, এ খবরও পেয়েছিলেন। তাই রাজি হলেন।

গুজব ছড়িয়ে পড়ার পর থেকেই যেন পাগল হয়ে গেলেন রহস্যময় ব্যারন। তবুও নিয়মিত হাজিরা দিলেন থিয়েটারে। এবার থেকে সঙ্গে রইল অর-ফানিক! এর পরেই এল শেষের সেই দিন।

শেষ অভিনয় করতে মঞ্চে উঠেছেন লা স্টিলা। মন প্রাণ ঢেলে দিয়ে শেষবারের মত গাইছেন।

"ওগো আমার বর,

আমি মরতে চাই…মরতে চাই।"

সারা শরীর কাঁপছে প্রচণ্ড আবেগে। এরকম আবেগ বিহ্বল হতে কখনো দেখা যায় নি লা স্টিলাকে। তিল ধারণের স্থান নেই থিয়েটারে। যত লোক ধরে, তার চারগুণ লোক ঢুকে বসে আছে প্রখ্যাত শিল্পীর শেষ অভিনয় দেখবার জন্যে। সারা হল গম গম করছে তার উদাত্ত কণ্ঠস্বরে। অনবদ্য অভিনয় দাগ কেটে বসে যাচ্ছে প্রত্যেকের মনের গহনতম কন্দরে।

পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে ছটফট করছেন কাউণ্ট ফ্রাঞ্জ ডি টেলক। এত দেরি কেন? কখন শেষ হবে গান?

নাটকীয় মুহূর্ত চরমে পৌঁছেছে। ভাবাবেশে অবশ লা স্টিলা। ঠিক এমনি সময়ে প্রাইভেট বক্সের অন্ধকার ঠেলে বেরিয়ে এল একটা মুখ।

হ্যাঁ, একটা মুখ। দুই চোখ যেন ধক্-ধক্ করে জলছে সেই মুখে। তেল চটচটে চুল এলিয়ে রয়েছে ঘাড়র ওপর।

ব্যারন রুডলফ ডি গর্ত্স্!

মুহূর্তের মধ্যে সর্বনাশ হয়ে গেল। আচমকা লা স্টিলার চোখ পড়ল সেই দিকে। মূর্তিমান বিভীষিকার মত সেই চোখ আর চাহনি দেখে বিষম আতংকে হাত চাপা দিলেন মুখে। তাল কেটে গেল, সুর ছিঁড়ে গেল, গলা আটকে গেল। দুই চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এল কোটর থেকে।

আর, তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়ল মুখচাপা আঙুলের ফাঁক দিয়ে!

পরমুহূর্তে বুকফাটা আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লেন লা স্টিলা। আর, বিকট চীৎকার শোনা গেল ব্যারন রুডলফের বক্সে।

দৌড়ে এলেন ফ্রাঞ্জ। হেঁট হয়ে নাড়ী দেখলেন ভাবী বউয়ের।

পরক্ষণেই বিকট হাহাকারে যেন ফেটে ফুটিফাটা হয়ে গেল সান কার্লো থিয়েটার—"মারা গেছে! মারা গেছে! লা স্টিলা মারা গেছে!"

হ্যাঁ, লা স্টিলা মারা গিয়েছেন। বুকের শিরা ছিঁড়ে মারা গিয়েছেন। তাই ভলকে ভলকে রক্ত বেরিয়ে এসেছে মুখ দিয়ে!

কি অবস্থায় যে হোটেলে পৌঁছোলেন ফ্রাঞ্জ, তা তাঁর মনে নেই। মহাসমারোহে সমাহিত করা হল লা স্টিলাকে। সারা শহর ভেঙে পড়ল গোরস্থানে। ফ্রাঞ্জ গেলেন না। তখনও তিনি বেহুঁশ!

গভীর রাতে একটি ছায়ামূর্তি আবির্ভূত হল গোরস্থানে। 'লা স্টিলা' লেখা পাথরের ফলকের সামনে হেঁট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। মুখ তার

মড়ার মুখের মত সাদা, অধরোষ্ঠ মৃতের মত বিকৃত এবং আড়ষ্ট। হেঁট হয়ে দাঁড়িয়ে কবরে কান পেতে যেন শুনতে চাইল লা স্টিলার শেষ গান··· ।

ইনি ব্যারন রুডলফ ডি গর্তস্

সেই রাতেই নেপলস ছেড়ে নিরুদ্দেশ হলেন অরফানিক এবং ব্যারন।

পরদিন সকালে একটা চিঠি পৌছোলো ফ্রাঞ্জের হাতে। চিঠিখানা এই:

"কাউন্ট ডি টেলেক—

লা স্টিলাকে তুমি-ই মেরেছো তোমার সর্বনাশ হোক! রুডল্ফ্ ডি গর্তস্।"

১০॥ গুন-গুন গান গাইছে কে?
গলা চমৎকার!
এমন খাসা পেত্নীর গান,
শুনিনি কো আর।

কান্নাঝরা সেই কাহিনী ভোলবার নয়! মর্মান্তিক সেই উপাখ্যান এত সহজে কি বিস্মৃত হওয়া যায়? তাই তো অমন চমকে উঠলেন ফ্রাঞ্জ রুডলফ ডি গর্তস্-য়ের নাম শুনে!

ব্যারন রুডলফ! কার্পেথিয়ান কাস্‌ল্ রহস্য ধূসর সেই মানুষটারই আদি নিবাস?

স্থাণুর মত বসে রইলেন কাউন্ট ফ্রাঞ্জ ডি টেলেক!

লা স্টিলাকে ক্যাম্পো সান্তো নুয়োভো-র কবরখানায় গোড় দেওয়ার পর থেকেই অপলকা সুতোয় যেন জীবন ঝুলতে লাগল বেচারা ফ্রাঞ্জের। যমে মানুষ লড়াই চলল দীর্ঘ একটি মাস।

সাংঘাতিক মানসিক আঘাতে পঙ্গু হয়ে গেলেন ফ্রাঞ্জ। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকতের দিবারাত্র, কাউকে চিনতে পারতেন না। এমনি কি কাছের মানুষ রোজকো-কে পর্যন্ত চিনতে পারতেন না।

একটানা এক মাস প্রচণ্ড জ্বরে গা যেন পুড়ে গেল। সেই সঙ্গে ভুল বকুনি। জ্বরের ঘোরে একটা নামই কেবল শোনা যেত তাঁর মুখে। লা স্টিলা! লা স্টিলা! লা স্টিলা!

ফ্রাঞ্জ কি তাহলে পাগল হয়ে গেলেন? সেই আশংকাই দেখা দিল ডাক্তারের মনে। রোজকো শংকিত হল রোগীর অবস্থা দেখে। কিন্তু ঈশ্বর মুখ তুলে চাইলেন।

রোজকোর প্রাণপাত সেবা, নামী ডাক্তারদের শুশ্রূষা এবং স্বয়ং ফ্রাঞ্জের লৌহ কঠিন স্বাস্থ্যের জন্যেই বিপদ কেটে গেল। যমের খপ্পর থেকে ফিরে এলেন তরুণ কাউন্ট।

না, মাথা খারাপ হয় নি। হতে হতেও একচুলের জন্যে বেঁচে গেলেন।

কিন্তু নেপল্‌সে আর থাকতে পারলেন না। চিরতরে নেপল্‌স্ ছেড়ে বিদায় নেওয়ার আগে রোজকো-কে নিয়ে গেলেন গোরস্থানে। অঝোরধারে কাঁদলেন সমাধির মাটি আঁকড়ে ধরে।

এলেন ক্রাজোয়ায়—নিজের প্রাসাদে। দীর্ঘ চার বছর স্বেচ্ছা-বন্দী হয়ে রইলেন প্রাচীন প্রাসাদের চৌহদ্দির মধ্যে। লোকজন সইতে পারতেন না। কারো সঙ্গে মিশতেন না। পাহাড় জঙ্গলের নির্জনতায় বিষণ্ণ অন্তরে ঘুরে বেড়াতেন একাকী। অল্প বয়স—মানসিক ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারছিলেন না কিছুতেই।

রোজকো ছায়ার মত রইল পেছনে। অনেক বোঝাল। নিঃসঙ্গ থাকা আর সমীচীন নয়। এবার একটু দেশভ্রমণে বেরোনো যাক। মনটা ভাল হবে।

রোজকোর জেদেই শেষ পর্যন্ত ক্রাজোয়া কাসলগড়ের বাইরে পা দিলেন ফ্রাঞ্জ। ভলক্যান গিরিমালা দেখলেন, রিটিযাট পাহাড়ে উঠলেন, মারোস উপত্যকায় ভ্রমণ করলেন। কয়েক সপ্তাহ পরে ক্লান্ত দেহে এসে উঠলেন 'কিং ম্যাথিয়াস' সরাইখানায়।

এসেই শুনলেন কার্পেথিয়ান কাসলের নিগূঢ় রহস্য। শুনলেন তাঁর জীবনের সব চাইতে বিয়োগান্তক অধ্যায়ের নাটের গুরুর অধিবাস অলুক্ষুণে ঐ হানাবাড়িতে!

বিমূঢ় হয়ে গেলেন ফ্রাঞ্জ! চক্ষের পলকে মনের পর্দায় ভেসে উঠল মাত্র চার বছর আগেকার প্রতিটি ঘটনা। তুফান উঠল যেন মাথার কোষে কোষে। বিহ্বল চোখে চাইলেন রোজকোর পানে!

শংকিত হল রোজকো। অতিকষ্টে একটা ধাক্কা সামলে উঠেছেন ফ্রাঞ্জ। আবার কি তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে? ভর্ৎসনা মিশোনো চোখে চাইলেন মাস্টার কোল্‌জের পানে। কি দরকার ছিল এসব কথা ওঁকে বলবার?

মাস্টার কোল্‌জ অতশত বুঝলেন না। শুধু বুঝলেন, কাউন্ট ফ্রাঞ্জ ডি টেলেকের সঙ্গে ব্যারন রুডলফ ডি গর্তস্‌-য়ের কোথাও একটা নিগূঢ় সম্পর্ক আছে! কোথাও একটা দুর্বোধ্য রহস্য লুকিয়ে আছে! কিন্তু তা জিজ্ঞেস করবার সাহস হল না।

বিদায় নিলেন মাস্টার কোল্‌জ—পেছন পেছন অন্যান্য মাতব্বররা।

বেলা তিনটে নাগাদ মাস্টার কোল্‌জের বাড়িতে হাজির হলেন কাউন্ট।

মোড়ল যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। এ যে পরম সৌভাগ্য! কাউন্ট ফ্রাঞ্জ ডি টেলেকের মত আমীর ওমরা-রা এর আগে কখনো তাঁর গৃহে পায়ের ধুলো দেন নি! কি যে করবেন ভেবে পেলেন না তিনি। শতমুখে প্রশস্তি আরম্ভ করলেন ফ্রাঞ্জের। তিনি এসেছেন বলেই তো সরাইখানায় ফের আড্ডা বসল···এরপর থেকে নিশ্চয় অন্যান্য টুরিস্টদেরও ভয় ভাঙবে···ফের আসবেন তাঁরা বার্স্ট গ্রামে· আবার সুদিন আসবে···অবসান ঘটবে অসহ্য আতংকের···ইত্যাদি ইত্যাদি।

মৃদু হাসলেন কাউন্ট। আত্ম-প্রশস্তি আর শুনতে চাইলেন না।

মাস্টার কোল্‌জ হাত কচলাতে কচলাতে বললেন—"হুজুর কিন্তু শহরে গিয়ে পুলিশ পাঠিয়ে দেবেন। ভূত হোক আর চোর-ডাকাত হোক—এ অবস্থার নিষ্পত্তি হওয়া দরকার। হেস্তনেস্ত করা দরকার।"

"বলেছি তো বলব," বললেন কাউন্ট। "ভাল কথা, নিক ডেক এখন কি রকম আছে?"

"ভাল। পক্ষাঘাত সেরে এসেছে।"

"তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"নিশ্চয়! নিশ্চয়।"

সম্মানীয় অতিথিকে মহাসমাদরে ভেতরের ঘরে নিয়ে গেলেন মাস্টার কোল্‌জ। মিরিওটাও সেখানে ছিল। কাউন্ট তাকে সৌজন্যমূলক দু'একটা কথা বললেন! প্রশংসা করলেন মিরিওটার রূপের। লজ্জায় লাল হল মিরিওটা।

সবশেষে বললেন—"আপনাদের বিয়েতে কিন্তু আমি যেন নেমন্তন্ন পাই।"

"সে আমার মস্ত ভাগ্য," বিগলিত কণ্ঠে বললেন মাস্টার কোল্‌জ।

আবেগ বিহ্বল কণ্ঠে বলল মিরিওটা—"কিন্তু ভূতের খপ্পর থেকে নিক রেহাই পাবে তো?"

"তার মানে?"

"ওর গায়ে যে ভূতের হাওয়া লেগেছে। আর কি ছাড়বে? বিয়ের পরেও তো ফের উৎপাত করতে পারে?"

"দেখা যাক।" সংক্ষেপে বললেন কাউন্ট। "নিক ডেক কোথায়?"

"আসুন।"

পাশের ঘরে একটা মস্ত আরাম কেদারায় আড় হয়ে শুয়েছিল নিক ডেক।

আট দিনেই ভূতের ছোঁয়াচ অনেকটা কাটিয়ে উঠেছে। শয়তানের ধাক্কায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত বাম প্রত্যঙ্গ এখন নাড়তে পারে। কাউন্টকে দেখেই তাই নিজেই উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে।

যেন অনেকদিনের বন্ধু, এমনিভাবে নিক ডেকের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করলেন কাউন্ট।

বললেন—"আচ্ছা, সত্যি করে বলুন দিকি, আপনি বিশ্বাস করেন কার্পেথিয়ান কাস্‌ল্‌-য়ে ভূত আছে?"

"করি বইকি—করিয়ে ছেড়েছে।"

"অর্থাৎ বলতে চান, ভূতেরাই আপনাকে পাঁচিল পেরোতে দেয় নি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"এ বিশ্বাস আপনার মনে এল কেন?"

"ভূত ছাড়া ঐ রকম অসম্ভব ব্যাপাব কারও পক্ষে সম্ভব কি? আপনিই বলুন না, মানুষের পক্ষে কি সম্ভব?"

"ঠিক কি-কি ঘটেছিল। একটুও বাদ না দিয়ে বলতে পারবেন?"

"নিশ্চয়।"

বলে, নিক ডেক যা বলল তা আগেই 'কিং ম্যাথিয়াস'-য়ের বসে শুনে নিয়েছেন কাউন্ট। মাস্টার কোল্‌জ এবং মাতব্বররা যা বলেছিলেন—তার বেশি কিছু নয়। কাউন্ট অবশ্য তা শুনেই বলেছিলেন, দুর্বোধ্য হলেও সে সবের পেছনে মানুষের হাত থাকাটা অসম্ভব কিছু নয়। অলৌকিক কাণ্ডকারখানা মানুষের কারখানায় বানিয়ে নেওয়া এমন কি কঠিন ব্যাপার? চোর-বদমাসরা বদ মতলব চরিতার্থ করার জন্যে অদ্ভুত কারসাজি রচনা করতে পারে নাকি? ডক্টর পাটাক অবশ্য দিব্যি গেলে বলেছেন, কে যেন তাঁর পা টেনে ধরেছিল মাটিতে—পা অবশ হয়ে গিয়েছিল। যে রকম ভীতু লোক তিনি, ভয়ের চোটে হার্টফেল করেন নি এই যথেষ্ট। প্রচণ্ড ভয় পেলে মানুষ আঙুল নাড়ানোর ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলে। ডক্টর পাটাক পা নাড়াতে পারেন নি সেই কারণেই।

সব শুনে নিক ডেক অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললেন—"কি যে বলেন! ওঁর মত ভীতু লোক ঠিক দরকারের সময় পা তুলতে পারলেন না, তাও কি হয়?"

"তাহলে বলব ঘাসের তলায় লুকোনো কোনো ফাঁদে পা আটকে গিয়েছিল পাটাকের।" ফ্রাঞ্জ ছাড়বার পাত্র নন।

"ঘাতিকল যখন বন্ধ হয়, পা কেটে যায়, মাংস খুবলে নেয়, রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে। পাটাকের পায়ে আঁচড়টি লাগে নি।"

"তাহলে হয়ত পাথরের খাঁজে-টাজে পা আটকে গিয়েছিল।"

"খাঁজটা কি তাহলে আপনা থেকেই খুলে গেল?"

অকাট্য যুক্তি নিকোলাসের। কি বলবেন ভেবে পেলেন না ফ্রাঞ্জ। হকচকিয়ে গেলেন সাফ সাফ কথায়।

ফের বলল নিক—"পাটাকের কথা বাদ দিন। সে না হয় বানিয়ে বলেছে, বাড়িয়ে বলেছে। কিন্তু আমার কথায় তো ভেজাল নেই।

"হ্যা হ্যা আপনার কথাই বরং শোনা যাক", ঝটিতি বললেন ফ্রাঞ্জ।

একটা বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। প্রচণ্ড ধাক্কায় মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছি। সে ধাক্কা মানুষের ধাক্কা নয়।"

"গায়ে চোট লাগেনি?"

"না। সাংঘাতিক ঠেলায় ছিটকে পড়েছিলাম—ব্যাস, তাব বেশি কিছু নয়।"

"টানা পুলের লোহার কজায় হাত দিতেই ধাক্কা খেলেন?"

"আজ্ঞে হ্যা। কজাটা ধরতে না ধরতেই সারা দেহ যেন পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে গেল। কি ভাগ্যিস অমন মারাত্মক ধাক্কা খেয়েও বুদ্ধিভ্রংশ ঘটেনি। তাই যে-হাতে শেকল আঁকড়ে ছিলাম, সে হাতের মুঠো ছেড়ে দিইনি। শুধু আলগা করেছিলাম। তাইতেই হড়কে নেমে এসেছিলাম নিচে। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম খালের তলায় পৌছে।"

ফ্রাঞ্জ শুধু মাথা ঝাঁকালেন। ভাবখানা, যত্তো সব গাঁজা গল্প! কোনো মানেই হয় না!

নিক ডেক তা আঁচ করল। বলল—"ভাবছেন স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্ন দেখলে নিশ্চয় অসাড় অবশভাবে কেউ একটানা আটদিন বিছানায় শুয়ে থাকে না? আজ্ঞে হ্যা, এই আটটা দিন কি কষ্টে যে কেটেছে—আমিই জানি। দুঃস্বপ্ন কি পক্ষাঘাত ডেকে আনে?"

আমতা আমতা করে বললেন ফ্রাঞ্জ—"তা অবশ্য ঠিক। জানোয়ারের মত কেউ ধাক্কা মেরেছে আপনাকে। ধাক্কাটা অন্ততঃ স্বপ্ন নয়।

"শুধু জানোয়ারের মত বললে হবে না, বলুন শয়তানের মত।"

"ঐ একটি জায়গাতেই একমত হতে পারছিনা আপনার সঙ্গে। আপনি বিশ্বাস করে বসে আছেন এ-সবই ভূতের খেলা। আমি তা বিশ্বাস করতে রাজি নই। কেন না, ভূত বলে কিছু আছে, তাই তো বিশ্বাস করি না আমি।"

"বিশ্বাস করা না করা আপনার অভিরুচি," বলল নিক ডেক। "দয়া করে শুধু বুঝিয়ে দিন অদৃশ্য হাতে ধাক্কাটা কে মারল—আট দিন পঙ্গু করে কে আমাকে বিছানায় শুইয়ে রাখল।"

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারলেন না কাউন্ট।

বললেন একটু থেমে—"একদিন বুঝিয়ে দেব ঠিকই। সেদিন দেখবেন আপাততঃ গোলমেলে মনে হলেও ঘোর প্যাঁচ কোথাও নেই।"—

"ঈশ্বর করুন যেন তাই হয়।"

"একটা প্রশ্ন। কার্পেথিয়ান কাস্ল্ কি বরাবরই গর্ডস্ ফ্যামিলির সম্পত্তি ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ -এখনও এ-সম্পত্তি তাঁদেরই—যদিও সর্বশেষ বংশধর যেন কর্পূরের মত উবে গিয়েছেন। কেউ জানে না ব্যারন রুডল্ফ্ এখন কোথায়।"

"কবে উধাও হলেন ভদ্রলোক ?"

"বিশ বছর আগে।"

"বিশ বছর ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। বিশবছর আগে উনি কাস্ল্ ছেড়ে নিরুদ্দেশ হন। তার মাস কয়েক পরে শেষ চাকরটিও মারা যায়। তারপর থেকে হানাবাড়ি হয়ে গিয়েছে কাস্ল্গড়।"

"তারপর থেকে কাস্লে কেউ আর থাকে নি ?"

"আজ্ঞে না।"

"ব্যারন সম্বন্ধে প্রতিবেশীদের ধারণা কি ? কোথায় গেছেন বলে মনে হয় ?"

"ব্যারন মারা গিয়েছেন—কাসলগড় ছেড়ে যাওয়ার পর কিছুদিন পরেই দেহ রেখেছেন।"

"ভুল। ব্যারন বেঁচে আছেন। অন্ততঃ পাঁচ বছর আগেও ছিলেন।"

"বেঁচে আছেন ?"

"তবে আর বলছি কি !"

"কোথায় ?"

"ইটালীর নেপলসে।"

"আপনি দেখেছেন ?"

"হ্যাঁ, আমি দেখেছি।"

"গত পাঁচ বছরে ?"

"আর কোনো খবর পাইনি।"

শুনে ভুরু কুঁচকে রইল নিক ডেক। কি যেন ভাবল। তারপর বলল :

"আমার কি মনে হয় জানেন। ব্যারন রুডলফ হয়ত কার্পেথিয়ান কাসলে ফিরে এসেছেন। ঘাপটি মেরে আছেন সাত পুরুষের ভিটেতে।"

"আমার তা মনে হয় না, নিক ডেক।"

"ঠিক বলেছেন। খামোকা ঘাপটি মেরে থেকে লাভ কি তাঁর? গাঁ-শুদ্ধ লোককে ভয় দেখিয়ে দূরে ঠেকিয়ে রাখার উদ্দেশ্য কি?"

"কিচ্ছু না!" বললেন কাউন্ট।

মুখে বললেন বটে, কিন্তু কথাটা গেঁথে গেল কাউন্টের মনে। ব্যারন লোকটা এমনিতেই ছিটগ্রস্ত। আচার আচরণ সৃষ্টি ছাড়া। নেপল্‌স্ ছেড়ে নিজের ভিটেতে ফিরে আসাটাই তো তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। নির্জনতায় অভ্যস্ত তিনি। লোক গিজগিজে শহরে থেকেও কাউকে কাছে ঘেঁসতে দিতেন না। কে জানে এখানেও সেই পরিবেশ গড়ে তুলেছেন কিনা ভূতের খেলা দেখিয়ে! এ-অঞ্চলের ভয় তরাসে মানুষগুলোর নাড়ি নক্ষত্র তাঁর জানা। সুতরাং অবাঞ্ছিত উৎপাতদের দূরে রাখবার জন্যে নিজেই শয়তান সেজে বসেছেন হয়ত! ভূত নেই, অথচ ভূতের রাজা!

বিদ্যুৎ ঝলকের মত কথাগুলো মাথার মধ্যে ঝলসে উঠলেও মুখে তা প্রকাশ করলেন না কাউন্ট। ব্যারন রুডল্‌ফ্‌-য়ের শয়তানি চেহারা তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। বেদনাময় সেই অতীত তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। বার্স্ট গাঁয়ের অজ্ঞ মানুষগুলোর কাছে তা বলার দরকার নেই।

ঠিক এই সময়ে নিক ডেক বলল তার শেষ কথা—"কাসলগড়ে সত্যিই যদি ব্যারন রুডলফ ঘাপটি মেরে থাকেন তো বলব তিনিই খোদ শয়তান। কেন না আমার এ-দশা করার ক্ষমতা শয়তান ছাড়া আর কারো নেই। ব্যারন রুডল্‌ফ্‌-ই এ গাঁয়ের 'চর্ট'!"

কথার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন ফ্রাঞ্জ। নিক ডেককে বুঝিয়ে বললেন, আর যেন কার্পেথিয়ান কাস্‌ল্‌-য়ে না যাওয়া হয়। খামোকা গোঁয়ার্তুমি করে লাভ আছে কি? ও কাজ যাদের, তারাই করুক। অর্থাৎ কার্লস্‌বার্গে গিয়ে পুলিশ পাঠিয়ে দেবেন কাউন্ট। তারা এসে ফাঁস করে দিয়ে যাবে'খন কার্পেথিয়ান কাস্‌ল্‌-রহস্য।

এই বলে বিদায় নিলেন কাউন্ট। কিঙ ম্যাথিয়াসে ফিরে এলেন। সেদিন আর কোথাও বেরোলেন না। ছটা নাগাদ খাবার নিয়ে এল জোনাস। বড় হল ঘরে মুখোমুখি বসে খেয়ে নিলেন কাউন্ট আর রোজকো। খাওয়ার সময়ে বিরক্ত করা শোভন হবে না বুঝেই মাস্টার কোল্‌জ আড্ডা মারতে এলেন না সরাইখানায়—কাউকে আসতেও দিলেন না। নিঃশব্দে সমাধা হল আহার পর্ব।

আটটা বাজল। রোজকো বললে - "আমার সঙ্গে আর দরকার আছে?"

"না, রোজকো," বললেন কাউন্ট।

"তাহলে আমি ছাদে গিয়ে ধূমপান করি?"

"যাও।"

একলা বসে রইলেন কাউন্ট। মস্ত আরাম চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে ভাবতে লাগলেন সান্ কার্লো থিয়েটারের সেই শেষ দৃশ্য·· পাঁচ বছর আগেকার ঘটনা··· কিন্তু যেন স্পষ্ট দেখতে পেলেন ব্যারন রুডলফ্ ডি গর্ত্স্‌কে· লা স্টিলার শেষ গানের সময়েই প্রথম তাকে দেখেছিলেন ফ্রাঞ্জ·· অন্ধকারে ছাওয়া বক্স থেকে সহসা আবির্ভূত হয়েছিল ভয়ংকর একটা মুণ্ড·· জ্বলন্ত চক্ষু·· বিস্রস্ত কেশ··· লা স্টিলাকে যেন জীবন্ত দগ্ধ করতে চেয়েছিল সেই চাহনি··· !

মনের পর্দায় ভেসে এল আরো কত ছবি·· সেই চিঠি ··ব্যারন রুডলফ্-য়ের লেখা সেই চিঠি· কাউন্ট ফ্রাঞ্জ ডি টেলেক-ই নাকি মেরে ফেললেন লা স্টিলাকে!

স্মৃতির অলস রোমন্থনের সঙ্গে সঙ্গে ঘুমের বাজনা বাজতে লাগল মনের আকাশে···রিমঝিম রিমঝিম করে রাজ্যের ঘুম নামছে যেন চোখের পাতায় ···তন্দ্রায় শিথিল হয়ে এল কাউন্টের দেহ-মন-চেতনা···।

ঠিক সেই সময়ে কর্ণরন্ধ্র দিয়ে মনের মঞ্জিলে ভেসে এল আশ্চর্য একটা সুর··· একটা গানের সুর· ভারি মিষ্টি, ভারি সুরেলা, ভারি আমেজী··· !

ঘরে কেউ নেই···একলা কাউন্ট।

ফ্রাঞ্জ কি স্বপ্ন দেখছেন? অত ভাববার সময় নেই কাউন্টের। হুঁশ রইল না গানের সুধা কানে ঝরে পড়তেই। উৎকর্ণ হয়ে শুনলেন·· শুনলেন···

বাতাস যেন ফিসফিসিয়ে উঠেছে তাঁর কানের সামনে·· যেন কার অদৃশ্য ঠোঁটজোড়া নড়ছে তাঁর কানের অতি সন্নিকটে·· মিহি গলায় গাইছে স্টিফানো বিরচিত প্রাণস্পর্শী সেই গান!

"·· চলো যাই হাজার ফুলের কাননে।"

রোমান্টিক এই গীতি-কাহিনী এর আগেও শুনেছেন ফ্রাঞ্জ। সান্ কার্লো থিয়েটারে শেষ অভিনয় রজনীতে এই গানই শোনা গিয়েছিল গানের রাণী লা স্টিলার কণ্ঠে···এই গান গেয়েই তিনি বিদায় নিয়েছিলেন মর্ত্যের উদ্যান থেকে—রওনা হয়েছিলেন স্বর্গের কানন অভিমুখে!

তন্দ্রা যদি এত মধুর হয় তো হোক! কি দরকার জোর করে তন্দ্রা ছুটিয়ে নিরর্থক তদন্তের পেছনে দৌড়োনোর? নিঝুম হয়ে শুয়ে তাই শুনতে লাগলেন ফ্রাঞ্জ কান্না ঝরানো সেই কণ্ঠ·· শেষ বিদায় নিচ্ছেন লা স্টিলা!

ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে এল কণ্ঠস্বর…গানের রেশ আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল ঘরের মধ্যেই…বাতাস যেন থির থির করে কাঁপতে কাঁপতে অবশেষে নিথর হল কণ্ঠ স্তব্ধ হতেই!

ঘোর কেটে গেল ফ্রাঞ্জের। লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন। নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে কান খাড়া করে শুনতে চাইলেন অনির্বচনীয় কণ্ঠস্বরের আরো কিছু গান… আরো একটা গানের কলি…

কিন্তু না, আর কোনো শব্দ নেই, নিস্তব্ধ চারিদিক।

বিমূঢ় কণ্ঠে বিড় বিড় করলেন ফ্রাঞ্জ—"লা স্টিলা…লা স্টিলা… লা স্টিলার গলা!"

পরমহূর্তেই ফিরে এল সম্বিৎ, বললেন আত্মস্থ কণ্ঠে!

"ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু একি স্বপ্ন দেখলাম?"

১১॥ গভীর রাতে কেল্লা ছাতে, ধিন-তা-ধিনা পেত্নী নাচে।

কাক-ডাকা ভোরে ঘুম ভাঙল কাউণ্টের। কিন্তু কিছুতেই স্থির করতে পারলেন না মনকে। গত রাতের স্বপ্ন ঘুরে ফিরে আসতে লাগল মনের মধ্যে।

সকাল সকাল বেরোতে হবে। বার্স্ট গ্রাম পেছনে ফেলে কোলোস্ভারের রাস্তা ধরে আগে যাবেন পেট্রোসনি আর লিভাডজেল টাউনে। তারপর পুরো একটা দিন কাটাবেন কার্লসবার্গে। সেখান থেকে রেলে চেপে সটান চলে যাবেন সেণ্ট্রাল হাঙ্গারীতে।

সরাইখানা থেকে বেরিয়ে এলেন ফ্রাঞ্জ। পা-য়ে পা-য়ে এলেন মালভূমির উঁচু ছাদে। দূরবীন সঙ্গেই ছিল। চোখে লাগিয়ে উৎসুক চাহনি নিক্ষেপ করলেন কার্পেথিয়ান কাস্‌ল্‌-এর দিকে।

বহু দূরে ওরগাল প্লেটোর মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে আছে কালো পাথরের আতংকপুরী। অনিমেষ নয়নে চেয়ে রইলেন ফ্রাঞ্জ। মন ছুটে চলল দুরন্ত কুরঙ্গের মত। রাশি রাশি চিন্তা ভিড় করে এল মনের মধ্যে।

কি করবেন ফ্রাঞ্জ? সত্যি সত্যিই কি কার্লসবার্গে পৌঁছে সশস্ত্র পুলিশ পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন?

গ্রামবাসীদের কথা দিয়েছিলেন কাউণ্ট পুলিশ দিয়ে ঠেঙিয়ে ভূত তাড়াবেন কাস্‌ল্‌গড় থেকে। তখন ভেবেছিলেন নিশ্চয় পলাতক আসামীরা আড্ডা

গেড়েছে ফাঁকা কেল্লায়। তখন কি ছাই জানতেন কাস্‌ল্‌গড় আসলে ব্যারন রুডলফের সম্পত্তি ?

কথাটা শোনবার পর থেকেই ভাবান্তর এসেছে তাঁর মনে। নষ্ট চরিত্রের বা দুষ্টজনের কারসাজি বলে কাস্‌ল্‌গড়ের ভুতুড়ে কেরামতিকে আর উড়িয়ে দিতে পারছেন না।

পাঁচ বছর·· দীর্ঘ পাঁচটি বছর ব্যারনের খোঁজখবর পাননি কাউন্ট, পাওয়ার চেষ্টাও করেননি। শুনেছিলেন, নেপল্‌স্‌ ছেড়ে নিরুদ্দেশ হওয়ার পরেই নাকি পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলেন ব্যারন। কিন্তু সত্যি সত্যিই কি মারা গিয়েছেন ? প্রমাণ কি ? কেউ দেখেছে কি তাঁর মৃত্যু ? কে জানে, নেপল্‌স্‌ থেকে সটান পূর্বপুরুষের ভিটেতে এসে উঠছেন কিনা ? ফাঁকা কেল্লা—জনমনিষ্যি থাকে না। এমন নিভৃত জায়গা আর পাবেন কোথায় ? সঙ্গে এনেছিলেন একমাত্র সঙ্গী অরফানিক-কে। কাণা অরফানিক নাকি মস্ত বৈজ্ঞানিক। কথায় বলে, কাণা-খোঁড়া-কুঁজো, তিন চলে না উজো। অর্থাৎ কাণা খোঁড়া কুঁজোরা কখনো সোজা রাস্তায় চলে না। ভেতরে তাদের জিলিপীর প্যাঁচ।

সুতরাং কাণা অরফানিক-ই ভুতুড়ে ম্যাজিক-নাট্যর লেখক-পরিচালক-প্রযোজক কিনা কে বলতে পারে ? কে জানে লোমহর্ষক কাণ্ডকারখানার মধ্য দিয়েই প্রকাশ পাচ্ছে কিনা অরফানিকের বিকৃত উদ্ভাবনী প্রতিভা ?

দুজনেই নিরালা থাকতে ভালবাসেন। বহু বছর পরে তাঁদের ফিরে আসার খবর পেয়ে পাছে উৎসুক গ্রামবাসীরা এসে উৎপাত শুরু করে, এই ভয়েই হয়ত রক্ত জল করা ভোজবাজি দেখিয়ে চলেছেন বিজ্ঞানের জাদুকর অরফানিক !

তাই যদি হয় তো কার্লসবার্গে গিয়ে পুলিশ পাঠানো কি সমীচীন হবে ? ব্যারন রুডলফের ব্যক্তিগত শান্তি ক্ষুণ্ণ করার কোনো অধিকার কাউন্টের নেই। তাঁর ব্যাপারে নাক গলানোরও কোনো প্রয়োজন নেই।

এইসব কথাই মনের মধ্যে তোলাপাড়া করছেন কাউন্ট, এমন সময়ে পাশে এসে দাঁড়াল রোজকো।

মনের কথা মুখে প্রকাশ করলেন কাউন্ট। শুনল রোজকো।

বলল—"আপনি ঠিক বলেছেন। ব্যারন রুডলফ-ই ফিরে এসেছেন। তিনিই কাউকে ঘেঁসতে দিচ্ছেন না। তাঁর কেল্লায় তিনি যদি কাউকে ঢুকতে না দেন তো তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাব কেন ?"

"তুমিও তাহলে তাই বলছ ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আমরা বেড়াতে এসেছি, বেড়িয়ে চলে যাব। গাঁয়ের ব্যাপারে নাক গলাতে যাব কেন ?"

"তাছাড়া, মাস্টার কোল্জকে যখন বলেই দিয়েছি কি করলে উৎপাত দূর করা যাবে। যাক না নিজেরা শহরে, ডেকে আনুক পুলিশ। না কি বল?" বললেন ফ্রাঞ্জ।

"আজ্ঞে, হ্যাঁ। ওদের ব্যাপার ওরা বুঝুক।"

"তাহলে ব্রেকফাষ্ট খেয়েই বেরিয়ে পড়া যাক?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আর দেরি করা যায় না।"

"একটা কথা আগেই বলে রাখি। সিল উপত্যকায় পৌঁছোনোর আগে আমি একটু ঘুরে যাব।"

"কোথায় যাবেন?"

"কারপেথিয়ান কাস্‌ল্‌। পাঁচিলের বাইরে থেকে দেখব কাস্‌ল্‌গড়ের চেহারা।"

"কি লাভ মালিক?" উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল রোজকো। তরুণ মনিবের মনে পূর্বস্মৃতির উদয় হওয়াটা সে চায় না। অনেক কষ্ট পেয়েছেন বেচারী! কেন খুঁচিয়ে আবার সেই অব্যক্ত বেদনাকে জাগিয়ে তোলা? কি দরকার অভিশপ্ত কেল্লার ছায়া মাড়ানোর?

কিন্তু মনিবকে সে চেনে। বড একরোখা, বড় জেদী। সংক্ষেপে বললেন কাউন্ট—"আমার মন টানছে—তাই। লাভ কিছুই নেই, রোজকো। কিন্তু এত কাছে যখন এসেছি। তখন না দেখে যাই কি করে?"

বাধা দিয়ে লাভ নেই জেনে চুপ করে গেল রোজকো।

কাউন্টের মনের মধ্যে তখন ঝড় উঠেছে। গত রাতের শেষ কলিটা এখনও যেন গুনগুনিয়ে ধ্বনিত হচ্ছে মগজের কোষে কোষে। লা স্টিলার স্মৃতি এক লাফে এতগুলি বছরের ব্যবধান পেরিয়ে মাথা চাড়া দিয়েছে মনের মধ্যে; চুম্বকের মত কে যেন তাঁকে টানছে বিশাল গড়ের দিকে!

বেচারা রোজকো! কাউন্টের সংকল্প শোনবার পর থেকেই মনের শান্তি উড়ে গেল তার। মনিবকে সে হাড়ে হাড়ে চেনে। কাস্‌ল্‌গড়ের পাদমূলে পৌঁছে ভেতরে ঢোকার বাসনা হবে না কাউন্টের—এমন কথা কিন্তু তিনি বলেন নি। ভেতরে ঢুকবেন ঠিকই। তারপর? পরিণামটা কল্পনা করতেই শিউরে উঠল রোজকো! এই সরাইখানাতেই ডাকাবুকো নিক ডেক-কে হুঁশিয়ার করেছিল অদৃশ্য কণ্ঠ। নিক ডেক তোয়াক্কা করেনি। ফল ভাল হয়নি। সামনে আগুন জেনেও পতঙ্গের মত কেন ছুটছেন কাউন্ট?

সরাইখানা থেকে বেরোতে বেরোতে দুপুর হয়ে গেল। ঝোপ বুঝে কোপ মারল জোনাস। অর্থাৎ বেশ চড়া দাম আদায় করে নিল মাননীয় অতিথিদের কাছ থেকে।

মাস্টার কোল্জ প্রমুখ সবার কাছ থেকে হাসিমুখে বিদায় নিলেন কাউন্ট। মিরিওটাকে বললেন চটপট বিয়ে সেরে নিতে। মাস্টার কোল্জকে বললেন পুলিশ দিয়ে ঠেঙিয়ে দুদিনেই ভূতের উপদ্রব বন্ধ করে দিতে।

শুনে মাস্টার কোল্জ শুধু বললেন—"বলা সহজ, স্যার।"

"কাজেও সহজ বৈকি।" বললেন কাউন্ট।

মুখফোঁড় পাটাক বললেন ফস করে—"আমাদের সঙ্গে গেলেই বুঝতেন কত ধানে কত চাল!"

হাসলেন কাউন্ট—"আপনার মত আমার পা দুখানাও কেউ খামচে ধরত, এর বেশি কিছু তো না?"

"পা নয় স্যার, পা নয়—বুট! ভয় পেয়ে বানিয়ে বলছি ভাববেন না—"

"আরে না, না, সে-রকম কিছুই ভাবছি না। আমি শুধু ভাবছি মিলিটারী বুটের ধাক্কা সইতে পারবে তো কাসলগড়ের ভূতেরা? মিলিটারী বুট বড ডিসিপ্লিনের ভক্ত। আপনার দশা নাও ঘটতে পারে।" বলে রওনা হলেন কাউন্ট। গাঁয়ের লোক দেখল কোলোস্ভারের রাস্তা ধরে নেমে যাচ্ছেন কাউন্ট আর রোজকো কার্লসবার্গের দিকে। কিন্তু মালভূমির ছাদ থেকে দূরবীন কষে কাউন্ট আগেই দেখে নিয়েছিলেন আর একটা রাস্তা রিটিঘাট পাহাড়ের গোড়া ঘুরে উঠে গিয়েছে ভলক্যান অঞ্চলে। সে পথে কাস্ল্ গেলে গাঁয়ের লোক কেউ দেখতে পাবে না।

ইচ্ছে করেই তাঁর কাসলগড় দর্শনের সংকল্প চেপে গিয়েছিলেন গ্রামবাসীদের কাছে। রোজকো-কেও বলতে বারণ করেছিলেন। কি দরকার অত কথা বলার? মনের ইচ্ছে মনেতেই থাকুক।

রোজকো অন্তরে অশান্ত হলেও তাই বাইরে প্রশান্ত থেকেছে। মিলিটারীর মতই মুখ বুজে সঙ্গ নিয়েছে মনিবের। বিপদ সামনে জেনেও দ্বিরুক্তি করে নি। কতবার ইচ্ছে হয়েছে বলবার—"কেন খামোকা ঘুরে মরছেন? কষ্ট করছেন? চলুন যাই সিধে পথে।" কিন্তু প্রতিবারেই সামলে নিয়েছে নিজেকে।

গভীর চিন্তায় তন্ময় হয়ে পথ হাঁটছেন কাউন্ট। ঘণ্টা দুয়েক একটানা পথ চলার পর জিরিয়ে নিলেন আধ ঘণ্টার মত। এবার অন্য দিকে যেতে হবে। ঘুর পথে যাওয়ার দরুন দ্বিগুণ পথ হাঁটতে হবে যদিও। তাহলে বেলাবেলি পৌঁছোনো যাবে। দিনের আলো থাকতে থাকতেই কাসলগড়ের কালো চেহারা দেখে নেওয়া যাবে। রাত্তির নাগাদ পৌঁছোনো যাবে লিভাডজেল টাউনে।

সুগভীর চাহনি মেলে চেয়ে রইলেন ফ্রাঞ্জ। একদিকে ওয়ালাচিয়ান

উপত্যকায় তরঙ্গায়িত ভূমি। আর একদিকে প্রেসা আর ওরগাল প্লেটো। পাহাড় টপকে পৌঁছোতে হবে কাসলগড়ে।

শুরু হল অভিযান। প্রথমে পেরোতে হবে উপত্যকা। রাস্তা নেই সেখানে। ঘন ঝোপ। মাঝে মাঝে গভীর খানা। বাদলার দিনে প্লাবন শুরু হয় উপত্যকায়। তখন এই সব খানাখন্দ দিয়ে জল বয়ে যায় সগর্জনে। দুস্তর এই পথ পেরিয়ে ভলক্যান রাস্তায় ফিরে আসতেই বাজল পাঁচটা।

নিক ডেক হিমসিম খেয়ে গিয়েছিল প্রেসার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময়ে। হাত ব্যথা হয়ে গিয়েছিল ঝোপঝাড় কাটতে কাটতে। কিন্তু প্রেসার ডানদিকে ঝোপঝাড়ের সে উৎপাত নেই। আছে নতুন উৎপাত। বড় বড় পাহাড় যেন অনেক উঁচু থেকে আছড়ে পড়েছে সেখানে ভেঙে-চুরে ছত্রাকার হয়ে পড়েছে। বড় বড় প্রস্তর খণ্ডর পাশেই চোরা গর্ত। নয়ত অন্ধকার খাদ। ভয়াবহ সেই অঞ্চলে মৃত্যু পদে পদে। একটু অন্যমনস্ক হলেই হয় পা ভাঙবে, নয় মাথা।

বাস্তবিকই, প্রকৃতি স্বয়ং কার্পেথিয়ান কাসল-য়ের প্রহরী। এত দুর্গম, সুরক্ষিত দুর্গ বড় একটা দেখা যায় না।

কাউন্ট এগোচ্ছেন কেল্লার উত্তরদিক দিয়ে। এদিকে টানাপুল বা তোরণ নেই। তাতে কিচ্ছু এসে যায় না। ভেতরে ঢোকার দুর্মতিও নেই কাউন্টের। সে দুর্মতি হয়েছিল নিক ডেকের। তাই সে গিয়েছিল পূবদিক দিয়ে।

সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার সময়ে ওরগাল প্লেটোর শেষ সীমায় পৌঁছোলেন কাউন্ট। সামনে ধূসর পর্বতের মত বিশাল প্রস্তর স্তূপ। যেন প্রস্তর যুগের অসুর মানুষদের দানবিক কীর্তি। বর্বর আকৃতি, পাশবিক গঠন, বুভুক্ষু ছায়ায় ঘেরা! মহাকালের রঙে কালো পর্বতের মতই ধূসর-কালো কেল্লার বর্ণ। বাঁদিকের সুউচ্চ পাঁচিল হঠাৎ মোড় নিয়ে চোখেব আড়ালে চলে গিয়েছে। মোড়ের মাথায় বুরুজ। বুরুজের ছাদ আর কাণিশের ওপর কিংবদন্তীর সেই বীচ-বৃক্ষ। তিনটে মাত্র শাখার মধ্যে দিয়ে হু-হুংকার শব্দে বয়ে চলেছে দক্ষিণ পশ্চিমের দামাল হাওয়া!

যা রটে, তার কিছু বটে! সত্যিই তো! বীচ-গাছে বাকি রয়েছে মাত্র তিনটে ডাল! অর্থাৎ আর মাত্র তিন বছর পরমায়ু অলুক্ষুণে এই কেল্লা প্রাসাদের! সত্যিই করাল ছাড়া পড়েছে বীচের শাখায়!

নিঃশব্দে দুজনে চেয়ে রইলেন কুটিল-আকৃতি বিশাল গড়ের দিকে। সেকেলে ম্যাগিয়ার কেল্লায় নাকি অনেক আশ্চর্য রন্ধ্রপথ থাকে। অনেক শব্দময় সুড়ঙ্গ আর মৃত্যুপুরীর গোলোকধাঁধায় সমাকীর্ণ সেখানকার পাতাল

অঞ্চল। কে জানে বিকট চেহারার এই এই কেল্লার তলদেশেও অনুরূপ পাতালের পাকচক্র আছে কিনা। কে জানে, অসংখ্য খিলেনের তলা দিয়ে এক ধ্বনি শতেক প্রতিধ্বনি হয়ে সহস্র সুরের ইন্দ্রজাল রচনা করে কিনা। সুড়ঙ্গে সুড়ঙ্গে গোলকধাঁধার ভয়াবহতা-এর জঠরেই নির্মিত হয়েছে কিনা। বিচিত্র কিছু নয়। নইলে ব্যারন রুডলকের মত খামখেয়ালী উদ্ভট চরিত্রের মানুষ এখানে বাসা নেবেন কেন? জনহীন এই নরক-পুরীই তো তাঁর বাসস্থানের উপযুক্ত স্থান!

নির্নিমেষ চোখে চেয়ে রইলেন কাউন্ট। সুবিশাল প্রাকারের শীর্ষে আজ উড়ছে না কোনো কেতন, বাজছে না তুরীভেরী কাড়ানাকড়া। অথচ একদিন উৎসবের বাদ্যিতে মুখর থাকত সুবিশাল উপত্যকা, অস্ত্রের ঝনৎকারে ছলকে উঠত বুকের রক্ত। আজ সব স্তব্ধ। তিল মাত্র শব্দও নেই কোথাও। পাখি পর্যন্ত উড়ছে না মাথার ওপর। জানলা বন্ধ, প্রাকার শীর্ষ শূন্য। থ্যাবড়া ডোনজোন জনহীন!

এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি রোজকো। ফেরানোর চেষ্টাও করেনি মালিককে। কিন্তু ঠিক সাড়ে সাতটার সময়ে কাঁধের ওপর দিয়ে সূর্য অস্তাচলে যেতেই কোত্থেকে তাল তাল ছায়া টুপটাপ লাফিয়ে পড়তে লাগল উপত্যকায়, পাহাড়ে, জঙ্গলে।

আর স্থির থাকতে পারল না রোজকো। বলল—"মালিক, আটটা বাজতে চলল।"

যেন শুনতে পেলেন না ফ্রাঞ্জ।

ফের বলল রোজকো—"চলুন ফিরি। নইলে লিভাডজেল পৌঁছে দেখব সব সরাইখানায় ঝাঁপ তুলে দিয়েছে।"

"রোজকো·· আর একটা মিনিট··· ।"

"ফিরতে কম করেও এক ঘণ্টা লাগবে! অন্ধকারে পথ চিনতে পারব না।"

"আর কটা মিনিট রোজকো···"

অনড় দেহে দাঁড়িয়ে রইলেন কাউন্ট। পৌঁছে অবধি এইভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। যেন পাথর হয়ে গিয়েছেন। নাকি ডাক্তার পাটাকের মত কেউ পা টেনে ধরেছে? ফাঁক ফোকরে বুট আটকে যায়নি তো? মোটেই না। পা নাড়াতে পারছেন, কিন্তু নাড়াচ্ছেন না! চাপা উত্তেজনায় ছটফট করছেন, মুখে কিছু বলছেন না। যাই-যাই করেও যেতে পারছেন না। কেন যেতে পারছেন না? কে তাকে টেনে রেখেছে? জানেন না কাউন্ট। মনের অনেক রহস্যই মনেই মালিক জানতে পারে না। এ-রহস্যও সেই রহস্য

যেন। মন থেকে তিনি যাওয়ার নির্দেশ পাচ্ছেন না। কেন? কেল্লায় প্রবেশের গোপন বাসনা কি উঁকি দিয়েছে মনের কোনে? বাধা দেওয়ার কেউ নেই। গেলেই বা ক্ষতি কি?

সত্যিই কি যাবেন কাউণ্ট সামনে···আরো সামনে···?

কাউণ্টের মনের ভাব আঁচ করেই যেন শেষবারের মত বলল রোজকো—"মালিক, আসছেন কিনা বলুন!"

"হ্যাঁ, যাই·· যাই।"

কিন্তু নড়লেন না। নিস্পন্দ রইল সারা দেহ।

ওরগাল প্লেটো ততক্ষণে আঁধারে ঢাকা পড়েছে! পাহাড় বনের মাথা টপকে টপকে লম্বা ছায়া কালো দৈত্যর মত পা ফেলে এগিয়ে আসছে কাসলগড়ের দিকে। গড়ের আদল দেখা যাচ্ছে কেবল···অস্পষ্ট একটা অন্ধকারের পিণ্ড···বাতায়নে বাতি না জ্বললে এবার তাও দেখা যাবে না।

"মালিক, আসুন·· আর দেরি করবেন না।"

পেছন ফিরতে যাচ্ছেন ফ্রাঞ্জ, এমন সময়ে বুরুজের ছাদে কিংবদন্তী-খ্যাত বীচ বৃক্ষের তলায় আবির্ভূত হল একটা ছায়া মূর্তি···

থমকে গেলেন ফ্রাঞ্জ· ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন·· ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠছে ছায়া মূর্তি···স্পষ্টতর হচ্ছে বহিরেখা · নারীমূর্তি···বুরুজে দাঁড়িয়ে শ্বেতবসনা এক সুন্দরী···আলুলায়িত কুন্তল ছড়ানো পিঠের ওপর·· স্থির দুই হাত বাড়ানো সামনে···সারাদেহ আবৃত ধবধবে সাদা আলখাল্লায়···

নারকীয় আলোয় জ্বলজ্বল করছে অনিন্দ্য সুন্দরী নারীমূর্তি!

কিন্তু 'ওরল্যাণ্ডো' গীতিনাট্যের প্রতিটি দৃশ্য এখনো ভাসছে ফ্রাঞ্জের চোখের সামনে। মর্মস্পর্শী সেই শেষ দৃশ্যে লা স্টিলার পরনে এই পোশাকই তো ছিল।

নারীমূর্তি লা স্টিলার! নিস্পন্দ দেহে দাঁড়িয়ে আছেন গানের রাণী লা স্টিলা! দুই হাত বাড়িয়ে ধরেছেন কাউণ্টের পানে·· অন্তর্ভেদী চাহনি মেলে নিষ্পলকে তাঁকে দেখছেন···দেখছেন···!

"লা-স্টিলা! লা-স্টিলা!" বুকভাঙা হাহাকার বেরিয়ে এল ফ্রাঞ্জের ভাঙা গলা দিয়ে।

ছুটে গেলেন সামনে—খপ করে ধরে ফেলল রোজকো। নইলে সর্বনাশ ঘটত। সামনেই খাদ।

সহসা ফিকে হয়ে এল প্রেতচ্ছায়া। এক মিনিটও গেল না—অন্ধকার গ্রাস করল উজ্জ্বল নারী মূর্তিকে।

তাতে কী? এক মিনিটেরও দরকার ছিল না—এক সেকেণ্ডেই যথেষ্ট। ও মূর্তি কি ভোলবার?

আবার পাহাড়-উপত্যকা রনরনিয়ে উঠল কাউণ্ট ডি টোলকের আর্ত হাহাকারে:

"বেঁচে আছে বেঁচে আছে লা স্টিলা বেঁচে আছে!"

১২॥ আলো দেখায় পেত্নীরানী ফটক খোলে সে— ঝুম ঝুমাঝুম ছুটছে ফ্রাঞ্জ মরণ এসেছে!

এও কি সম্ভব? লা স্টিলা বেঁচে আছেন? যাঁকে মৃত বলেই জেনে এসেছেন কাউণ্ট, তিনি মরেন নি? সশরীরে ঐ তো তিনি দেখা দিয়ে সরে গেলেন গম্বুজের ছাদ থেকে! না, না, চোখের ভুল নয়·· মায়া মরীচিকা নয়··· একসঙ্গে দুজনেরই দৃষ্টি বিভ্রম ঘটতে পাবে না বোজকোও দেখেছে তাঁকে!

সান্ কার্লো থিয়েটারে পাঁচ বছর আগে এই বেশেই তিনি অনবদ্য অভিনয় করে গিয়েছিলেন অ্যান্জেলিকার ভূমিকায়।

লা স্টিলা! আজও জীবিত!

জটিল রহস্যজাল চক্ষের নিমেষে সরল হয়ে এল কাউণ্টের মনের চোখে। উনি যেন স্পষ্ট দেখতে পেলেন কি-কি ঘটেছিল সে রাতে। লা স্টিলা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। মরেন নি। মরণাপন্ন অবস্থায় ফ্রাঞ্জকে যখন হোটেলে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল, হট্টগোলের মাঝে ব্যারন রুডলফ্ সরিয়ে ফেললেন জ্ঞানহীনা স্টিলাকে। শহরবাসীদের সামনে সমাধিস্থ হল শূন্য কফিন।

লা স্টিলা মরেন নি। ব্যারন তাঁকে গোপনে পাচার করেছেন বিজন কেল্লায়। দীর্ঘ পাঁচ বছর আটক রেখেছেন কেল্লার চৌহদ্দির মধ্যে! জীবন্ত লা স্টিলাকে তাই তো দেখা গেল বুরুজের ছাদে!

অবিশ্বাস্য? অসম্ভব? অবাস্তব? হোক! কিন্তু লা স্টিলা অবিশ্বাস্য অসম্ভব অবাস্তব নয়। হলে সশরীরে আবির্ভূত হতে পারতেন না পাহাড় ঘেরা এই দুর্গম অঞ্চলে!

লা স্টিলা! লা স্টিলা! লা স্টিলা!

বিহ্বল চোখে রোজকোর পানে তাকালেন ফ্রাঞ্জ। বললেন অভিভূত কণ্ঠে:

"রোজকো…রোজকো·· আমার মাথার মধ্যে কি রকম করছে…আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি ?"

"মালিক !…মালিক !",

"রোজকো…শোনো·· আমার কথা শোনো · লা স্টিলা আমার ভাবী বউ…সে ডাকছে…আমি যাই · ।"

"মালিক ! · মালিক !"

"না—না—না ! আজ রাতেই আমি যাব…তাকে মুক্তি দেব কারাগার থেকে…"

"না । কাল সকালে !"

"অসম্ভব । আজ রাতেই হেস্তনেস্ত হয়ে যাক । লা স্টিলা আমাকে দেখেছে · আমিও ওকে দেখেছি ।· রোজকো, ও যে পথ চেয়ে রয়েছে আমার ·· "

"বেশ । আমিও সঙ্গে যাব···"

"না—না—না ! আমি একা যাব ··"

"একা ?"

"হ্যাঁ·· ।"

"কিন্তু নিক ডেক কাসলে ঢুকতে পারেনি । আপনি ঢুকবেন কি করে ?"

"আমি ঢুকবই ।"

"গেট বন্ধ·· "

"থাকুক·· গেট দিয়ে আমি ঢুকব না ··পুরোনো কেল্লা…নিশ্চয় দেওয়াল ভেঙেছে কোথাও·· আমি সেই ফাঁক দিয়ে ঢুকব ।"

"মালিক, আমি আপনার সঙ্গে যাব কেন না করছেন ?"

"না । তুমি যাও । আমাকে খুশি করাই যদি তোমার লক্ষ্য হয় তো তুমি যাও । আমি একলাই যাব ।"

"তবে কি আপনি ফিরে না আসা পর্যন্ত এখানে বসে থাকব ?"

"না ।"

"কোথায় যাব তাহলে ?"

"বার্স্টগ্রামে·· না, না, বার্স্টগ্রামে যেও না এত কথা ওদের বলার দরকার নেই…ভলক্যানে যাও সকালে উঠেই·· না, না ··সকালে উঠে ঘণ্টা কয়েক অপেক্ষা করবে· যদি না ফিরি ? সোজা কার্লসবার্গে যাবে·· পুলিশকে বলবে যা-যা ঘটেছে…লোকজন নিয়ে ফিরে আসবে…গোলাবারুদ আনবে·· দরকার হলে কেল্লা উড়িয়ে দিতে হবে…লা স্টিলার বন্দিনী দশা ঘোচাতেই হবে… রুডলফ্ ডি গর্তস-য়ের নাগপাশ থেকে তাকে মুক্ত করতেই হবে…!"

নিদারুণ উত্তেজনায় কথা জড়িয়ে গেল ফ্রাঞ্জের—সীমাহীন আবেগে কোনো কথাটাই পুরোপুরি শেষ করতে পারলেন না শংকিত হল রোজকো·· কাউন্ট ফ্রাঞ্জ ডি টেলেক যেন নিজের মধ্যে আর নেই অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছেন।

রোজকো দাঁড়িয়ে আছে দেখে এবার গর্জন করে উঠলেন ফ্রাঞ্জ :

"যাও বলছি!"

"সত্যিই যেতে বলছেন ?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ।"

রোজকো আর দ্বিরুক্তি করল না। স্বভাবে সে মিলিটারী। হুকুম তামিল করাই কাজ। তাছাড়া দাঁড়িয়ে থেকেও আর লাভ ছিল না। ফ্রাঞ্জ কেল্লার দিকে একাই পা বাড়িয়েছেন।

স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল রোজকো। চোখের সামনে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন কাউন্ট। উদ্বেগে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ হাল্কা হয়ে এল রোজকোর মন।

নিক ডেক দিনের আলোয় যে-কেল্লায় ঢুকতে পারেনি, ঘুটঘুটে অন্ধকারে দুর্ভেদ্য সেই গড়ে প্রবেশ অসম্ভব। নাজেহাল হয়ে কাউন্টকেও ফিরতে হবে। দিনের আলোতেও চেষ্টা করতে পারেন। পথ পাবেন না। ফিরে যাবেন ভলক্যানে। প্রভু-ভৃত্য দুজনে একই সঙ্গে যাবে কার্লসবার্গে—পুলিশ নিয়ে ফিরবে—এবং ব্যারন রুডলফের শয়তানি ঘুচিয়ে ছাড়বে। ভূতপ্রেতের খেলা কদ্দুর গড়ায় দেখা যাবে।

নিশ্চিন্ত মনে ফেরার পথ ধরল রোজকো। ভলক্যান রোডে পৌঁছোতে পারলে আর চিন্তা নেই।

ফ্রাঞ্জ কিন্তু চলেছেন নিঃসীম অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে। পরিখার কিনারায় পৌঁছে চললেন বাঁদিকে বুরুজের দিকে

মাথার মধ্যে এলোমেলো চিন্তা লা স্টিলা বেঁচে আছেন· ব্যারন তাকে আটকে রেখেছেন কিন্তু তাঁকে পাথরের পিঞ্জর থেকে বের করা যায় কি করে ? নিক ডেক পারেনি ভেতরে ঢুকতে···ফ্রাঞ্জ কি পারবেন ?

দিনের আলোয় অসুবিধে ছিল না। কিন্তু অমানিশার অন্ধকারে এক হাত দূরেও কিছু দেখা যাচ্ছে না পায়ের তলায় খানাখন্দগুলো পর্যন্ত আঁচ করা যাচ্ছে না কি কষ্টে যে পথ চলতে হচ্ছে, তা ঈশ্বরই জানেন।

চাঁদ এখনো ওঠেনি। পথ অত্যন্ত বিপজ্জনক। কখন কোন মুহূর্তে পা ভাঙবে কি মাথা ভাঙবে, তার ঠিক নেই।

অনেকক্ষণ পা ঘসটে ঘসটে চলার পর, আঙুলের ডগা বুলিয়ে বুলিয়ে পাথর টপকে আসার পর পাওয়া গেল বুরুজটা। পরিখা এখানে হঠাৎ মোড় নিয়েছে। দক্ষিণে পাঁচিল। এই পাঁচিলেই রয়েছে টানাপুল!

পাহাড় জঙ্গলে মানুষ বলেই এত কষ্ট সইতে পারছেন ক্রাগ। অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারছেন। কুকুরের মত যেন গন্ধ শুঁকে শুঁকে এগিয়ে চলেছেন। পাড় থেকে সরে গেলেই পথ হারাবেন। নিঃসীম অন্ধকারে কোন্ গহ্বরে ঠিকরে পড়বেন—কেউ জানতেও পারবে না।

গম্বুজ পেরিয়ে আসার পর বিঘ্ন যেন বৃদ্ধি পেল। বড় বড় পাথর, চোখা চোখা টিলা। তেমনি কাঁকড় আর আলগা নুড়ি। পাড় ধরে এগোনো আর সম্ভব নয়। বাধ্য হয়ে সরে আসতে হল ক্রাগকে।…শুধু পাথর নয়, পাথরের জঙ্গল বললেই চলে বন্ধুর এই পথকে…বিপজ্জনক…ভয়ংকর । তার ওপর মিশমিশে অন্ধকার—ডোনজোনের জানলা থেকেও যদি আলোর কণা দেখা যেত…

চার হাত পায়ে জন্তুর মত হামাগুড়ি দিয়ে তেলতেলে মসৃণ মস্ত একটা চাঙড় পেরিয়ে এলেন ক্রাগ…পরক্ষণেই হাতের তেলোয় ফুটে গেল ছুরীর মত ধারালো পাথরের খোঁচা… রক্ত ঝরছে…ঝরুক!… কাঁটা ঝোপ আর তীক্ষ্ণ পাথরের ওপর দিয়ে হাত-পা কেটেকুটেও সমানে এগিয়ে চললেন কাউন্ট… জামাকাপড় ফালাফালা হয়ে গেল কাঁটায় আটকে গিয়ে…ভ্রূক্ষেপ নেই ক্রাগের… পাথরের খাঁজে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিল একজোড়া চিল… ক্রাগের হাত গিয়ে পড়ল তাদের বাসায়…কঠিন চঞ্চুর ঠোকরে গাল থেকে রক্ত ঝরিয়ে ডানার ঝাপটায় চুল উড়িয়ে আকাশে উড়ল জোড়া চিল…রাত্রি বিদীর্ণ হল বিকট বীভৎস চীৎকারে… !

আহারে! এই সময়ে যদি বুড়ো গির্জের ঘণ্টা বেজে উঠত ঢং ঢং করে! নিক ডেক আর পাটাক সেই শব্দ শুনেছিল…ভয়ে অবশ হয়েছিল… রাত্রি নিশীথে সেই ঘণ্টাধ্বনি যদি ফের শোনা যেত, পথ চিনতে পারতেন ক্রাগ… ঘণ্টার আওয়াজ শুনে অন্ধকারেও পথ ঠাহর করতে পারতেন…অথবা জ্বলত যদি ভুতুড়ে প্রদীপ ডোনজোনের কোনো জানলায়? অথবা ডোনজোনের চূড়োয়? তীব্র আলোকশিখায় আকাশ উদ্ভাসিত হলে এ-ভাবে অন্ধকারে ঘুরে মরতে হত না ক্রাগকে…

পুরো একটি ঘণ্টা অন্ধকারে দিশেহারা হয়ে ঘুরলেন ক্রাগ…কাপড়জামা ছিঁড়ে গেল… সারা গা রক্তে মাখামাখি হয়ে গেল…মাত্র কয়েক গজ দূর পর্যন্ত অতি কষ্টে দেখা গেল—তার বেশি নয়।

বেশ বুঝলেন ফ্রাঞ্জ রাস্তা হারিয়েছেন তিনি। পরিখা কোন দিকে বুঝতে পারছেন না। টানাপুল কি পেরিয়ে এসেছেন?

খামোকা কষ্ট করে লাভ কি? দাঁড়িয়ে পড়লেন ফ্রাঞ্জ…নিষ্ফল আক্রোশে পদাঘাত করলেন পাথরে সারারাত এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে ভাবতেই মাথার মধ্যে যেন আগুন জলে গেল…আলো ফুটলে কেল্লা দেখা যাবে ঠিকই, তাঁকেও দেখা যাবে কেল্লা থেকে·· চুপিসারে হানা দেওয়ার আশা ত্বরাশা হয়ে দাঁড়াবে আচমকা চড়াও হওয়ার অনেক সুবিধে…দিনের আলোয় তাঁকে দেখেই হুঁশিয়ার হয়ে যাবেন ব্যারন…

যা থাকে কপালে, রাত ফুরোনোর আগেই কেল্লায় ঢুকতে হবে। কিন্তু পথ কোথায়? আলো কোথায়? নিঃসীম অন্ধকারে কোন্ দিকে চলেছেন ফ্রাঞ্জ? কাস্‌ল্‌গড় সামনে না পেছনে? ডাইনে বা বাঁয়ে?

পথ হারিয়েছেন কাউন্ট।

আকুল আর্ত হাহাকার তাই জমাট দীর্ঘশ্বাসের মতই বেরিয়ে এল গলা চিড়ে, "স্টিলা! স্টিলা! স্টিলা!"

কিসের আশায় চেঁচাচ্ছেন ফ্রাঞ্জ? কেন ডাকছেন বন্দিনী নটিনীকে? লা স্টিলার কানে পৌছোবে কি তাঁর বুকভাঙা বিলাপ?

না পৌছোক·ফ্রাঞ্জের হৃদয় কিন্তু বারংবার মোচড় দিয়ে উঠল মুহুর্মুহু আহ্বানের মধ্যে·· ডেকেই চলেছেন কাউন্ট একবার·· ত্বার…বারবার·· ! প্লেসার অরণ্য ছাপিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনির ঢেউ তুলল সেই কাতর কান্না!

স্টিলা! · স্টিলা!·· স্টিলা!

আচম্বিতে একটা উজ্জ্বল রশ্মি উঁকি দিল অন্ধকারের যবনিকায়। ত্বই চক্ষু বিস্ফারিত হল ফ্রাঞ্জের। সত্যিই একটা ঝকমকে আলোক-কণা দেখা যাচ্ছে… অনেক ওপরে…কিন্তু মিথ্যে নয়…মায়া নয়,…মরীচিকা নয়·· অন্ধকার ফুঁড়ে আলোর বিন্দুটা যেন তাঁকেই হাতছানি দিচ্ছে।

"কাস্‌ল্·· ঐ তো কাস্‌ল্!" নিশ্চয় ডোনজোনের ওপরে জলছে আলোটা।

অতি উত্তেজনায় কাউন্ট ফ্রাঞ্জের মনের অবস্থা তখন খুবই কাহিল লা স্টিলা তাঁর ডাক শুনেছেন…ডাকে সাড়া দিয়েছেন…আলো নিয়ে নিজেই ছুটে এসেছেন তাঁকে পথ দেখাতে! বুরুজের ছাদে উঠে তাঁকে দেখেই চিনেছিলেন স্টিলা…হাতছানি দিয়ে ডেকেছিলেন…এখন তাঁর ডাক শুনে দৌড়ে এসেছেন…প্রবেশ পথ দেখাচ্ছেন!

আলো লক্ষ্য করে ছুটলেন ফ্রাঞ্জ। অনেকটা বাঁ দিকে চলে গিয়েছিলেন শ্লেটোর মধ্যে। ডান দিকে গিয়ে পৌছোলেন পরিখার ধারে।

আলোটা আরো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে·· আরো উজ্জ্বল···আরো প্রখর· ডোনজোনের জানলায় দুলছে অত্যুগ্র আলো·· নিশানা জানাচ্ছেন স্টিলা।

উদ্‌ভ্রান্তের মত ফটকের পানে দৌড়োলেন ফ্রাঞ্জ। কিন্তু কেন দৌড়োচ্ছেন? লাভ কি? পঞ্চাশ ফুট উঁচু পাঁচিল পেরোনো তো সম্ভব নয়। ফটক বন্ধ···টানাপুল টেনে তোলা ওপরে···সামনে দুর্লঙ্ঘ্য পাঁচিল···তারপর?

তারপরের কথা তারপরে! পরিখার পাড় বেয়ে ছুটলেন ফ্রাঞ্জ·· গিয়ে কি দেখবেন জেনেও ছুটলেন···দেখবেন টানাপুল ওপরে তোলা···

কিন্তু একি! পুল যে নামানো রয়েছে! সেতু পাতা হয়ে গেছে পরিখার ওপর!

ভাববার অবসর নেই! নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে ছুটতে ছুটতে পুল পেরিয়ে গেলেন ফ্রাঞ্জ। হাত দিলেন বন্ধ ফটকে···

কড়-ড়-ড় ঝন-ঝন শব্দে দুহাট হয়ে গেল বিশাল তোরণ!

ছুটে ভেতরে ঢুকে গেলেন ফ্রাঞ্জ। অন্ধকারের মধ্যে পাগলের মত দশ বারো পা যেতে না যেতেই···

প্রচণ্ড শব্দে ছিটকে উঠে এল টানাপুল—দড়াম করে আছড়ে পড়ল ফটকের ওপর।

কার্পেথিয়ান কাস্‌ল্‌-য়ে কয়েদ হলেন কাউণ্ট ফ্রাঞ্জ ডি টেলেক।

১৩॥ পাতাল ঘরে আঁধার বড়
বৃথাই ফেলা দীর্ঘশ্বাস
ডাইনী মায়ায় ভুললে জেনো
হবেই হবে সর্বনাশ!

দূর থেকে কার্পেথিয়ান কাস্‌ল্‌-কে দেখে মনে হয় যেন একটা ভগ্নস্তূপ। অতীতের কংকাল। প্রাগৈতিহাসিক দানবের দেহাবশেষ।

ভয়ার্ত পথচারী এবং গ্রামবাসীরা তার বেশি কিছু দেখতে চায় না, জানতেও চায় না। কেল্লা ভেঙে পড়ছে, বুরুজ ধ্বসে যাচ্ছে, পাথর খসে পড়ছে। পড়ুক। তা নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই। পরিত্যক্ত প্রাসাদদুর্গ ভাঙাচোরা-ই হয়। দূর থেকেই তাই সেলাম ঠুকেছে অতিবড় দুঁদে গ্রামবাসীও।

কিন্তু সত্যিই কি তাই? সত্যিই কি অজেয় প্রাকারবেষ্টিত বিকটদর্শন কার্পেথিয়ান কাস্‌ল্‌ ধূলিসাৎ হতে বসেছে মহাকালের অমোঘ বিধানে?

মোটেই না। সামন্ত যুগের কেল্লা এত সহজে ভাঙে না। ভেতরে সবকিছুই প্রায় অটুট। বড় বড় বাড়ির মধ্যে এত জায়গা আছে যে এখনো একটা সৈন্য-ঠাঁই নিতে পারে।

অতিকায় হলঘর, প্রকাণ্ড খিলান, সুগভীর ভূগর্ভ কক্ষ, অসংখ্য গলিপথ, সারি সারি সভাকক্ষ—লতাপাতায় যদিও ঢেকে গেছে শ্যাওলা ধরা বড় বড় পাথরগুলো। পাতালপুরীর মধ্যে বহু বিস্তীর্ণ গোলকধাঁধা—সূর্যরশ্মি কস্মিনকালেও পথ খুঁজে পায় না সেখানে। ভীষণ পুরু দেওয়ালের মধ্যে লুকোনো গোপন সিঁড়ি। কামান বসানোর দুর্ভেদ্য কক্ষ—সঙ্কীর্ণ ঘুলঘুলি দিয়ে ম্রিয়মাণ আলো কুণ্ঠিতভাবে প্রবেশ করে সেখানে। তিনতলা ডোনজোনে সারিবদ্ধ অগুন্তি ঘর, বহু ঘর এখনো বাসোপযোগী। বিশাল ছাদ। বিস্তর অট্টালিকা। খেয়ালখুশি ছকে বানানো গলিপথের গোলকধাঁধা—কখনো তা ঠেলে উঠেছে বুরুজের শীর্ষে—কখনো ধাঁ করে নেমে গেছে পাতালের পাকচক্রে। মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা। বর্ষার জল তাতে জমা হয়—বাড়তি জল উপচে গিয়ে মেশে নিয়াড নদীতে। এছাড়াও আছে অসংখ্য সুড়ঙ্গ। ভাঙাচোরা কাণাগলি নয়। পাতালের রন্ধ্র পথ এঁকে বেঁকে ভলক্যান রোডে গিয়ে মিশেছে। জ্যামিতির জটিল ছকে নির্মিত এ-হেন বিচিত্র কাস্‌ল্‌গড়ের আশ্চর্য নক্সা ক্রীট, লেমনোস অথবা প্রোসিনা গোলকধাঁধার চাইতে কম জটিল নয়।

ফ্রাঞ্জের একমাত্র অভিলাষ ছিল ভেতরে ঢোকার। সে অভিলাষ পূর্ণ হয়েছে। এতক্ষণ যে পথ বন্ধ ছিল, সহসা সে পথ প্রশস্ত হল কেন তার জন্যে, তা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় তাঁর নেই· মনের অবস্থাও নেই। বন্ধ গেট আপনা থেকেই খুলে গেল এবং অন্তঃপুরে পা দিতে না দিতেই টানাপুল সশব্দে উঠে এসে ফেরার পথ বন্ধ করে দিল ঠিকই—কিন্তু তা নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই কাউন্টের। লা স্টিলা যেখানে বন্দিনী, ব্যারন রুডলফ যেখানে গুপ্ত, মহাভয়ংকর সেই কার্পেথিয়ান কাস্‌ল্‌-য়ে তিনি প্রবেশ করতে চেয়েছিলেন যেন তেন প্রকারেন! সে বাসনা পূর্ণ হয়েছে। আর কি চাই?

সামনে পা বাড়ালেন ফ্রাঞ্জ। তমালকালো অন্ধকারে শুধু বুঝলেন প্রকাণ্ড গ্যালারির মধ্যে এসে পড়েছেন তিনি। পদশব্দ বহু উঁচু ছাদে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছে। পায়ের তলার মেঝে মসৃণ নয় মোটেই—এবড়োখেবড়ো ভাঙাচোরা। পা টিপে টিপে এগোলেন ফ্রাঞ্জ। মাঠের মত বড় হলঘরে দিশেহারা হয়ে না ঘুরে সরে গেলেন বাঁ দিকে। অন্ধের মত এগিয়ে চললেন দেওয়াল

ধরে। খড়খড়ে দেওয়ালে আঙুল ছড়ে গেল। জ্বালা করতে লাগল। মুখে হাওয়ার ঝাপটা লাগল বহু দূর থেকে। কোথাও কোনো শব্দ নেই – নিজের জুতোর শব্দ ছাড়া। পদশব্দ দেওয়ালে দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে ভুতুড়ে শব্দ হয়ে ফিরে আসছে।

হাতে একটা থাম ঠেকল। পোস্তার মত দেয়ালকে ধরে রেখেছে মস্ত একটা থাম। দেয়াল আচমকা মোড় নিয়েছে বাঁ দিকে। পথ আর চওড়া নয়—বিলক্ষণ সঙ্কীর্ণ। দুহাত দুপাশে ছড়ালেই দেয়ালে লাগছে।

দেওয়াল ধরে ঈষৎ ঝুঁকে অতি সাবধানে পা ফেলতে লাগলেন ফ্রাঙ্ক। খেয়াল রাখলেন, গলিপথ বেঁকে যাচ্ছে কিনা।

শ'দুই গজ সোজা যাওয়ার পর ফের বাঁ দিকে মোড় নিল রাস্তা। ব্যাপার কি? ফটকের দিয়েই যাচ্ছেন নাকি? ডোনজোনের তলদেশে শেষ হয়েছে কি গলিপথের গোলকধাঁধা?

তাড়াতাড়ি চলতে চাইলেন—কিন্তু পারলেন না। মেঝেতে বিস্তর খোঁচা। কতবার যে হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়লেন, তার ইয়ত্তা নেই। দেওয়াল একটানা নয়—মাঝে মাঝে ফাঁক। নতুন গলি বেরিয়েছে সেখান দিয়ে। শাখা উপশাখায় ছড়িয়ে গিয়েছে দিকে দিকে। কতবার যে কাণাগলির মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসতে হল তাঁকে, সে হিসেবও হারিয়ে ফেললেন।

অন্ধকার · অন্ধকার···দেওয়াল ধরে চললেও বিপদ আসতে পারে পায়ের তলা থেকে। কে জানে ফাঁদ পাতা আছে কিনা আলগা পাথরের ফাঁকে। তাই পা ফেলার আগে প্রতিবারে পা বাড়িয়ে পরখ করে নিলেন পাথর মজবুত কিনা, বুট ঠুকে শুনলেন মেঝে ফাঁপা কিনা।

পথ কিন্তু ঢালু নয়, খাড়াই-ও নয়। অর্থাৎ তিনি পাতালেও নামেননি, ছাদেও ওঠেন নি। কিন্তু শেষ কোথায় এ-পথের?

এককালে নিশ্চয় সোজা পথ ছিল প্রধান তোরণের সামনেই। ব্যারনরা নিশ্চয় এত গলিঘুঁজির মধ্যে দিয়ে অন্দরমহলে যেতেন না। নিশ্চয় গেটের উল্টো দিকেই আর একটা দরজা ছিল। কিন্তু সে দরজা এখন বন্ধ। পাথর গেঁথে নিশ্চিহ্ন। অত হাত বুলিয়েও ফ্রাঙ্ক সে পথের অস্তিত্ব ধরতে পারলেন না।

ঝাড়া একটি ঘণ্টা এইভাবে গুটি গুটি পথ চললেন কাউন্ট। চারিদিক নিঝুম নিস্তব্ধ। ঠিক যেন মৃত্যুপুরী। লা স্টিলার নাম ধরে ডাকবারও সাহস নেই। দমেও যায় নি। যতক্ষণ শরীর বইবে, যাবেন।

কিন্তু শরীর আর বইছিল না। এতক্ষণ চলেছেন স্রেফ মনের জোরে।

সকাল থেকে পেটে তেমন কিছু পড়েনি। খিদে তেষ্টায় অবসন্ন সারা শরীর। তারপর সীমাহীন উদ্বেগ আর এই পথকষ্ট। হাপরের মত হাঁপাচ্ছেন ক্রাঞ্জ। বুকের মধ্যে ছুরমুশের মত উঠছে নামছে কলজেটা।

রাত নটা নাগাদ বাঁ ফেলতে গিয়ে পায়ের তলায় জমি পেলেন না ক্রাঞ্জ।

সিঁড়ির ধাপ!

কোথায় নেমেছে এই সিঁড়ি? ভিত পর্যন্ত? বেরোনোর পথ আছে কি?

কি হবে অত ভেবে? বিনা দ্বিধায় সিঁড়িতে পা দিলেন ক্রাঞ্জ। গুণে গুণে নামতে লাগলেন এক-একটা ধাপ।

সাতাত্তরটা ধাপ নামবার পর সিঁড়ি শেষ হল। আবার একটা গলি। গেছে বাঁ দিকে। এগোলেন ক্রাঞ্জ। আবার ঘুরে মরলেন চোখ বাঁধা বলদের মত পাতালের গোলকধাঁধায়।

এক ঘণ্টা ধরে এইভাবে পাকসাট খাওয়ার পর জিভ বেরিয়ে পড়ল ক্রাঞ্জের। আর পারছেন না হাঁটতে।

আচমকা একটা আলো দেখা গেল সামনে।

প্রখর দ্যুতি নয়—চাপা আভা। কয়েকশো ফুট দূরে গলিপথের প্রান্তে কে যেন ফের আলো জ্বালিয়ে সংকেত করছে তাঁকে।

লা স্টিলা নাকি? প্লেটোতে পথ হারানোর পর স্টিলাই আলো জ্বালিয়ে তাঁকে পথ দেখিয়েছিলেন। গোলকধাঁধায় পথভ্রষ্ট হওয়ার পর আবার কি তিনি এসেছেন অন্ধকারে গা ঢেকে?

ঝুঁকে পড়ে কুকুরের মত হাঁপাতে লাগলেন ক্রাঞ্জ। চলবার শক্তি নেই, ভাববার শক্তিও নেই। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন সুদূরের আলোর পানে।

আলোটা ঠায় জ্বলছে। গলিপথের শেষে বৃত্তাকার যেন একটা প্রকোষ্ঠ। আলো জ্বলছে সেই প্রকোষ্ঠে।

টলতে টলতে এগোলেন ক্রাঞ্জ। পা অসাড়, হাত রক্তাক্ত, মুখ ক্ষতবিক্ষত। তবুও হুমড়ি খেতে খেতে এগোলেন।

প্রকোষ্ঠই বটে। ভূগর্ভ কক্ষ। প্রায় বারো ফুট উঁচু—ব্যাস বারো ফুট। বৃত্তাকার ঘর। ভাঙাচোরা নয়—ভালোই। আটটা খর্বকায় থামের ওপর কারুকাজ করা সিলিং। ঠিক মাঝখানে জ্বলছে একটা কাচের ফানুস। হলদেটে আলো ঝরছে ফানুস থেকে।

প্রবেশ পথের ঠিক উল্টো দিকে আর একটা দরজা। বড় বড় গোলাকার লোহার চাকতি লাগানো পাল্লায়; অর্থাৎ চাকতির ওদিকে ঝুলছে তালা। পাল্লা ধরে টান দিলেন ক্রাঞ্জ। কিন্তু মরচে ধরা কব্জা একটুও কাঁপল না।

পাতাল ঘরে আসবাবপত্র অতি সামান্যই। মান্ধাতার আমলের ফার্নিচার। একটা চারপায়া; খাট না বলে তাকে বেঞ্চি বলাই উচিত। ওককাঠের তাকে জড়ো করা বিছানার চাদর। পা-বাঁকা একটা টুল। লোহার বল্টু দিয়ে দেওয়ালের সঙ্গে আটকানো একটা টেবিল। টেবিলের ওপর খানকয়েক বাসন, জলভর্তি একটা বড় জগ। একটা প্লেটে এক স্লাইস ঠাণ্ডা মাংস এবং সামুদ্রিক বিস্কুটের ইয়া মোটা একটা রুটি। এককোণে ঝিরঝির করে জল ঝরে পড়ছে ছোট্ট চৌবাচ্চায়। বাড়তি জল বেরিয়ে যাচ্ছে নর্দমা দিয়ে।

যেন অতিথি আপ্যায়নের জন্যেই এত আয়োজন। পাতাল ঘরে এই বুঝি আবির্ভাব ঘটবে তাঁর। অতিথি না হয়ে কয়েদী হওয়াও বিচিত্র নয়। কাস্‌ল্‌গড়ের অভ্যন্তরে কারারুদ্ধ হয়েছেন কাউন্ট—তাই কয়েদীরূপেই তাঁকে খাতির করা হচ্ছে ঠাণ্ডা রুটি-মাংস-জল দিয়ে।

ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত ক্লান্ত ফ্রাঞ্জের তখন অতশত ভাববার সময় নেই। গবগব করে খাবার ঠাসলেন মুখে, ঢকঢক করে জল ঢাললেন গলায়। চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়লেন বিছানায়। কয়েক মিনিটের ঘুম এখন বিশেষ দরকার।

কিন্তু একি হল ফ্রাঞ্জের! চিন্তাগুলো সব গুলিয়ে যাচ্ছে কেন? এলোমেলো চিন্তাকে জড়ো করতে গিয়েও যেন পারছেন না · ফসকে মুঠোর মধ্যে দিয়ে নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে · !

কি করবেন ফ্রাঞ্জ? জিরোবেন? না, আজ রাতেই কার্পেথিয়ান কাস্‌ল্‌-এর রহস্য স্বচক্ষে দেখবেন? দিনের আলোর জন্যে সবুর করবেন? এক ঘুম ঘুমিয়ে একটু চাঙা হয়ে নেবেন?

"না · না···এক সেকেণ্ডও আর দেরি নয়· আজ রাতেই পৌঁছোবো ডোনজোনে?"

সহসা নিবে গেল কড়িকাঠের ফানুস। অন্ধকার ঝাঁপ দিয়ে পড়ল নিমেষ মধ্যে। সেকি অন্ধকার! ভাষায় বর্ণনা করা যায় না!

ধড়মড়িয়ে উঠতে গেলেন ফ্রাঞ্জ · পারলেন না···চিন্তাগুলোও যেন বিবশ হয়ে পড়ছে···ধরে রাখতে পারছেনা···আচমকা যেন দেহ আর মন যুগপৎ ঠুঁটো হয়ে পড়েছে · দম দেওয়া ঘড়ির স্প্রিং ভেঙে গেলে ঘড়ির কাঁটা যেমন দাঁড়িয়ে যায়—তাঁর অবস্থাও হয়েছে তাই···অদ্ভুত ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ছেন ফ্রাঞ্জ। এ-ঘুম স্বাভাবিক ঘুম কি? কিসের প্রভাবে তিনি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছেন? চেতনার অবলুপ্তি ঘটছে? আপন সত্তা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছেন? যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছেন ভেতরে ভেতরে···মন আর মন নেই··· দেহ আর দেহ নেই···

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলেন এইভাবে বলতে পারবেন না ফ্রাঞ্জ। চোখ মেলেই দেখলেন মাথার ওপর ফের জলে উঠেছে হলদেটে ফানুস। দৌড়ে গেলেন সামনের দরজায়। সে দরজা এখনো খোলা। পেছনের দরজা কিন্তু এখনো বন্ধ।

ঘরে কেউ ঢুকেছিল। জল আর খাবার রেখে গেছে। এঁটো কাঁটা নিয়ে গেছে।

কে সে? ব্যাবন রুডলফ? তিনি তাহলে টের পেয়েছেন কার্পেথিয়ান কাসলে গোপনে হানা দিয়েছে পুরোনো শত্রু কাউন্ট ডি টেলেক?

সোজা কথায়, তাঁকে নিয়ে কি তাহলে পুতুল নাচ নাচাচ্ছেন ব্যারন? খাঁচায় পোরা ইঁদুরের মত সারারাত ছুটিয়েছেন, তারপর খাবার খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন? ব্যাবনের করুণার ওপব নির্ভর কবছে কাউন্টের জীবন?

অসম্ভব! কাউন্টকে কারাগারে পোরা অত সহজ নয়। এখুনি পালাতে পারেন ফ্রাঞ্জ। দেহে মনে শক্তিও রয়েছে। যে-পথে এসেছেন, সেই পথেই ফিরে যাবেন পাঁচিলের ধারে

কিন্তু টানা পুল তো ফের উঠে এসেছে! স্বচক্ষে দেখেছেন ফ্রাঞ্জ!

তাছাড়া লা স্টিলা-কে না দেখেই ফিরবেন? তাঁকে না নিয়ে একলাই চম্পট দেবেন?

এ-অবস্থায় তাই করতে হবে বই কি! ফ্রাঞ্জ একলা পারবেন কেন ব্যারনের শক্তির সঙ্গে? পুলিশ এনে উদ্ধার করা যাবে'খন লা স্টিলাকে।

পাঁচিলের গোড়ায় একবার পৌঁছোতে পারলে হল·· থাকুক গেট বন্ধ··· যেভাবেই হোক পাঁচিল টপকে খানা পেরিয়ে যাবেন ফ্রাঞ্জ!

খোলা দরজার দিকে পা বাড়ালেন কাউন্ট।

হঠাৎ একটা খস্‌খস্‌ আওয়াজ শোনা গেল। বন্ধ দরজার পেছনে কে যেন এসেছে···মার্জারের মত লঘু চরণে হাঁটছে

ছুটে গেলেন ফ্রাঞ্জ। কান পাতলেন কপাটে। কান খাড়া করে রইলেন নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে ··

পায়ের শব্দ যেন সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে···কারা যেন পা টিপে টিপে উঠছে এক-একটা ধাপ! দরজার পেছনে তাহলে একটা সিঁড়ি আছে। খুব সম্ভব অন্দরের উঠোনে যাওয়া যায় ঐ সিঁড়ি দিয়ে।

ছুরি খুলে দাঁড়ালেন ফ্রাঞ্জ। যেই আসুক না কেন, সহজে রেহাই পাবে না। ব্যারনের চাকর হলে ছুরির ডগা দিয়ে তাকে ঠেলে নিয়ে যাবেন বাইরে। চাবি ছিনিয়ে নিয়ে যাবেন ভোনজোনে।

আর যদি স্বয়ং ব্যারন আসেন? ফ্রাঞ্জ জীবনে তাঁকে একবারই দেখেছেন।' সান কার্লো রঙ্গমঞ্চের বক্সে প্রেতমূর্তির মত বিকট বদন অন্ধকারের মধ্যে থেকে চকিতে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সে মুখ ভোলবার নয়। ফ্রাঞ্জ-ও ভোলেন নি। ফের দেখলেই আপ্যায়ন করবেন ছুরির ফলা দিয়ে—এ ফোঁড ও ফোঁড় করে দেবেন হৃৎপিণ্ড··

কিন্তু পায়ের শব্দ হঠাৎ থেমে গেল দরজার পেছনে। যেন কেউ এসে দাঁড়িয়েছে চাতালে। কেন? কি মতলবে?

আচমকা একটা সুরেলা কণ্ঠ ভেসে এল কানে। যেন বাতাস গান গেয়ে উঠল. ফিসফিস স্বরে সুধাবর্ষণ করল ··আশ্চর্য মিষ্টি স্বরে গান গাইছে একটি মেয়ে...গানের ভুবন যেন মূর্ত হয়ে উঠছে সেই সুরের মধ্যে ..

লা স্টিলা! লা স্টিলা এসে দাঁড়িয়েছেন দরজার পেছনে হৃদয়ের সমস্ত আকুতি উজাড় করে দিয়ে গাইছেন ·

" চলো যাই হাজার ফুলের কাননে"

শিউরে উঠলেন ফ্রাঞ্জ এ শিহরণ আনন্দের শিহরণ· 'কিঙ ম্যাথিয়াস' সরাইখানায় তন্দ্রার আবেশে এই গলা এই গান তিনি শুনেছিলেন যেন স্বপ্নের ঘোরে!

কিন্তু এখন তো স্বপ্ন দেখছেন না। কান্না জড়ানো স্বরে ঐ তো গেয়ে চলেছেন লা স্টিলা:

চলো যাই হাজার ফুলের কাননে।"

গান তো নয়, যেন আহ্বান। লা স্টিলা গানের ভাষায় তাঁকে ডাকছেন··· কাছে যেতে বলছেন · !

কিন্তু যাবেন কি করে? দরজা যে এখনো বন্ধ!

"স্টিলা স্টিলা!" কপাটের ওপর আছড়ে পড়লেন ফ্রাঞ্জ। "স্টিলা··· স্টিলা!"

কিন্তু মাথা কোটাই সার হল। দরজা নড়ল না।

ক্ষীণ হয়ে আসছে গানের গলা মিলিয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে দূর হতে দূরে সরে যাচ্ছে পদশব্দ!

নতজানু হয়ে বসে পড়লেন ফ্রাঞ্জ। নখ দিয়ে খামচে পাল্লা উপড়ে আনার চেষ্টা করলেন লোহার কব্জা বেঁকিয়ে দিতে চাইলেন। বারবার কপাটে মুখ রেখে স্টিলার নাম ধরে ডাকলেন আর্তকণ্ঠে—কিন্তু লা স্টিলা আর দাঁড়ালেন না। বিলাপ-সঙ্গীতও আর শোনা গেল না।

আচমকা একটা ভয়ংকর সন্দেহ উঁকি দিল ফ্রাঞ্জের মনে।

লা স্টিলা পাগলা হয়ে গিয়েছেন! বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গিয়েছেন। বিশালগড়ের অলিন্দে অলিন্দে তাই তিনি কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছেন! দীর্ঘ পাঁচ বছর বন্দিনী থেকেছেন সুকুমারী স্টিলা ভীষণ প্রকৃতি ব্যারনের নিগ্রহ সইতে পারেন নি... বিপর্যয় ঘটেছে স্নায়ুকেন্দ্রে লা স্টিলা অসুস্থ বিকৃত · অস্বাভাবিক · !

ছিটকে দাঁড়িয়ে উঠলেন ফ্রাঞ্জ! কি সর্বনাশ! তাঁর নিজের মাথার মধ্যেও যে বৃশ্চিক দংশনের তীব্র জ্বালা শুরু হয়েছে · তুমুল দাপাদাপি শুরু হয়েছে মগজের কোষেকোষে! ফ্রাঞ্জ কি পাগল হয়ে যাচ্ছেন ?·· তার আগেই বেরোতে হবে কাস্‌লগড়ের কারাগার থেকে। ছুটে বেরোতে যাচ্ছেন ফ্রাঞ্জ। ভীষণ চমকে উঠলেন দরজা বন্ধ দেখে। ·

নিঃশব্দে পেছনের দরজাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে গান শোনার সময়ে। পাতাল কক্ষে বন্দী হলেন কাউন্ট!

১৪ ॥ দরজা ভেঙে ছুটছে ফ্রাঞ্জ
গা-হাত-পায়ে রক্ত ঝরে—
একী! একী! এ-কার বাতি?
জ্বলছে কেন অন্ধকারে?

হৃক চকিয়ে গেলেন ফ্রাঞ্জ!

কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। কি করবেন ভেবে পেলেন না। কেল্লায় প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে রুদ্ধ হয়েছিল প্রধান তোরণ; এখন হল পাতাল তোরণ!

মাথার মধ্যে যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে ফ্রাঞ্জের। সুস্থ চিন্তার শক্তি আর নেই। শুধু একটা চিন্তাই এখনো প্রবল মাথার মধ্যে। লা স্টিলার চিন্তা। স্বকর্ণে শুনেছেন ফ্রাঞ্জ—স্টিলা গান গাইছেন মাত্র একহাত দূরে দরজার ওপারে...

কানের ভুল? অসম্ভব। ভেল্কীবাজি? আরো অসম্ভব! ও গান কি ভোলবার? পাগল করে দেওয়া ও সুর কি মন থেকে মোছবার? স্টিলা এই কাসলেই রয়েছেন। মাথার ঠিক নেই। তাই ফ্রাঞ্জের অত ডাকেও সাড়া দেন নি। কাছে এসেও তাই আবার দূরে গেলেন লা স্টিলা!

কিন্তু পাগলকে সুস্থ করা যায়। ক্রাজোয়া কাসলে নিয়ে গিয়ে ফেলতে পারলে সেবা আর চিকিৎসা দিয়ে ফের আরোগ্য করা যাবে তাঁকে।

কিন্তু তার আগে বেরোনো দরকার এই পাতাল-কারাগার থেকে।

কিভাবে? দরজা তো বন্ধ! ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে গেল ফ্রাঞ্জের। নিষ্ফল আক্রোশে ইচ্ছে হল ঘুসি মেরে দরজা ভেঙে বেরিয়ে যাওয়ার।

অতিকষ্টে নিজেকে সংযত করলেন কাউন্ট। ধীরভাবে শুরু হল চিন্তা। প্রথম সমস্যা—বাইরে বেরোতে হবে। কিভাবে? উপায় আছে কি?

হঠাৎ একটা ঘোর সন্দেহ উঁকি দিল মনের মধ্যে। মনে পড়ল তাঁর অস্বাভাবিক ঘুমের কথা। বেঘোরে ঘুমিয়ে ছিলেন তিনি। এখন দিন কি রাত সে খেয়ালও নেই। রাজ্যের ঘুম চোখে নেমেছিল পেট ঠেসে খাওয়ার পরেই!

তবে কি ঘুমের ওষুধ মেশানো আছে খাবার জলে?

নিশ্চয় তাই। ঠিক আছে, জল আর খাবেন না ফ্রাঞ্জ। খাবারও ছোঁবেন না। নিরম্বু উপবাস দিলেই ঘুম উড়ে যাবে চোখের পাতা থেকে। যথা-সময়ে চুপিসারে লোক ঢুকবে কারাগারে জল আর খাবার নিয়ে! পিটুনি কাকে বলে হাড়ে হাড়ে বুঝবে বাছাধন!

কিন্তু এখন কটা বাজে? বলা মুস্কিল। ঘুম থেকে উঠে ফ্রাঞ্জ দেখেছিলেন দম ফুরিয়ে যাওয়ায় ঘড়ি থেমে গিয়েছে। এখন দিন কি রাত বলা আর সম্ভব নয়।

জ্বলন্ত চোখে ওৎ পেতে রইলেন ফ্রাঞ্জ। উৎকর্ণ হয়ে রইলেন পদশব্দ শোনার প্রতীক্ষায়। মাথার মধ্যে যেন আগুন জ্বলতে লাগল, কান ভোঁ-ভোঁ করতে লাগল, চোখ জ্বালা করতে লাগল এবং দম আটকে আসতে লাগল উৎকণ্ঠায় আর টাটকা বাতাসের অভাবে। সহসা একটা মৃদু শব্দ শোনা গেল। হাওয়ার শব্দ। ডান দিকের থামের আড়াল থেকে শব্দটা ভেসে আসছে। সেই সঙ্গে টাটকা বাতাসের ঝাপটা।

গুপ্ত পথ নাকি? থামের আড়ালে পাতাল সুড়ঙ্গ? বাইরের বাতাস আসছে সে পথেই?

পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলেন ফ্রাঞ্জ। সত্যিই তো! দুই থামের কোণে অন্ধকার ঢাকা একটা সরু সুরঙ্গ। এতক্ষণ চোখে পড়েনি। পাতাল কক্ষে বাতাস যাতায়াতের ঘুলঘুলি বললেও চলে।

অন্ধকারে পা দিলেন ফ্রাঞ্জ। খুবই সরু পথ। কষ্টেস্থষ্টে এসে পৌঁছোলেন সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্তে। পাঁচ ছ গজ চওড়া একটা উঠোন। গোল উঠোন। একশ ফুট উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা।

ঠিক যেন একটা পাতকুয়ো। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়। পাতাল ঘরে হাওয়া পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা।

ইঁদারার মাথায় আকাশ দেখা যাচ্ছে। দিনের আলো এখনো নিভে যায় নি। সূর্যরশ্মি তির্যক রেখায় ছুঁয়ে যাচ্ছে ইঁদারার পাড়। তপনদেব নিশ্চয় গগন পরিক্রমা সাঙ্গ করে হেলে পড়েছেন দিগন্তে।

অর্থাৎ বেলা প্রায় পাঁচটা।

তার মানে, একটানা চল্লিশ ঘণ্টা ঘুমিয়েছেন ক্রাঞ্জ। চল্লিশ ঘণ্টা! ঘুমের ওষুধ না খেলে কি এমন ঘুম ঘুমোনো যায়? নিশ্চয় জলে ঘুমের আরক মিশিয়ে দিয়েছিল কেউ।

এগারোই জুন রোজকো-কে নিয়ে রওনা হয়েছিলেন ক্রাঞ্জ। আজ তাহলে তেরোই জুন!

বৃত্তাকার চত্বরের সুউচ্চ প্রাচীর দেখে মনটা দমে গেল ক্রাঞ্জের। অনেক আশা নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন ভূগর্ভ কক্ষ থেকে। ভেবেছিলেন, এই পথেই মিলবে মুক্তির নিশানা। কিন্তু তেল তেলে মসৃণ ঐ দেওয়াল বেয়ে একমাত্র টিকটিকি গিরগিটি মাকড়শাই ওপরে উঠতে পারবে—মানুষ নয়।

মুখ চুণ করে পাতাল ঘরে ফের ফিরে এলেন ক্রাঞ্জ। দেখা যাক, দুটো দরজার কোনো একটা দিয়ে হওয়া যায় কিনা।

যে দরজা দিয়ে এসেছিলেন পাতাল ঘরে, ক্রাঞ্জ পরীক্ষা করে দেখলেন তার কপাট জোড়া পাথরের মত মজবুত। তার ওপর আগাগোড়া লোহার পাত মারা। নাঃ, এ-দরজা ভাঙতে হলে হাতি দরকার।

ফিরে এলেন দ্বিতীয় দরজায়। এই দরজার ওপারেই লা স্টিলা এসে দাঁড়িয়েছিলেন কিছুক্ষণ আগে' শুনিয়েছিলেন জাদু-সঙ্গীত।

দরজাটা তেমন মজবুত নয়। ছ্যাতলা পড়া স্যাঁতসেঁতে পাল্লা। বিশেষ করে লোহার কব্জার আশেপাশে ভিজে কাঠ বেশ নরম হয়ে এসেছে। চাপ দিলেই ছুরি বসে যায়।

তবে আর দেরী কেন? হাতে সময় খুব কম। ওরা কিন্তু এসে পড়বে এখুনি। জল খাওয়ার কতক্ষণ পরে ঘুমে ঢলে পড়বেন ক্রাঞ্জ, সে হিসেব জানে বইকি কয়েদখানার মালিক।

সুতরাং হাত চলল ঝড়ের মত। এত তাড়াতাড়ি কাঠ খুবলে উঠে আসবে, ভাবতেও পারেন নি ক্রাঞ্জ। কব্জা যেখানে কাঠের সঙ্গে স্ক্রু দিয়ে আঁটা, ঠিক সেই জায়গার কাঠ কুরে কুরে তুলে আনলেন ক্রাঞ্জ।

ঘণ্টা তিনেক পরে নড়বড়ে হয়ে এল কব্জা। তারপর একেবারেই খুলে গেল পাল্লা থেকে।

এতক্ষণ নিঃশব্দে কাজ করেছেন ক্রাঞ্জ। হাত টনটন করছে। নিঃশ্বাস

আটকে আসছে। একটু বিশ্রাম দরকার। ছুটে বেরিয়ে গেলেন ইদারা চত্বরে। দেখলেন সূর্য এখন অস্তাচলে। রিচিঘাট পাহাড়ের তলায়। চাঁদও উঠছে বোধহয়। আকাশে শুরু হয়েছে রঙের খেলা। পাল্লা দিয়ে ছুটছে মেঘের পর মেঘ।

রাত বোধহয় নটা।

পাতাল ঘরে ফিরে এলেন ফ্রাঞ্জ। তেষ্টায় ছাতি ফাটছে। আকণ্ঠ জল খেলেন ঝিরঝিরে ঝর্ণা থেকে। জগের জল ঢেলে ফেলে দিলেন নর্দমায়।

ছুরি কোমরে গুঁজে বেরিয়ে এলেন দরজার বাইরে। চাতালে দাঁড়িয়ে বেশ করে টেনে বন্ধ করে দিলেন পাল্লা জোড়া। তারপর অন্ধকারেই পা বাড়ালেন সামনে।

ঠোক্কর খেলেন সঙ্গে সঙ্গে। সিঁড়ি।

বিনা দ্বিধায় ধাপ গুনে গুনে উঠে গেলেন ফ্রাঞ্জ। আর কি! এবার দেখা মিলবে লা স্টিলার। অন্ধকারে গা ঢেকে প্রাসাদ অলিন্দে এখনো নিশ্চয় একাকিনী ঘুরে বেড়াচ্ছেন গানের রানী···কেন ঘুরছেন তা নিজেও জানেন না ··

ষাট ধাপ ওঠবার পরেই ফুরিয়ে গেল সিঁড়ি। পাতাল ঘরে নেমেছিলেন কিন্তু সাতাত্তর ধাপ সিঁড়ি ভেঙে। তার মানে, জমি থেকে এখনো প্রায় আট ফুট নিচে রয়েছেন ফ্রাঞ্জ।

দুহাত দুপাশে বাড়ালেন। হাত ঠেকে গেল দেওয়ালে। সঙ্কীর্ণ সুড়ঙ্গ। কত লম্বা কে জানে। তবুও এগিয়ে চললেন ফ্রাঞ্জ নিঃশব্দে মার্জারের মত।

কিন্তু পথের শেষ কোথায়? কতবার যে মোড় ঘুরলেন, সে হিসেব হারিয়ে গেল। ওরগাল প্লেটো কোনদিকে, সে খেয়ালও রইল না। চলেছেন তো চলেইছেন। হাঁটু টনটন করছে, নিঃশ্বাস দ্রুত হচ্ছে। তবুও চলেছেন। প্রতি মুহূর্তে আশা করছেন, এই বুঝি পথ ফুরোলো। এই বুঝি হাত ঠেকল লোহার জালতিতে এই বুঝি মুখ থুবড়ে পড়লেন খাঁচার গরাদে। পাতালের পাকচক্রে এমনি কত বাধাই তো থাকতে পারে। কিন্তু বাধাও নেই, পথেরও শেষ নেই। একি আশ্চর্য গোলকধাঁধা?

আচমকা কঠিন দেওয়ালে হাত ঠেকল ফ্রাঞ্জের। রাস্তা বন্ধ।

হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখলেন ফ্রাঞ্জ। ইটের দেওয়াল। কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই। সুড়ঙ্গ একদম বন্ধ।

অস্ফুট চীৎকার করে উঠলেন ফ্রাঞ্জ। নিঃসীম হতাশায় বুক যেন ভেঙে

গেল। হাত-পায়ের শেষ শক্তিটুকুও মিলিয়ে গেল। ধপ করে বসে পড়লেন মেঝের ওপর

দেওয়ালে মাথা রেখে এলিয়ে পড়েছিলেন ফ্রাঙ্ক। এত কষ্টের এই ফল? কত দুর্ভোগ আর লেখা আছে কপালে?

হঠাৎ একটা ফাটলে আঙুল ঠেকল ফ্রাঙ্কের। মেঝের কাছেই ইটের দেওয়ালে সামান্য একটা ফাটল। আলগা ইট। নাড়া দিতেই নড়ে উঠল। মনটাও নেচে উঠল সেই সঙ্গে।

"পাওয়া গেছে! পথ পাওয়া গেছে!"

কুত্তার মত হাঁপাচ্ছিলেন ফ্রাঙ্ক। তা সত্ত্বেও কাঁপা আঙুল খসিয়ে আনতে লাগলেন একটার পর একটা ইট। ক্রমশঃ বড় হতে লাগল ফোকর।

আচমকা স্তব্ধ হল হাত। বিস্ফারিত হল চক্ষু।

ফোকরের মধ্যে দিয়ে ঠিকরে এল একটা আলোক রশ্মি।

আলো! কিসের আলো?

ম্যাড়মেড়ে আলোয় দেখা গেল একটা প্রকাণ্ড হল ঘর। ভাঙা গির্জের অন্তঃপুর। কার্পেথিয়ান কাসলে-র বুড়ো গির্জের ধ্বংসাবশেষ। আধখানা ছাদ ভেঙে ঝুলছে কড়িবরগার ভাঙা পাঁজরায়। বিশাল ফ্রেমের জানলা উধাও। জানলায় জায়গায় মস্ত ফুটো। রাবিশ আর ভাঙা পাথর স্তূপীকৃত এখানে-সেখানে। গর্তস্ পরিবারের স্বনামধন্য পূর্বপুরুষদের মর্মরমূর্তি মুখ থুবড়ে হেলায় পড়ে রাবিশের মধ্যে। বড় বড় মার্বেল পাথর গড়াগড়ি যাচ্ছে আশেপাশে। অবহেলায় অযত্নে শেষ অবস্থায় এসে পৌঁচেছে অমন সুন্দর গির্জে ঘর। বড় বড় থামের কয়েকটা এখনো খাড়া রয়েছে। টলমল করছে গথিক জানলা। সুন্দর কারুকাজ করা বেদিগুলো পর্যন্ত শ্রীহীন হয়ে গেছে ধুলো ময়লার দৌরাত্ম্যে।

বাইরে ঝুলছে একটা দড়ি। দড়ির মাথায় প্রকাণ্ড ঘণ্টা। বুড়ো গির্জের ভাঙা ঘণ্টা ঘর। এই ঘণ্টাধ্বনিই দিকে দিকে ভেসে গিয়েছে এই সেদিনও। ঝড়ো হাওয়ায় ঢং ঢং নিনাদে রক্ত জল করে ছেড়েছে গ্রামবাসীদের।

ভাঙা গির্জের রাবিশ মাড়িয়ে ভেতরে আসছে একটি মূর্তি। হাতে লণ্ঠন। যে গির্জের মধ্যে মানুষ ঢোকে নি কত বছর কত যুগ—পরিত্যক্ত সেই উপাসনা মন্দিরে কে এল এমন অসময়ে?

লণ্ঠনের আলো পড়েছে লোকটার মুখে। এক নজরেই চিনলেন ফ্রাঙ্ক

অরফানিক। ব্যারন রুডলফের রহস্যময় অনুচর। ছায়ার মত যে ব্যারনের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে, যে নাকি মস্ত বৈজ্ঞানিক অথচ যার বৈজ্ঞানিক প্রতিভা

সাধারণ মানুষ আঁচ করতেও পারেনি, যে পথ চলে আপন মনে বক বক করতে,—নয়ত হাত মুখ' নেড়ে অদৃশ্য কোনো ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলতে বলতে, যার ইচ্ছে হলেই নাকি সিংহমুখো রাক্ষসের মত মূর্তিমান আতংকরা জন্ম নিতে পারে—আজব সেই অরফানিক্ নিশ্চিন্ত চরণে প্রবেশ করল গির্জের ভেতরে।

নিমেষ মধ্যে অনেক রহস্য পরিষ্কার হয়ে এল ফ্রাঙ্কের মনের চোখে। অরফানিক। বিভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক অরফানিকই তাহলে ভেল্কী সৃষ্টি করে চলেছে কার্পেথিয়ান কাস্‌ল্‌-য়ের আকাশে-বাতাসে। ব্যারন রুডলফের সেবায় প্রয়োগ করেছে তার বৈজ্ঞানিক প্রতিভা। বিজ্ঞানের বিস্ময় দিয়ে তাক লাগিয়ে ছাড়ছে নিরক্ষর গ্রামবাসীদের!

এতদিন এই সন্দেহই উঁকি-ঝুঁকি দিয়েছিল মনের মধ্যে। সন্দেহ এখন সত্যে পরিণত হল চোখের সামনে কানা অরফানিকের বিটকেল মূর্তি দেখার পর। নিশুতি রাতে পোড়ো গির্জেতে কি করতে এসেছে অরফানিক?

এক কোণে একটা মস্ত কাটিম পড়েছিল। অরফানিক কাটিম থেকে তার খুলে টেনে আনল গির্জের মাঝখানে। অনেকগুলো লোহার সিলিণ্ডার পড়েছিল সেখানে। জড়াতে লাগল সিলিণ্ডারগুলোর গায়ে।

প্রবল ইচ্ছে হল ফ্রাঙ্কের সেই মুহূর্তে ইটের ফোকর দিয়ে গলে পড়ার। ইচ্ছে হল খপাখপ আরো কয়েকটা ইট খসিয়ে এনে ফাঁক দিয়ে পিছলে নিচে পড়ার। তন্ময় হয়ে কাজ করছে অরফানিক। ফ্রাঙ্ক পেছনে এসে দাঁড়ালেও টের পাবে না। তারপর? তারপর হাতের সুখ মিটিয়ে গলাটা টিপে ধরা যাবে শয়তানের দোসর শয়তানের···

কিন্তু না! যদি বিফল হন ফ্রাঙ্ক, জীবন নিয়ে আর ফিরতে হবে না গোলক ধাঁধার মত এই গড়বন্দী থেকে। ব্যারনের রহস্য জেনে ফেলেছেন কাউন্ট। জান নিয়ে দাম আদায় করে ছাড়বেন মহা পাপিষ্ঠ রুডলফ ডি গর্তস্‌!

সহসা অরফানিকের পাশে আবির্ভূত হল আরো একটি মূর্তি!

ব্যারন রুডলফ ডি গর্তস্‌!

যে মুখ একবার দেখলে জীবনে বিস্মৃত হওয়া যায় না—এ সেই মুখ। এত বছরেও পালটান নি ব্যারন। লম্বাটে বিশীর্ণ পাংশু মুখ এখনো আগের মতই লম্বাটে বিশীর্ণ পাংশু। কাঁচা-পাকায় মিশোনো চটচটে লম্বা চুল কানের পাশ দিয়ে ঝুলছে ঘাড়ের ওপর। কৃষ্ণবর্ণ অক্ষি কোটরের অন্তঃস্থল থেকে দপ-দপ করে অগ্নিবিচ্ছুরণ করছে এক জোড়া অঙ্গার-চক্ষু!

ধীরপদে অরফানিকের পাশে এসে দাঁড়ালেন ব্যারন। নিবিষ্ট চিত্তে দেখতে লাগলেন অনুচরের হাতের কাজ।

তারপর শুরু হল দুজনের কথাবার্তা। দুজনেরই বাচনভঙ্গী কাটাকাটা ধারালো।

কান খাড়া করে শুনলেন ফ্রাঞ্জ।

১৫ ॥ ডানা ঝটপট, ল্যাজ লটপট!
দে চম্পট! দে চম্পট!
বুঝে ত্যাখরে ওরে মর্কট!
সব মিথ্যে! নেই লটঘট!

"অরফানিক, গির্জেয় তার পাতা শেষ হয়েছে?"

"এঁই মাত্র হঁল," খোনা গলায় বলল অরফানিক।

"বুরুজের কামান-ঘরের ব্যবস্থা?"

"সম্পূর্ণ।"

"এখন থেকে তাহলে ডোনজোনের সঙ্গে গির্জে আর বুরুজের যোগাযোগ হয়ে গেল তারের মধ্যে দিয়ে?

"তাঁ হঁল।"

"জেনারেটরের কারেন্ট চালু হয়ে গেলেই বেরিয়ে পড়ার সময় পাবো তো?"

"নিশ্চয়।"

"ভলক্যান পাহাড় পর্যন্ত সুড়ঙ্গটা সাফ আছে কিনা দেখেছ?"

"বিঁলকুল সাঁফ।"

মিনিট কয়েক আর কথা নেই। লণ্ঠন তুলে গির্জের অন্ধকার গর্ভে আলোক নিক্ষেপ করল অরফানিক।

ক্রুর হেসে বললেন ব্যারন—"বুড়ো কেল্লা রে! তোর বুড়ো চেহারা দেখতে যে-ই আসুক না কেন এবার, বড্ড বেশী আক্কেলসেলামী দিতে হবে তাকে। বোমা মেরে পাঁচিল ভাঙবে? হাঃ হাঃ হাঃ!"

শুনে শিরদাঁড়া পর্যন্ত শির শির করে উঠল ফ্রাঞ্জের!

ফের শুধোলেন ব্যারন—"বার্স্টগ্রামের কথাবার্তা সব শুনেছো তো?"

"পঁঞ্চাশ মিনিট আঁগেই শুঁনলাম। তাঁরের মধ্যে দিয়ে ভেসে এঁল সমস্ত শঁলা-পঁরামর্শ। জোর ষঁড়যন্ত্র চলছে কিও ম্যাঁথিয়াসে।"

"চড়াও হচ্ছে কখন? আজ রাতেই নাকি?"

"আজ্ঞে না। রাত ভোর হলে—দিনের আলোয়।"

"বার্স্ট গ্রামে রোজকো ফিরেছে কখন?"

"দু ঘণ্টা আগে—সঙ্গে করে এনেছে কার্লসবার্গের পুলিশ।"

"চমৎকার! চমৎকার! বুড়ো কেল্লার এখন শেষ অবস্থা—হানাদারদের ঠেকানোর ক্ষমতা তাঁর নেই। তাতে কি! সবশুদ্ধ ভেঙে পড়তে পারবে তো! হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়বে কাউন্ট ডি টেলেক আর তার স্যাঙাতদের মাথার ওপর! মরুক সব চাপা পড়ে!"

শেষ কথাগুলো দাঁতে চিবিয়ে বললেন ব্যারন।

একটু থেমে ফের বললেন—"অরফানিক, তারগুলোর কি হবে? কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও না টের পায় কাস্‌ল্ থেকে কিড ম্যাথিয়াস পর্যন্ত তার পাতা ছিল অ্যাদ্দিন!"

"আজ্ঞে না, কেউ জানতে পারবে না। তাঁর উপড়ে আনব আমি নিজেই!"

কার্পেথিয়ান কাস্‌ল্ শুরু থেকেই অনেক রহস্য সৃষ্টি করেছে, অনেক দুর্বোধ্য হেঁয়ালী রচনা করেছে। এমন অনেক কাণ্ড ঘটেছে এ-কাহিনীর পাতায় পাতায় যা রাক্ষস-খোক্কসের কাণ্ডকারখানা বলেই মনে হয়েছে এতদিন। এবার সময় হয়েছে হাটে হাঁড়ি ভাঙবার। রহস্য ফাঁস করবার। প্রহেলিকাব সমাধান আর লুকিয়ে রাখার দরকার নেই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকেই এ সব ঘটনা ঘটেছিল বার্স্ট গ্রামে। ইলেকট্রিসিটির ব্যবহার তখন সবে জানা গিয়েছে। ইলেকট্রিসিটিকে বলা হচ্ছে "ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা"। স্বনামধন্য এডিসন সুযোগ্য শিষ্যদের নিয়ে চূড়ান্ত উন্নতি করেছেন তড়িৎ শক্তির।

ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রপাতির তখন জয়জয়কার। বিশেষ উন্নতি ঘটেছে টেলিফোন যন্ত্রের। ডায়াফ্রাম এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে কানে ইয়ারফোন না লাগিয়েও প্রতিটি কথা সুস্পষ্ট শোনা যায়। ফিস ফিস করে কথা বললেও হাজার হাজার লীগের ওপার থেকে ফিসফিসানি ভেসে আসছে তারের মধ্যে দিয়ে—যেন সামনে দাঁড়িয়ে কেউ কথা বলছে। গান গাইলেও সে গান চক্ষের নিমেষে চলে আসছে তারের মধ্যে দিয়ে। পাশাপাশি বসে কথা বলা আর কয়েক হাজার লীগ তফাতে বসে কথা বলার মধ্যে কোনো প্রভেদ আর নেই *

---

* শুধু কথা কেন, দরকার হবে পরস্পরকে দেখতেও পারবে বক্তারা। তারের সঙ্গে সংলগ্ন মস্ত পর্দায় ভেসে উঠবে দুজনের ছবি। জয় হোক 'টেলি-ফটো'র! জুল ভের্ন॥

ইলেকট্রিসিটি নিয়ে বিজ্ঞানীমহলে জোর মাতামাতি চলেছে, অরফানিক তখন নিজেও এ-নিয়ে অনেক গবেষণা অনেক আবিষ্কার করে ফেলেছে। চৌকস উদ্ভাবক বলতে যা বোঝায়, অরফানিক কিন্তু তাই। ইলেকট্রিসিটির ব্যবহারিক প্রয়োগ কত রকমের হতে পারে, তা নিয়ে অনেক আশ্চর্য বুদ্ধি নিত্য গজগজ করে তার মাথায়। কিন্তু পোড়াকপালে খ্যাতি লেখা ছিল না। তাই গালমন্দ টিটকিরি বিদ্রূপ ছাড়া কিছুই জুটল না বরাতে। জ্ঞানীগুণী মহলও পাত্তা দিল না কুশলী আবিষ্কারক অরফানিককে। বললে, আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে যা হোক! যত সব উদ্ভট ধারণা! ধীমান ব্যক্তির বরাতে যদি উন্মাদ অ্যাখ্যা জোটে, প্রচণ্ড রাগে সে পাগল তো হবেই! অরফানিকেরও হয়েছে তাই। ঘৃণার বিষে জ্বলেপুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে ভেতরটা। সতীর্থদের নাম পর্যন্ত সইতে পারে না।

ঠিক এই সময়ে আলাপ হল ব্যারন রুডল্‌ফের সঙ্গে। তখন দারুণ টানাপোড়েন চলছে অরফানিকের। দুবেলা পেট ভরে খেতে পর্যন্ত পাচ্ছে না। ব্যারন তার দুরবস্থা দেখে এগিয়ে এলেন। কথা দিলেন, গবেষণা করতে যা টাকা লাগবে দেবেন। শুধু একটা সর্ত থাকবে। আবিষ্কারী যা কিছু করবে অরফানিক, তা ভোগে লাগাবে কেবল ব্যারনের। বাইরের লোক সে-সবের বিন্দুবিসর্গ জানতে পারবে না।

দুজনেরই মিল ছিল অনেকদিক দিয়ে। দুজনেই বিকারগ্রস্ত, ছিটগ্রস্ত প্রচণ্ড একরোখা, গোঁড়া এবং তেজী। ফলে বনিবনা ঘটতে দেরি হল না। সেই থেকে ব্যারনের প্রকৃত পার্শ্বচর হয়ে গেল অরফানিক। একদিনের জন্যেও আর কাছছাড়া হল না। ইটালীর নানা শহরে ব্যারন টোঁ-টোঁ করে ঘুরেছেন লা স্টিলার গান শোনার জন্যে—অরফানিক তাঁর ছায়া হয়ে গিয়েছে সব জায়গায়।

দুজনে কিন্তু বুঁদ হয়ে রইলেন দুটি ভিন্ন বিষয়ে। গান-পাগল ব্যারন যেন মাতাল হয়ে গেলেন গানের রাণীর গান শুনে। দিগবিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন গানের নেশায়। অরফানিক কিন্তু তন্ময় হয়ে রইল ইলেকট্রিসিটি সম্পর্কিত নানারকম গবেষণা নিয়ে। সমসাময়িক বৈজ্ঞানিকদের ছাড়িয়ে গেল অরফানিক—অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারের ইতিবৃত্ত কিন্তু কাকপক্ষীও টের পেল না।

ভের্ণের বড় সাধ ছিল শতাব্দী ফুরোনোর আগেই যেন তাঁর ভবিষ্য দর্শন সত্যি হয়ে দাঁড়ায়। হয়েছেও তাই। জন্ম নিয়েছে ক্লোজ্‌ড্ সার্কিট এবং ল্যাণ্ডলাইন টেলিভিশন। সম্পাদক॥

নাটকীয়ভাবে লা স্টিলার শিল্পী-জীবনের অবসান ঘটবার পর কেউ জানল না রাতারাতি কোথায় উধাও হয়ে গেলেন ব্যারন আর অরফানিক। কোথায় আর যাবেন? এলেন বাপঠাকুর্দার বুড়ো কেল্লায়—কার্পেথিয়ান কাসলে। সঙ্গে অরফানিক।

শুরু হল নির্জনবাস। অরফানিকও তাই চায়! গাঁয়ের মানুষ যেন ধারে কাছেও না আসে, তাই ব্যারন কাউকেই জানতে দিলেন না তাঁর ফিরে আসার খবর। কাউকেই উনি সহ্য করতে পারছিলেন না। অথচ রোজকার খাবার-দাবার এবং অন্যান্য জিনিসপত্র তো চাই। সে-ব্যবস্থাও হয়ে গেল। কাস্‌ল্‌গড় থেকে একটা পাতাল সুড়ঙ্গ ছিল ভলক্যান রোড পর্যন্ত। সেই পথে রোজ দরকারী জিনিসপত্র কেল্লায় পৌঁছে দিয়ে যেত ব্যারনের এক বুড়ো চাকর যার নামও এ তল্লাটে কেউ শোনে নি। অতি গোপনে সে আসত যেত—কেউ টেরও পেত না।

বাইরে থেকে ভাঙাচোরা মনে হলেও কাস্‌ল্‌গড়ের ডোনজোন কিন্তু মোটামুটি অটুট ছিল। আরামে থাকবার মত জায়গার অভাব ছিল না—দুজনের পক্ষে যা প্রয়োজন, তারো বেশি। সুতরাং পুরোদমে শুরু হল অরফানিকের গবেষণা। জায়গার অভাব নেই, টাকার এবং উপকরণেরও অভাব নেই। ফিজিক্স আর কেমিস্ট্রি নিয়ে গবেষণা শুরু করল 'পাগলা' বৈজ্ঞানিক। ব্যারনকে বললে, এই সব আবিষ্কার দিয়ে উৎসুক গ্রামবাসীদের পিলে চমকে দিতে চায়—যাতে তারা ভয়ের চোটে এ-মুখো আর না হয়।

ব্যারনও তাই চান। এককথায় রাজি হলেন তিনি। ফলে, উদ্ভট যন্ত্রপাতি বানিয়ে নিল অরফানিক। সাংঘাতিক সেইসব কলকব্জার সাহায্যে এমন আতংক ছড়িয়ে দিলে আশেপাশে যা নাকি পিশাচসিদ্ধ ডাকিনী ছাড়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

কিন্তু প্রথমেই দরকার বার্স্ট গ্রামের রোজকার খবর। গ্রামবাসীরা সত্যিই ভয় পাচ্ছে কি? সন্দেহ-টন্দেহ করছে না তো? কার্পেথিয়ান কাস্‌ল্ সম্বন্ধে তাদের মতামত কি? অরফানিক সমাধান করে দিল সেই সমস্যার! টেলিফোন-যন্ত্র দিয়ে। কঠিন কিছু তো নয়! কিঙ ম্যাথিয়াস সরাইখানায় মাতব্বরদের আড্ডা বসে রোজ সন্ধ্যায়। কাস্‌ল্ থেকে সরাইখানা পর্যন্ত টেলিফোনের তার পাতলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।

অরফানিকের উৎসাহ এ-সব ব্যাপারে অতি প্রচণ্ড। খুব গোপনে অথচ ঝানু মিস্ত্রীর মতই কাজ এগিয়ে রাখল সে। ইনসুলেটর দিয়ে মোড়া তামার তার পাতল কাস্‌ল্ থেকে নিয়াড নদীর তলা বরাবর। তারপর একদিন

টুরিস্টের ছদ্মবেশে গিয়ে উঠল সরাইখানায়। পেছনের জানলা কস্মিনকালেও খোলা হত না। নিয়াড নদীর তার টেনে নিয়ে এল সেই জানলা দিয়ে বড় হলঘরে। তরপর তারের প্রান্তে টেলিফোনিক যন্ত্র বসিয়ে ঢেকে রাখল লতাগুল্মের আড়ালে। যন্ত্রটা অরফানিকের নিজের আবিষ্কার। অতিশয় শক্তিশালী। ফিসফিস করে কথা বললেও শোনা যায় কাস্‌লে। আবার কাস্‌ল্‌ থেকে কথা বললেও গম্‌গম্‌ করে সে কথা পৌঁছে যায় সরাইখানায়। একই যন্ত্র দিয়ে দু'ধরনের কাজ চলে। ফলে এক ঢিলে দু'পাখি মারলেন ব্যারন। আড়ি পেতে কথাও শুনবেন, আবার দরকার হলে শাসানি-ও শোনাবেন!

প্রথম কয়েকটা বছর কাটল নির্বিঘ্নে। কোনো উপদ্রব ঘটল না। কেউ ত্রিসীমানাও মাড়াল না। তারপরেই ফেরিওয়ালার হাতে একটা টেলিস্কোপ এসে পৌঁছোল গাঁয়ে। কেল্লার মাথায় ধোঁয়া দেখতে পেল গাঁয়ের লোক। চিমনীর ডগায় ধোঁয়া! শুরু হল দারুণ উত্তেজনা!

টেলিফোনিক যন্ত্রটা এইবাব কাজ দিল। কেল্লায় বসে গ্রামবাসীদের জল্পনা-কল্পনা শুনলেন ব্যারন। নিক ডেক আর পাটাক কেল্লায় আসছে শুনে শাসিযে উঠলেন। তাবের মধ্যে দিয়ে শাসানি এসে ধ্বনিত হল সরাইখানার হলঘরে! গ্রামবাসীরা ভাবল অদৃশ্য প্রেতের কণ্ঠস্বর!

কিন্তু ভয় পেল না কেবল নিক। কেল্লায় সে আসবেই। ব্যারন তখন রেগে টং হলেন। ঠিক করলেন এমন শাস্তি দেবেন নিক-কে যে শিক্ষা হয়ে যাবে বাকি সকলের।

সেই রাতেই আরম্ভ হয়ে গেল অরফানিকের আজব যন্ত্রপাতির অদ্ভুত ভেল্কিবাজি। প্রতিটি যন্ত্রই চালু ছিল। যা ঘটল, তা ফিজিক্স-এব ম্যাজিক ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল ভয়ার্ত গ্রামবাসীদের। ঘণ্টা বাজাতে লাগল ঢং-ঢং করে, সমুদ্র-লবণ মিশোনো তীব্র অগ্নিশিখা নিক্ষিপ্ত হল উর্ধ্ব আকাশে—মনে হল যেন প্রেতলোকের তোরণ ভেঙে পিলপিল করে ছুটে এসেছে অশরীরীরা। উচ্চচাপের বাতাস তেড়েফুঁড়ে বেরিয়ে এল ইলেকট্রিক সাইরেনের মধ্যে দিয়ে—ঠিক যেন গিটকিরি দিয়ে গান গাইছে রাক্ষসের দল—হুংকার ছাড়ছে পিশাচ সৈন্যরা! প্রকাণ্ড রিফ্লেকটর দিয়ে প্রক্ষিপ্ত হল দত্যিদানোর আঁকা ছবি অনেক উঁচুতে মেঘের গায়ে—যেন মেঘলোক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল বলে কিম্ভূতকিমাকার জীবেরা! পরিখার পাড়ে ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হল লোহার প্লেট—তার দিয়ে জোড়া রইল ইলেকট্রিক-ব্যাটারীর সঙ্গে। টানাপুলের লোহার কব্জার সঙ্গেও লাগানো

রইল ইলেকট্রিক তার। ঘাসের লুকোনো প্লেটটা চুম্বক হয়ে গিয়েছিল কারেন্ট চালু হতেই—লোহার নাল আর পেরেক জুতো সমেত ডাক্তারকে আটকে রেখেছিল মাটিতে। হুড়কোয় হাত দিতেই নিক ডেক প্রচণ্ড শক্ খেয়ে ঠিকরে পড়তে পড়তেও প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল কপালজোরে।

ভয়ানক কাণ্ড সন্দেহ নেই! এরপর নিশ্চয় আগামী কয়েক পুরুষেও বার্স্ট গ্রামের আর কেউ কেল্লার মাইল কয়েকের মধ্যে আসতে চাইবে না। আতংক বড় সাংঘাতিক জিনিস। বুদ্ধিবৃত্তি পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে দেয়। এ-হেন আতংকই চূড়ান্তভাবে ছড়িয়ে দেওয়া গেছে। এখন হাতে সোনা রুপো গুঁজে দিলেও ডানপিটেদের সাহস হবে না ধারে কাছে ঘেঁসবার!

নিশ্চিন্ত হলেন ব্যারন রুডলফ।

ঠিক তারপরেই গাঁয়ে এসে পৌঁছোলেন কাউন্ট ডি টেলেক। তখনো কিন্তু ব্যারন ভাবেন নি কার্পেথিয়ান কাস্‌ল্ নিয়ে শেষকালে কাউন্টও উৎসুক হবেন এবং অযথা মাথা ঘামাবেন।

কাউন্ট ডি টেলেক 'কিঙ ম্যাথিয়াসে' আসতে না আসতেই খবর পৌঁছে গিয়েছিল ব্যারনের কাছে। টেলিফোনের তারে কান পেতে তিনি শুনেছিলেন গ্রামবাসীদের সঙ্গে ফ্রাঞ্জের প্রতিটি কথা। ফ্রাঞ্জকে সমস্ত অন্তর দিয়ে ঘৃণা করতেন ব্যারন। নেপল্‌সে ঘটনার কথা মনে পড়তেই আগুনে ঘি পড়ল যেন। তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন ব্যারন। দু'চক্ষের বিষ সেই ফ্রাঞ্জ হাজির হয়েছেন কাস্‌ল্ থেকে মাত্র মাইল কয়েক দূরে বার্স্ট গ্রামে। শুধু তাই নয়, যৎপরোনাস্তি টিটকিরি বিদ্রূপ আরম্ভ করেছেন কার্পেথিয়ান কাস্‌ল্-য়ের ফ্যানটাস্টিক কাণ্ডকারখানা নিয়ে। এতদিন ধরে এত কষ্টে ভৌতিক কুখ্যাতি দিয়ে কাস্‌ল্‌গড়কে সুরক্ষিত রেখেছিলেন ব্যারন। ভয়ের গণ্ডী টেনে আটকে রেখেছিলেন পাড়াগেঁয়ে লোকগুলোকে—কাছে ঘেঁষতে দেন নি। ফ্রাঞ্জ সেই ভুতুড়ে পরিবেশ নস্যাৎ করতে চাইছেন। বলছেন, সবই নাকি কুসংস্কার। চোখ কান মনের ভুল। ভূত নেই। কার্পেথিয়ান কাস্‌লে মানুষ যেতে পারে বইকি।

তার চাইতেও বড় কথা, নিজেই উদ্যোগী হয়ে কার্লসবার্গ থেকে পুলিশ ডেকে আনার চক্রান্তও আরম্ভ করেছেন এই ফ্রাঞ্জ। স্পর্ধা তো কম নয় লোকটার! কাস্‌ল্‌গড়ের কিংবদন্তীকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে পুলিশ দিয়ে!

আর সহ্য করতে পারলেন না ব্যারন। তাঁর নির্জনবাস পণ্ড হতে চলেছে যাঁর জন্যে, তাঁকে খাঁচায় পুরে খতম করবেন মনস্থ করলেন। ভুলিয়ে ভালিয়ে

একবার কাস্‌ল্‌গড়ে এনে ফেলতে পারলে হয় ইহজীবনে আর বেরোতে হবে না বাছাধনকে!

মর্মান্তিক চটেছিলেন ব্যারন! তাই টেলিফোনিক যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে লা স্টিলার গান শোনালেন 'কিঙ ম্যাথিয়াস' সরাইখানায়। কাজ হল। কাউণ্ট মনে মনে সংকল্প করলেন কাস্‌ল্‌গড় ঘুরে যাবেন। রাস্তায় নেমে সত্যিই এলেন বুরুজের পাশে। ছাদে লা স্টিলাকে দেখে ক্ষেপে গেলেন ভেতরে ঢোকবার জন্যে। গেট খুলে রাখা হল, ডোনজোনের জানলা থেকে আলো দেখানো হল। পাতাল ঘরে ফের শোনানো হল লা স্টিলার সুধা-ঝরা কণ্ঠ। বিভ্রান্ত হলেন কাউণ্ট। ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হল তাঁকে—ঘুমের মাঝে খাবার আর জল এনে রাখার ব্যবস্থাও হল। ব্যারনের মুঠোর মধ্যে এসে পড়লেন কাউণ্ট।

কিন্তু একি বিপত্তি! ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জলে গেল ব্যারনের যখন শুনলেন রোজকো লোকটা কার্লস্‌বার্গ গিয়ে পুলিশ ডেকে এনেছে। অরফানিককে নিয়ে দুজনে মিলে লোমহর্ষক এত কাণ্ড করেছেন, যুক্তিবাদী ফ্রাঞ্জকে পর্যন্ত খাঁচায় পুরেছেন। রহস্যের পর রহস্য সাজিয়েছেন—ঠিক যেন মাকড়শার জাল। ঊর্ণনাভের মতই মাঝে বসেছিলেন নাটের গুরু তিনি স্বয়ং!

কিন্তু সব ভণ্ডুল হতে চলেছে! নিক ডেক আর পাটাক্লকে আটকানো সহজ হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু ভুতুড়ে কারসাজি দিয়ে গোটা একটা পুলিশ-বাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে কি? পুলিশ পিশাচকে তোয়াক্কা করে না। ভূত দেখলেই বেয়োনেট নিয়ে তেড়ে যায়। শাঁকচুন্নীর হাতেও হাতকড়া পরাতে চায়। তাহলে?

ধ্বংস করে দেওয়া হোক সাধের কাস্‌ল্‌গড়! বহু ইতিহাস, বহু কিংবদন্তীর নাটমঞ্চ এই কার্পেথিয়ান কাস্‌ল্‌কে ধূলোয় মিশিয়ে দেওয়া হোক!

এই সিদ্ধান্তই নিলেন দুই আধ-পিশাচ আধ-পাগল মানুষ। আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন শুধু প্রতীক্ষা। ডোনজোন, গির্জে আর বুরুজের তলায় পোঁতা রয়েছে ডিনামাইট। ইলেকট্রিক কারেণ্ট দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটানো হবে নির্দিষ্ট সময়ে—বিস্ফোরণ ঘটবে আপনা থেকেই। কল চালু করে দিয়ে গোপন সুড়ঙ্গ দিয়ে সটকান দেবেন ব্যারন এবং অরফানিক। ওঁরা যখন ভলক্যান রোড পৌঁছোবেন, পুলিশ তখন পাঁচিল টপকে ভেতরে ঢুকবে। ঘটবে প্রলয়ংকর বিস্ফোরণ! পাথরের স্তূপে পরিণত হবে ঐতিহাসিক কেল্লা। জীবন্ত সমাধি ঘটবে ফ্রাঞ্জ এবং পুলিশের।

কিন্তু সে প্ল্যান আর গোপন নেই! টুকরো-টাকরা কথা থেকেই ষড়যন্ত্র

ধরে ফেলেছেন ফ্রাঞ্জ। কেল্লাতে বসেই তাহলে সরাইখানার শুলতানি শোনা যায় টেলিফোনের দৌলতে! ফন্দী বান্‌চাল হয়ে যেতেই পাপিষ্ঠ ব্যারন কেল্লা উড়িয়ে দেবেন! সেই সঙ্গে প্রাণে মারবেন কাউন্ট এবং হানাদার পুলিশ-বাহিনীকে! নিজেরা কিন্তু থাকবেন অনেক···অনেক দূরে জ্ঞানহীনা লা স্টিলাকে টানতে টানতে নিয়ে যাবেন পাতাল সুড়ঙ্গ দিয়ে·· !

কি করবেন ফ্রাঞ্জ? লাফ দিয়ে পড়বেন গির্জের ভেতর? টুঁটি টিপে ধরবেন দুই শয়তানের? আটকাতে পারবেন কি প্রলয়ংকর বিস্ফোরণ? একা পারবেন দুই শয়তানের সঙ্গে টক্কর দিতে · ?

তার চাইতে বরং অপেক্ষা করা যাক! ব্যারন কানা বৈজ্ঞানিককে নিয়ে বেরিয়ে যাক বাইরে। তারপর ফাঁকা গির্জের ভেতর ঢুকে উপড়ে আনা যাবে ডিনামাইটের তার ·তার কেটে দিলেই বন্ধ হবে বিস্ফোরণ···

তারপর দুই শয়তানকে এক হাত নেওয়া যাবে'খন। কত ধানে কত চাল টের পাবে দুই বাছাধন!

গির্জের পূবদিকে আসন-সারির দিকে যাচ্ছেন ব্যারন আর অরফানিক। ওদিকে ও বেরোনোর পথ আছে নাকি? থাকতেও পারে। রহস্যাবৃত এই দানব-কেল্লার মাটি ফুঁড়ে তো কেবল সুড়ঙ্গের গোলকধাঁধা!

ফ্রাঞ্জ শুনলেন ব্যারন বলছেন অরফানিককে :

"আর কিছু করার নেই?"

"না।"

"তাহলে তুমি যাও।"

"আঁপনাকে এঁকলা রেঁখে?"

"হ্যাঁ, অরফানিক। একলাই থাকতে চাই। তুমি সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে যাও ভলক্যান রোডে।"

"আঁপনি?"

"শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত থাকবে কাস্‌ল্‌-য়ে।"

"আঁপনি না আঁসা পর্যন্ত ব্রিঁসত্রিজে থাঁকব তোঁ?"

"হ্যাঁ, ব্রিসত্রিজেই ফের দেখা হবে।"

"বেঁশ, তাঁহলে থাঁকুন এঁকলা। ব্যাঁরন রুঁডলফের কোঁনো সাঁধেই বাঁগড়া দিঁতে চাই না আঁমি।"

"অরফানিক, আমি শেষবারের ওর গান শুনতে চাই কার্পেথিয়ান কাস্‌ল্‌-য়ে বসে।"

বলতে বলতে গির্জে থেকে উধাও হলেন দুজনে।

লা স্টিলার নাম কিন্তু কোথাও উচ্চারিত হল না। তা সত্ত্বেও বুঝলেন ফ্রাঙ্ক। সমস্ত অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করলেন শেষবারের মত প্রস্তর পুরীতে বসে কাকে দিয়ে গান গাওয়াতে চান ব্যারন রুডলফ!

১৬॥ লা স্টিলা! লা স্টিলা!

দাঁড়িয়ে সামনে জ্যান্তো
ধরতে গেলেই মিলিয়ে যাবে
এমনটি কে জানতো?

বিপদের আর দেরি নেই। বিপর্যয় সমাসন্ন। ব্যারনের পরিকল্পনা ফাঁসাতে হলে ব্যারনকেই খতম করা দরকার সবার আগে।

রাত এগারোটা বাজে। আর কারো চোখে পড়ার সম্ভাবনা নেই। দ্রুত হাত চালালেন ফ্রাঙ্ক। খপাখপ সরাতে লাগলেন একটার পর একটা ইট। চূণ-সুরকি ঝরে পড়তে লাগল নিচে। পড়ুক। দেখতে দেখতে মানুষ গলে যাওয়ার ফোকর দেখা গেল দেয়ালে।

ঝুপ করে নিচে লাফিয়ে পড়লেন ফ্রাঙ্ক। খোলা আকাশের টাটকা হাওয়ার ঝাপটা লাগল মুখে। ফুসফুস ভরে শ্বাস নিলেন ফ্রাঙ্ক। পাঁজরা খসা গির্জের ছাদ আর বাতায়ন বিহীন ফোকর দিয়ে দেখা যাচ্ছে পাতলা মেঘের আনাগোনা। দু-চারটে তারা ম্যাড় ম্যাড় করছে মরা চাঁদের আলোয়।

প্রথমেই দরজাটা আবিষ্কার করতে হবে। কোন্ পথে চক্ষের নিমেষে উধাও হলেন ব্যারন আর বৈজ্ঞানিক, তা বের করতে হবে।

পা টিপে টিপে এগোলেন ফ্রাঙ্ক। মাড়িয়ে যেতে হল ভাঙা কবর আর খসে পড়া কড়ি কাঠ। গির্জের পুবদিকে চাঁদের আলো পৌঁছোচ্ছে না। নিদারুণ অন্ধকার সেদিকে। তবুও এগোলেন ফ্রাঙ্ক পাথরে মুখ থুবড়ে পড়ার ঝুঁকি নিয়েও।

এক কোণে খানিকটা জমাট অন্ধকার দেখা গেল। দরজা। এই পথেই তাহলে নররূপী শয়তান দুজন যাতায়াত করে গির্জের ভেতরে?

দরজার পর থেকেই শুরু হয়েছে একটা সুড়ঙ্গ। ভীষণ অন্ধকার। নিজের হাত পর্যন্ত দেখা যায় না। তবুও অন্ধের মত হাতড়ে হাতড়ে চললেন ফ্রাঙ্ক।

আধ ঘণ্টা পর অন্ধকার পাতলা হয়ে এল। মাথার ওপর মাঝে মাঝে ফোকর রয়েছে। চাঁদের আভা পাতলা হয়ে নামছে অন্ধকারে। ছায়া মায়ার পরিবেশে অন্য লোকের ভয় ধরে যেত। ফ্রাঙ্ক ছায়া দেখে চমকান না।

মেঝে ঢালু নয়। খাড়াইও নয়। দ্রুত পা চালালেন। পথ ফুরিয়ে গেল। সুড়ঙ্গ শেষ।

এ কোথায় এসে পড়লেন ফ্রাঙ্ক? এ-যে বুরুজের তলায় কামান ঘর! কামানের গোলা ছুঁড়েও যে ঘর ভাঙা যায় না—এ সেই ঘর। গোলাকার দেওয়ালে অনেকগুলি ঘুলঘুলি। এককালে এই ঘুলঘুলির মধ্যে কামানের চোঙা বেরিয়ে থাকত বাইরে। এখন বাইরে থেকে রন্ধ্রপথে নেমে আসছে মরা চাঁদের আলো। একদিকে একটা খোলা দরজা।

একটা ঘুলঘুলির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন ফ্রাঙ্ক। ফুরফুরে হাওয়ায় একটু জিরিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জিরোনো আর হল না।

ওকী দেখছেন ফ্রাঙ্ক? ওরগাল প্লেটোর শেষ প্রান্তে পাইন বনের সামনে ইতঃস্তত সঞ্চরমান কয়েকটা ছায়ামূর্তি দেখা যাচ্ছে না?

চোখ পাকিয়ে তাকালেন কাউণ্ট!

প্লেটোর কিনারায় কারা যেন আনাগোনা করছে। দু' তিনটে মানুষমূর্তি জঙ্গলের মধ্যে থেকে বেরিয়ে ফের ভেতরে গা ঢাকা দিচ্ছে।

পুলিশ! রোজকোর আনা পুলিশ! রাত ফুরোনোর আগেই শুরু হয়েছে তোড়জোড়! ভোর হলেই আরম্ভ হবে আক্রমণ!

দারুণ ইচ্ছে হল ফ্রাঙ্কের গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে ওঠার! কিন্তু রোজকোর নাম ধরে হাঁক দিলে রোজকো শুনতে পাবে ঠিকই, ডোনজোনেও সে হাঁক পৌছোবে। চকিতে হুঁশিয়ার হয়ে যাবেন ব্যারন। কল চালু করে দিয়ে পগাড়পার হবেন গোপন সুরঙ্গ দিয়ে। সর্বনাশকে আর ঠেকানো যাবে না।

অতিকষ্টে সামলে নিলেন ফ্রাঙ্ক। বেরিয়ে এলেন কামান ঘর থেকে অন্য দরজা দিয়ে। সুদীর্ঘ গলিপথ বেয়ে এগিয়ে চললেন হন হন করে।

প্রায় পাঁচশো গজ যাওয়ার পর সামনে পড়ল একটা সিঁড়ি। পুরু ইঁটের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা গোলাকার একটা সিঁড়ি। ঠিক যেন খাড়াই স্ক্রু। দেওয়ালের খাঁচায় বন্দী।

ডোনজোন কি তাহলে এসে গেছে? প্যারেড-গ্রাউণ্ডের তলায় পৌছেছেন কি ফ্রাঙ্ক! কিন্তু এ কি রকম সিঁড়ি? এ সিঁড়ি দিয়ে তিনতলা ডোনজোনের সব তলায় বেরোনো যাবে কি? দেখা যাক।

লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে লাগলেন ফ্রাঙ্ক। বিশ ধাপ ওঠবার পর থামলেন। কান খাড়া করলেন। কিন্তু চারদিক মৃত্যুপুরীর মত স্তব্ধ। কোথাও হাওয়া বওয়ার শব্দ পর্যন্ত নেই।

আবার উঠলেন। থামলেন একটা চাতালে পৌছে। চাতালের পরেই

একটা ছাদ। উঁকি দিলেন ফ্রাঙ্ক। দেখলেন, ডোনজোনের একতলার বৃত্তাকার ছাদ। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা।

হেঁট হয়ে পাঁচিল ঘেঁসে ওয়গাল প্লেটোর দিকে গিয়ে দাঁড়ালেন ফ্রাঙ্ক। মুখ বাড়িয়ে দেখলেন বনের ধারে ছায়ামূর্তিগুলো এখনো ঘুর ঘুর করছে—কিন্তু কেল্লার দিকে আসার নামও করছে না।

কিন্তু ব্যারনকে আটকাতেই হবে সুড়ঙ্গ পথে চম্পট দেওয়ার আগে। অন্য দরজা দিয়ে ফের সিঁড়িতে গিয়ে দাঁড়ালেন ফ্রাঙ্ক। দু'হাতে দু'পাশের দেওয়াল ধরে উঠতে লাগলেন আরো ওপরে।

চারিদিক নিঝুম নিস্তব্ধ। গোরস্থানও বুঝি এত স্তব্ধ হয় না।

একতলার ঘর খালি। কেউ থাকে থাকে বলে মনে হল না।

দোতলার ঘরও তাই।

তিনতলার চাতালে পৌঁছে আর সিঁড়ি খুঁজে পাওয়া গেল না। সিঁড়ির শেষ—পথেরও।

ডোনজোনের সবচেয়ে উঁচু তলা। খাঁজ কাটা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছাদ। খাঁজের মধ্যে এক কালে বন্দুক বসিয়ে শান্ত্রী মোতায়েন থাকত। মাথাব ওপর উড়ত গর্ৎস্ ব্যারনদের নামাঙ্কিত নিশান।

চাতালের বাঁদিকের দেওয়ালে একটা দরজা। কপাট বন্ধ।

চাবির ফোকর দিয়ে পেন্সিলের মত সরু আলোক রশ্মি এসে পড়ছে বাইরে।

কান পেতে শুনলেন ফ্রাঙ্ক। কিন্তু কই! কোনো শব্দ তো নেই!

চাবির ফোকরে চোখ রাখলেন। দেখলেন ঘরের বাঁদিকে ঝলমলে আলো—ডান দিকে অন্ধকার।

ঘরটা খুবই বড়। মাঠের মত বড় হল ঘর। পুরো তিনতলা জুড়ে একটাই ঘর। গোলাকার দেওয়াল। ছাদের কড়িকাঠ পাঁজরার মত কেন্দ্রে এসে মিশেছে—জমকালো কারুকাজ সেখানে। দেওয়ালে ঝুলছে নক্সা কাটা ফুল লতাপাতার এমব্রয়ডারী করা দামী পর্দা। মান্ধাতার আমলের খানদানী কাবোর্ড, সাইডবোর্ড, আর্মচেয়ার, টুল ছড়ানো ঘরে। জানলায় ভারি পর্দা—ঘরের আলো যাতে বাইরে না যায়। মেঝেতে উলের পুরু কার্পেট—হাঁটলে যেন পায়ের আওয়াজ না হয়।

ঘরের সাজসজ্জা এবং আলোর ব্যবস্থা কেমন যেন খাপছাড়া, সৃষ্টিছাড়া। একদিকে উগ্র আলো, আর একদিকে জমাট আঁধার। ঘরে পা দিয়েই তাই থমকে দাঁড়ালেন ফ্রাঙ্ক।

ডানদিকে কি আছে কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। এত অন্ধকার সেদিকে।

বাঁদিকে একটা মঞ্চ। কালো পর্দাগুলো প্রখর আলোয় উদ্ভাসিত। আলো যে মেশিন থেকে আসছে, সেটি কিন্তু দেখা যাচ্ছে না।

মঞ্চের ফুট দশেক তফাতে একটা সেকেলে পিঠ-উঁচু আর্মচেয়ার। মঞ্চ আর চেয়ারের মাঝে বুক সমান উঁচু পর্দা। মঞ্চের আলোর ম্লান আভা এসে পড়েছে চেয়ারে।

চেয়ারের পাশেই একটা খাটো টেবিল। টেবিলে একটা বাক্স। লম্বায় বারো থেকে পনেরো ইঞ্চি। চওড়া পাঁচ ছ' ইঞ্চি। রত্নখচিত ডালা-টা খোলা। একটা ধাতব চোঙা দেখা যাচ্ছে সেখানে।

ঘরে ঢুকেই দেখেছিলেন ফ্রাঞ্জ চেয়ারে আসীন মূর্তিটিকে। নিথরভাবে বসে আছে একটি মনুষ্যমূর্তি, মাথা হেলে পড়েছে চেয়ারের পিঠে। চোখ বন্ধ। ডান হাতটা টেবিলে রাখা বাক্সের ওপর।

রুডলফ ডি গর্ত্স্!

সেকি! রাতটা ঘুমিয়ে কাটাবেন নাকি ব্যারন? কিন্তু অরফানিককে তো তা বলেন নি? অথচ ঘরের মধ্যে আর কেউ নেই। অরফানিক নিশ্চয় হুকুম মত এতক্ষণে পাতাল সুড়ঙ্গে নেমে গেছে।

কিন্তু লা স্টিলা কোথায়? ডিনামাইট দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়ার আগে কেল্লাপ্রাসাদে বসেই তাঁর গান শুনবে বলেছিলেন ব্যারন··নিশ্চয় সেই মতলবেই এসেছেন নিরালা এই হল ঘরে নিশ্চয় প্রতি রাতে এমনি করেই তিনি আহ্বান করেন লা স্টিলাকে লা স্টিলা আসেন···গান শোনান ফের পাগলের মত ঘুরে ঘুরে বেড়ান প্রাসাদের অজস্র অলিন্দে··· !

কিন্তু কোথায় লা স্টিলা?··

কোথাও নেই·· ঘরের মধ্যে লা স্টিলা নেই··· একা বসে ব্যারন···

নেই লা স্টিলা তাতে কি এসে যায়? ব্যারন তো রয়েছেন···ইচ্ছে হলেই তাঁকে নিকেশ করা যায় তবে আর দেরি কেন?·· যত অনিষ্টের মূল ব্যারন তাঁর সামনেই বসে ব্যারন ব্যারন···ফ্রাঞ্জ তাঁকে দেহের প্রতিটি অনুপরমাণু দিয়ে ঘৃণা করেন · ব্যারনও তাঁকে ঘৃণা করেন···লা স্টিলাকে হরণ করে এনেছেন এই লোকটাই·· লা স্টিলা বেঁচে আছেন · কিন্তু পাগল হয়ে গিয়েছেন ·· দায়ী এই ব্যারন · তবে আর দেরী কেন?·· খতম করা যাক শয়তানের শয়তানি জন্মের মত!···

পা টিপে টিপে ঠিক আর্মচেয়ারের পেছনে এসে দাঁড়ালেন ফ্রাঞ্জ। হাত বাড়ালেই এখন ধরা যায় পিশাচ ব্যারনের কণ্ঠদেশ·· মুখটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে···

নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না ফ্রাঞ্জ··· ছুরিশুদ্ধ ডান হাত তুললেন· মাথার ওপর···

আচম্বিতে আবির্ভূত হলেন লা স্টিলা···

ছুরি খসে পড়ল ফ্রাঞ্জের হাত থেকে কার্পেটের ওপর !

মঞ্চে দাঁড়িয়ে লা স্টিলা। খোলা চুল এলিয়ে পড়েছে কাঁধের ওপর, দুই হাত ছড়ানো সামনে। পরণে শ্বেতবস্ত্র—ওরল্যানডো গীতিনাট্যের শেষ দৃশ্যে অ্যানজেলিকার ভূমিকায় এই বেশেই শেষ দেখা দিয়েছিলেন লা স্টিলা। এই বেশেই ফের তাঁকে দেখা গিয়েছিল বুরুজের ছাদে গভীর রাতে। পলকহীন· চোখে লা স্টিলা চেয়ে আছেন কাউণ্টের পানে· শুধু চেয়ে আছেন নয়, রক্ত মাংসের বাইরেটা ফুঁড়ে মর্ম পর্যন্ত যেন দেখে নিচ্ছেন !

কাউণ্টকে দেখেছেন লা স্টিলা ··নিশ্চয়ই দেখেছেন···কিন্তু হাতছানি দিয়ে ডাকছেন না···ঠোঁট নেড়ে কথাও বলছেন না···বলবেন কি করে ? উনি যে· পাগল···বদ্ধ উন্মাদ···স্মৃতি বলে কিছু কি আছে ?

ক্ষিপ্তের মত সামনে ধেয়ে যেতে যাচ্ছেন ফ্রাঞ্জ, এমন সময়ে···

সুরেলা গলায় গান গেয়ে উঠলেন লা স্টিলা। এ সেই সুর, যে সুর শুনলে মন উদাস হয়ে যায়, দেহ স্থানু হয়ে যায়।

ব্যারন চেয়ার থেকে নড়লেন না—ঈষৎ ঝুঁকে পড়ে ডুবে রইলেন গানের জাদুতে। সুর তো নয় যেন সুগন্ধি। যেন আতরের খোশবাই নিমেষ মধ্যে পরিবেশ পালটে দিল ঘরের। হৃদয়ের সমস্ত আকুতি উজাড় করে দিয়ে শেষ গান গাইছেন লা স্টিলা·· ইটালীতে এই গান শোনা গিয়েছিল দীর্ঘ পাঁচ বছর আগে···আবার শোনা গেল ট্রানসিলভানিয়ায় - ডোনজোনের চূড়োয় অসীম নির্জনতার মধ্যে প্রকাণ্ড এই ঘরে।

সত্যিই ফের গাইছেন লা স্টিলা! গাইছেন শুধু ব্যারন রুডল্‌ফের মনস্তুষ্টির জন্যে···আর কারো জন্যে নয়···কথা যেন নিঃশ্বাস হয়ে ঝরে পড়ছে ঈষৎ উন্মুক্ত অধরোষ্ঠের ফাঁক দিয়ে · ঠোঁট নড়ছে না ·· মুখ নড়ছে না···কিন্তু গানের রাণী লা স্টিলা বিমূর্ত হয়েছেন ভুবন ভোলানো গানের মধ্যে ·

মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে রইলেন ফ্রাঞ্জ·· দীর্ঘ পাঁচ বছর এ-গান তিনি শোনেন নি···দীর্ঘ পাঁচ বছর একটা কথাই তিনি ধ্রুব সত্য বলে জেনে এসেছিলেন—লা স্টিলাকে আর দেখতে পাবেন না·· লা স্টিলা আর গান শোনাবেন না কিন্তু সব মিথ্যে · মিথ্যে মিথ্যে···জাদুমন্ত্রবলে যেন মাটি ফুঁড়ে আবির্ভূত হয়েছেন লা স্টিলা সশরীরে প্রাণবন্ত রূপে·· !

যেন ফের বেঁচে উঠেছেন লা স্টিলা জাদুকরের কুহক মায়ায়!

সেই গানটাই ফের গাইছেন। ভয়ংকর শেষ রজনীর সর্বশেষ গান। বুক-ভাঙা হাহাকার গানের সুর হয়ে ঝরে পড়েছিল সেই রাতে···কত দীর্ঘশ্বাস, চাপা ব্যথা রূপ নিয়েছিল সুরের মধ্যে। ওরল্যানডো গীতিনাট্যের বিয়োগান্তক দৃশ্যের সেই হতভাগিনীই বটে। চূড়ান্ত মুহূর্তে কলজে থেকে রক্ত ঝরিয়ে গাইছেন :

"Inamorata, mio cuore tremante
Voglio morire"

অমর গীতিকাহিনীর প্রতিটি কথা গেঁথে গেল ফ্রাঞ্জের অন্তরে·· যেন লা স্টিলা ফের মঞ্চে নেমেছেন সান কার্লো থিয়েটারে! কিন্তু এবার আর আচমকা খতম হবে না গানের কলি যেমনটি হয়েছিল পাঁচ বছর আগে ইটালীতে··· !

নিঃশ্বাস নিতেও বুঝি ভুলে গেলেন ফ্রাঞ্জ ··গানের নেশায় আত্মহারা হয়ে গেলেন ··ভুলে গেলেন তিনি কোথায় দাঁড়িয়ে···কার পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন ··

সুর উঠছে, নামছে, সারা ঘরটা রন্ রন্ করছে আশ্চর্য মিহি সুরের ইন্দ্রজালে···আর একটু পরেই সাঙ্গ হবে সুরের স্বর্গরচনা।

কিন্তু একি! স্বর ক্ষীণ হয়ে আসছে কেন? ব্যথা টনটনে দুটি শব্দ উচ্চারণ করতে গিয়েও যেন পারছেন না লা স্টিলা ··

"Voglio morire."

আবার স্টেজে আছড়ে পড়বেন নাকি লা স্টিলা পাঁচ বছর আগের মত?

না। লুটিয়ে পড়লেন না বটে, তাল কেটে গেল। সান কার্লো থিয়েটারে ঠিক যেভাবে যে জায়গায় সুর ছিঁড়ে গিয়েছিল, ঠিক সেই ভাবে সেই জায়গায় পৌঁছেই লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল গানের স্বর্গ—বিষম কষ্টে আর্ত চীৎকার করে উঠলেন লা স্টিলা কলজে ছিঁড়ে গেল যেন আবার—ঠিক এইভাবে এইরকম নাটকীয়ভাবে সান কার্লো থিয়েটারেও শেষ চীৎকার করে লুটিয়ে পড়েছিলেন নিষ্প্রাণ লা স্টিলা···

কিন্তু এবার আর ভূলুণ্ঠিত হলেন না সুন্দরী লা স্টিলা·· দুহাত বাড়িয়ে নরম চোখে শুধু চেয়ে রইলেন কাউন্টের পানে—চোখের পাতা পর্যন্ত কাঁপল না।

লাফিয়ে সামনে ছুটে গেলেন ফ্রাঞ্জ আর দেরি নয়· ·ফের সর্বনাশ ঘটবার আগেই লা স্টিলাকে কাঁধে ফেলে তিনি উধাও হবেন কাস্‌ল্‌গড়ের বাইরে··

ঠিক সেই সময়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ব্যারন। মুখোমুখি দাঁড়ালেন দুই পরম শত্রু—ব্যারন আর কাউন্ট।

"একি! ফ্রাঞ্জ ডি টেলেক! খাঁচা খুলে পালিয়েছেন ফ্রাঞ্জ ডি টেলেক!" ভীষণ চমকে উঠলেন ব্যারন।

জবাব দেওয়ার সময় নেই ফ্রাঞ্জের। পাগলের মত চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটলেন মঞ্চের দিকে—"স্টিলা…স্টিলা…বেঁচে আছেন… স্টিলা বেঁচে আছেন!"

"বেঁচে আছেন! লা স্টিলা বেঁচে আছেন!" আবার যেন চমকে উঠলেন ব্যারন।

পরক্ষণেই বিদ্রূপের হাসিতে ফেটে পড়লেন…অট্টহাসিতে কেঁপে উঠল আপাদ মস্তক জিঘাংসায় জঘন্য হল মুখচ্ছবি!

"বেঁচে আছেন! বটে! তাই বুঝি ফ্রাঞ্জ ডি টেলেক এসেছে তাঁকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে!" চিবিয়ে চিবিয়ে ফের বললেন রুডলফ ডি গর্ত্স্!

দুহাত সামনে বাড়িয়ে দিলেন ফ্রাঞ্জ। লা স্টিলা এখনো চেয়ে আছে তাঁর পানে স্নিগ্ধ নিষ্পলক চাহনি!

ঠিক তখনি হেঁট হলেন রুডল্ফ্। ফ্রাঞ্জের হাত থেকে খসে পড়া ছুরিটা কুড়িয়ে নিলেন কার্পেট থেকে এবং ধেয়ে গেলেন নিষ্পন্দ নারীমূর্তির দিকে

ফ্রাঞ্জও ছুটলেন ব্যারনকে আটকানোর জন্যে… ছুরি বসল বলে লা স্টিলার বুকে

কিন্তু আটকানো গেল না। বিদ্যুৎবেগে মঞ্চে উঠেই চক্ষের পলকে ব্যারন ছোরা মারলেন লা স্টিলার বুকে।…

কাঁচ ভাঙার ঝন্ ঝন্ শব্দ শোনা গেল। ভাঙা কাঁচ ছড়িয়ে পড়ল ঘরময়।

অদৃশ্য হয়ে গেলেন লা স্টিলা!

পাথর হয়ে গেলেন ফ্রাঞ্জ!… সেইসঙ্গে হতচকিত!… লা স্টিলার মত তিনিও কি শেষে পাগল হয়ে গেলেন?

সম্বিৎ ফিরে এল ব্যারনের বীভৎস চীৎকারে—

"লা স্টিলা আবার উধাও হলেন ফ্রাঞ্জ ডি টেলকের খপ্পর থেকে! লা স্টিলার গলা কিন্তু রইল আমার কাছে…থাকবে চিরদিন।… লা স্টিলার গলা আমার… আমার আর কারো নয় কেউ তা পাবে না…"

ছিটকে গেলেন ফ্রাঞ্জ ব্যারনের টুঁটি টিপে ধরার জন্যে। কিন্তু স্নায়ু আর ধকল সইতে পারল না। সহসা রাজ্যের অন্ধকার নামল চোখের সামনে। জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন মঞ্চের গোড়ায়।

ফিরেও তাকালেন না ব্যারন। খপ করে তুলে নিলেন টেবিল থেকে প্রায় চৌকোনা বাক্সটা, তীরের মত ছুটে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। দ্রুতপদে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন ডোনজোনের একতলার ছাদে। ছুটে অন্য দরজার দিকে যাচ্ছেন, এমন সময়ে শোনা গেল রাইফেল-নির্ঘোষ।

পরিখার ঢালু পাড়ে দাঁড়িয়ে রোজকো। ব্যারনকে তাগ করে আগুন ছুটে এসেছে তারই রাইফেল থেকে।

গুলি ব্যারনের গায়ে লাগল না—তবে চুরমার করে দিল হাতের বাক্সটা।

ভীষণ চীৎকার করে উঠলেন ব্যারন।

"গেল · গেল সব গেল! লা স্টিলার প্রাণ ভোমরা গুঁড়িয়ে গেল!… লা স্টিলার গানের গলা উড়ে গেল!"

নিমেষ মধ্যে মাথার চুল দাঁড়িয়ে গেল ব্যারনের। দুই হাত মুঠি পাকিয়ে উন্মাদের মত ছুটলেন ছাদের ওপর দিয়ে—

"গুঁড়িয়ে গেল স্টিলার গলা!…উড়ে গেল প্রাণ ভোমরা! নিপাত যা· নিপাত যা তোরা!"

হাহাকারের শব্দ মিলিয়ে গেল সিঁড়ির সুরঙ্গে। উধাও হলেন ব্যারন!

পুলিশের অপেক্ষায় আর কি দেরি করা যায়? নিক ডেক আর রোজকো দুজনে সাত তাড়াতাড়ি উঠতে গেল কেল্লার পাঁচিলে…

আচম্বিতে দিগবিদিক থর থর করে কেঁপে প্রলয়ংকর বিস্ফোরণে। ভূমিকম্প আরম্ভ হয়ে গেল যেন সারা প্লেটোয়। লেলিহান শিখা লাফ দিয়ে গা চেটে দিল উড়ন্ত মেঘের। স্খলিত পর্বতের মত শিলাখণ্ড ঠিকরে গেল ভলক্যান রোড পর্যন্ত।

উড়ে গেল বুরুজ, প্রাকার, ডোনজোন, গির্জে, কার্পেথিয়ান কাস্‌ল্‌। রইল শুধু ধূমায়িত ধ্বংসস্তূপ আর সারা ওরগাল প্লেটো জুড়ে ছড়ানো বড় বড় প্রস্তর খণ্ড।

১৭॥ পেত্নীর সঙ্গে হাত মিলোবি?
দিনু তোরে সাজা!
পাগল হয়ে থাকরে তুই
আমি ভূতের রাজা!

ঠিক ছিল, ব্যারন কেল্লা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর ডিনামাইটগুলো ফাটবে। কিন্তু তার অন্যথা হল কেন? কেল্লার মধ্যে থাকতে থাকতেই কল্পনাতীত বিস্ফোরণ ঘটল কেন? রোজকোর বুলেট হাতের বাক্স গুঁড়িয়ে দিতেই দিতেই বিকট গলায় কিসব আবোল তাবোল চেঁচিয়ে ছিলেন ব্যারন· মাথা মুণ্ডু বোঝা ভার সে-সব কথার! গান স্তব্ধ হতেই কি তাহলে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন ব্যারন? শোকে দুঃখে হতাশায় রাগে উন্মাদ হয়ে ছুটে-

ছিলেন দিগবিদিক জ্ঞান হারিয়ে? খেয়াল ছিল না কখন কোন মুহূর্তে ইলেকট্রিক মেশিন চালু করতে হবে? কেল্লা গুঁড়িয়ে দিতে হবে? মাথার ঠিক ছিল না বলেই কি অসময়ে ডিনামাইট ফাটিয়ে খতম করতে চেয়েছিলেন দুশমনদের?

কপাল বটে পুলিশদের। বিস্ফোরণের সময়ে তারা কেউই প্রেটোয় ওঠেনি। রোজকোর আচমকা গুলিবর্ষণে চমকে উঠলেও পাথর-বৃষ্টিতে কেউ হতাহত হয় নি। গায়ে আঁচড়টিও লাগেনি। দুর্গ-প্রাকারের পাদমূলে হাজির ছিল কেবল নিক ডেক আর রোজকো। স্রেফ আয়ু ছিল বলেই যেন তারা পাথর চাপা পড়েনি।

পুলিশের কাজ সহজ করে দিল বিস্ফোরণ। বড় বড় পাথরের টুকরোয় প্রায় ভরাট হয়ে গেল সুগভীর পরিখা। টপাটপ পাথর ডিঙে দলবলে সবাই ঢুকে পড়ল.কেল্লার ধ্বংসাবশেষে।

বেশি দূর যেতে হল না। পঞ্চাশ গজ দূরে ডোনজোনের তলায় পাওয়া গেল একটা নিথর নিস্পন্দ নিষ্প্রাণ দেহ। ব্যারন রুডল্ফ্‌কে দেখেই চিনলেন মাস্টার কোল্‌জ এবং বার্স্ট গ্রামের বুড়ো মাতব্বররা।

কিন্তু কাউণ্ট কোথায়? হন্যে হয়ে খুঁজতে লাগল নিক ডেক আর রোজকো। বিস্ফোরণের সময়ে নিশ্চয় তিনি ভেতরেই ছিলেন। কথামত রোজকোর সঙ্গে তিনি দেখা করেন নি। তার মানে কেল্লায় ঢুকেছেন— বেরোতে আর পারেন নি।

অথচ তিনি নেই। দেহ নিপাত্তা। তবে কি আর বেঁচে নেই তিনি? এই বিপর্যয়ের পর-ও বেঁচে থাকা কি সম্ভব? ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল রোজকো। নিক ডেক ভাষা খুঁজে পেল না তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার।

একটানা আধঘণ্টা তল্লাসির পর অবশেষে পাওয়া গেল কাউণ্টের দেহ। ডোনজোনের ওপরতলার ধ্বংসাবশেষে একটা মস্ত কড়িকাঠের তলায় শুয়ে ছিলেন ফ্রাঞ্জ। জীবিত। কড়িকাঠটাই পাথর চাপা পড়তে দেয়নি তাঁকে। একেই বলে নিয়তি!

"মালিক···মালিক!" ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল রোজকো।

"কাউণ্ট—"বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে ডাক দিল নিক ডেক।

ওরা ভেবেছিল, কাউণ্ট মারা গিয়েছেন। আসলে তিনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন।

চোখ খুললেন ফ্রাঞ্জ। উদভ্রান্ত চাহনি। রোজকোকে চিনতে পারলেন না। রোজকোর কাতর কান্নাও শুনতে পেলেন না।

পাঁজাকোলা করে কাউন্টকে তুলে নিয়ে ফের কোমল কণ্ঠে ডাকল নিক ডেক। জবাব পেল না।

বিহ্বল কণ্ঠে শুধু গেয়ে উঠল লা স্টিলার শেষ গান—

"Inamorata—Voglia morire"

মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে ক্রাঙ্ক ডি টেলেকের!

১৮॥ ছায়া মায়ায় গড়া মোরা
ছায়াবাজি নাম,
কলের গানের নামে তবু
চমকে ওঠে গ্রাম!

মুস্কিল দেখা দিল কাউন্ট পাগল হয়ে যাবার পর। কাসল গড়ের শেষ রহস্যের ইতিবৃত্ত তিনি ছাড়া আর কেউ জানেন না। তবে কি শেষ রহস্য চির রহস্য হয়ে থাকবে?

মোটেই না। দিন কয়েকের মধ্যেই জানা গেল কেল্লা রহস্যের অনেক কিছু।

কথা ছিল, বিসত্রিজে অরফানিক অপেক্ষা করবে ব্যারনের। কিন্তু চারদিন পথ চেয়ে বসে থাকার পরেও ব্যারন এলেন না দেখে উৎকণ্ঠায় উদ্বেগে বার্স্ট গ্রামে দৌড়ে এল অরফানিক। বিস্ফোরণের শিকার হন নি তো ব্যারন? পাথর চাপা পড়েন নি তো? ভাঙা কেল্লার আনাচে কানাচে ঘুর ঘুর করতে লাগল সে পাগলের মত ব্যারনের খোঁজে।

রোজকো দেখেই চিনেছিল তাকে। ফলে, পুলিশ গ্রেপ্তার করল অরফানিককে। নিয়ে গেল রাজধানীতে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে। জিজ্ঞাসাবাদের ফলে ফাঁস হয়ে গেল অনেক চাঞ্চল্যকর রহস্য।

ব্যারনের মৃত্যুতে খুব একটা বিচলিত হয় নি অরফানিক। আত্মকেন্দ্রিক মানুষ তো। মাথাতেও ছিট আছে। বৈজ্ঞানিক ধ্যান ধারণা ছাড়া মাথার মধ্যে আর কিছুই নেই। ব্যারন রুডল্‌ফের শোচনীয় মৃত্যু তাই নাড়া দিতে পারেনি তাকে।

প্রথম প্রশ্নটা করেছিল অবশ্য রোজকো। লা স্টিলা কি সত্যিই বেঁচে আছে? ফ্যা-ফ্যা করে হেসে বলেছিল অরফানিক—পাগল, লা স্টিলা সত্যিই মরেছে। সত্যিই তার মরা দেহটাকে গোর দেওয়া হয়েছে। নেপল্‌স্‌-য়ের ক্যাম্পো সান্তো নুয়োভো গোরস্থানে পাঁচ বছর আগে সত্যিই তাকে ধুমধাম

করে সমাধি দেওয়া হয়েছে। মাটি খুঁড়লে এখনো কংকাল পাওয়া যাবে বই কি।

শুনে আরো আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল রোজকোর। সেকী কথা! সে যে নিজের চোখে বুরুজের ছাদে দেখেছে লা স্টিলাকে? ফ্রাঞ্জ তাঁর গান শুনেছেন সরাইখানায়, পাতাল কক্ষে এবং ডোনজোনের ছাদে! স্বচক্ষে দেখেছেনও তাঁকে! হেঁয়ালী তো সরল হচ্ছে না। বরং আরো জটপাকিয়ে যাচ্ছে!

বুঝিয়ে দিল অরফানিক। উদ্ভট কাণ্ডকারখানার অতি সহজ ব্যাখ্যা শুনে বিশ্বাস করতেও মন চাইল না অনেকের।

ফ্রাঞ্জ ডি টেলেকের সঙ্গে লা স্টিলার বিয়ের খবর ছড়িয়ে পড়তেই মনে মনে খুব ভেঙে পড়েছিলেন ব্যারন রুডলফ। সত্যি সত্যিই গান প্রেমিক ছিলেন তিনি। লা স্টিলার গান-ই তাঁকে যেন বাঁচিয়ে রেখেছিল দিনের পর দিন। সেই গান আর শোনা হবে না জেনে পাগলের মত হয়ে গেলেন ব্যারন।

তাঁর ঐ অবস্থা দেখে জবর বুদ্ধি বাতলালো কানা বৈজ্ঞানিক। ফোনোগ্রাফ তখন সবে জন্ম নিয়েছে। সমসাময়িক বৈজ্ঞানিকরা কলের গানের অনেক উন্নতি করেছেন। অরফানিক বললে, সে ইচ্ছে করলে ফোনোগ্রাফের এমন উন্নতি করতে পারে যা বৈজ্ঞানিকরা এখনো ভাবতেই পারে নি। ফোনোগ্রাফে লা স্টিলার গান রেকর্ড করে রাখলেই তো ল্যাটা চুকে যায়। তার আবিষ্কৃত কলের গানে গান শুনলে মনেই হবে না যন্ত্রের মধ্যে থেকে গান বেরোচ্ছে—মনে হবে যেন পাশে বসে রক্ত-মাংসের লা স্টিলা গান গাইছেন!

প্রস্তাব শুনে আকাশের চাঁদ যেন হাতে পেলেন ব্যারন। কলের গানের দৌলতে যতবার খুশী গান শুনতে পাওয়ার সৌভাগ্য ক'জনের ভাগ্যে জোটে? অতি সন্তর্পণে কাকপক্ষীকেও না জানিয়ে যন্ত্রপাতি বসানো হল থিয়েটারের প্রাইভেট বক্সে। অরফানিক নিয়মিত আসত লা স্টিলার গান রেকর্ড করতে। গীতিনাট্যের বহু অংশ, অর্কেস্ট্রা, অরল্যাণ্ডোর শেষ দৃশ্য পর্যন্ত হুবহু রেকর্ড করে নেওয়া হল কলের গানে। এমন কি লা স্টিলার আর্তচীৎকার এবং শেষ দীর্ঘশ্বাসটুকুও বাদ গেল না।

কলের গান নিয়ে কার্পেথিয়ান কাস্‌ল্‌-য়ে ফিরে এলেন ব্যারন। সংসারের আর কারো মুখ দর্শন করতে চাইলেন না। নির্জনে বসে অত্যাশ্চর্য মেশিন চালু করে দিয়ে শুনতেন লা স্টিলার অতুলনীয় গান লা স্টিলা যেন গানের মধ্যে দিয়ে ফের জীবন্ত হয়ে উঠতেন···

সবচেয়ে আশ্চর্য কথা, গান শুরু হলেই লা স্টিলা সত্যি সত্যিই এসে দাঁড়াতেন সামনে। ঠিক যেন সান কার্লোর মঞ্চে দাঁড়িয়ে চুল এলিয়ে দুহাত বাড়িয়ে উদাসিনী লা স্টিলা গাইছেন তার শেষ গান!

কী ভাবে? ভৌতিক কিছুই নয়। স্রেফ ছায়াবাজি। চোখের ধাঁধা।

আগেই বলা হয়েছে, লা স্টিলার একটা মূল্যবান ছবি কিনেছিলেন ব্যারন। ক্যানভাসের ছবির দিকে তাকালে দৃষ্টি বিভ্রম ঘটত। মনে হত যেন স্বয়ং লা স্টিলা দাঁড়িয়ে আছেন নরম চোখে তাকিয়ে। শ্বেত বস্ত্র। চুল খোলা। অরল্যাণ্ডোর শেষ দৃশ্যে অ্যানজেলিকার ভূমিকায় যেন গান গাইছেন লা স্টিলা।

অরফানিক বিশেষ কোনো দর্পণের সাহায্যে এই ছবির প্রতিবিম্ব নিক্ষেপ করত এমনভাবে যে আয়নার ছায়া জীবন্ত হয়ে উঠত চোখের সামনে। প্রখর আলোয় প্রাণসঞ্চার ঘটত যেন ক্যানভাসের ছবির মধ্যে। প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব রঙে রূপে সজীব হয়ে ভাসত বিস্মিত চোখের সামনে।

আশ্চর্য এই আবিষ্কারটাকেই বুরুজের ছাদে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল অরফানিক। রাতের অন্ধকারে ছায়াবাজি দেখিয়ে ভুলিয়েছিল ফ্রাঞ্জকে। দেখেই উদভ্রান্ত হয়েছিলেন ফ্রাঞ্জ। ডোনজোনের ওপর তলায় ব্যারন যখন গান শুনতে মোহিত, এই 'সজীব' ছায়াই তখন ভাসছিল বায়স্কোপের মত কাঁচের পর্দায়। ফ্রাঞ্জ অত কাছ থেকে দেখেও ফাঁকি ধরতে পারেন নি। কাঁচ ভেঙে যেতেই ছায়া মিলিয়ে গিয়েছে—পাগল হয়ে গিয়েছেন।

সবই কলের কারসাজি। বুক ফুলিয়ে নিজের কীর্তি জাহির করল অরফানিক জেরার সময়ে। ভূতপ্রেত তার হাতের পুতুল। সারা গ্রামকে সে একাই নাচিয়েছে, ভয়ে কাঠ করে রেখেছে। নিক ডেক মরতে মরতে বেঁচে গেছে, ফ্রাঞ্জ পাগল হয়ে গিয়েছেন। ক'জন পারে এমন কলের কেরামতি দেখাতে?

সব তো হল, কিন্তু কেল্লা থেকে বেরোনোর আগেই ব্যারনের মাথায় কেল্লা ভেঙে পড়ল কেন? ভেল্কীর জাদুকর সে সন্দেহ নেই, কিন্তু এত করেও শেষ রক্ষে করা গেল না কেন? কেল্লা থেকে চম্পট দেওয়ার আগেই কেন মালিকের মাথায় ভেঙে পড়ল বুড়ো কেল্লা? দোষটা কার?

মাথা চুলকোলো অরফানিক। এ রহস্য তাকেও ভাবিয়ে তুলেছে বইকি। তারপর যখন শুনল, রোজকো গুলি ছুঁড়ে ব্যারনের হাতের বাক্স চুরমার করে দিতেই পাগলের মত হাঁফ ছেড়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়েছিলেন ব্যারন—তখন এক গাল হেসে বললে—"বুঝেছি! আত্মহত্যা করলেন মালিক!"

"আত্মহত্যা! কেন?"

ফ্যা-ফ্যা করে হেসে বলেছিল অরফানিক—লা স্টিলার ঐ কলের গান ছিল তাঁর প্রাণ। গান চুরমার হতেই তাঁর প্রাণও চুরমার হয়ে গিয়েছে। বেঁচে থেকে আর লাভ কী? বিশেষ ঐ কলের গানের মধ্যেই ধরা ছিল লা স্টিলার শেষ গান—ডোনজোনে বসে এই গানটাই শেষবার শোনার খেয়াল হয়েছিল ব্যারনের। অত সাধের গান গুঁড়িয়ে যেতেই তাই উনি আর বাঁচতে চাননি।

যথাবিধি সম্মান সহকারে কেল্লার গোরস্থানেই গোর দেওয়া হল ব্যারনকে। ক্রাজোয়া কাস্‌ল্-য়ে ফ্রাঞ্জকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল রোজকো। অরফানিক দয়া করে লা স্টিলার অন্যান্য কলের গানগুলো দান করেছিল কাউন্টকে। দিবারাত্র এই গান বাজিয়ে শোনানো হত তরুণ কাউন্টকে। গান শুনলেই ছটফটানি কমে যেত ফ্রাঞ্জের, সহজ হয়ে আসত উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। কথায় বলে, গান স্বর্গের সম্পত্তি। গান শুনলে দেবতাও তুষ্ট হন। পাগলের পাগলামি কেটে যাবে, এ-আর আশ্চর্য কী। মাস কয়েকের মধ্যে ফ্রাঞ্জও ভাল হয়ে গেলেন। কাস্‌ল্‌গডের শেষ রহস্য-কাহিনী উপহার দিলেন সবাইকে।

কার্পেথিয়ান কাস্‌ল্ ভেঙে পড়ার সাতদিন পরেই খুব ধুমধামের মধ্যে দিয়ে বিয়ে হয়ে গেল নিক ডেকের সঙ্গে মিরিওটার। ভলক্যান নগর থেকে বরবউ ফিরতেই মাস্টার কোল্‌জ তাঁর বাড়ীর সব সেরা ঘরটা ছেড়ে দিলেন মেয়ে জামাইয়ের জন্যে।

কার্পেথিয়ান কাস্‌ল্-য়ের ভূত-ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানা আসলে কলের কেরামতি ছাড়া যে কিছুই নয়—মিরিওটাকে কিছুতেই কিন্তু তা বোঝানো গেল না। ভুতুড়ে কেল্লার নাম করলেই তাই মুখ শুকিয়ে যেত বেচারীর। ফ্যানটাসটিক প্রেতগুলো নাকি এখনো আসর জমিয়ে বসে আছে ভাঙা কেল্লার ওপরে। শুধু নিক ডেক কেন, জোনাস কত বোঝালো গ্রামবাসীদের। সরাইখানায় সবাই জড়ো না হলে তাঁর কারবার যে লাটে উঠবে! কিন্তু কে কার কথা শোনে! ফ্রিক, স্কুল মাস্টার থেকে আরম্ভ করে মাস্টার কোল্‌জ পর্যন্ত ভয়ে সিঁটিয়ে যেতেন কার্পেথিয়ান কাস্‌ল্-য়ের নাম করলেই! বেশ বোঝা গেল, বহু বছর লাগবে ভয়কাতুরে এই মানুষগুলোর ভয় ভাঙতে।

ডাক্তার পাটাক আগের মতই লম্ফঝম্প জুড়লেন। বারফট্টাই ছাড়তে লাগলেন নানারকম—"ভূত?…ছোঃ! ভূত আবার আছে নাকি?…আমি তো আগেই বলেছিলাম কাস্‌ল্-য়ে ভূত-ফুত কিচ্ছু নেই…!"

শুনে কেউ চটে বোম্ হল, কেউ তেড়ে এল দাঁত খিঁচিয়ে। গাড়োয়ানী

ইয়ার্কির একটা সীমা আছে! ভূত নিয়ে ফষ্টিনষ্টি ভূতেরা কখনোই সহ্য করে না!

ম্যাজিস্টার হারমড আগের মতই ভূত পেত্নীদের গল্প শোনাতে লাগলেন গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের। বহু যুগ পরেও হয়ত শোনা যাবেই সেই একই কাহিনী—পরলোক থেকে ভূত-প্রেত-দত্যি-দানো পিশাচ ডাইনীরা এসে নাকি রোজ রাত্রে নাচানাচি করে কার্পেথিয়ান কাস্‌ল্‌-য়ের ধ্বংসস্তূপে!

পাতাল অভিযান

[এ-জার্নি টু দি সেণ্টার অফ দি আর্থ]

১॥ আমার কাকা লিডেনব্রক

চব্বিশে মে, ১৮৬৩ সাল। রবিবার। আমার কাকা প্রফেসর লিডেনব্রক ঝড়ের মত ফিরছিলেন তাঁর উনিশ নম্বর কনিগ্ স্ট্রাফ স্ট্রীটের ছোট্ট বাড়ীতে। হামবুর্গের পুরোনো পাড়ার অন্যতম প্রাচীনতম রাস্তা হল এই কনিগ্ স্ট্রাফ স্ট্রীট।

মার্থা ভাবছিল বুঝি ওরই খুব দেরী হয়ে গিয়েছে। কেননা, রান্নাঘরের স্টোভে রাতের খাবার তখন সবে সোঁ-সোঁ করে ফুটতে শুরু করেছে।

আমি নিজের মনেই বলছিলাম—"কাকা এসে যদি দেখেন রান্নাবান্না হয়নি, তাহলে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করে ছাড়বেন। যা অধৈর্য উনি।"

"এসে গেছেন প্রফেসর লিডেনব্রক!" খাবার ঘরের দরজা অর্ধেক খুলে অবাক কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল মার্থা। বলেই সাঁ করে উধাও হল ওর রন্ধন-গবেষণাগারে।

একা বসে রইলাম আমি। কোপন স্বভাব খুড়োমশায়ের সামনে থাকাটা ঠিক হবে না, এই চিন্তা করে আমিও গুটিগুটি কেটে পড়বার মতলব করছি আমার ওপর তলার ঘরে, এমন সময়ে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে হুহাট হল রাস্তার দরজা, কাঠের সিঁড়ি কেঁপে উঠল গুরুভার পায়ের চাপে, এবং গৃহস্বামী খাবার ঘরের মধ্যে দিয়ে ধেয়ে এলেন তাঁর পড়বার ঘরে।

আসবার পথেই অবশ্য গোলমাথা ছড়িটাকে ঘরের কোণে এবং চওড়া-কিনারা টুপীটাকে টেবিলের ওপর নিক্ষেপ করবার সঙ্গে সঙ্গে হুকুমটাও ছুঁড়ে দিয়ে গেলেন তাঁর ভাইপোর প্রতিঃ "অ্যাকজেল, চলে এসো!"

আমিও সাঁ করে ছুটে গেলাম আমার দোর্দণ্ড প্রতাপ মনিবের পড়ার ঘরে।

অটো লিডেনব্রক লোকটা খারাপ নন। কিন্তু দারুণ খামখেয়ালী। সেই সঙ্গে ভীষণ রকমের ছিটিয়াল, মানে, ছিটগ্রস্ত।

কাকা অধ্যাপনা করতেন জোহান্নিয়ামে। বক্তৃতা দিতেন খনিজ তত্ত্বের ওপর। প্রতিটি বক্তৃতার সময়ে এক আধবার তিরিক্ষে মেজাজের পরিচয় দিতেন ছাত্রদের। তাঁর ছাত্ররা বক্তৃতা শুনতে এল কিনা, মন দিয়ে বক্তিমে শুনল কিনা, অথবা পরে বক্তৃতা শুনে লাভবান হল কিনা—তা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামান না কাকামশায়। জার্মান দার্শনিকদের মত তাঁরও শিক্ষাদান ব্যাপারটা নিছক নিজের জন্যই—পরের জন্যে নয়। দারুণ স্বার্থপর পড়ুয়া ছিলেন আমার কাকা। নিজে বিদ্যের জাহাজ— কিন্তু এককণা বিদ্যে সেই জাহাজ থেকে কেউ আহরণ করতে গেলেই অমনি বেঁকে বসতেন। সোজা কথায়, শিক্ষাদানের ব্যাপারে উনি কিপটে। জার্মানীতে তাঁর ধাতের প্রফেসর আরও কয়েকজন আছেন।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমার কাকামশায় তড়বড় করে কথা বলতে পারতেন না। বাড়ীতে যাও যা বলতেন, পাঁচজনের সামনে গেলে তাও আটকে যেত। বক্তার পক্ষে এ হল একটা শোচনীয় ত্রুটি। জোহান্নিয়ামে লেকচার দেবার সময়ে ঘটত এই বিভ্রাট। মাঝে মাঝে এক-আধটা বিদ্রোহী শব্দ ঠোঁট দিয়ে আর গলতে চাইত না। শেষকালে অনেক ধাক্কা খেয়ে অনেক লড়াই করে তেড়ে ফুঁড়ে যখন বেরিয়ে পড়ত শব্দগুলো, তখন তা নেহাৎই অবৈজ্ঞানিক আকারে আছড়ে পড়ত শ্রোতাদের কানে। ফলে, রেগে তিনটে হয়ে যেতেন খুড়ামশায়।

খনিজ বিদ্যেতেও রয়েছে বিপুল সংখ্যক বর্বর শব্দ। তাদের অর্ধেক গ্রীক, অর্ধেক ল্যাটিন। উচ্চারণ করতে গেলে কাল ঘাম ছুটে যায়, কবিদের ঠোঁটের চামড়া ছিঁড়ে যায়। বিশেষ এই বিজ্ঞানের মুণ্ডপাত করার জন্যে এসব কথা আমি বলছি না। তবে রম্বোহেড্রাল, ক্রস্ট্যালস, রেটিনাস্‌ফালটিক রেজিনস, গেলেনাইটস, ফানগাসাইটস, মলিবডেনাইটস, টাঙসটেটস অফ ম্যানগানিজ এবং টাইটানাইট অফ জারকোনিয়াস জাতীয় শব্দ নিচয় উচ্চারণ করতে গিয়ে যদি জিভ এলিয়ে পড়ে, তাহলে সে জিভকে ক্ষমা করাই উচিত।

সারা শহর কাকামশায়ের এই ক্ষমার্হ ত্রুটির বৃত্তান্ত জানত। সুযোগও নেওয়া হত গলদটার। ছাত্ররা বিপজ্জনক শব্দগুলোর প্রতীক্ষায় কান খাড়া করে থাকত। যেই হোঁচট খেতেন প্রফেসর, অমনি হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ত তারা। প্রফেসর লিডেনব্রকের শ্রোতা সমাগম বিপুল সংখ্যক হলে তো আর কথাই নেই। অধিকাংশ শ্রোতাই মজা লুটতো প্রফেসরের অগ্নিশর্মা মূর্তির হাস্যকর দৃশ্য দেখে। যাই হোক, আগেই বলেছি, কাকা আমার খাঁটি বিদ্যেদিগগজ। ওঁর মধ্যে প্রতিভা আছে দুটি—ভূতত্ত্ব আর খনিজ তত্ত্ব—

ছুটোই ওঁর নেশার বস্তু। হাতুড়ি, কাঁটা কম্পাস, ব্লোপাইপ আর নাইট্রিক অ্যাসিডের বোতল হাতে পেলে আমার খুড়ামশায় তখন অন্য মানুষ। যে কোনো খনিজ পদার্থের ফাটাফুটো চেহারা, কঠিনতা, গলে যাওয়ার ক্ষমতা, শব্দ, গন্ধ আর স্বাদ বিচার করেই উনি বলে দিতে পারেন আধুনিক বিজ্ঞান যে-ছশরকমের খনিজ পদার্থের সন্ধান পেয়েছে, হাতের নমুনাটি তার কোন শ্রেণীতে পড়ে।

কলেজে এবং জ্ঞানীগুণী মহলে লিডেনব্রকের নাম এই কারণেই শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করা হয়। হামবুর্গে এলে হামফ্রি ডেভী, হামবোল্ড, ক্যাপ্টেন ফ্রাঙ্কলিন এবং জেনারেল স্যাবাইন তাঁর সঙ্গে দেখা না করে যেতেন না। কেমিস্ট্রির শক্ত শক্ত সমস্যা নিয়ে হামেশাই তাঁর বুদ্ধি নিতেন বড় বড় কেমিস্টরা।

অনেকগুলি আশ্চর্য আবিষ্কারের জন্যে বিশেষ এই বিজ্ঞান চিরঋণী থাকবে তাঁর কাছে। ১৮৫৩ সালে প্রফেসর অটো লিডেনব্রকের লেখা ক্রিস্ট্যাল তত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণা গ্রন্থটি অবশ্য পয়সা কড়ির দিক দিয়ে মার খেয়েছে বেধড়কভাবে। বই ছাপাব খরচও নাকি ওঠেনি।

এসব ছাড়াও আমার কাকা রাশিয়ান রাজদূত প্রতিষ্ঠিত খনিজ পদার্থ মিউজিয়ামের কিউরেটর। সারা ইউরোপে খ্যাতি আছে এই জাদুঘরটির দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহের জন্যে।

এ হেন ভদ্রলোকই অধীরভাবে ডাক দিয়ে গেলেন আমাকে। মনে মনে কল্পনা করা যাক একজন দীর্ঘ, শীর্ণ মানুষকে। স্বাস্থ্য মজবুত। যুবকের মত চেহারা। দেখলে পঞ্চাশ বছর বলে মনে হয় না—মনে হয় যেন আরো দশ বছর কম। মস্ত মস্ত চশমার আড়ালে সদাঘূর্ণ্যমান দুটি বিশাল চক্ষু। লম্বা ধারালো নাক দেখলে ছুরীর ফলার কথা মনে পড়ে। পাজী ছাত্ররা অবিশ্যি বলত নাকটায় নাকি চৌম্বক শক্তি আছে এবং চুম্বকের মতই লোহার কুচি কাছে টেনে নেয়। যদিও তা নয়। ঘন ঘন এবং বিপুল পরিমাণে নস্য আকর্ষণ করা ছাড়া খাঁড়া-নাকের আর কোনো শক্তি ছিল না।

অঙ্কের হিসেবে তিন ফুট জমি মেপে পা ফেলতেন খুড়ামশায়। হাঁটবাব সময়ে হাতের মুঠো পাকিয়ে রাখতেন যা কিনা প্রচণ্ড মেজাজের প্রকৃষ্ট লক্ষণ। এ-হেন লোকের সঙ্গ পাওয়াটা এইসব কারণেই বেজায় বিপজ্জনক।

ওঁর ছোট্ট বাড়ীটা অর্ধেক ইট আর অর্ধেক কাঠ দিয়ে তৈরী। তিনকোণা একটা জানলা দিয়ে সর্পাকৃতি খাল দেখা যায়। হামবুর্গের পুরোনো পাড়ায় এমনি খাল আরো অনেক আছে। ১৮৪২ সালের বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডর খপ্পর থেকে কোন মতে রেহাই পেয়ে গিয়েছিল প্রাচীন এই পল্লীটি।

অন্যান্য জার্মান বিদ্যেদিগগজদের তুলনায় আমার কাকার অবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছল। বাড়ীটি তাঁর নিজের। বাড়ীতে থাকে তাঁর ধর্মকন্যা গ্রোবেন—বয়স সতেরো বছর। মার্থা। আর আমি। যেহেতু একাধারে আমি তাঁর ভাইপো এবং অনাথ, সুতরাং তাঁর গবেষণা-সঙ্গীও বটে।

ভূতত্ত্ব বিদ্যেটাকে সোৎসাহে আয়ত্ত করতে আরম্ভ করেছিলাম। খনিজ তত্ত্ব রয়েছে আমার রক্তে। দামী দামী নুড়ি পাথর নিয়ে নাড়া চাড়া করতে পারলে আর কিছু চাইতাম না।

এইসব নিয়েই খুশীর ছন্দে এগিয়ে চলেছিল কনিগ্ স্ট্রাফ স্ট্রীটের ছোট্ট ভবনের জীবনযাত্রা। খিটখিটে মেজাজ থাকুক, কাকা আমাকে স্নেহ করতেন খুবই। মানুষটা কিন্তু সবুর করতে পারতেন না কোনো ব্যাপারেই—প্রকৃতির চাইতেও তাঁর তাড়াহুড়োটা যেন একটু বেশী মাত্রায়। এপ্রিল মাসে মাটির পাত্রে চারাগাছ পুঁতে রাখতেন ড্রইংরুমে। তারপর থেকেই প্রতি সকালে পাতাগুলো টেনে টেনে তাড়াতাড়ি গাছটাকে বড় করার চেষ্টা করতেন।

এইরকম খ্যাপা মানুষকে মেনে চলাই মঙ্গল। আমিও দ্বিরুক্তি না করে দৌড়োলাম তাঁর পড়ার ঘরে।

২॥ অদ্ভুত পার্চমেণ্ট

পড়ার ঘর তো নয়, আস্ত একটা মিউজিয়াম। খনিজ জগতের যাবতীয় নমুনা হাজির সেখানে। আমি নিজেও উন্মাদ ছিলাম খনিজ নমুনা নিয়ে। নাওয়া-খাওয়া ভুলে যেতাম, সমবয়েসীদের সঙ্গে আড্ডা মারার কথাও মনে থাকত না যখন গ্র্যাফাইট, অ্যানথ্রাসাইট, কয়লা, লিগনাইট, পীট-এর ধুলো ঝাড়তাম আপন মনে। বিটুমেট, রেজিন, লোহা, সোনা ইত্যাদি মূল্যবান নমুনাগুলোর ওপর যাতে এক-কণা ধুলোও না জমে, কড়া নজর রাখতাম সেদিকে।

ঘরে ঢোকার পর কিন্তু এইসব খনিজ-বিস্ময়ের দিকে নজর গেল না আমার। দেখলাম শুধু আমার কাকাকে। বিরাট ভেলভেট চেয়ারে বসে সপ্রশংস চোখে একটা বইয়ের দিকে তাকিয়ে ছিলেন উনি।

আমাকে দেখেই বললেন—"খাসা বই!"

ওঁর তারিফ শুনেই মনে পড়ল কাকার আর একটা বাতিকের কথা। অবসর সময়ে দুষ্প্রাপ্য পুঁথি আর কেতাব জড়ো করা ওঁর প্রচণ্ড সখ। খুব অনন্যসাধারণ অথবা অপাঠ্য না হলে কোনো গ্রন্থই অবশ্য ওঁর নজর কাড়ত না।

"দেখেছো? কি জিনিস এনেছি দেখো। সেই ইহুদি হ্বাভেলিয়াসের দোকান তোলপাড় করে বার করেছি বইটা।"

জোর করে উৎসাহ টেনে আনলাম কণ্ঠস্বরে—"চমৎকার!"

কিন্তু বুঝলাম না চামড়া বাঁধানো হলদেটে একখানা বই নিয়ে এত নাচানাচির কি আছে? পাতাগুলোও তো দেখছি বিবর্ণ হয়ে এসেছে।

"আহা, কী চমৎকার কেতাব! বাঁধাইটাও কী অপূর্ব! এত পুরোনো, অথচ এখনো কেমন মজবুত। বইটার কত বয়স জানো? সাতশ বছরেও কোথাও নষ্ট হয়নি। এমন খাসা বাঁধাই আমি দেখিনি। যেখানে খুশী খোলা যায়, যখন-তখন ভালো ভাবে বন্ধ করা যায়! বাঃ, বাঃ! বোজরিয়ান, ক্লস, পারগোল্ডরাও ট্যারা হয়ে যেত এমন বাঁধাই দেখলে!"

এই বলে আমার ছিটগ্রস্ত কাকা বার বার বইটা খুলতে লাগলেন এবং বন্ধ করতে লাগলেন।

"বইটার নাম কী?" শুধোলাম আমি।

"টার্লেশনের 'হিমস্ ক্রিংলা'।" আরো উত্তেজিত হয়ে বললেন কাকা। "দ্বাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত লেখক। নরওয়ের যে যুবরাজরা আইসল্যাণ্ড শাসন করেছিল, এ-গ্রন্থ তারই ধারাবাহিক ইতিহাস।"

"তাই নাকি? অনুবাদ নিশ্চয়?"

"অনুবাদ?" গর্জে উঠলেন কাকা। 'অনুবাদ নিয়ে আমার কি হবে? আইসল্যাণ্ডের ভাষায় লেখা এটাই হল মূল বই। আইসল্যাণ্ডের ভাষা কত সমৃদ্ধ তা জানো তো? যেমন তেজালো, তেমনি সরল আর ব্যাকরণের খেলা।"

"জার্মান ভাষার মত?"

"তা ঠিক। তবে ভুলে যেও না গ্রীকদের মত আইসল্যাণ্ডের ভাষায় তিন শ্রেণীর লিঙ্গ আছে। আবার ল্যাটিনের মত প্রপার-নাউনের ধার ধারে না।"

"বইয়ের হরফগুলো ভালো তো?"

"মূর্খ! হরফের কথা বলেছি আমি? আচ্ছা উজবুক ছোঁড়া তো? তুমি কি ভেবেছো এটা ছাপা বই? গাধা কোথাকার—এটা হাতে লেখা রুনিক পাণ্ডুলিপি।"

"রুনিক?"

"হ্যাঁ। এবার নিশ্চয় জানতে চাইবে রুনিক মানে কী?"

"না, না," আহত কণ্ঠে বললাম আমি। কিন্তু কে শুনছে আমার কথা? তেড়েমেড়ে অনেক জ্ঞান দিলেন কাকা। সে সব জ্ঞানের কিছুই আমার জানবার কোনো ইচ্ছে ছিল।

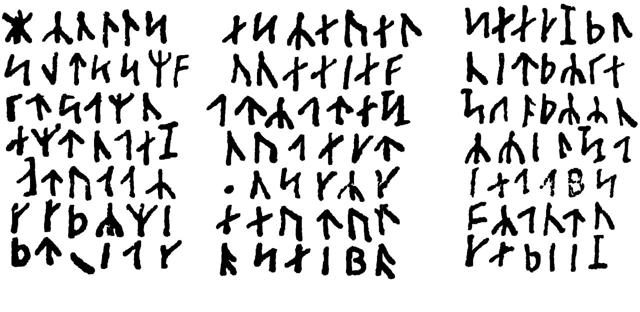
"রুনিক হল আইসল্যাণ্ডের আদিকালের হরফ। পুরাণের মতে নাকি এ-হরফ আবিষ্কার করেছিলেন স্বয়ং ওডিন। ওহে গণ্ডমূর্খ, দেবতার কল্পনা থেকে যে হরফের জন্ম, তা দেখে একটু তারিফ অন্ততঃ করো।"

কি যে বলা উচিত, তা ভেবে না পেয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে যাচ্ছি দেব-কল্পিত রুনিক হরফকে, এমন সময় তুচ্ছ একটা কাগজ এসে মোড় ঘুরিয়ে দিল কথাবার্তার। বইয়ের মধ্যে থেকে টুক করে খসে পড়ল একটা নোংরা পার্চমেণ্ট কাগজ।

ছোঁ মেরে কাগজটা কুড়িয়ে নিলেন কাকা। স্মরণাতীত কাল থেকে পুরোনো পুঁথির মধ্যে বন্দী একটা দলিলের দাম তাঁর চোখে যে কতখানি, তা আমিই জানি।

"কী এটা?" বলতে বলতে টেবিলের ওপর ভাজ মেলে ধরলেন পার্চমেণ্টের। কাগজটার সাইজ লম্বায় পাঁচ ইঞ্চি, চওড়ায় তিন ইঞ্চি। দুর্বোধ্য হরফে লেখা কয়েকটা লাইন লেখা রয়েছে সে কাগজে।

হরফগুলো হুবহু তুলে দিলাম নীচে। অদ্ভুত সাংকেতিক চিহ্নগুলো অবিকল ছাপিয়ে দেওয়া দরকার মনে করি এই কারণে যে এই লিপি হাতে আসার পরেই প্রফেসর লিডেনব্রক এবং তাঁর ভাইপো উনবিংশ শতাব্দীর বিচিত্রতম অভিযান পরিচালনা করেছিলেন অন্য এক জগতে।



উদ্ভট অক্ষরগুলোর দিকে কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন প্রফেসর। তারপর চশমা তুলে বললেন—"রুনিক হরফই বটে। টার্লেসনের পাণ্ডুলিপির সঙ্গে হুবহু মিলেও যাচ্ছে। কিন্তু মাথামুণ্ডু কিছুই তো বুঝছি না।"

রুনিক হরফের কিম্ভূতকিমাকার মূর্তি দেখেই বুঝেছিলাম, এ-হরফের সৃষ্টি হয়েছে কেবল পৃথিবীর সব কিছুতেই হেঁয়ালীর জট পাকানোর জন্যে। সুতরাং প্রফেসর যে হিমসিম খাবেন, এ আর আশ্চর্য কী! উত্তেজনায় দেখলাম থর থর করে আঙুল কাঁপছে কাকার!

"কিন্তু হলফ করে বলতে পারি এ-হরফ আইসল্যাণ্ডের!" দাঁতে দাঁত পিষে বললেন কাকা। তাঁর মত ভাষাবিদও নাজেহাল হয়ে যাচ্ছেন রুনিক হরফের ভোজবাজিতে? পৃথিবীর দু হাজার চারশো ভাষা গড়গড় করে বলতেন না পারলেও বহু ভাষার সঙ্গে মোটামুটি পরিচয় ছিল প্রফেসর লিডেন ব্রকের। কিন্তু তিনিও তো দেখছি হালে পানি পাচ্ছেন না!

বেকায়দায় পড়ে নির্ঘাৎ মাথা গরম করে ফেলবেন কাকা। আমি সেটা আঁচ করেই সরে পড়বার অছিলা খুঁজছে, এমন সময়ে ঢং-ঢং করে ঘড়িতে দুটো বাজল।

দরজা ফাঁক করে মার্থা বললে—"সুপ তৈরী।"

"গোল্লায় যাক সুপ, সুপের রাঁধুনি আর সুপ যারা খায়—তারা!" ফেটে পড়লেন কাকা।

সাঁ করে সরে পড়ল মার্থা। আমিও উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গিয়ে বসে পড়লাম খাবার টেবিলে আমার বসবার চেয়ারে।

মিনিট কয়েক সবুর করলাম। কিন্তু পাত্তা পাওয়া গেল না প্রফেসরের। মার্থা সেদিন রান্নাও করেছে তোফা। এ-রকম রাজসিক খাওয়া ফেলে কিনা নোংরা একটা পার্চমেণ্ট নিয়ে তন্ময় হয়ে রইলেন প্রফেসর?

কি আর করা যায়! খুড়ো-ভক্ত ভাইপোর যা কাজ, আমি তাই করলাম। অর্থাৎ তাঁর হয়ে নিজে খেলাম, তাঁর খাওয়াটাও খেয়ে নিলাম। সুচারুভাবে শেষ করলাম ভাইপোর কর্তব্য।

মার্থা বললে—"জীবনে এমন কাণ্ড দেখিনি বাপু। প্রফেসর লিডেনব্রক খেতে এলেন না!"

"অবিশ্বাস্য, তাই না?"

"নিশ্চয় গুরুতর কিছু ঘটতে চলেছে।"

গুরুতর আর কি হতে পারে? প্রফেসর এসে যখন দেখবেন তাঁর আহার আমার উদরে, তখনকার সেই ভয়ংকর দৃশ্যটা মনে মনে কল্পনা করলাম আমি।

শেষ গলদা চিংড়িটা সবে সাবাড় করেছি, এমন সময়ে প্রফেসরের দুন্দুভি কণ্ঠ ছুটিয়ে দিল আমার খাদ্যবিলাস। লাফ দিয়ে খাবার ঘর থেকে আমি পৌঁছোলাম পড়বার ঘরে।

৩ ॥ কাকা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলেন

"রুনিক…আলবৎ রুনিক হরফ," ভ্রূকুটি করে বললেন প্রফেসর। "কিন্তু কোথায় যেন একটা গুপ্ত ব্যাপার রয়েছে…সিক্রেটটা আবিষ্কার না করা পর্যন্ত—"

"বসো," মুঠো দিয়ে টেবিল দেখিয়ে বললেন কাকা—"লেখো।"

মুহূর্তের মধ্যে তৈরী হলাম কাগজ-কলম নিয়ে।

"আই সল্যাণ্ডের হরফের বদলে আমাদের হরফগুলো একে-একে বলব হুঁশিয়ার হয়ে লিখবে। দেখা যাক, কি দাঁড়ায়।"

বলা শুরু করলেন কাকা। খুব সতর্কভাবে শ্রুতি লিখন লিখলাম। জিনিসটা যা দাঁড়াল, তা কতকগুলো দুর্বোধ্য শব্দ ছাড়া কিছুই নয়:

mm. rnlls	esreuel	seecJde
sgtssmf	unteıef	niedrke
kt, samn	atrateS	saodrrn
emtnael	nuaect	rrilSa
Atvaar	.nscrc	ieaabs
ccdrmi	eeutul	frantu
dt, iac	oseibo	KediıY

লেখা শেষ হতেই কাগজটা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেন কাকা।

"মানে কী?" বললেন কলের পুতুলের মত।

মানে যে কী, তা কি আমিও ছাই বুঝেছি? কাকা অবশ্য আমাকে প্রশ্ন করেন নি। বক বক করে চলেছিলেন আপনমনে।

"এরই নাম হল সাংকেতিক লিপি। অর্থাৎ অক্ষরগুলোকে ইচ্ছে করে এলোমেলো ভাবে সাজিয়ে একটা জগাখিচুড়ি জিনিস দাঁড় করানো। ঠিকমত সাজালে মানেটা কিন্তু পরিষ্কার হয়ে যেত।"

বলে, বই আর পার্চমেণ্ট পাশাপাশি রাখলেন কাকা। বললেন—"হাতের লেখাতো এক নয়। সাংকেতিক লিপি লেখা হয়েছে বই লেখার অনেক পরে। প্রমাণ দিচ্ছি। এই যে ডবল এম দেখা যাচ্ছে লিপির শুরুতেই, এ অক্ষর (m m) তুমি টার্লেসনের বইতে পাবে না। কেন না, ডবল এম আইসল্যাণ্ডের ভাষায় জায়গা পেয়েছে চতুর্দশ শতাব্দীতে। সুতরাং বই আর পার্চমেণ্টের মধ্যে সময়ের ব্যবধান হল কম করেও দুশ বছর।"

অকাট্য যুক্তি। নির্ভুল সিদ্ধান্ত।

কাকা বলে চললেন—"বইয়ের মালিকানা যাদের হাতে গিয়েছিল, নিশ্চয় তাদেরই একজন লিখেছে এই লিপি। কিন্তু সে কে? বইতে কি তার নাম লেখা নেই?"

চশমা খুলে ফেললেন কাকা। শক্তিশালী আতস কাঁচ নিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠা। দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পেছনে কালির মত একটা দাগ

দেখা গেল। আতস কাঁচের দৌলতে দাগটার মধ্যে পাওয়া গেল কয়েকটা প্রায়-মুছে-যাওয়া অক্ষর। অতিকষ্টে উদ্ধার করা গেল নীচের রুনিক হরফ ক'টি :



"আর্ন্ সাকন্যুউজম!" সোল্লাসে বললেন কাকা। "আরে! এযে ষোড়শ শতাব্দীর বিখ্যাত অ্যালকেমিস্ট। তার চাইতেও বড় কথা ইনিও যে আইসল্যাণ্ডের লোক।"

আমি সপ্রশংস চোখে তাকালাম কাকার পানে। কাকা তখন বলে চলেছেন—"অ্যাভিসেনা, বেকন, লাল্লি, প্যারাসেলসাস—এঁরা ছিলেন খাঁটি বৈজ্ঞানিক। বলতে গেলে সে সময়ে এঁরা ছাড়া বৈজ্ঞানিকও আর ছিল না। বিস্ময়কর অনেকগুলো আবিষ্কার করেছিলেন এঁরা। আর্ন্ সাকন্যুউজমও সেরকম কিছু পিলে চমকানো আবিষ্কার সাংকেতিক চিরকুটের মধ্যে লুকিয়ে রাখেন নি তো? নিশ্চয় তাই। ঠিক ধরেছি।"

আমি বললাম—"তাই যদি হয়, তাহলে বৈজ্ঞানিক ভদ্রলোক চমকপ্রদ আবিষ্কারটাকে দুর্বোধ্য হেঁয়ালী দিয়ে গোলমাল পাকিয়ে রাখবেন কেন?"

"কেন তা আমি কি করে বলব? গ্যালিলিও নিজেও তো শনিগ্রহ আবিষ্কার করে একই কাণ্ড করেছিলেন? যাই হোক, হেঁয়ালির মানে উদ্ধার না করা পর্যন্ত খাওয়া ঘুম সব ত্যাগ করলাম আমি।"

"বটে!" মনে মনে বললাম আমি।

"অ্যাকজেল, আহার নিদ্রা তোমারও বন্ধ,' বললেন খুড়া মশায়।

"ভাগ্যিস ডবল ডিনার খেয়ে নিয়েছিলাম।" মনে মনে ভাবলাম আমি।

কাকা বললেন—"প্রথমে সাংকেতিক লিপির মূল চাবিকাঠিটা বার করতে হবে আমাকে। খুব কঠিন কাজ নয়। ১৩২ টা অক্ষর আছে এই পার্চমেণ্টে। ৭৯ টা ব্যঞ্জনবর্ণ, ৫৩ টা স্বরবর্ণ। ব্যঞ্জনবর্ণ আর স্বরবর্ণের এই ধরনের অনুপাতের মিশেল দক্ষিণ অঞ্চলের ভাষাগুলোতেই দেখা যায়। উত্তর অঞ্চলের ভাষায় দেখা যায় ব্যঞ্জনবর্ণের বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি। সুতরাং, এ-লিপি লেখা হয়েছে দক্ষিণ অঞ্চলের কোনো ভাষায়।"

সিদ্ধান্তটা বাস্তবিকই খুব যুক্তি সঙ্গত।

"কিন্তু সে ভাষাটা কী ?"

এই সুযোগে কিছু জ্ঞান অর্জন করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার পিতৃব্য বিশ্লেষণ নিয়ে তন্ময় হয়ে রইলেন।

বললেন—"সাকন্যুউজম ভদ্রলোক শিক্ষিত ছিলেন। শিক্ষিত হয়েও যখন মাতৃভাষায় লেখেন নি, তখন ল্যাটিন ভাষায় লিখেছেন। কেননা ষোড়শ শতাব্দীতে শিক্ষিত ব্যক্তিরা ল্যাটিনেই লেখার কাজ সারতেন। অনুমান ভুল হলেও অবশ্য স্পানিশ, ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান, গ্রীক, হিব্রু নিয়ে পড়া যাবে 'খন। কিন্তু ল্যাটিনটাই ছিল ষোড়শ শতাব্দীর শিক্ষিত লোকের লেখার ভাষা।"

সটান হয়ে বসলাম। ল্যাটিন আমি জানি। কিন্তু এই বর্বর শব্দগুলোকে ল্যাটিন বলতে বিদ্রোহী হল আমার মন। ভার্জিলের মিষ্টি ভাষার আর পার্চমেণ্টের খটমট ভাষা কি এক হল ?

"ল্যাটিন ঠিকই" বললেন কাকা—"তবে জট পাকানো।"

"বেশ তো," বললাম মনে মনে—"জট যদি ছাড়াতে পারেন, মাই ডিয়ার কাকা, আপনাকে সত্যিই সেয়ানা বলব।"

আমার লেখা কাগজের টুকরোটা তুলে নিয়ে বললেন উনি—"১৩২ টা অক্ষর দেখছি এলোমেলোভাবে ছড়ানো। কতকগুলো শব্দে কেবল ব্যঞ্জনবর্ণই রয়েছে। যেমন প্রথম শব্দ, mm. rnlls, কতকগুলির মধ্যে স্বরবর্ণর আধিপত্য রয়েছে, যেমন পঞ্চম শব্দ unteief। কিন্তু অক্ষরগুলোকে এভাবে ইচ্ছে করে সাজানো হয়নি। একটা অলিখিত গাণিতিক নিয়ম অনুসারেই অক্ষর বিন্যাস ঘটেছে এইভাবে। আমার তো মনে হয়, মূল কথাটা সোজা সুজিই লেখা হয়েছিল। পরে কোন নিয়ম অনুসারে তা ভেঙে চুরে এই অবস্থায় আনা হয়েছে, এখুনি তা আবিষ্কার করব। সাংকেতিক লিপি বানিয়েছে যে, গরগর করে এটা পড়বার ক্ষমতাও রাখে সে। অ্যাকজেল, মাথায় ঢুকছে তো ?"

কথাটার জবাব দিলাম না। আমার চোখ তখন দেওয়ালে ঝোলানো গ্রোবেনের ছবিতে নিবদ্ধ। গ্রোবিনকে আমি পছন্দ করি। গ্রোবিনও অ্যাকজেল বলতে পাগল। এক আত্মীয়ের বাড়ী গিয়ে রয়েছে গ্রোবিন। ফলে, আমার দিন আর কাটছে না। গ্রোবিনকে নিয়েই আমি মিউজিয়ামের কাজকর্ম করি। বৈজ্ঞানিক সমস্যা নিয়ে ওর মত মাথা ঘামাতে অনেক তালেবর বিদ্যেদিগগজকেও দেখিনি।

আচম্বিতে আমার পতন ঘটল সুখচিন্তার জগত থেকে মাটির পৃথিবীতে। প্রচণ্ড শব্দে টেবিল চাপড়েছেন প্রফেসর।

বলছেন—"অক্ষরগুলো নিয়ে গোলমাল পাকানোর মতলব মাথায় এলে প্রথমেই কি করতে ইচ্ছে যায়? হরফগুলো পাশাপাশি না লিখে খাড়াই ভাবে ওপর থেকে নীচে লিখে ফেলতে হয়।" চশমার আড়ালে আলোর ঝিলিক খেলতে লাগল প্রফেসর লিডেনব্রকের চোখে। প্রাচীন পার্চমেণ্টটা তুলে নিতে গিয়ে কেঁপে উঠল আঙুলগুলো। প্রতিটা শব্দের প্রথম অক্ষর-গুলো বেছে নিয়ে একটি শব্দ রচনা করলেন। এই ভাবেই হল দ্বিতীয় শব্দ। তারপর তৃতীয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর মুখের শব্দগুলো সাজিয়ে লিখলাম নীচের উদ্ভট লাইন কটি:

mmessunka Senr A. ıcefdok. segnittamurtn
ecertserrette, rotaivsadua, ednecsed sadne
lacarınıılu Jsirat rac Sarbmutabile dmek
meretarcsiluco Ys!effen SnI

দারুণ মুষ্ট্যাঘাতে টেবিল নেচে উঠল চার পায়ার ওপর। কালি ছিটকে গেল শূন্যে। কলম হাত থেকে উড়ে গিয়ে পড়ল মেঝেতে।

"হতেই পারে না! এর কোনো মানেই নেই।"

পরমুহূর্তেই কামানের গোলার মত যেন তিনি উড়ে গেলেন পড়ার ঘর থেকে। পাহাড় থেকে যে ভাবে ধ্বস নামে, সেইভাবে সর সর করে নেমে গেলেন সিঁড়ি বেয়ে। ঝাঁপিয়ে পড়লেন রাস্তার ওপর। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে নক্ষত্রবেগে অদৃশ্য হলেন নিমেষ মধ্যে।

৪ ॥ চাবিকাঠি পেলাম আমি

দরজাবন্ধের ধাক্কায় তখনো কাঁপছে সারা বাড়ী, এমন সময়ে ঘরে ঢুকল মার্থা।

"চলে গেলেন?"

"হ্যাঁ।"

"খাবেন না?"

"না।"

"সেকী?"

"উনি নিজেও খাবেন না, এ বাড়ীর কাউকেই মুখে দানা তুলতে দেবেন না, যতক্ষণ না একটা সৃষ্টিছাড়া হেঁয়ালির মানে উনি আবিষ্কার করছেন।"

"সেকী কথা! না খেয়ে মরতে হবে?"

মনে মনে বললাম, কাকার পাল্লায় পড়েছি যখন, তখন বরাতে অনাহারে মৃত্যুই আছে।

মার্থা খুবই ভাবিত হয়ে এবং ভয় পেয়ে গজগজ করতে ফিরে গেল রান্নাঘরে।

ভাবলাম এই ফাঁকে ব্যাপারটা আদ্যপান্ত গ্রোবেনকে বললে হয় না? কিন্তু হুম করে যদি ফিরে আসেন কাকা? এসে যদি তলব করেন আমাকে?

অগত্যা বসেই রইলাম নিজের জায়গায়। বেসানকনের এক খনিজতাত্ত্বিক কতকগুলো আশ্চর্য নুড়ি পাঠিয়েছিল। নুড়িগুলো সিলিকা দিয়ে প্রকৃতি দেবী গড়েছেন বিচিত্র খেয়ালে। কেননা প্রত্যিটি বিলকুল ফোঁপরা। ভেতরে একটা করে ক্রস্ট্যালের দানা!

কাঁচের আলমারীতে ফোঁপরা নুড়িগুলো সাজিয়ে রাখলাম লেবেল লাগিয়ে। তারপর ভাবলাম কাকা এসেই তো আবার হামলা আরম্ভ করবেন। এই ফাঁকে ধাঁধা মার্কা কাগজটায় একটু চোখ বুলিয়ে দেখা যাক না কেন?

নানা রকম ভাবে সাজাতে লাগলাম হরফগুলো। গ্রুপ বানিয়ে শব্দ তৈরীর চেষ্টাও করলাম। লক্ষ্য করলাম চতুর্দশ, পঞ্চদশ এবং ষোড়শ অক্ষর জুড়লে ইংরেজি শব্দ ICE পাওয়া যায়। এইভাবে অন্যান্য তিনটে অক্ষর পাশাপাশি রাখলে হয় SIR। তৃতীয় লাইনেও রয়েছে কয়েকটা ল্যাটিন শব্দ।

ধুত্তোর! কোনো মানে হয় এ সবের? চতুর্থ লাইনে রয়েছে একটা ল্যাটিন শব্দ—luco, মানে হল—পবিত্র কাষ্ঠ! এ ছাড়া এদিকে ওদিকে রয়েছে হিব্রু শব্দ, এমন কি ফরাসী শব্দ।

পাগল হয়ে যাবো নাকি? বিভিন্ন ভাষার হরেক রকম শব্দ দিয়ে একি হাস্যকর বাক্য। বরফ, মহাশয়, ক্রোধ, নিষ্ঠুর, পবিত্র কাষ্ঠ, মা, ধনুক, সমুদ্র—মানে হয় এসব শব্দের? প্রথম আর শেষ শব্দ দুটি ধরলে দাঁড়ায় বরফ সমুদ্র। আইসল্যাণ্ডের পাণ্ডুলিপিতে বরফ সমুদ্র কথাটা থাকলেও থাকতে পারে।

ভাবতে ভাবতে মাথা ঘুরতে লাগল। চোখে ধোঁয়া দেখলাম। একশ বত্রিশটা হরফ যেন পতপত শব্দে ডানা মেলে উড়তে লাগল চোখের সামনে।

মরীচিকার খপ্পরে পড়েছি বুঝলাম। শরীরটাও আড়ষ্ট লাগছে। আসলে দরকার এখন বাতাসের। তৎক্ষণাৎ হিজিবিজি হিসেব কষা কাগজটি তুলে নিয়ে আমি হাওয়া খেতে লাগলাম। চোখের সামনে দিয়ে কাগজটা যাওয়া আসা করতে লাগল নিয়মিত ছন্দে।

কাগজটা চোখের সামনে দিয়ে আসছে যাচ্ছে, আসছে যাচ্ছে। আচমকা

কাগজের পেছন দিকটা চোখের দিকে ফিরোতেই ভূত দেখার মত চমকে উঠলাম। মনে হল কতকগুলি দারুণ সহজ ল্যাটিন শব্দ যেন চোখের সামনে ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল। শব্দগুলো হল craterem আর terrestre !

রহস্যের অন্ধকারে আলো দেখা যাচ্ছে তাহলে! আর কী। ধাঁধার চাবিকাঠি তো হাতে এসে গেছে আমার! সামান্য দুটি সূত্র চোখের নিমেষে হেঁয়ালীর জট সরল করে ছেড়েছে আমার মনের চোখে।

পুরো দলিলটার মর্মোদ্ধার করতে হলে এখুনি পার্চমেণ্টটা পড়ে ফেলা দরকার। এতক্ষণে বুঝলাম, প্রফেসর যা যা সিদ্ধান্ত খাড়া করেছিলেন, সব সত্যি। অক্ষর বিন্যাস সম্পর্কে তাঁর অনুমান নির্ভুল—দলিলের ভাষা সম্পর্কেও যা বলেছিলেন, তা নির্জলা সত্যি। ল্যাটিন কথাটা গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত পড়তে হলে "আরও একটা ব্যাপার" তাঁর মাথায় আসা উচিত ছিল। বরাত জোরে, সেই "আরও একটা ব্যাপার" আমার মাথায় দৈবাৎ এসে গিয়েছে।

সে যে কি নিদারুণ উত্তেজনা, তা পাঠকের পক্ষে কল্পনায় আনা সম্ভব হবে কি? অতি কষ্টে পাচমেণ্টটা চোখের সামনে টেবিলের ওপর মেলে ধরলাম যাতে চোখ বুলিয়েই সাংকেতিক লিপির মর্মোদ্ধার করতে পারি।

অবশেষে নার্ভকে ঠাণ্ডা করার জন্যে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম। হন হন করে বার দুয়েক ঘরময় ঘুরে এসে ধপ করে ফের বসে পড়লাম চেয়ারে।

দেখা যাক এবার কি আছে কাগজে, নিজের মনেই বললাম এবং বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলাম।

টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে, একটির পর একটি অক্ষরের ওপর পর্যায়ক্রমে আঙুল রেখে একদম না থেমে এক সেকেণ্ডের জন্যেও দ্বিধা না করে গড় গড় করে উচ্চ কণ্ঠে পড়ে ফেললাম গোটা বাক্যটা।

পরিণামটা হল সাংঘাতিক! স্রেফ হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম আমি! স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলাম বজ্রাহতের মত! সেকী! এইমাত্র যা পড়লাম, সত্যিই কি একদা তা ঘটেছে? মানুষের এত স্পর্ধাও কি আছে যে……?

"না…না," তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে চেঁচিয়ে বললাম আমি। "কাকাকে এই সাংঘাতিক অভিযানের বিন্দুবিসর্গ জানতে দেওয়া হবে না। যা তুখোড় ভূতাত্ত্বিক উনি! জানলেই ছুটবেন—আমাকেও সঙ্গে নেবেন—দুজনের কেউই আর ফিরব না। না কখনোই না!"

অবর্ণনীয় উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলাম আমি।

"তার চাইতে বরং দলিলটা ধ্বংস করে ফেলি। আমি ছাড়া সাংঘাতিক

এই অভিযান আর কেউ জানে নি—ভবিষ্যতেও যাতে জানতে না পারে, তার ব্যবস্থা এখুনি করছি।"

আগুনের চুল্লীতে আগুন জ্বলছিল। আমার লেখা কাগজ আর স্যাকন্যুউজমের পার্চমেণ্ট নিয়ে আগুনে ফেলতে যাচ্ছি, বিপজ্জনক গুপ্ত রহস্যকে চিরকালের মত বিনষ্ট করতে যাচ্ছি এমন সময়ে দরজা খুলে বোঁ করে ঘরে ঢুকলেন আমার কাকা।

৫॥ ক্ষিধের জ্বালায় হার মানলাম

সর্বনাশা দলিলটা ঝট করে নামিয়ে রাখলাম টেবিলে।

প্রফেসর লিডেনব্রক তখন পুরোপুরি আত্মনিমগ্ন। সমস্ত রাস্তাটা উনি নিশ্চয় ভাবতে ভাবতে এসেছেন। কল্পনার গাছে চড়ে যতরকম প্রন্থায় হেঁয়ালিকে কুপোকাৎ করা যায়, সব ভেবেছেন। বাড়ী ফিরেছেন নিশ্চয় আরো কয়েক রকম কায়দায় অক্ষরগুলিকে সাজিয়ে দেখবার জন্যে।

সত্যি সত্যিই টেবিলে বসে অক্ষর সাজাতে আরম্ভ করলেন কাকা। মনে হল যেন বীজগণিতের আঁক কষছেন। উৎকণ্ঠায় কাঠ হয়ে আমি দেখতে লাগলাম তাঁর কলমের দ্রুত উড়ে চলা। বাসরে! এই রকম ভাবে মাথা চালালে সত্যি সত্যিই আবিষ্কার না করে ফেলেন।

ঝাড়া তিনটি ঘণ্টা মাথা গুঁজে এক নাগাড়ে নানারকম ভাবে অক্ষরগুলিকে সাজিয়ে চললেন কাকা। কত শ' বার যে সাজালেন তার ইয়ত্তা নেই।

যতরকম ভাবেই সাজান না কেন, মাত্র বিশটা হরফের সমাধান সাজানো যায় ২, ৪৩২ ,৯০২, ৮০০, ১৭৬, ৬৪ , ০০০ রকম ভাবে। আর ১৩২টা অক্ষর বিন্যাস যে কত বকমভাবে হতে পারে, সে হিসাব নাই বা দিলাম। কাকা অতিমানুষ হলেও এ-কাজ তার পক্ষে সম্ভব নয়।

রাত নামল। রাস্তা নিস্তব্ধ হল। কাকা ঘাড় কাৎ করে লিখেই চললেন। শেষ কালে আমিও সোফায় নাক ডাকতে লাগলাম।

ঘুম ভাঙল পরের দিন ভোরে। দেখি অক্লান্তভাবে মহাপণ্ডিত লিডেনব্রক তখনো কলম চালাচ্ছেন কাগজের ওপর। চুল উস্কখুস্ক। উত্তেজনায় এবং সারা রাত ব্যাপী মানসিক পরিশ্রমে গাল টকটকে লাল।

একটি মাত্র কথা বলে তাঁর সব দুশ্চিন্তার অবসান ঘটাতে পারি জেনেও বোবা হয়ে বসে রইলাম। না, আমি নিষ্ঠুর নই। কিন্তু কাকার ঐকান্তিক মঙ্গলের জন্যেই সাময়িক ভাবে নিষ্ঠুর হতে হল আমাকে। ওঁকে আমি চিনি।

অন্যান্য ভূতাত্ত্বিকদের টেক্কা মারবার মওকা পেলে ছাড়বেন না। জীবন-পণ করে বেরিয়ে পড়বেন অজানার উদ্দেশ্যে।

কিন্তু এরপর এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটল যে ভেস্তে গেল আমার প্ল্যান।

বাজার করার সময় হল। মার্থা বেরোতে গিয়ে দেখে সদর দরজায় তালা দেওয়া। চাবি পাওয়া যাচ্ছে না। চাবি কোথায়? কাকার কাছে? উনি কি ভুল করে চাবি রেখেছেন নিজের কাছে? না ইচ্ছে করে? সেবার তো একটা কঠিন সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে ঝাড়া আটচল্লিশ ঘণ্টা না খেয়ে ছিলেন কাকা। সেই সঙ্গে বাধ্য করেছিলেন আমাদেরও উপোষী থাকতে। ফলে আমার পেটে যে যন্ত্রণা দেখা দিয়েছিল, তা এখনো ভুলিনি। এবারও কি তার পুণরাবৃত্তি ঘটবে?

বেলা দুটো বাজল। খিদের কামড়ে আস্তে আস্তে আকাশ-পাতাল চিন্তা করতে লাগলাম। খামোকা মুখে চাবি এঁটে আছি কেন? অসম্ভব অবিশ্বাস্য সমাধানটা যদিও বা বলি কাকাকে, উনি তো হেসেই উড়িয়ে দিতে পারেন!

আরে বাঃ! তাহলে এতক্ষণ ধরে না খেয়ে থাকলেও তো চলত! কালকেই বললেই তো ল্যাটা চুকে যেত।

কথাটা কিভাবে পাড়বো ভাবছি, এমন সময়ে কাকা উঠে দাঁড়ালেন। বেরোবার জন্যে তৈরী হলেন।

সর্বনাশ! চাবি দিয়ে বেবিয়ে যাচ্ছেন নাকি?

"কাকা।" বললাম আমি।

কাকা শুনতে পেলেন বলে মনে হল না।

"লিডেনব্রক কাকা।" গলা চড়ালাম আমি।

"অ্যাঁ?" ঘুম ভাঙল যেন ...।

"চাবিটা কি হল?"

"কি চাব? দরজার?"

"না! দলিলের হেঁয়ালির।"

চশমার ওপর দিয়ে অদ্ভুত চোখে আমার দিকে তাকালেন কাকা। খপ্ করে আমার হাত চেপে ধরলেন—কথা বলতে পারলেন না। শুধু চোখ দিয়ে যেন একরাশ প্রশ্ন ছুঁড়ে মারলেন আমাকে।

আমি মাথা হেলিয়ে সায় দিলাম।

যেন উন্মাদকে নিয়ে মহামুস্কিলে পড়েছেন, এমনি ভাবে মাথা ঝাঁকালেন উনি।

আমি আরো জোরে মাথা হেলালাম।

চোখ জলে উঠল কাকার। হাতের মুঠি সাঁড়াশির মত চেপে বসল আমার বাহুতে।

বললাম—"চাবিটা···হঠাৎ আমি··"বলে লেখা কাগজটা এগিয়ে দিলাম তাঁর দিকে।"

"ও লেখার কোনো মানে নেই," বলে হাতের মুঠোয় দলা পাকালেন কাগজের টুকরোটা।

"শুরু থেকে শুরু করুন। শুরুটা হবে কিন্তু শেষ থেকে—"

আমার বাকী কথা শেষ হল না। হুংকার দিলেন কাকা। বুঝে ফেলেছেন উনি।

বলেই কাগজটার ওপর যেন ঝাঁপিয়ে পড়লেন। জলভরা চোখ আর ভাঙা গলা নিয়ে পড়লেন গোটা দলিলটা—পড়লেন অবশ্য শেষ থেকে।

পড়ে যা পেলেন, তা ল্যাটিন কথা। তার বাংলা দিচ্ছি নীচে :--

"হে দুঃসাহসী পর্যটক, স্নেফেল ইয়ুকুল আগুন পাহাড়ের জ্বালামুখে স্কারটারিস পাহাড়ের ছায়া পড়বে জুলাই মাস শুরু হওয়ার আগে! সেই জ্বালামুখ দিয়ে নেমে গেলে তুমি পৃথিবীর কেন্দ্র বিন্দুতে পৌছোবে। আমি নেমেছি সেই পথে। আর্নে সাকনুসউজম।"

পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এমন ভাবে লাফিয়ে উঠলেন কাকা যেন আচমকা ইলেকট্রিক শক খেয়েছেন। ওঁর সব কিছুই মাত্রাছাড়া। আনন্দ, সাহস, আত্ম-বিশ্বাস—কোনোটাই ধরে রাখতে পারেন না। ঘরময় পায়চারী করলেন, চেয়ারগুলো দুমদাম করে এদিক-ওদিক সরালেন, বইগুলো তাগাড় করলেন, ফোঁপরা নুড়িগুলো নিয়ে (অবিশ্বাস্য যদিও!) লোফালুফি করলেন। তারপর দম ফুরিয়ে যেতে আমি চেয়ারে এলিয়ে পড়ে শুধোলেন :

"কটা বাজে?"

"তিনটে।"

"তাই নাকি? তাই এত খিদে পেয়েছে। আগে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক। তারপর—"

"তারপর?"

"আমার বাক্সটা গুছিয়ে দিও।"

"কি বললেন?"

"সেই সঙ্গে তোমারটাও গুছিয়ে নিও।" বলে খাবার ঘরের দিকে এগোলেন প্রফেসর।

৬॥ বৃথা তর্ক করলাম

শুনেই তো থরহরি কম্প লেগে গেল আমার সর্বাঙ্গে। অতি কষ্টে সামলে নিলাম নিজেকে। ঠিক করলাম, ওঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিরস্ত করব পরে। বৈজ্ঞানিক যুক্তি জুৎসই হলেই তবে ওঁকে হতোদ্যম করা সম্ভব। পৃথিবীর জঠরে অভিযান! তোবা! তোবা! উন্মাদের কল্পনা ছাড়া আর কি!

খাবার টেবিলে গিয়ে টেবিল ফাঁকা দেখে মহা তর্জন-গর্জন শুরু করলেন কাকা। কিন্তু ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই মার্থা সব কিছু কিনে-কেটে এনে রান্নাবাড়া সেরে খেতে বসিয়ে দিল আমাদের।

খাবার টেবিলে অন্যমূর্তি দেখা গেল কাকার। খুশীতে ডগমগ হয়ে আগড়ম-বাগড়ম কত কথাই না বললেন! খাওয়া সাঙ্গ হলে আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন পড়ার ঘরে।

"অ্যাকজেল," টেবিলে বসে বললেন প্রসন্ন কণ্ঠে—"তুমি ভারী সেয়ানা ছোকরা। আমি নাজেহাল হয়ে যখন হাল ছেড়ে দিতে যাচ্ছি, ঠিক তখনি তুমি উপায় বাৎলে দিয়েছো। সুতরাং স্মরণীয় এই অভিযানের অংশীদার হওয়ার গৌরব তুমিও পাচ্ছো হে।"

"চমৎকার।"

কাকা বললেন—"এ-কথা যেন পাঁচ-কান না হয়, বুঝেছো? আমার হিংসুটে প্রতিদ্বন্দ্বীর অভাব নেই। আমি চাই না তারা আমার আগেই পৃথিবীর অন্তঃপুর ঘুরে আসুক।

"আপনার কি মনে হয় এ ঝুঁকি নেওয়ার মত লোক দুনিয়ায় আছে?"

"আলবৎ আছে। এ খ্যাতির লোভ সামলাবে কে? দলিলটা পাঁচজনকে জানিয়ে দিলেই তো গাদা গাদা ভূতাত্ত্বিকরা আর্নে সাকনুউজমের পথে পাঁই পাঁই করে দৌড়োবে পৃথিবীর জঠরে।"

"আমার তো মনে হয় না দলিলে সত্যি বলে কিছু আছে।"

"বটে! পাণ্ডুলিপিটা সম্পর্কে কি মত তোমার?"

"সাকনুউজম লিখেছেন নিশ্চয়। কিন্তু তাতে প্রমাণিত হয় না যে উনি সত্যিই পৃথিবীর কেন্দ্রে গিয়েছিলেন। দলিলটা আসলে একটা ধাপ্পা!"

কথাটা বলে ফেলে বুঝলাম ভুল করেছি। ঝোপের মত ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন কাকা। ভাবলাম এই বুঝি শুরু হল তাঁর খিচুনি। কিন্তু না। মৃদু হেসে বললেন কাকা—"দেখা যাক।"

"আপত্তি আরো আছে কিন্তু।"

"বলে ফ্যালো বাবা, বলে ফ্যালো। ভাইপো হিসেবে নয়, সহকর্মী হিসেবে বলো।"

"ইওকুল, স্নেফেল আর স্কার্টারিস শব্দগুলোর মানে কি? জন্মেও তো এসব কথা শুনি নি।"

"সোজা প্রশ্ন। বইয়ের তাকের চতুর্থ সারিতে দ্বিতীয় অংশের তৃতীয় মানচিত্রটা নামাও।"

আমি নামালাম।

কাকা ম্যাপ খুলে বললেন—"দেখছো তো সারা দ্বীপ জুড়ে কেবল আগ্নেয় গিরি। আরো দেখো, সব কটারই নাম হল ইওকুল। আইসল্যাণ্ডের ভাষায় শব্দের মানে হল 'হিমশৈল'। এত উঁচুতে অগ্ন্যুৎপাত সাধারণতঃ বরফের মধ্যে দিয়ে ঘটে। তাই আইসল্যাণ্ডের আগ্নেয়গিরির আগে পিছে 'ইওকুল' শব্দটা থাকে।"

"বুঝলাম। কিন্তু স্নেফেল মানে কি?"

ম্যাপে আঙুল লাগিয়ে বললেন কাকা—"কি দেখছো?"

"সমুদ্র ফুঁড়ে যেন একটা পাহাড় মাথা তুলেছে।"

"এই হল স্নেফেল। পাঁচ হাজার ফুট উঁচু পাহাড়। শীগগিরই এর মুখ দিয়ে পৌঁছোবো পৃথিবীর পেটে।"

"অসম্ভব! আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ নিশ্চয় গলিত লাভায় ভর্তি।"

"মরা আগ্নেয়গিরি হলে?"

"মরা?"

"সারা পৃথিবীতে সজীব আগ্নেয়গিরির সংখ্যা এখন মাত্র তিনশ। মরা আগ্নেয়গিরির সংখ্যা কিন্তু বিস্তর। স্নেফেল এদের অন্যতম। স্নেফেলের ইতিহাসে একবারই আগুন বমি করেছে সে—তাও ১২২৯ সালে। তারপর থেকেই তাল ঠোকা কমে আসে স্নেফেলের—শেষ কালে একেবারেই নিভে যায়।"

ঐতিহাসিক সত্যের বিরুদ্ধে কথা খুঁজে না পেয়ে দলিলটার আবছা দিকটার ওপর জোর দিলাম আমি।

বললাম—"স্কারটারিস মানে কী? জুলাই শুরু হওয়ার আগে জ্বালা-মুখ দিয়ে নামতে বলা হয়েছে কেন?"

জবাব খোঁজার জন্যে একটু সময় নিলেন কাকা। আমি ভাবলাম বুঝি শেষ পর্যন্ত কিস্তিমাৎ করে ফেললাম। কিন্তু বৃথা আশা!

উনি বললেন—"তোমার কাছে যা ধোঁয়াটে, আমার কাছে তা জলের মত পরিষ্কার। আবিষ্কারটা গোপন রাখার জন্তেই এত হুঁশিয়ার হয়েছেন সাকন্যুউজম। স্নেফেলের জ্বালামুখ একটা নয়—অনেকগুলো। ঠিক কোনটা দিয়ে নীচে নামলে পৃথিবীর পেটে পৌঁছোনো যায়, দলিলে তার নির্দেশ থাকা দরকার। উনি দেখলেন জুলাই শুরু হওয়ার আগে, অথবা জুনের শেষের দিকে, স্কারটারিস নামে স্নেফেলের একটা শিখরের ছায়া এসে পড়ে ভূগর্ভে নামবার বিশেষ জ্বালামুখটির ওপর। দলিলে হুবহু সেই ভাবেই পথনির্দেশ দিলেন উনি।"

কাকা তো দেখি সব প্রশ্নেরই উত্তর মুখে মুখে দিয়ে যাচ্ছেন। সুতরাং দলিল সংক্রান্ত ত্রুটি বিচ্যুতির ধার দিয়েও এবার আর গেলাম না। বৈজ্ঞানিক আপত্তি যা-কিছু থাকতে পারে, একে একে তুলে ধরলাম তাঁর সামনে। সব নয়, যেগুলো দারুণ গুরুতর—শুধু সেইগুলো।

বললাম—"বেশ, সাকন্যুউজমের কথা যে জলবৎ তরলম এবং সন্দেহাতীত ভাবে সত্যি তা মেনে নিলাম। দলিলটাও জাল নয়। তাও মানছি। মহাপণ্ডিত সাকন্যুউজম স্নেফেলের সানুদেশে গিয়েছিলেন, স্কারটারিসের ছায়াকে ছুঁতে দেখেছিলেন বিশেষ একটি জ্বালামুখকে জুলাই শুরু হওয়ার ঠিক আগে, এমন কথাও হয়ত শুনেছিলেন যে ঐ জ্বালামুখ দিয়ে পৃথিবীর পেটে যাওয়া যায়, ফিরেও আসা যায়। কিন্তু উনি নিজে সেখানে গিয়ে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছেন—এমন কথা বিশ্বাস করতে আমি পারব না! একশবার বলব—না, না, না।"

"কেন না?" অপরিসীম শ্লেষতীক্ষ্ণ কণ্ঠে শুধোলেন কাকা।

"বিজ্ঞান বলছে তা অসম্ভব। বিজ্ঞানের থিওরী তাই বলছে।"

"তাই নাকি? থিওরী তা প্রমাণ করেছে? ভাবী বদ থিওরী তো!"

আচ্ছা জ্বালা তো! প্রফেসর তো দেখছি আমাকে নিয়ে দিব্বি মজা করছেন!

আমি কিন্তু হাল ছাড়লাম না। বললাম—"সবাই জানেন, সত্তর ফুট অন্তর ভূগর্ভে এক ডিগ্রী করে তাপমাত্রা বেড়ে চলেছে। এই হারে যদি টেম্পারেচার বেড়ে চলে, আর পৃথিবীর ব্যাসার্ধ যদি চার হাজার মাইলের একটু বেশী হয়, তাহলে ভূকেন্দ্রের তাপমাত্রা দাঁড়াবে বিশলক্ষ ডিগ্রীরও বেশী। ফলে, ভূকেন্দ্রের যাবতীয় বস্তু দ্যুতিময় গ্যাস হয়ে থাকবে। সোনা, প্লাটিনাম থেকে শুরু করে কঠিনতম পাথর পর্যন্ত এই তাপমাত্রার মধ্যে কঠিন অবস্থা

বজায় রাখতে পারবে না। সুতরাং ভূকেন্দ্রে অভিযানটা সম্ভব হয় কি করে,- এ-প্রশ্ন নিশ্চয় যুক্তি সঙ্গত কারণেই করতে পারি!"

"তাই বলো, টেম্পারেচার নিয়ে ঘাবড়ে গেছো?"

"তাতো বটেই। বেশী কী, পঁচিশ মাইল নামলেই তো ১৩০০ ডিগ্রী তাপমাত্রায় মধ্যে গিয়ে পড়ব।"

"পাছে গলে যাও, এই তো?"

"জবাবটা আপনিই দিন না," ক্ষেপে গিয়ে বললাম।

"তবে শোনো আমার জবাব," কর্তৃত্বব্যঞ্জক স্বরে বললেন কাকা— "পৃথিবীর পেটে সত্যি সত্যিই কি চলছে, তা তুমি আমি কেউ জানি না। কেননা, পৃথিবীর ব্যাসার্ধের বারো হাজার ভাগের মাত্র এক ভাগ পর্যন্ত ভূগর্ভে নেমেছি আমরা। তাছাড়া, বিজ্ঞান জিনিসটা মুহূর্তে মুহূর্তে নিজেকে শুধরে চলেছে। এক-একটা নতুন থিওরী পুরোনো থিওরীদের নাকচ করছে। কোরিয়ারের আগে পর্যন্ত তো সবার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আন্তর্গ্রহ পর্যটনের তাপমাত্রা নাকি ক্রমশঃ কমতে থাকে। এখন তো জানছি ইথার রাজ্যে নিম্নতম তাপমাত্রা জিরো ডিগ্রীর নীচে চল্লিশ পঞ্চাশ ডিগ্রীর তলায় কখনো নামে না। পাতালের তাপমাত্রাও সেরকম কিছু হবে না কেন? বিশেষ একটা ধাপে পৌঁছে তাপমাত্রা স্থির অবস্থায় আটকে যাবে না কেন? সাংঘাতিক চাপে যে সব খনিজ গলানো যায় না, সে সবকেও গলিয়ে দেবার মত তাপ মাত্রার প্রশ্নই উঠতে পারে না।"

কাকা দেখছি এবার হাইপোথিসিস নিয়ে আমাকে নাকাল করছেন। বুদ্ধিমানের মত তাই বোবা হয়ে গেলাম।

কাকা বলে চললেন—"আরে বাবা, পোসঁর মত সত্যিকারের কয়েকজন বৈজ্ঞানিকও প্রমাণ করে গেছেন ভূগোলকের ভেতরকার তাপমাত্রা যদি বিশলক্ষ ডিগ্রী হত, তাহলে গলিত পদার্থ থেকে ভয়ংকর গ্যাস বেরিয়ে ভূত্বক ফাটিয়ে বেরিয়ে যেত বোমার মত।"

"ওটা তো পোসঁর অভিমত—তার বেশী কিছু নয়।"

"মানলাম। কিন্তু আরও কয়েকজন নামী ভূতাত্ত্বিকও তো বলেছেন ভূগোলকের ভেতরে গ্যাস, জল বা ভারী খনিজ পদার্থ নেই। থাকলে পৃথিবীর এখনকার যা ওজন, তার অর্ধেক হত।"

"অংক কষে যা খুশী প্রমাণ করা যায়।"

"ঘটনা দিয়েও তা প্রমাণ করতে পার। যেমন একটা ঘটনা বলছি। পৃথিবীর আদিকালে জীবন্ত আগ্নেয়গিরির সংখ্যা যা ছিল, এখন তা ঢের কমে

গেছে। কেন? না, পাতালের তাপমাত্রা কমে এসেছে। না কমলে, আগ্নেয়গিরিগুলো একে একে মরে যেতো না।"

"কাকা, যদি স্রেফ আন্দাজের বশে নীচে নামতে চান, আমার কিছু বলার নেই।"

"কিন্তু বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকরাও তো আমার কথাই বলছেন। মনে আছে ১৮২৫ সালে আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন বিখ্যাত ইংরেজ রসায়নবিদ হামফ্রি ডেভী?"

"না। কেননা তখনো আমি জন্মাইনি।"

"হামবুর্গ এসেই হামফ্রি ডেভী দেখা করেছিলেন আমার সঙ্গে। ভূকেন্দ্রের তরলাবস্থা নিয়ে অনেকক্ষণ হাইপোথিসিস নিয়ে আলোচনা করলাম দুজনে। দুজনেই এলাম একই সিদ্ধান্তে। ভূকেন্দ্র তরলাবস্থায় থাকতেই পারে না। বিজ্ঞান তা মেনে নিতে পারে না যে কারণের জন্যে তা নাকচ করার সাধ্য বিজ্ঞানেই নেই।"

"সে কারণটা কী?"

"সমুদ্র যেমন চাঁদের আকর্ষণে ফুলে উঠে, পৃথিবীর কেন্দ্রে তরল পদার্থও চাঁদের আকর্ষণে দুলে উঠবে। ফলে দিনে দুবার পাতাল-জোয়ার হবে। ভূমিকম্প দেখা দেবে নিয়ম করে দিনে দুবার।"

আমি বললাম—"তা হতে পারে। তবে আমি বলব ভূত্বক ঠাণ্ডা হয়ে শক্ত হয়ে যাওয়ার দরুন তাপটা গিয়ে জড়ো হয়েছে ভূকেন্দ্রে।"

"আবার ভুল করলে," বললেন কাকা। "পৃথিবী তেতে উঠেছিল ভূত্বকের আগুনের জন্যে—আগুনটা আর কোথাও ছিল না। ভূত্বকে পটাসিয়াম আর সোডিয়ামের মত বিস্তর ধাতু ছিল। বাতাস আর জলের সংস্পর্শে এলেই দপ করে জ্বলে ওঠা এদের ধর্ম। আকাশ থেকে যেই বৃষ্টি নেমেছে, অমনি এরা জ্বলে উঠেছে দাউ দাউ করে। বৃষ্টির জল ভূত্বকের ফাঁক ফোকর দিয়ে ভেতরে ঢুকেছে, সেখানেও জ্বলেছে আগুন। সেই সঙ্গে বিস্ফোরণ আর অগ্ন্যুৎপাৎ। পৃথিবীর শৈশবে এত আগ্নেয়গিরির জন্ম হয়েছে এইভাবেই।"

"দারুণ মৌলিক থিওরী তো!" না বলে পারলাম না আমি।

"এই ঘরেই হামফ্রি যে এক্সপেরিমেণ্ট করে দেখিয়েছিলেন, সেটাও কম মৌলিক নয়। এইমাত্র যেসব ধাতুর নাম করলাম, সেইসব ধাতু বেশী করে নিয়ে একটা মস্ত বল বানালেন তিনি। বলটা সব দিক দিয়ে অবিকল ভূ-গোলকের মত। এর ওপর তিনি বৃষ্টি স্প্রে করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ফোস্কা উঠল বলের গায়ে, মাথা তুলল একটা ক্ষুদে পাহাড়—পাহাড়ের চূড়ায়

তৈরী হল জ্বালা মুখ এবং সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল এমন দারুণ অগ্ন্যুৎপাত যে গোটা বলটা তেতে উঠল আগুনের মত।"

প্রফেসর খুব সহজভাবে সোৎসাহে বলে গেলেন যুক্তির পর যুক্তি—আমি কিন্তু খড়কুটোর মতই ভেসে গেলাম তাঁর যুক্তির তোড়ে।

উনি বললেন—"পৃথিবীর ভেতরে কি আছে আর কি নেই, এ-নিয়ে কত থিওরী যে খাড়া করেছেন ভূতাত্ত্বিকরা তার ইয়ত্তা নেই। প্রতিটি থিওরীই কিন্তু তোমার এই ভূকেন্দ্রের তাপমাত্রা থিওরীর মতই সত্যি-হলেও হতে পারে গোছের। অত কথায় কাজ কি বাবা, সুযোগ যখন পেয়েছি, নিজের চোখে দেখে এসে আমরা বলব সেখানে কি আছে, আর কি নেই।"

"আদৌ কিছু দেখার মত অবস্থা যদি থাকে।"

"কেন থাকবে না? বায়ুমণ্ডলের ইলেকট্রিক প্রচণ্ড চাপে দীপ্তি ছড়াতে পারে ভূকেন্দ্রের পথে। তখন সবই দেখতে পাব আমরা।"

"তা সম্ভব।" সায় দিলাম আমি।

"কিন্তু পাঁচ কান যেন না হয়। আমাদের আগে কেউ যেন সেখানে পদার্পণ করতে না পাবে।

৭॥ প্রস্তুতি

কাকার যুক্তিতর্কের ঝড়ে আমার যেন দম আটকে এল। বাড়ী থেকে রাস্তায় বেরিয়েও মনে হল হামবুর্গের যাওয়াও আমার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। সুতরাং গেলাম এলবি নদীর তীরে।

প্রফেসর লিডেনব্রক সত্যি সত্যিই পৃথিবীর পেটে ঢুকবেন? এইমাত্র যা শুনলাম, তা পাগলের প্রলাপ, না, প্রতিভাধরের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত?

হঠাৎ দেখলাম আত্মীয়ার বাড়ী থেকে গ্রোবেন ফিরছে। আমার উদ্বিগ্ন মুখ দেখে অবাক হল সে। সংক্ষেপে বললাম কাকার অভিপ্রায়। গ্রোবেন সব শুনে শুধু বললে—"অ্যাকজেল, অভিযানটা দারুণ হবে কিন্তু। মেয়েদের যদি নেওয়া যেত, তাহলে আমিও যেতাম।"

আমার তো আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল কথা শুনে! বলে কি গ্রোবেন?

গ্রোবেন আরও বলল—"বৈজ্ঞানিকের ভাইপোর উপযুক্ত অভিযান। মানুষ মাত্রেরই উচিত দারুণ দুঃসাহসের কিছু একটা কাজ করে দশজনের একজন হওয়া।"

মুখ দিয়ে আর কথা বেরোলো না। হাত ধরাধরি করে বাড়ী ফিরলাম

দুজনে। তখন রাত হয়েছে। মনে মনে ভেবে রাখলাম, জুনের শেষ হতে এখনো অনেক দেরী। ইতিমধ্যে অনেক ঘটনা ঘটে যাবে। আপাততঃ গিয়ে দেখব কাকা নাক ডাকাচ্ছেন।

ও হরি! বাড়ীর সামনে দেখি মহা হাঁকডাক লাগিয়েছেন কাকা। গাড়ী-ভর্তি মাল নামাচ্ছেন লোক দিয়ে। মার্থা তাকিয়ে আছে অবাক হয়ে।

আমাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠলেন কাকা—"অ্যাকজেল, জলদি! তোমার বাক্স এখনো গোছানো হয়নি, আমার কাগজপত্র সাজানো হয়নি। আমার ব্যাগের চাবিও আমি পাচ্ছি না।"

মাথার ওপরে বাজ পড়ল যেন! হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। বিড়বিড় কোনোমতে বললাম—"সত্যিই যাচ্ছি তাহলে?"

"আচ্ছা এঁচড়ে পাকা গবেট তো, যাচ্ছি তো বটেই।"

"সত্যিই যাচ্ছি?" গলা আরো ক্ষীণ হয়ে এল আমার।

"পরশু সকালেই যাচ্ছি।"

আমি ভোঁ দৌড় দিলাম নিজের ঘরে।

আর কোনো সন্দেহ নেই। সারা বিকেল দরকারী জিনিসপত্র কেনাকাটা করেছেন কাকা। দড়ির মই, গিঁট দেওয়া দড়ি, মশাল, বড় বড় শিশিবোতল, কুড়ুল, গাঁইতি—পর্বতাভিযানে যা-যা দরকার সব কিনেকেটে এনেছেন।

কি অবস্থায় যে রাত কাটল, তা ঈশ্বর জানেন। ভোরবেলা ঘুম থেকে ডেকে তুলল গ্রোবেন। বলল—"অ্যাকজেল, প্রফেসরের কাছে সব শুনেছি। ওঁর সাহস আছে কল্পনা করার। ফিরে যখন আসবে, তখন তুমি প্রফেসর লিডেনব্রকের সমান যোগ্যতা নিয়ে ফিরবে।" তখনও কিন্তু বিশ্বাস করতে মন চাইল না যে সত্যিই আমি যাচ্ছি। কাকার পড়ার ঘরে গিয়ে শুধোলাম মিন্‌মিন্‌ করে—"কাকা, বাস্তবিকই কি যাচ্ছি আমরা?"

"সন্দেহ আছে তাতে?"

"এত তাড়াতাড়ির কি দরকার?"

"সময় আর কই?"

"আজ তো মোটে ছাব্বিশে মে। জুনের শেষ হতে—"

"আহাম্মক আর বলে কাকে! আইসল্যাণ্ডে যাওয়া কি চাট্টিখানি কথা? লিফেনডার কোম্পানীর কোপেনহেগেন অফিসে গিয়ে দেখে এলেই তো হয়—মাসে মাত্র একবারই জাহাজ ছাড়ে আইসল্যাণ্ডের দিকে। প্রতি মাসের বাইশ তারিখে। বাইশে জুন পর্যন্ত বসে থাকলে আইসল্যাণ্ডে

পৌঁছোতে দেরী হয়ে যাবে। গিয়ে দেখবে স্কার্টারিসের ছায়া সরে গেছে। যাও! জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও!"

মুখ চুণ করে ঘরে গেলাম। গ্রোবেন গুছিয়ে দিল আমার জিনিসপত্র একটা 'পোর্টম্যান্টোর মধ্যে।'

বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, বন্দুক, বৈজ্ঞানিক কলকব্জা দেখে ভ্যাবাচাকা খেয়ে মার্থা শুধোলো—"কর্তামশায়ের কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ," বললাম আমি।

"পরের দিন ভোর সাড়ে পাঁচটার সময়ে গরগর করে একটা গাড়ী এসে থামল দুয়ারে। কাকা হৃষ্টচিত্তে ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিয়েছেন ততক্ষণে। আমি কিছুই মুখে তুলতে পারিনি।

পোর্টম্যাণ্টো নামিয়ে আনার জন্যে আমার ওপর আরেকদফা তম্বি করে গ্রোবেনকে গেরস্থালীর ভার বুঝিয়ে দিলেন কাকা।

বিদায় নেওয়ার সময়ে সেই প্রথম জল দেখলাম গ্রোবেনের চোখে।

"গ্রোবেন!" বললাম সবিস্ময়ে।

"অ্যাকজেল, অনেক বড় হয়ে ফিরে এসো। মানুষের মত মানুষ হও। তবেই না আমি তোমার বউ হব!"

আমাকে আর খুড়োকে নিয়ে গাড়ী উধাও হল আলটোনার দিকে।

৮॥ প্রথম পর্যায়

ভারী চমৎকার শহর হল এই কোপেনহেগেন। ষোড়শ শতাব্দীর তৈরী পেল্লায় রাজবাড়ী। চারধারে পরিখা দিয়ে ঘেরা। পরিখার ওপর একটা সেতু।

কোপেনহেগেনে পৌঁছে যথাসময়ে শহর দেখতে বেরোলেন কাকা আমাকে নিয়ে। দেখবার জিনিস বিস্তর ছিল। কিন্তু আমাকে টেনে নিয়ে গেলেন একটা বেজায় উঁচু গির্জের দিকে। গির্জে তো নয়, যেন মেঘ-ছোঁওয়া অতিকায় টাওয়ার! গা দিয়ে একটা ঘোরানো সিঁড়ি সটান উঠে গেছে মেঘলোকের দিকে। গির্জের চূড়ো যেখানে শেষ হল—তারপরেও সিঁড়িটা খাড়াই ভাবে উঠেছে শূন্যপথে!

এই সিঁড়ি দিয়ে আমাকে টেনে হিঁচড়ে ওপরে তুললেন কাকা। আমার আবার ওপরে উঠলে মাথা ঘোরে। কিন্তু ওঠার অভ্যাস করা দরকার। তাই আমার আঁৎকে ওঠা দেখেও কলার খামচে ধরে টেনে নিয়ে চললেন কাকা।

সিঁড়ি যতক্ষণ ভেতর দিক দিক দিয়ে উঠছিল, অতটা অসুবিধে হয়নি। কিন্তু শদেড়েক সিঁড়ি ভাঙবার পর খোলা জায়গায় এসে পড়লাম। এখান থেকে সটান মেঘলোকের দিকে উঠেছে ভয়ংকর সিঁড়িটা!

আমার মাথা ঘুরতে লাগল। চোখে অন্ধকার দেখলাম। বসেও পড়লাম। কিন্তু দয়া হল না কাকার। কি করে যে ওপরে উঠলাম ওঁর মুখখিঁচুনি শুনতে শুনতে, তা জানি না।

ডগায় পৌঁছোনোর পর সে কী হাওয়ার ঝাপটা। তখনও ধমকাচ্ছেন কাকা—"ভালো করে দেখে নাও চারদিক। উঁচু থেকে খাদের ভেতর দেখা অভ্যেস করো। পাতাল ছোঁয়া গহ্বরের দিকে এইভাবেই তো তাকাতে হবে পাহাড়ের ডগা থেকে।"

ভয়ে ভয়ে নীচের দিকে তাকালাম। ধোঁয়ার আস্তরণে যেন ঢেকে গেছে ঘরবাড়ীগুলো। ক্ষুদে ক্ষুদে ঘরবাড়ী, পিঁপড়ের সারির মত চলমান জনস্রোত। এত উঁচুতে ওঠার দরুন মনে হচ্ছে, ছুটন্ত মেঘগুলিই বুঝি নিথর নিস্পন্দ—গির্জের চূড়ো সমেত আমিই বরং বাঁই বাঁই করে ছুটে চলেছি মেঘগুলোকে পেছনে ফেলে। দূরে সবুজ বনভূমি, আরো দূরে রোদ্দুর ঝকমকে সমুদ্র। সবই যেন বোঁ-বোঁ করে ঘুরছে লাট্টুর মত।

শিউরে উঠলাম। ঘেমে গেলাম। পা কাঁপল, গা ঝিম ঝিম করল। কিন্তু রেহাই পেলাম না। আচ্ছন্নের মত সেখানে থাকতে হল ঝাড়া একটি ঘণ্টা। গির্জে থেকে নামবার পর সিধে যেন দাঁড়াতেও পারছিলাম না।

"আবার কাল প্র্যাকটিস করবে", বললেন কাকা।

পর-পর পাঁচদিন উঁচু থেকে নীচে দেখার ব্যায়াম করতে হল কাকার জবরদস্তিতে।

৯ ॥ আইসল্যাণ্ডে

ভলকিরিয়া জাহাজে চেপে রওনা হলাম আমরা আইসল্যাণ্ড অভিমুখে। জাহাজ চলার সময়ে কেবিন থেকে বেরোন নি কাকা। স্নেফেল সম্বন্ধে কাউকেই কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেন নি পাছে তাঁর অভিযান জানাজানি হয়ে যায়—এই ভয়ে। কেবিন থেকে না বেরোনোর আসল কারণ অবশ্য সমুদ্র পীড়া। অমন ডাকসাইটে কাকাও কিনা শেষকালে কুপোকাৎ হলেন ঢেউয়ের দোলায়।

দশ এগারোদিন পর আইসল্যাণ্ডের রাজধানী রিকজাভিকে পৌঁছোলো

জাহাজ। ভাসমান কারাগার থেকে নামবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন কাকা। কিন্তু ডেক ছেড়ে যাওয়ার আগে আমাকে গলুইয়ের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে উপসাগরের উত্তর দিকে আঙুল তুলে দেখালেন। দুটো চুড়োওলা একটা বিশাল উঁচু পাহাড় দেখলাম। বরফ ছাওয়া সে পাহাড় যেন মহাশূন্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সদম্ভে।

"স্নেফেল।" রুদ্ধশ্বাসে বললেন কাকা—"স্নেফেল!"

পরমুহূর্তেই ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলেন, কাকপক্ষীও যেন জানতে না পারে গোপন অভিযানের বৃত্তান্ত।

আগেকার ব্যবস্থা মত বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ফ্রিদিকসনের বাড়ীতে অতিথি হলাম আমরা।

কাকা তো মহাখুশী। আমাকে ডেকে বললেন—"সব ঝামেলা চুকল। এবার নেমে পড়াটাই কেবল বাকী।"

"নেমে তো পড়বেন, উঠবেন কি করে?"

"তা নিয়ে ভাবি না। চললাম লাইব্রেরীতে। সাকন্যুজমের দুএকটা পাণ্ডুলিপি পেলে ঘেঁটে দেখতে হবে।"

"আমি তাহলে শহর দেখে আসি?"

"এসো। যদিও আইসল্যাণ্ডের দেখবার জিনিস মাটির ওপরে নেই—নীচে রয়েছে!"

উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে অনেকক্ষণ ঘুরলাম শহরের পথেঘাটে। গাছপালা অত্যন্ত বিরল এ-অঞ্চলে। আগ্নেয়শিলার ন্যাড়া স্তরে ঢাকা চারিদিক। পাথর তো নয়—যেন দ্বীপের পাঁজরা। বাসিন্দাদের কুঁড়েঘরগুলো মাটি দিয়ে তৈরী। দেওয়ালগুলো ভেতর দিকে ঢালু বলে কুঁড়ের চাল যেন মেঝেতে এসে ঠেকেছে। এই চালের ওপর ঘাস গজায়।

আইসল্যাণ্ডের লোকগুলো হাসতে জানে না মোটেই। সদা বিষণ্ণ মুখ। নোংরা পোশাক পরে গতর খাটিয়ে চলেছে অষ্টপ্রহর। সভ্য জগৎ থেকে এরা যেন নির্বাসিত বরফ রাজ্যের সীমান্তে। তাই ওরা হাসতে পারেনা। অনেক চেষ্টা করলাম হাসাতে। দুএকজনের মুখের পেশী ঈষৎ কুঁচকে গেল—হাসি কিন্তু বেরোলো না।

১০॥ আইসল্যাণ্ডের প্রথম ভোজ

বাড়ী ফিরে দেখলাম খানা তৈরী। জাহাজে উপোষ করার দরুন কাকার উদর গহ্বর যেন বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল। আহা! খেলেন বটে তিনি।

খাবারের ধরন অবশ্য সাদাসিদে ড্যানিশ টাইপের—আইসল্যাণ্ডের খাবার নয়। গৃহস্বামী নিজে কিন্তু খাঁটি আইসল্যাণ্ডের বাসিন্দা—ড্যানিশ মোটেই নন। কিন্তু অতিথি অ্যাপ্যায়ণ করতে যাঁরা জানেন, তাঁরা অতিথি কিসে সুখী হবেন, নজর রাখেন সেইদিকেই। সুতরাং খেতে বসে মনে হল বাড়ীতে বসে খাচ্ছি।

প্রথমেই মিস্টার ফ্রিড্রিকসন কাকার কাছে জানতে চাইলেন তাঁর গ্রন্থাগার মনে ধরেছে কিনা।

"আপনার লাইব্রেরী!" পরম কৌতুকে বললেন কাকা—"ধূলোভর্তি ফাঁকা তাকগুলোয় তো মাত্র খান কয়েক বই দেখলাম।"

"বলেন কি মশায়!" জবাব দিলেন ফ্রিড্রিকসন। "আটহাজার বই আছে লাইব্রেরীতে। বেশীর ভাগই দারুণ দামী আর দুষ্প্রাপ্য। প্রাচীন স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার ভাষায় লেখা প্রতিটি বই। সদ্য প্রকাশিত বইগুলো পর্যন্ত কোপেনহেগেন থেকে চালান আসছে ফি-বছর।"

"আট হাজার বই! আমি তো দেখলাম⋯⋯"

"প্রফেসর লিডেনব্রক, বইগুলো ছড়িয়ে আছে সারা দেশে। বরফ-দ্বীপের প্রতিটি মানুষ জানবেন এক-একটা গ্রন্থকীট। জেলে থেকে আরম্ভ করে চাষা পর্যন্ত বই পেলে আর কিছু চায় না। তাই লাইব্রেরীর বই হাতে হাতে ঘুরে লাইব্রেরীতে ফিরে আসে দু'এক বছর পরে। যাই হোক, কি বই খুঁজছিলেন বলুন তো?"

দেখলাম মহাফাঁপরে পড়েছেন কাকা। প্রশ্নটা যা দিয়েছে তাঁর গোপন অভিযানের একদম গোড়ায়। সেকেণ্ড কয়েক পরে উনি বললেন—

"আর্নে সাকনুস্যাউজম-এর বই।"

"আর্নে সাকনুস্যাউজম! ষোড়শ শতাব্দীতে যিনি ছিলেন একাধারে বিখ্যাত অ্যালকেমিস্ট।* দুঁদে পর্যটক এবং দুর্ধর্ষ প্রকৃতিবিদ?"

"ঠিক বলেছেন।"

"আইসল্যাণ্ডের বিজ্ঞান আর সাহিত্যের অন্যতম মুকুটমণি?

"ঠিক⋯⋯ঠিক।"

"সাংঘাতিক স্বনামধন্য পুরুষ? দেশ গৌরব সাকনুস্যাউজম?"

"যা বলেছেন।"

---

*সব ধাতুকে সোনা করার গুপ্ত বিদ্যেতে যিনি পারঙ্গম—তিনিই অ্যালকেমিস্ট।

"যাঁর সাহস আর প্রতিভা দাঁড়িপাল্লায় ওজনে সমান সমান ?"

"দেখছি ওঁর ঠিকুজী কুষ্ঠি পর্যন্ত জানেন ?" বলতে বলতে খুশীতে চক চক করে উঠল কাকার চোখ। "ওঁর লেখা বই-টইগুলো সম্পর্কে কিছু বলুন ?"

"ওঁর লেখা ?···কিসস্থ নেই।"

"অ্যাঁ ! আইসল্যাণ্ডে নেই ?"

"আইসল্যাণ্ডে কেন, কোনো ল্যাণ্ডেই নেই !"

"কেন নেই ?"

"কেননা চার্চ-বিরুদ্ধ আচার আচরণে অভ্যস্ত হওয়ায়, মানে, ম্লেচ্ছ আর ধর্ম বিদ্বেষী হওয়ায় দারুণ নির্যাতন চলে তাঁর ওপর। ১৫৭৩ সালে তাঁর বইপত্র সব পুড়িয়ে ফেলা হয় কোপেনহেগেনে সামান্য এক জল্লাদকে দিয়ে।"

"খাসা ! চমৎকার !" কাকার চীৎকার শুনে তো আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল ফ্রিড্রিকসনের।

ভড়কে গিয়ে বললেন—"কি···কি বললেন ?"

"আর কি, ধাঁধার উত্তর তো পেয়েই গেলাম। যেখানে যা কিছু ধোঁয়াটে ছিল, সব পরিষ্কার হয়ে গেল এবার। এখন বুঝছি ঐরকম একজন ধুরন্ধর ধীমান মানুষ কেন ঐ আবিষ্কারকে সাংকেতিক চিরকুটের মধ্যে গোপন করে রেখেছিলেন – "

"আবিষ্কার ! সাংকেতিক লিপি !" ফ্রিড্রিকসনের মনে কৌতূহল দেখা দিল।

"আবিষ্কার···মানে " তোৎলাতে শুরু করলেন কাকা।

"আপনার হেপাজতে কোনো সাংকেতিক হরফের দলিল আছে নাকি ?"

"না···না · আমি স্রেফ অনুমান করছিলাম—"

"তাই বলুন," ফ্রিড্রিকসন বিষয়টি নিয়ে বেশী রগড়ারগড়ি কবলেন না। "যাওয়ার আগে এ-দেশের খনিজ সম্পদ দেখে যাওয়া চাই কিন্তু।"

"তা তো যাবই।" বললেন কাকা। "কিন্তু এলাম তো অনেক দেরীতে। আমার আগে আর কোনো বৈজ্ঞানিক আসেন নি তো ?"

"এসেছেন অনেক," বলে দাঁতভাঙা নামের একটা ফিরিস্তি শুনিয়ে দিলেন ফ্রিড্রিকসন—"কিন্তু এখনও তো অনেক কিছু করবার রয়েছে।"

"তাই নাকি ? তাই নাকি ?" নিরীহ সাজবার চেষ্টা করলেন কাকা দুই চোখ কিন্তু জ্বলতে লাগল দারুণ আনন্দে।

"এখনো কত পাহাড় হিমশৈল আগ্নেয়গিরি ভাল করে দেখা হয়নি। বেশী কথা কি, ঐ যে পাহাড়টা দেখছেন ? ওর নাম স্নেফেল।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্নেফেল।"

"আগ্নেয়গিরি। স্নেফেলের জ্বালামুখ কিন্তু আজও তেমন করে দেখা হয়নি।"

"মরা আগ্নেয়গিরি বুঝি?"

"তা আর বলতে। গত পাঁচশ বছরের মধ্যে আর ট্যাঁ-ফোঁ করতে দেখা যায়নি স্নেফেলকে।"

"তাই নাকি? তাই নাকি?" পাছে আনন্দের চোটে শূন্যে লাফ দিয়ে ফেলেন, তাই পা দিয়ে পা জড়িয়ে ধরলেন কাকা—"তাহলে তো আমার অভিযান এই সেফেল·· ফেসেল···ধুত্তোর! কি যেন নামটা বললেন?"

"স্নেফেল। আমার সময় থাকলে আপনার সঙ্গেই যেতাম।"

"আরে না, না। আপনার কাজ নষ্ট করতে আমি চাই না। একটা গাইড খুঁজে নেব 'খন।"

"আমি একজন গাইড দিতে পারি আপনাকে।"

"বিশ্বাসী আর চালাক তো?"

"বিলকুল।"

"কবে পাচ্ছি?"

১১॥ গাইড হ্যান্স

পরেরদিন সকাল কাকার জোর কথাবার্তায় ঘুম ভেঙে গেল আমার। পাশের ঘরে গিয়ে দেখি হাত-পা ছুঁড়ে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে কাকা যার সঙ্গে ড্যানিশ ভাষায় কথা বলছেন তার চেহারা পাথরের মত মজবুত। চোখ দুটো স্বপ্ন ছাওয়া নীলচে এবং বুদ্ধিদীপ্ত। লম্বা লম্বা লাল চুল লুটোচ্ছে বিশাল কাঁধের ওপর। লোকটা হাত-পা নাড়ছে না বললেই চলে। আচার-আচরণ প্রশান্ত গম্ভীর। মেজাজটা যেন বরফ দিয়ে গড়া। শান্তির প্রতিমূর্তি বলতে যা বোঝায়, আগন্তুক তাই। এ লোককে দুনিয়ার কোনো কিছু দিয়েই অবাক করা যায় না, বা উত্যক্ত করা যায় না! নিবাত নিষ্কম্প জীবনদর্শন নিয়েই সে ধীর-স্থির শান্ত। স্বল্পবাক—কাজের কথা ছাড়া বাজে কথা বলা কুষ্ঠিতে লেখেনি।

দু হাত বুকের ওপর ভাঁজ করে নিথর দেহে দাঁড়িয়ে সে কেবল ঘাড় নাড়ছে কাকার কথার উত্তরে। কথা বলছে না। হ্যাঁ-বাচক উত্তর দিচ্ছে ওপর-নীচে ঘাড় নেড়ে; না-বাচক উত্তর দিচ্ছে ডাইনে-বাঁয়ে ঘাড় নেড়ে।

দর কষাকষি তার ধাতে নেই। যা হয় পেলেই সে খুশী। কাকাও তেমনি। যা চাইবে তাই দিতে তিনি রাজী। সুতরাং মাইনের ঝকমারি নিয়ে কাউকেই বিব্রত হতে হল না। শুধু সর্ত রইল হপ্তা শেষে শনিবার মাইনের টাকাটা তাকে দিতে হবে।

গাইড হিসেবে সে যাবে আমাদের সঙ্গে স্নেফেল পাহাড়ের তলা পর্যন্ত। তারপর দরকার হলেও আরও অনেক দূর যেতেও রাজী। সেটা যে কতদূর তা আর ভেঙে বললেন না কাকা। সে বিদায় নিলে আমাকে বললেন— পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত গাইড নিয়ে যাবেন তিনি।

লোকটার নাম হান্স বিল্‌কে।

এরপর দুটো দিন গেল সিল্কের দড়ি, দড়ির মই, গাইন্তি, কুড়ুল, দেশলাই, চুরুট যন্ত্রপাতি, খাবার-দাবার, রাইফেল পিস্তল ইত্যাদি গোছগাছ করতে। চারটে বড় বড় প্যাকেট বাঁধা হল। ঘোড়া নেওয়া হল চারটে। রসদ রইল ছ মাসের। কিন্তু গোলা-বারুদ যে কেন নেওয়া হল বুঝলাম না। পৃথিবীর পেটে লড়ব কার সঙ্গে?

ষোলই জুন সকালে ঘোড়ায় চেপে রওনা হলাম আমরা।

১২ ॥ শম্বুক গতি

সেদিন আকাশ ছিল মেঘে ছাওয়া। তবে খাঁটি টুরিস্ট আবহাওয়া। মানে, ঝড়-বাদলা অথবা প্রচণ্ড গরমের বিপদ নেই।

রীতি-মাফিক হান্স হেঁটে চলল। মালপত্র পিঠে নিয়ে ঘোড়া নিজে থেকেই রইল ওর পেছনে। তাদের পেছনে আমি আর কাকা।

আইসল্যাণ্ড হল ইউরোপের সব চাইতে বড় দ্বীপ। চোদ্দ হাজার বর্গমাইল এর ক্ষেত্রফল। সে তুলনায় জনসংখ্যা মোটে ষাট হাজার।

রিকজাভিক ছেড়ে আসার পর সমুদ্র উপকূল ধরে চলল হান্স। দুপাশে শস্যক্ষেত্র। সবুজে জমিকে যেন অনেক কষ্টাকষ্টি করে তবে সবুজ থাকতে হচ্ছে হলুদের মাঝখানে।

কাকাকে দেখে হাসি পাচ্ছিল আমার। ওঁর ঘোড়াটির তুলনায় উনি অনেক ঢ্যাঙা। পা দুটি যেন মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেছে। ফলে ঘোড়ার চার পা আর ওঁর দু'পা মিলে ওঁকে দেখতে হয়েছে ছপেয়ে অর্ধমানব অর্ধপশুর মত —গ্রীক পুরাণে যার নাম সেণ্টর।

"খাসা ঘোড়া! ফার্স্টক্লাস ঘোড়া!" ক্রমাগত একই বুকনি ছাড়তে

লাগলেন কাকা। "অ্যাকজেল, সারা দুনিয়ায় আইসল্যাণ্ডের ঘোড়ার চাইতে চালাক জীব তুমি আর পাবে না।"

গতিবেগ আগের চেয়ে দ্রুত হল। মরুভূমির মত খাঁ খাঁ করছে চারিদিক। কাঠ, মাটি বা লাভার চাঁই দিয়ে গড়া ছন্নছাড়া দু'একটা খামারবাড়ী। রাস্তা নেই, গাছপালা নেই।

রিকজাভিক থেকে রওনা হওয়ার পর দু ঘণ্টা বাদে আমরা পৌঁছোলাম গুফুন্সের ছোট্ট শহরে। জায়গাটা এত মামুলী যে জার্মানীতে গ্রাম বলাও চলে না। এইখানেই আধঘণ্টার মত জিরিয়ে নেওয়ার ফাঁকে প্রাতরাশ খেলাম আমরা।

বিকেল চারটে নাগাদ হিসেব করে দেখা গেল, ইংরেজী হিসেবে আমরা বিশ মাইল হেঁটেছি। আইসল্যাণ্ডের হিসেবে অবশ্য তা মাত্র চার মাইল!

এ অঞ্চলের পাহাড়ি নদীর এপার ওপার দেখা যায় না—এত চওড়া। তা প্রায় মাইল দুয়েক চওড়া তো হবেই। চোখা চোখা পাথরের ওপর আছড়ে পড়ছে ঢেউ। তিন হাজার ফুট উঁচু খাড়া পাথরের দেওয়াল মাথা তুলে আছে নদীর দুই পাড়ে।

স্রোতের উদ্দামতা দেখে আমার তো ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল। কাকা কিন্তু অন্যধাতের মানুষ। তিনি ঘোড়া নিয়ে জলে নামবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ঘোড়াটিও তেমনি। মাথা নীচু করে ঢেউ শুঁকে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল জগদ্দল পাথরের মত। ঘোড়ার এই বেয়াদবি খেপিয়ে তুলল কাকাকে। উনি বেধড়ক চাবুক চালালেন। ঘোড়া তখন শির-পা হয়ে দাঁড়িয়ে ফেলে দিতে গেল কাকাকে। না পেরে হাঁটু মুড়ে বেরিয়ে এল কাকার দু পায়ের ফাঁক দিয়ে। দুটো পাথরের চাঁইয়ের ওপর দুপা দিয়ে রোডসের কালোসাসের মত ভ্যাবাচাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কাকা।

অশ্বারোহী থেকে মুহূর্ত মধ্যে পদাতিক বনে যাওয়ায় রেগে তিনটে হয়ে এবার ঘোড়ার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করে ছাড়লেন কাকা।

"ফার্জা," বলল গাইড। ভাষাটা ড্যানিশ।

"কী? ফেরী?"

"ডার।" নৌকো দেখিয়ে বলল হ্যান্স।

"সেটা আগে বলা হয়নি কেন? চলো।"

আরও দুচার কথায় বুঝিয়ে বলল হ্যান্স: এখন জোয়ারের লাফ ঝাঁপ চলেছে ঢেউয়ের মধ্যে। ভাঁটার সময়ে জল কমলে ভেলায় চেপে নদী পেরোতে হবে।

অপেক্ষা করতে লাগলেন নিরুপায় কাকা। পাশের গ্রাম থেকে দুটি মজুর শ্রেণীর লোককে দিয়ে প্রচুর কাঠ আর বাঁশ নিয়ে এল হান্স। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনজনে মিলে বানিয়ে ফেলল চমৎকার একটা ভেলা।

ঘণ্টাখানেক লাগল নদী পেরোতে। ঘোড়া নিয়ে ভেলায় চেপেছিলাম আমরা। ওপারে পৌঁছোতে রাত হয়ে গেল। কিন্তু রাত বলতে যা বোঝায়, তার চিহ্নমাত্র দেখা গেল না। আইসল্যাণ্ডে জুন জুলাই মাসে সূর্য কখনো অস্ত যায় না।

তবে শীত নামল। খিদের চোটে নাড়ি ভুঁড়ি পর্যন্ত হজম হতে বসেছিল। আমরা রাত কাটালাম একটা চাষীর বাড়ীতে। সেই মুহূর্তে তার সামান্য কুটিরখানিই আমাদের কাছে রাজপ্রাসাদ বলে মনে হল। ঘুমোলাম খড়ের বিছানায়।

পরদিন ভোরবেলায় চাষী পরিবারের কাছে বিদায় নিয়ে পথে নামলাম। জমির চেহারা এখন পাল্টে যাচ্ছে। মেঠোপথ আস্তে আস্তে জলাভূমির মত কাদা প্যাচপেচে হচ্ছে। পথচলাই দুষ্কর হয়ে দাঁড়াল শেষকালে। ডানদিকে পর্বতসারি। প্রকৃতি দেবী নিজেই যেন অন্তহীন কেল্লা বানিয়ে রেখেছেন সেদিকে।

নির্জনতা আরো বাড়ল। দিকবিদিক একদম জনপ্রাণী শূন্য। পরিত্যক্ত পথঘাট। ভূ-প্রকৃতি ক্রমশঃ বিষণ্ণ হয়ে উঠছে। বিষাদভার পাথরের মত মনটার ওপর চেপে বসছে। ঘাস আর দেখা যাচ্ছে না। যে-টুকু দেখছি, তাও আমাদের পায়ের চাপে শেষ হয়ে যাচ্ছে। গাছের তো চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। দু'একটা ঘন ঝোপ চোখে পড়ছে অবশ্য। এক আধটা বাজপাখীকে মাঝে মাঝে দেখছি ধূসর মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে দক্ষিণ পাহাড়ের দিকে উধাও হচ্ছে। বন্য সৌন্দর্যের মাঝে ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকা এই বিষণ্ণ পরিবেশে নিজেকে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। বারবার মনে পড়ছে দেশের কথা।

ছোট ছোট কয়েকটা পাহাড়ি নদী পেরোতে হল। জোয়ারের জলে ফেঁপে থাকা একটা উপসাগরও পেরিয়ে এলাম ঝটপট।

উনিশে জুন। আইসল্যাণ্ডের হিসেবে মাইলখানেক ধরে লাভাবাঁধানো জমির ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছি। লাভা এখানে এমন ভাবে কুঁচকে গিয়েছে যেন রাশিকৃত ইলেকট্রিক তার কেউ ছড়িয়ে রেখেছে। কখনো তা কুণ্ডলি পাকানো কখনো ছড়ানো লম্বালম্বিভাবে। লাভা এসেছে পাশের পাহাড় থেকে। তরঙ্গের পর তরঙ্গ এসে সহসা জমে গেছে পথিমধ্যে। দেখলেই বোঝা

যায় এককালে কি ভয়ানক অগ্ন্যুৎপাত ঘটেছে অঞ্চলটায়। এখন তারা সরে গেলেও ইতস্ততঃ উষ্ণ প্রস্রবণ এখনো দেখা যাচ্ছে। বাষ্প ফুঁসে ফুঁসে উঠছে সে সবের মধ্যে থেকে।

এ-সব দেখবার মত সময় কিন্তু ছিল না। এগিয়ে চলেছি তো চলেইছি। আবার ঘোড়ার পায়ের তলায় কাদা প্যাচপেচে বাধা পড়েছে। এদিকে ওদিকে দেখা যাচ্ছে সরোবর। ফাক্সা উপসাগর ঘুরে চলেছি পশ্চিমদিকে। কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল স্নেফেলের মহাকায় চুড়ো দুটো। পাঁচ মাইল দূরে থেকেও স্নেফেলের আকাশ ছোঁয়া বিরাট শরীর দেখে বুক গুর-গুর করে উঠল আমার।

ঘোড়াগুলো আবার দ্রুত চলেছে। আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কাকা? অভিযানের প্রথমদিনে যতখানি তেজীয়ান ছিলেন এখনো তাই। আর আমাদের গাইডের কাছে তো এ অভিযান নেহাতই চড়ুইভাতি করতে বেরোনোর সামিল।

বিশে জুন সন্ধ্যেবেলা বুদির নামে একটা গ্রামে এসে পৌছোলাম। সমুদ্রের কোল ঘেঁসা গ্রাম। এখানে পৌছেই চুক্তিমত মাইনে চাইল গাইড। পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে দিলেন কাকা।

রাতে জিরেন নিলাম হ্যান্সের পরিবারের মধ্যেই। খুব খাতির যত্ন করল সকলে। ইচ্ছে ছিল আরো দিন কয়েক থেকে গা গতরের ব্যথাটা সারিয়ে নোব। কিন্তু আমার কাকা পরের দিনই হৈ হৈ করে বেরিয়ে পড়লেন ঘোড়ায় চেপে। রকমসকম দেখে মনে হল আর বুঝি তর সইছে না ওঁর।

জমির চেহারা এবার অন্যরকম। গ্র্যানাইট পাথরে ছাওয়া। স্নেফেলের সানুদেশ যে শুরু হয়ে গেল—এ হল তার পূর্বাভাস। বুড়ো ওক গাছের মোটা মোটা শেকড় যেমন জমির ওপর দিয়ে বহু দূর বিস্তৃত থাকে, স্নেফেলের লাভা স্রোত যেন সেই রকম শেকড়ের আকারে পাহাড়ের গোড়া থেকে ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিকে। ভলক্যানোর গোড়া মাড়িয়ে চলেছি আমরা। প্রফেসর কিন্তু ঠায় চেয়ে আছেন আগুন-পাহাড়ের দিকে। মুঠো ছুঁড়ছেন যুদ্ধং দেহি ভাবে। আর চেঁচাচ্ছেন সমানে:

"রে রে দৈত্য! তোকে আমি জয় করবই করব।"

চার ঘণ্টা এক নাগাড়ে পথ পরিক্রমার পর ঘোড়া চারটে নিজে থেকেই গণ্ডগ্রাম স্টাপিতে দাঁড়িয়ে পড়ল।

১৩॥ শেষ তর্ক

স্ট্যাপিতে কুঁড়ে ঘর বলতে মাত্র তিরিশটা। লাভার ওপর খাড়া করা। আগ্নেয়গিরিতে প্রতিফলিত সূর্যরশ্মিতে ঝলমলে। ছোট্ট একটা পাহাড়ি নদী বয়ে চলেছে গাঁয়ের পাশ দিয়ে। অদ্ভুত গড়নের ব্যাসাল্ট পাথর দিয়ে ঘেরা।

ব্যাসাল্ট পাথরের উৎপত্তি আগুন-পাহাড়ের গর্ভ থেকে। এ-পাথরের রঙ বাদামী। প্রকৃতি তাদের নিয়মিত ছন্দে সাজিয়ে রেখেছেন সুন্দর আকারে। দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। প্রকৃতির খামখেয়ালের চিহ্নমাত্র এখানে নেই। প্রাকৃতিক দৃশ্য অন্য কোথাও এলোমেলো হতে পারে। বিসদৃশভাবে পাহাড়, অর্ধসমাপ্ত শঙ্কু এবং আবাখ্যাচড়া পিরামিড ছড়িয়ে থাকতে পারে একটা যাচ্ছেতাই রকমের জগাখিচুড়ির মত। কিন্তু এখানে একেবারে উল্টো চেহারা। এখানে প্রকৃতি যেন মাপজোখ করে জ্যামিতির রেখায় সব সাজিয়েছেন। কম্পাশ, ওলন-দড়ি আর সেট-স্কোয়ার দিয়ে হিসেব করে নিখুঁত করে সমান মাপের সমান গড়নের সমান চেহারার বাদামী ব্যাসাল্ট দিয়ে অপরূপ করেছেন স্নেফেলের সানুদেশ। ব্যাবিলনের জমকাল স্থাপত্য অথবা গ্রীসের বিস্ময়কর ভাস্কর্যও ম্লান হয়ে যায় সৃষ্টিকর্তার এই ভাস্কর-প্রতিভার সামনে।

পাহাড়ি নদীর দুপাশে ব্যাসাল্ট থামের সারি। তিরিশ ফুট উঁচু থাম। সমান মাপের সারি সারি থামেব সমান্তরাল খিলেন। তলা দিয়ে সমুদ্রের ফেনিল চেহারা দেখা যাচ্ছে। জলের তোড়ে কতকগুলো ব্যাসাল্ট পাথর খসে পড়েছে নদীর মধ্যে। জেগে রয়েছে প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মত। কত শতাব্দী কেটে গেছে, জলের তোড়ে যেন তারা চির নবীনরূপে মাথা তুলে রয়েছে আজও।

এ-হেন জায়গায় বিস্তর নৈপুণ্য দেখিয়ে আমাদের নিয়ে এল হান্স। আমরা রাত কাটালাম রেকটরের বাড়ীতে।

স্ট্যাপিতে পৌছেই পুণর্যাত্রার প্রস্তুতি শুরু হল। ঘোড়া চারটের বদলে চারজন কুলী ব্যবস্থা করল হান্স। ঠিক হল জ্বালামুখ পযন্ত পৌছে তারা চলে আসবে। তার পরের ভাবনা তাদের নয়।

এইবার ঝেড়ে কাশলেন কাকা। অর্থাৎ আসল মতলবটা খুলে বললেন হান্সকে। জ্বালামুখের ভেতরে নামার অভিপ্রায় আছে শুনে হান্স মুখে কোনো কথা বলল না। শুধু ঘাড় নেড়ে জানাল তার সম্মতি। তার কাছে দ্বীপের পাতাল গহ্বরে প্রবেশ দ্বীপের ওপরে চর্কিপাক দেওয়ার নামান্তর মাত্র। কিন্তু আমি? আমি আবার ভেঙে পড়লাম। জানি, যে কাকাকে হামবুর্গে

রুখতে পারিনি, তাঁকে স্নেফেলের পাদদেশে এসে আটকানো যাবে না কোনমতেই।

একটা সম্ভাবনা—একটি অত্যন্ত করাল সম্ভাবনা—আমার স্নায়ুর গোড়া ধরে নাড়া দিচ্ছিল। আতঙ্কে হাত-পা সিঁটিয়ে আসছিল সম্ভাবনাটা যতবার উঁকি মারছিল মনের মধ্যে।

স্নেফেল যে মরে ভূত হয়ে গিয়েছে, তার কোনো প্রমাণ আছে কি? এই মুহূর্তে আর একটা অগ্ন্যুৎপাতের মহড়া ভেতর ভেতর চলছে কিনা, তা কে বলতে পারে? ১২২৯ সাল থেকে ঘুমিয়ে আছে বলে আকাশ মুখো বিশাল দেহ এই দৈত্য আবার প্রলয় কাণ্ড শুরু করবেনা, এমন গ্যারান্টি কেউ দিয়েছে, না দিতে পারে?

ঘুম উড়ে গেল আমার চোখ থেকে। আগ্নেয়গিরির লাভা ছাই আগুনের সঙ্গে আমারও দেহাবশেষ বেরিয়ে আসছে, ভাবতেই আমার প্রাণটা অর্ধেক উড়ে গেল।

শেষকালে ভয়ংকর সম্ভাবনাটা নিয়ে নিজে নিজে তোলা পাড়া করার মত মনের জোরও হারিয়ে ফেললাম। ঠিক করলাম, একটা পুরোপুরি অবিশ্বাস্য হাইপোথিসিস হিসেবেই আইডিয়াটা উপস্থাপিত করা যাক খুড়োর সামনে।

কিন্তু কথাটা তিনি শোনার সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে বললেন—"আমিও তাই ভাবছিলাম।"

কি বলতে চান কাকা?

একটু থেমে ফের বললেন কাকা—"স্ট্যাপিতে পৌঁছোনোর পর থেকে কথাটা আমার মাথাতেও ঘুরঘুর করছে। কিন্তু আগ্নেয়গিরির ঘুম ভাঙবার অনেক আগে থেকে অনেকগুলো লক্ষণ দেখা যায়। এ-সব লক্ষণ কি ধরনের —তা অজানা নয় কারোরই। আমি তাই স্থানীয় বাসিন্দাদের জিজ্ঞেস করেছি। নিজে জমি পরীক্ষা করে দেখেছি। অ্যাকজেল, মাভৈঃ! অগ্ন্যুৎপাতের আর কোনো সম্ভাবনা নেই।"

আমি মস্ত হাঁ করে চেয়ে রইলাম। কথা বলতে পারলাম না। "কী? বিশ্বাস হল না বুঝি? বেশ, চলে এসো দিকি আমার পেছন পেছন," বলে পা বাড়ালেন কাকা।

আমিও দ্বিরুক্তি না করে আঠার মত লেগে রইলাম পেছনে। ব্যাসাল্টের দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে এসে পড়লেন কাকা। এরপর থেকে স্নেফেল পর্যন্ত আর কিছু নেই। এ-যেন আগ্নেয়গিরির উচ্ছিষ্ট দিয়ে পেটাই করা তেপান্তরের মাঠ। যেন গ্র্যানাইট, ব্যাসাল্ট ইত্যাদি যত রকমের

আগ্নেয়পাথর থাকতে পারে, সবকিছুর বিরাম বিহীন ধারাবর্ষণে থেঁতো হয়ে যাওয়া সুবিশাল এক প্রান্তর।

মাঝে মাঝে পাথর ফুঁড়ে সাদা বাষ্প ফোঁস ফোঁস করে ঠেলে উঠছে আকাশের দিকে। এ-বাষ্প আসছে উষ্ণ প্রস্রবণ থেকে। এই থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে মাটির তলায় ভলক্যানোর কাজ এখনো চলছে। আমার আতংক তাহলে অমূলক নয়। কিন্তু কাকা আমাকে তোপের মুখে উড়িয়ে দিলেন যেন। বললেন:

"বাষ্প দেখে ঘাবড়াও মাৎ, অ্যাকজেল। ভলক্যানো আর বেঁচে নেই।"

"কি করে তা প্রমাণিত হল মাথায় আসছেনা," বললাম আমি।

"শোনো তাহলে। অগ্ন্যুৎপাত আসন্ন হলে এই বাষ্পগুলোর তৎপরতা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। অগ্ন্যুৎপাত যখন আরম্ভ হয়, তখন বাষ্প-টাষ্প সব উধাও হয়: কেননা, আগ্নেয়গিরির মুখ খুলে গেলে, মাটির তলায় বন্দী গ্যাসের ওপর চাপ কমে যায়। সে-গ্যাস তখন মাটি ফুঁড়ে বেরোয় না—আগ্নেয়গিরির মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। সুতরাং বাষ্প-ফোয়ারা যদি যেমন তেমনি থাকে, যদি আকাশ বাতাস থমথমে না হয়, তাহলে জানবে অগ্ন্যুৎপাতের কোনো সম্ভাবনাই নেই।"

"কিন্তু..... "

"আর না। বিজ্ঞান মুখ খুলেছে যখন, তখন তোমার মুখ বন্ধ রাখাই সমীচীন।"

মুখ আমসি করে ফিরে এলাম চাষীর বাড়ীতে। কাকা বিজ্ঞান দিয়ে মুখ বন্ধ করে দিলেন আমার। তখনও একটা ক্ষীণ আশা টিম টিম করতে লাগল মনের মধ্যে। জ্বালামুখে পৌঁছোনোর পর ভেতরে নামার পথটা যদি না খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে তুনিয়ার সমস্ত সাকন্যুউজম এলেও মুখ চুন করে বাড়ী ফিরতে হবে।

সেই রাতেই একটা লোমহর্ষক তুঃস্বপ্ন দেখলাম। আমি যেন আগ্নেয়গিরির অন্তঃপুরে ছিলাম। ফলে, সেখান থেকে ঠিকরে গিয়ে অগ্ন্যুদগারের পাথর হয়ে ছুটে চলেছি তুই গ্রহের মাঝখানকার মহাশূন্য দিয়ে।

পরের দিন ২৩শে জুন। স্ট্যাপি থেকে বেরিয়ে পড়লাম আমরা।

১৪ ॥ স্নেফেলের চুড়ো

স্নেফেলের উচ্চতা পাঁচ হাজার ফুট। আমরা যেখান থেকে রওনা হলাম, স্নেফেলের জোড়া চুড়ো সেখান থেকে দেখা যায় না। চোখে পড়ল কেবল

বিশাল তুষার মুকুট পর্বতের করোটি ঘিরে শোভা পাচ্ছে ধূসর আকাশের পটভূমিকায়।

নীরবে উঠতে লাগলাম পাহাড়ে। পথ বেজায় সঙ্কীর্ণ। আমরা তাই লাইন দিয়ে চলেছিলাম। গাইড আগে, আমরা পেছনে।

পর্বতারোহণের উদ্বেগের মধ্যেও চারপাশে ছড়ানো খনির আকর না দেখে পারছিলাম না। প্রকৃতি স্বয়ং যেন দুষ্প্রাপ্য পাথর আর খনিজ আকর দিয়ে সাজিয়ে রেখেছেন তাঁর জাদুঘর।

পথ ক্রমশঃ খাড়াই আর বিপদ সঙ্কুল হচ্ছে। মাঝে মাঝে পাথর খসে গড়িয়ে পড়ছে। একবার পা ফসকালে আর রক্ষে নেই।

হ্যান্স এমনভাবে যাচ্ছে যেন এটা পাহাড় নয়, সমতল ভূমি। মাঝে মাঝে তার চেহারা হারিয়ে যাচ্ছে প্রকাণ্ড পাথরের চাঁইয়ের আড়ালে। পরক্ষণেই তীক্ষ্ণ শিসধ্বনি দিয়ে জানিয়ে দিচ্ছে এগোনোর পথটা কোন দিকে। কখনো সখনো দাঁড়িয়ে গিয়ে আলগা নুড়ি সাজিয়ে এমন বিদঘুটে চিহ্ন রেখে যাচ্ছে পথের ওপর যাতে ফেরার সময়ে পথ গুলিয়ে না যায়। তবে আমাদের দুর্ভাগ্য— ভবিষ্যতে যা ঘটল তার ফলে এ-চিহ্ন কোনো কাজে আসেনি।

ঘণ্টা তিনেক প্রচণ্ড পরিশ্রমের পর পাহাড়টার গোড়ায় পৌঁছোলাম। ঘণ্টাখানেক জিরিয়ে প্রাতরাশ খেলাম সেখানে।

এবার শুরু হল স্নেফেলের ঢাল বেয়ে পর্বতারোহণ। বরফ মোড়া চূড়ো দুটো মনে হচ্ছিল না জানি কত কাছে, কিন্তু পৌঁছোতে পৌঁছোতে তো মাঝরাত হয়েছিল! আলগা পাথরগুলো মাটি বা ঘাসের বাঁধনে আটকে না থাকার দরুন গড়িয়ে পড়ছিল গরগর করে হিমশৈলের গতিবেগে।

আমার কাকা কিন্তু আমার গা ঘেঁসে চলছিলেন। কখনো আমাকে চোখের আড়াল হতে দিচ্ছিলেন না। কখনো-সখনো বাহু চেপে ধরে সিধে রাখছিলেন আমাকে।

পাহাড় যা খাড়াই, চূড়োয় শেষ পর্যন্ত পৌঁছোতে পারব বলে ভরসা পেলাম না। কিন্তু কপাল ভালো। ঘণ্টাখানেক পরে বিলকুল বেদম হয়ে যাওয়ার পর বরফের মাঝে সন্ধান পেলাম এক থাক সিঁড়ির। প্রকৃতি যেন স্বহস্তে রাশিকৃত পাথর ঢেলে রেখেছেন। অগ্ন্যুৎপাতের সময়ে পাথরগুলো উঠে এসেছিল পাহাড়ের কোটর থেকে। আইসল্যাণ্ডের ভাষায় এর নাম স্টিলা। পাহাড়ের গায়ে পাথরগুলো না আটকালে ছিটকে গিয়ে পড়ত সমুদ্রে, সৃষ্টি হত বেশ কয়েকটা দ্বীপ।

যাই হোক, অপ্রত্যাশিতভাবে পাথর-সিঁড়ি পেয়ে যাওয়ায় আরোহণ পর্ব অনেক সহজ হয়ে এল।

সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ, মাত্র দু হাজার ধাপ উঠে যেখানে পৌঁছোলাম স্নেফেলের শঙ্কুর মত চূড়োর গোড়া রয়েছে সেইখানে।

তিন হাজার দশ ফুট নীচে সমুদ্রের চেহারা দেখলাম সেখান থেকে। দারুণ ঠাণ্ডায় হাত-পা জমে যাবার উপক্রম হচ্ছে। কনকনে বাতাসে হাড় পর্যন্ত কাঁপছে। আমি আর পারছিলাম না। প্রফেসর দেখলেন আমার হাঁটু বেঁকে যাচ্ছে। উনি হুকুম দিলেন—আর না, এবার বিশ্রাম।

কিন্তু গাইড মাথা নেড়ে ড্যানিশ ভাষায় বুঝিয়ে দিলে এখন থামা হবে না, আরো ওপরে উঠতে হবে। কারণ? আঙুল দিয়ে সমতল ভূমির দিকে দেখালো হ্যান্স। বলল—"মিসটুর!"

যা দেখলাম, এক কথায় তা ভয়ংকর সুন্দর। জলস্তম্ভের আকারে পাকসাট দিয়ে ঝামাপাথর গুঁড়ো, ধুলো আর বালি শূন্যে উঠছে অতিকায় থামের মত। হাওয়ার টানে ধুলে-দৈত্য এগিয়ে আসছে স্নেফেলের দিকে। ওদিকে সূর্য থাকায় কালোছায়া পড়েছে আমাদের ওপর। আইসল্যাণ্ডের ভাষায় এই বিভীষিকার নাম 'মিসটুর'।

ঊর্ধ্বশ্বাসে এগোলাম বললেই চলে। হ্যান্সের পেছন পেছন চূড়ো ঘিরে পৌঁছোলাম অপর দিকে। সেই মুহূর্তেই ধুলো-ঝড় আছড়ে পড়ল স্নেফেলের ওপর। পাহাড়ের গোড়া পর্যন্ত কাঁপতে লাগল এক একটা ঝাপটায়। কত পাথর যে দমাদম শব্দে গড়িয়ে গেল তার ইয়ত্তা নেই।

বেঁচে গেলাম। কিন্তু হ্যান্স রেহাই দিল না আমাদের। এঁকেবেঁকে উঠতে লাগলাম মাত্র পনের'শ ফুট ওপরকার চূড়োর দিকে। মাত্র পনের'শ ফুট উঠতে মাইল সাতেক পথ পেরোতে হল এঁকেবেঁকে চলার দরুন। সময় লাগল পাঁচঘণ্টা। আমি আর পারছিলাম না। ঠাণ্ডায়, ক্ষিদেতে এবং উচ্চতার দরুন কম অক্সিজেনে আমি আমার শক্তির শেষ সীমায় পৌঁছেছিলাম।

মাঝরাতে গভীর অন্ধকারে গা মিলিয়ে পা দিলাম স্নেফেলের চূড়োয়। জ্বালামুখের ভেতরে আশ্রয় নেওয়ার আগে মধ্যরাত্রির সূর্য দেখার সুযোগ হল আমার। ম্যাড়মেড়ে রোদ্দুরে পায়ের তলায় দেখলাম ঘুমন্ত আইসল্যাণ্ড দ্বীপকে।

১৫ ॥ জ্বালামুখের ভেতরে

চটপট খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লাম। শক্ত বিছানা, মাথার ওপর ছাউনী নেই বললেই চলে, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে পাঁচ হাজার ফুট ওপরে আরামপ্রদ কিছু

আশাও করা যায় না। তবুও কিন্তু আমি ঘোষের মত ঘুমোলাম সে রাতে। স্বপ্নের উৎপাতও ঘটল না ঘুমের মধ্যে।

পরের দিন হিমেল হাওয়ায় ঘুম ভাঙল। চোখ রগড়ে দেখলাম ঝকঝকে রোদ্দুর। গ্র্যানাইট শয্যা ত্যাগ করে নীচে তাকিয়ে ছবির মত সুন্দর যে দৃশ্য দেখলাম তাকে ভূস্বর্গ বললেও বাড়াবাড়ি হয় না।

পশ্চিমমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে খুড়োমশায় আঙুল তুলে দেখালেন দূর দিগন্তে কুয়াশার মত, আবছা বাষ্পের মত একটা জিনিস। জলের ওপর জমি জেগে রয়েছে যেন।

"গ্রীনল্যাণ্ড", বললেন তিনি।

"গ্রীনল্যাণ্ড?" অবাক কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।

"হ্যাঁ, গ্রীনল্যাণ্ড, মাত্র একশ মাইল দূরে। বরফের চাঙর যখন ভাসতে ভাসতে আইসল্যাণ্ডে পৌঁছোয়, দেখা যায় তার ওপর মেরুর ভালুকও এসে গেছে আইসল্যাণ্ডে। আঁতকে উঠো না, আমরা রয়েছি স্নেফেলের চূড়োয়। চূড়োটির নাম কি, হ্যান্সকে জিজ্ঞেস করা যাক।"

জিজ্ঞেস করা হল গাইডকে।

"স্কার্টারিস," জবাব দিল হ্যান্স।

দিগ্বিজয়ীর মত আমার পানে চাইলেন খুড়োমশায়।

"এবার নামা যাক জ্বালামুখে!" সোল্লাসে বললেন কাকা।

স্নেফেলের জ্বালামুখ যেন একটা মস্ত ফানেল। ফানেলের মুখটা হল এক মাইল চওড়া। গভীরতা হাজার দুই ফুট। বিরাট এই চৌবাচ্চা আগুন আর বজ্র দিয়ে কানায় কানায় ভরা হলে কি কাণ্ডটা দাঁড়ায়, তা কল্পনায় আনলেও মাথার চুল খাড়া হয়ে যায়। ফানেলের তলদেশের পরিধি পাঁচশ ফুটের বেশী নয়। কাজেই মৃদুমন্দ ঢাল বেয়ে একদম তলদেশে পৌঁছোনো এমন কিছু কসরতের ব্যাপার নয়। আমার মনে হল, জ্বালামুখ তো নয়, যেন একটা অতিকায় ব্লানডারবাস বন্দুক। এ জাতীয় বন্দুকের চল নেই আজকাল। এ-বন্দুকের চোঙটা হত অবিকল ফানেলের মত ফাঁদালো।

মনে মনে ভাবলাম—"সর্বনাশ! ব্লানডারবাস বন্দুকের চোঙা দিয়ে নীচে নামব! বন্দুকে যদি বারুদ ঠাসা থাকে? একটু ছোঁয়া পেলেই যদি ফেটে উড়ে যায়? ওরে বাবা! মাথা খারাপ হলে তবে লোকে ওর মধ্যে নামে!"

কিন্তু ফেরার পথ আর নেই। হ্যান্স নির্বিকার ভাবে এগোলো সবার সামনে—আমি টুঁ শব্দটি না করে লেগে রইলাম ঠিক তার পেছনে।

দুপুর নাগাদ পৌঁছোলাম ফানেলের তলদেশে। মাথার ওপর ফানেলের

গোলাকার কিনারা। নীল আকাশ বন্দী হয়ে রয়েছে সেই গোলটুকুর মধ্যে। এক দিকে স্কার্টারিসের চূড়ো উদ্ধতভাবে মাথা তুলে রয়েছে আকাশের দিকে।

জ্বালামুখের তলদেশে দেখলাম তিনটে চিমনী। অগ্ন্যুৎপাতের সময়ে মাঝের চিমনী পথেই লাভা বমি করেছে স্নেফেল। প্রতিটি চিমনীর ব্যাস একশ ফুটের মত। পায়ের তলায় মুখব্যাদান করে তারা যেন গিলতে চাইছিল আমাকে। আমার তো হেঁট হয়ে দেখার সাহসও ছিল না। কিন্তু আমার খুড়োমশায়কে দেখলাম যেন নেচে নেচে হাত-পা ছুঁড়ে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী করে ঘুরছেন এক চিমনী থেকে আরেক চিমনীতে। আগাগোড়া বকর বকর করছেন দুর্বোধ্য ভাষায়। হান্স তার তিন স্যাঙাৎ নিয়ে লাভাস্তূপের ওপর আয়েশ করে বসে উপভোগ করছিল খুড়োর নৃত্য এবং মনে মনে হয়ত ভাবছিল আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে যা হোক!

আচম্বিতে ভীষণ চেঁচিয়ে উঠলেন কাকা। আমি ভাবলাম বুঝি পা হড়কে ছিটকে গেছেন কোনো একটা চিমনীর গহ্বরে। কিন্তু তা তো নয়! ঐ তো ওঁকে দেখা যাচ্ছে। মাঝের চিমনীর ধারে মস্ত একটা গ্র্যানাইট বেদীর ওপর দু পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি বিষম বিস্মিত হয়ে। দেখতে দেখতে তাঁর বিপুল বিস্ময় রূপান্তরিত হল তুমুল হর্ষে!

"অ্যাকজেল! অ্যাকজেল! এদিকে এসো! এখানে এসো!"

ছুটতে ছুটতে গেলাম তাঁর কাছে। এক চুলও নড়ল না হান্স আর তার তিন সাগরেদ।

"ছাখো!" বললেন প্রফেসর।

দেখে আমি চমৎকৃত হলাম—কিন্তু আনন্দিত হলাম না মোটেই। গ্র্যানাইট বেদীর পশ্চিম দিকে রোদে জলে ক্ষয়প্রাপ্ত রুনিক হরফে একটি মাত্র লাইন—অভিশপ্ত সেই নাম:



"আরন্ সাকন্যুউজম! কী, আর কোনো সন্দেহ আছে?" সেকী উল্লাস আমার কাকার।

ফ্যালফ্যাল করে লেখাটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। সম্বিত ফিরল অনেকক্ষণ পরে। দেখি সেই ফাঁকে পাওনাগণ্ডা বুঝে বিদায় নিয়েছে হান্সের তিন সঙ্গী। চিমনীর মুখে দাঁড়িয়ে কেবল আমরা তিনজন।

সে রাত কাটল তুঃস্বপ্নের মধ্যে। লাভার বিছানায় শুয়ে অবশ্য পরম সুখে নাক ডাকাতে লাগল হান্স। আমি ক্ষণে ক্ষণে আঁৎকে উঠতে লাগলাম—এই বুঝি কেঁপে উঠল জ্বালামুখ···এই বুঝি গুর গুর ধ্বনি শুনতে পাওয়া গেল তার অন্তঃপুরে।

পরের দিন আমার হল পোয়াবারো। কাকার মুখ থমথম করতে লাগল নিরুপায় রাগে। কারণ আর কিছুই নয়—আকাশ।

মেঘে ছেয়ে গেছে নীল আকাশ। সূর্যর মুখ দেখা যাচ্ছে না!

আহারে! সূর্য যদি এইভাবে মেঘলা আকাশে ঢাকা থাকে আরো ছটা দিন, তাহলেই পেরিয়ে যাবে স্কার্টারিসের ছায়াপাতের নির্দিষ্ট সময়। কোন পথে পৃথিবীর পেটে ঢোকা যাবে, তা অজ্ঞাত থেকে যাবে। মুখ আমসি করে ফিরে যাবেন কাকা। সেই সঙ্গে আমি।

সেদিন ছিল পঁচিশে জুন। পরের দিনও মুখ দেখা গেল না সূর্যদেবের। তার পরের দিন, মানে, আটাশে জুন আবহাওয়ায় ঈষৎ পরিবর্তন দেখা গেল চাঁদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে। জ্বালামুখে অকৃপণভাবে কিরণপাত করল সূর্যদেব। প্রতিটি টিলা, প্রতিটি পাথর, প্রতিটি পাহাড়, প্রতিটি খাঁজ-ফাটল উদ্ভাসিত হল প্রখর সূর্যালোকে। ছায়া পড়ল জমিতে। অনেক ছায়ার মধ্যে একটি ছায়া, স্কার্টারিসের ছায়া, ধারালো সংকেতের মতই ঘুরতে লাগল সূর্যের সাথে সাথে।

সেই সাথে ঘুরতে লাগলেন আমার কাকা।

ভরতুপুরে, অতি অল্প সময়ের জন্যে হলেও, ধারালো ছায়াটা আলতো করে ছুঁয়ে গেল মাঝের চিমনীকে।

"আছে! আছে! রাস্তা আছে! চলো পৃথিবীর পেটে···চলো! চলো!" সেকী চীৎকার কাকার। শেষ কথাটা অবশ্য ড্যানিশ ভাষায় বললেন।

আমি তাকালাম হান্সের পানে।

"ফোরাট!" প্রশান্ত কণ্ঠ হান্সের।

"ফরোয়ার্ড!" জবাব দিলেন কাকা—"চলো এগিয়ে!"

তখন একটা বেজে তেরো মিনিট।

১৬॥ শুরু হল আসল অভিযান

শুরু হল আসল অভিযান। অ্যাদ্দিন সমস্যার চাইতে মেহনৎ করেছি বেশী। এবার হল ঠিক তার উল্টো। প্রতি পদে দেখা দিল নতুন নতুন সমস্যা।

এতক্ষণ পর্যন্ত নিতল গহ্বরের ভেতরে উঁকি দেওয়ার সাহস হয়নি আমার। আমি ভয়ে সিঁটিয়ে রয়েছি, অথচ হ্যান্স এমন প্রশান্ত রয়েছে যে দেখেশুনে আমারই লজ্জা হতে লাগল। যে কোনো বিপদের জন্যে সে তৈরী। আর আমি? ধুত্তোর! লম্বা লম্বা পা ফেলে আমি এগিয়ে চললাম মাঝের চিমনীর দিকে।

কার্নিশের মত বেরিয়ে থাকা একটা পাথরের ওপর থেকে তাকালাম নীচের দিকে। তৎক্ষণাৎ লোম খাড়া হয়ে গেল আমার। একী দেখছি! এ গহ্বরের যে শেষ নেই! মাথা ঘুরে গেল আমার। দেহের ভারসাম্য হারিয়ে ফেললাম। পড়ে যাচ্ছিলাম গহ্বরের মধ্যে চুম্বকের মত আকর্ষণে, এমন সময়ে পেছন থেকে একটা বলিষ্ঠ হাত আমাকে টেনে নিল। হ্যান্স জীবন বাঁচাল আমার। বেশ বুঝলাম, কোপেনহেগেনের সেই আকাশছোঁয়া গির্জেতে উঠে "উঁচু থেকে খাদ দেখা"ব ব্যায়াম হয়েছে না কচু হয়েছে! কিছুই শিখিনি আমি!

এক পলকের মধ্যে দেখেছিলাম খাড়া পাতকুয়োর দেওয়ালে অজস্র খোঁচ। সিঁড়ির ধাপের মত তা ধরে ধরে নামা যাবে। কিন্তু ধাপ আছে তো রেলিং নেই। কি ধরে নামবো? দড়ি ধরে? সে দড়ি নীচে নামবার পর খুলব কেমন করে?

খুব সহজেই সমস্যার সমাধান করে দিলেন আমার কাকা। চারশ ফুট লম্বা বুড়ো আঙুলের মত মোটা একগাছি দড়ি নিয়ে উনি দুদিক ঝুলিযে দিলেন পাথুরে কার্নিশের দুপাশে। এখন ঐ ডবল দড়ি একসঙ্গে ধরে নেমে গিয়ে একগাছি দডি ধরে টানলেই হল। সরসর করে নেমে আসবে সমস্ত দড়িটা।

তা না হয় হল। কিন্তু অত মালপত্র নিয়ে নামব কি করে? সে সমস্যার ঝটিতি সমাধান করে দিলেন আমার কাকা। উনি ভঙ্গুর জিনিসগুলো নিয়ে তিনটে প্যাকেট করলেন। তিনজনের পিঠে রইল প্যাকেট তিনটে। বাদবাকী অভঙ্গুর জিনিসগুলো নিয়ে একটা বড় প্যাকেট বানালেন। বেশ করে দড়ি দিয়ে তা বাঁধলেন। তারপর বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে ঠেলে ফেলে দিলেন গহ্বরের মধ্যে। গর-গর-দুম-দাম-দমাস-ধাম শব্দে ধাক্কা খেতে দেখতে দেখতে চোখের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল বস্তাটা।

হৃষ্টকণ্ঠে বললেন কাকা—"চমৎকার! এবার আমাদের পালা!"

সাধু পাঠকদের শুধোই—এ-কথা শোনার পর সারা গায়ে রোমাঞ্চ দেখা দেয় কিনা?

তিনজনের পিঠে তিনটে পুলিন্দা নিয়ে একে-একে দড়ি ধরে ঝুলে পড়লাম আমরা। আগে হান্স, মাঝে কাকা, ওপরে আমি। আমি এক হাতে দড়ি ধরে আছি পাগলের মত, আরেক হাতের লোহার আঁকশি দিয়ে পাথরে ঠেক দিয়ে ব্যালেন্স রাখছি। নিটোল নৈঃশব্দের মধ্যে শোনা যাচ্ছে কেবল আলগা পাথর ছিটকে পড়ার শব্দ। মাঝে মাঝে বিপজ্জনক পাথর দেখলে ড্যানিশ ভাষায় হুঁশিয়ার করছে হান্স। সঙ্গে সঙ্গে তর্জমা করে শোনাচ্ছেন কাকা—"হুঁশিয়ার।"

আধঘণ্টা লাগল দুশ ফুট নামতে। শক্ত কার্নিশে পা দিয়ে দড়ির একপ্রান্ত ধরে টান দিতেই ওপরের কার্নিশ ঘুরে নেমে এল গোটা দড়িটা। আসবার সময়ে অবশ্য আলগা নুড়ির বিপজ্জনক ধারাবর্ষণ ঘটিয়ে অবস্থান সঙীন করে তুলল আমাদের।

এইভাবেই প্রতি আধঘণ্টায় নামতে লাগলাম দুশ ফুট করে। বহু ওপরে চিমনীর মুখ ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হয়ে এল। কিন্তু বহু নীচেও গহ্বরের তলদেশ দেখলাম না।

চোদ্দবার এইভাবে দড়ি লাগিয়ে এবং খুলে অবতরণ করলাম আমরা। তার মানে বিশ্রামের সময় সমেত, সাড়ে দশ ঘণ্টা পরে নামলাম ২৮০০ ফুট নীচে। তখন বাজে এগারোটা।

হান্স তখন বললে—"থামুন। এসে গেছি।"

"কোথায়?" হান্সের পাশে দড়ি থেকে নামতে নামতে শুধোলাম।

"খাড়াই চিমনার তলায়।"

"বেরোনোর রাস্তা দেখা যাচ্ছে কী?"

"ডানদিকে একটা গলিপথ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আজ আর না। এবার খাওয়া আর ঘুম।"

খেয়েদেয়ে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়লাম আমি। বহু ঊর্ধ্বে চিমনীর উন্মুক্ত হাঁয়ের মধ্যে দেখলাম একটা টিমটিমে আলো।

তারা জ্বলছে আকাশের বুকে।

ঘুমিয়ে পড়লাম আমি।

১৭॥ সমুদ্র-পৃষ্ঠের দশ হাজার ফুট নীচে

সকাল আটটায় ঘুম ভাঙল চোখের পাতায় দিনের আলোর সরু রশ্মিরেখা এসে পড়ায়। মণিমাণিক্যের চারধার থেকে আলো যেমন ঠিকরে যায়, সহস্র রোশনাই সৃষ্টি করে—লাভার দেওয়ালের অগুন্তি এবড়ো-খেবড়ো খাঁজে

ক্ষীণ রশ্মি রেখাটা সেইভাবে ওপর থেকে ঠিকরে ঠিকরে নীচে নেমে এসেছিল আশ্চর্য রোশনাইরূপে। যেন স্ফুলিঙ্গের ফুলঝুরি ঝরছিল মাথার ওপরে। আশপাশের সব কিছু দেখবার পক্ষে যথেষ্ট সেই আলো।

কাকা বললেন—"কী অ্যাকজেল, কি রকম লাগছে বল এবার? নিজের বাড়ীতেও এমন ঘুম ঘুমিয়েছিস কখনো? গাড়ীঘোড়ার ঘর্ঘর শব্দ নেই, ফেরিওয়ালাদের সোরগোল নেই, মাঝিমাল্লাদের চীৎকার নেই—এমন জায়গা পাবি কোথায়?"

"নির্জন তো বটেই", বললাম আমি। "কিন্তু এই নির্জনতাই তো বুক কাঁপিয়ে দিচ্ছে।"

"আচ্ছা ভীতু তো! এখনো তো পৃথিবীর খোলে ইঞ্চিখানেকও ঢুকিনি বললেই চলে।"

"তার মানে?"

"তার মানে—আমরা সবাই দ্বীপের তলায় পৌঁছেছি। জ্বালামুখ থেকে খাড়াই যে নলচে বেয়ে নেমে এলাম, তার শেষ হল সমুদ্র-পৃষ্ঠের সমান উচ্চতায়।"

"আপনার হিসেব ঠিক আছে তো?"

"ব্যারোমিটার দেখলেই তো হয়।"

সত্যিই তো! জ্বালামুখের ভেতর দিয়ে নামবার সময়ে ব্যারোমিটারের পারা ক্রমশঃ উঠছিল ওপরদিকে। এখন তা দাঁড়িয়ে উনত্রিশ ইঞ্চিতে।

প্রফেসর বললেন—"তাহলেই ছাখ, এতটা নেমেও বায়ুমণ্ডলের চাপ মাত্র এক এককে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এবার কিন্তু ব্যারোমিটারের বদলে ম্যানোমিটার বার করবার অপেক্ষায় রয়েছি আমি।"

বাস্তবিকই, সমুদ্র-পৃষ্ঠে বায়ুমণ্ডলের যা চাপ, তার ঊর্ধ্বে উঠলেই এ-যন্ত্র আর কাজ দেবে না।

বললাম—"কিন্তু এই যে চাপ বাড়তে বাড়তে চলেছে, আমাদের পক্ষে তা ক্রমশঃ যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠবে না?"

"না। আস্তে আস্তে নামছি বলে আমাদের ফুসফুস মানিয়ে নেবে আবো উচ্চচাপের বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে। উড়োজাহাজের পাইলটদেরও এইরকম অবস্থা দাঁড়ায় হঠাৎ ঘন বায়ুস্তর থেকে পাতলা বায়ুস্তরে উঠে গেলে। পরে সয়ে যায়। যাক, বাজে সময় নষ্ট করলে চলবে না। যে প্যাকেট গড়িয়ে দিয়েছিলাম, কোথায় সেটা?"

শখানেক ফুট ওপরে একটা কার্নিশে আটকে গিয়েছিল বাণ্ডিলটা। হ্যান্স

বেড়ালের মত অবলীলাক্রমে উঠে গেল দেওয়ালের খোঁচা ধরে ধরে। মিনিট-কয়েকের মধ্যে নামিয়ে আনল বাণ্ডিলটা।

প্রাতরাশ খেয়ে পকেট থেকে পুঁচকে নোট বই বার করলেন কাকা। বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ লিখে রাখার জন্যে খাতাটা পকেটে রেখেছিলেন উনি। নানা যন্ত্রপাতি দেখে খাতার পাতায় লিখলেন:

সোমবার ২৯শে জুন

ক্রোনোমিটার: সকাল আটটা সতেরো

ব্যারোমিটার. ২৯ ইঞ্চি ৭ লাইন

থার্মোমিটার: ৬ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড

দিকনির্দেশ: পূর্ব-দক্ষিণ-পূর্ব

শেষ লাইনটা লিখলেন কম্পাস দেখে। কম্পাসের কাঁটা ঘুরেছিল একটা অন্ধকার গলিপথের দিকে।

"অ্যাকজেল", উল্লসিতকণ্ঠ কাকার—"এই মুহূর্ত থেকে শুরু হল আমাদের পৃথিবীর উদরে অবতরণের পালা।"

এই না বলেই কাঁধে ঝোলানো Runmkorff তারের কুণ্ডলী টেনে নিয়ে লণ্ঠনের ফিলামেন্ট বা সূক্ষ্মসূত্রে লাগিয়ে দিলেন। দপ করে জ্বলে উঠল জোরালো আলো। অন্ধকার উধাও হল নিমেষ মধ্যে।

হ্যান্সের হাতে ছিল আরও একটা লণ্ঠন। সে-ও আলো জ্বালল একই পন্থায়। বৈদ্যুতিক শক্তির এই মৌলিক ব্যবহার কৃত্রিম দিবালোক সৃষ্টি করে চলবে বহুক্ষণ—দাহ্য গ্যাসের মধ্যেও অব্যাহত থাকবে তার ক্ষমতা।

"সামনে চলো!" হুকুম দিলেন কাকা।

শুরু হল অভিযান। যে-যার বাণ্ডিল তুলে নিল কাঁধে। আগে চললেন কাকা। পেছনে লম্বাদড়ির প্রান্তে বাঁধা বস্তাটা গড়িয়ে নিয়ে চলল হ্যান্স। সবার পেছনে আমি।

অন্ধকার গলিপথে প্রবেশ করার আগে ঘাড় ফিরিয়ে শেষবারের মত দেখে নিলাম সুদীর্ঘ খাড়াই টানেলের শীর্ষে আইসল্যাণ্ডের আকাশকে। জানি, এ-আকাশ ইহজীবনে আর দেখতে পাব না।

১২২৯ সালে শেষবার লাভা উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল এই সুড়ঙ্গ পথেই। দেওয়ালে, মেঝেতে এখনো সে চিহ্ন বিদ্যমান। চকচকে লাভার পলস্তারার ওপর ইলেকট্রিক লাইটের বহুশত প্রতিফলন যেন লক্ষ ঝাড়বাতি জ্বালাচ্ছে পথের দুপাশে।

পথ চলা দুষ্কর হত শুধু একটি কারণে। পথটা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী কোণে

এমনভাবে গড়িয়ে নেমে গেছে যে পা ফসকালেই টাল সামলানো মুস্কিল। কিন্তু সারা পথটায় লাভা জমে এমন অনেক খোঁচ জাগিয়ে রেখেছে যা সিঁড়ির ধাপের মত থাকে থাকে নেমে গেছে নীচের দিকে। আমরা পা টিপে টিপে সেইসব ধাপের ওপর পা দিয়ে নেমে চললাম। দড়ির ডগায় মালপত্তরের বস্তাটা সামনে গড়িয়ে চলল আপনা হতে—শুধু দড়ি টেনে রেখে এগিয়ে চলল হান্স।

পায়ের তলায় ধাপ সৃষ্টি করেছে যে-বস্তু, দেওয়ালে তা রূপান্তরিত হয়েছে লাইম কারবোনেটে। লাভার স্তরে মাঝে মাঝে বহুছিদ্রযুক্ত ফোস্কা জেগে রয়েছে; অস্বচ্ছ কোয়ার্জ অর্থাৎ শিলাস্ফটিকে যেন কাঁচের অশ্রুবিন্দু বসানো রত্নখচিত জড়োয়া গয়নার মত—ছাদ থেকে ঝাড়বাতির মত ঝুলছে আশ্চর্য সুন্দর এই শিলাস্ফটিক। আমাদের লণ্ঠনের আলোয় তা জ্বলে জ্বলে উঠছে যাওয়ার পথে—ফের নিভে যাচ্ছে লণ্ঠন নিয়ে এগিয়ে গেলেই। পাতাল সুড়ঙ্গের অশরীরী উপদেবতারা যেন ভূলোকের অতিথি সমাগমে উল্লসিত হয়ে আলোকসজ্জায় সাজাচ্ছে তাদের অন্ধকারের প্রাসাদকে।

ঘন ঘন কম্পাস দেখছিলাম আমি। আমরা কিন্তু সটান দক্ষিণ-পূবেই চলেছি। লাভাস্রোত একটুও এদিক ওদিক বেঁকেনি ধরিত্রীর জঠর থেকে উৎক্ষিপ্ত হওয়ার সময়ে। সোজা রেখায় ঠেলে এসেছে পৃথিবীর ওপরে।

কিন্তু কী আশ্চর্য! তাপমাত্রা তো তেমনভাবে বাড়ছে না। ডেভীর থিওরী তাহলে নির্ভুল প্রমাণিত হচ্ছে।

মনে পড়ল খাড়াই কুয়ো দিয়ে নীচে নামবার সময়ে কাকার বক্তৃতা। ঐ অবস্থায় প্রাণটা যখন গলায় এসে ঠেকেছে, তখন আশপাশের পাথুরে দেওয়ালে শিলাস্তরের বিন্যাস নিয়ে মাথা ঘামাতে অতি বড় পাগল ভূতত্ত্ববিদও বুঝি রাজী হতেন না। আমার কাছে সব শিলাই তখন একাকার হয়ে গিয়েছিল। লিওসেন, মিওসেন, ইওসেন, ক্রেটেসাস, জুরাসিক, ট্রায়াসিক, পার্মিয়ান, কারবোনিফেরাস, ডেভোলিয়ান, সিলুরিয়ান অথবা প্রিমিটিভ—সবই তখন আমার চোখে একরকমই মনে হচ্ছে। কাকা কিন্তু খরখরে চোখে নিশ্চয় সব লক্ষ্য করছিলেন অথবা লিখে রাখছিলেন। কেননা একবার দড়ি খোলবার অবসর পেয়ে উনি বলেছিলেন:

"যত নামছি ততই আস্থা বাড়ছে। আগ্নেয়শিলা যেভাবে সাজানো দেখছি, এতো ডেভীর থিওরী সত্যি না হলে সম্ভব নয়। যে শিলাস্তরের মধ্যে দিয়ে চলেছি, এ-ই হল পাথরের আদিম অবস্থা। ধাতব পদার্থের গায়ে জল আর হাওয়ার ছোঁয়া লাগতেই যে আগুন জ্বলেছিল, তার চিহ্ন পাথরের গায়ে বর্তমান। না, পৃথিবীর মাঝখানে সাংঘাতিক উত্তাপ একেবারেই নেই।"

তাপমাত্রা বাড়তে না দেখে মনে হল ভেভী তাহলে মিথ্যে বলেন নি। থার্মোমিটার দেখে আরো অবাক হলাম। রওনা হওয়ার পর ছঘণ্টা কেটেছে। অথচ টেম্পারেচার বেড়েছে মাত্র চার ডিগ্রী। দেখেশুনে মনে হল নিশ্চয় আমরা জমির সঙ্গে সমান্তরালভাবে চলেছি—খাড়াইভাবে নামছি না। কতখানি নেমেছি, তা অবশ্য কাকা বলতে পারবেন। প্রতি মুহূর্তে উনি হিসেব কষে বলেছেন—কিন্তু ফলাফল কাউকে বলছেন না।

রাত আটটায় থামলাম আমরা। লণ্ঠনগুলো বেঁধে নিলাম দেওয়ালের খোঁচা পাথরে। লক্ষ্য করলাম, গুহার ভেতরে বাতাসের অভাব তো নেই-ই, বরং মৃদু মন্দ সমীরণ বইছে যেন। কি করে তা সম্ভব বুঝলাম না। একটানা সাতঘণ্টা পা টিপে টিপে হেঁটে আর ক্ষিদের চোটে তখন আমি আধমরা। তার মধ্যেও একটা বিষয় আমাকে উদ্বিগ্ন করল। এখনো পর্যন্ত খাবার জলের কোনো ধারা চোখে পড়েনি। অথচ সঙ্গে যা জল এনেছিলাম, তা ক্রমশঃ ফুরিয়ে আসছে খুব জোর আর পাঁচদিন চলবে।

কাকাকে বলতেই উনি বললেন—"তা নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। গ্র্যানাইট দেওয়াল ফুটো করে জলের ধারা আসা যে সম্ভব নয়, এটা অন্ততঃ তোমার বোঝা উচিত।

"লাভার দেওয়াল তো অনেক দূর গিয়েছে। অথচ আমরা খুব নীচে নেমেছি বলে মনে হচ্ছে না।"

"এ-কথা মনে হল কেন?"

"সত্যিই যদি নীচে নামতাম, তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেত।"

"সেটা তো তোমার থিওরী অনুসারে। থার্মোমিটার কি বলে?"

"পনেরো ডিগ্রীও নয়। অর্থাৎ রওনা হওয়ায় পর টেম্পারেচার বেড়েছে ন' ডিগ্রী।'

"তা থেকে কি বুঝেছো?"

"খুব সূক্ষ্ম হিসেব অনুসারে একশ ফুট অন্তর এক ডিগ্রী করে টেম্পারেচার বাড়ে। অঞ্চল বিশেষে কম বেশীও হয়। সাইবেরিয়ার ইয়াখুটে (yakoutsk) দেখা গেছে প্রতি ছত্রিশ ফুটে এক ডিগ্রী টেম্পারেচার বাড়ে। তফাৎ পাথরের তাপ বহন করার ক্ষমতার নির্ভর করে। নেভা আগ্নেয়গিরির ধারে কাছে দেখা গিয়েছে ১২৫ ফুট অন্তর তাপমাত্রা বাড়ে এক ডিগ্রী করে। শেষের হিসেব ধরেই অংক কষলেই জানা যাবে আমরা কতখানি নেমেছি।"

"তাই কষো বাবা, কষে ফেলো অংকটা।"

"এ আর এমন কি অংক। ১২৫কে ৯ দিয়ে গুণ করলে হয় ১,১২৫ ফুট : আমরা নেমেছি মাত্র ১,১২৫ ফুট।"

"যা বলেছো।"

"তাহলে ?"

"তাহলে আর কি। আমার হিসেব অবশ্য বলছে আমরা সমুদ্রপৃষ্ঠের দশ হাজার ফুট নীচে পৌঁছে গেছি।"

"অসম্ভব!"

"অসম্ভব হলে বলব আমার হিসেবগুলো হিসেবই নয়!"

কিন্তু প্রফেসরের হিসেব বিলকুল খাঁটি। খনি অঞ্চলে মানুষ পাতাল অবতরণের যে রেকর্ড রেখেছে, আমরা তা চুরমার করে নেমেছি আরো ছ'হাজার ফুট নীচে।

এ-জায়গায় টেম্পারেচার হওয়া উচিত ছিল ৮১ ডিগ্রী। কিন্তু আসলে তা ১৫ ডিগ্রীও নয়।

ফলে, ভীষণ ভাবনায় পড়লাম আমি।

১৮॥ আবার ওপর দিকে

পরের দিন তিরিশে জুন ভোর ছটায় রওনা হলাম আমরা। বারোটা সতেরো মিনিটে দেখলাম, সুড়ঙ্গটা দুভাগ দুদিকে গেছে।

কোন দিকে যাওয়া সঙ্গত ? এমন কোনো গাইড নেই সঙ্গে যে সঠিক পথ বাতলে দেয়। সুতরাং কাকা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ঝটপট সিদ্ধান্ত নিলেন। বিনা দ্বিধায় পা বাড়ালেন পুব দিকের সুড়ঙ্গে।

এ-সুড়ঙ্গ দেখলাম ততটা ঢালু নয়।

সন্ধ্যে ছটা নাগাদ দেখলাম দক্ষিণ দিকে মাইল পাঁচেক হেঁটেছি বটে, কিন্তু সিকি মাইল নীচেও নামিনি।

পরের দিন ফের রওনা হলাম লাভা দিয়ে বাঁধানো সুড়ঙ্গ দিয়ে। লক্ষ্য করলাম, সুড়ঙ্গ পথ নীচের দিকে ঢালু হওয়া দূরের কথা, ক্রমশঃ যেন সমান্তরাল হয়ে গিয়ে ঈষৎ ওপরের দিকে উঠতে আরম্ভ করেছে। সকাল দশটা নাগাদ উর্ধ্বগতির জন্য আমার গতি মন্থর হল।

অমনি খেঁকিয়ে উঠলেন কাকা—"অ্যাকজেল, ব্যাপারটা কী ?"

আমি বললাম আমার আশংকার কথা। বললাম—"এ-ভাবে চললে শীগগিরই আইসল্যাণ্ডের জমিতে ফের ফিরে যাবো।"

গোঁয়ার কাকা কোনো জবাব না দিয়ে এগিয়ে চললেন। অগত্যা আমিও চললাম। দুপুর নাগাদ সিলুরিয়ান শিলাস্তর চোখে পড়ল। দেখলাম চুণা পাথর, 'শেল' শিলা আর স্লেট পাথর।

কাকাকে বললাম—"আমরা কিন্তু সেই স্তরে এসেছি যেখানে উদ্ভিদ আর প্রাণীর প্রথম সূচনা দেখা দিয়েছিল।"

"তাই নাকি?"

"নিজেই দেখুন না।"

কাকা লণ্ঠন তুলে দেওয়ালের নমুনা দেখলেন। অবাক হয়েছেন কিনা বোঝা গেল না—একটা কথাও আর বললেন না।

বুঝলাম। পুবদিকের সুড়ঙ্গে নামাটা ভুল হয়েছে, তা স্বীকার করতে পারছেন না কাকা। হাজার হোক বয়েসে ছোট তো আমি!

কিন্তু একশ গজ যেতে না যেতেই অকাট্য প্রমাণ হাতে এল। সিলুরিয়ান যুগে উদ্ভিদ জগৎ আর প্রাণী জগতের প্রায় পনের'শ রকম শ্রেণী ছিল সমুদ্রের জলে। পায়ের তলায় হঠাৎ পেলাম তাদের নমুনা। লাভার মেঝে শেষ হয়ে গেল আচম্বিতে। দেখলাম ধূলোয় পা বসে যাচ্ছে। এ-ধূলো গাছ আর শামুক চূর্ণ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। দেওয়ালে স্পষ্ট ছাপ রয়েছে পাহাড়ি ঝোপ আর শ্যাওলার।

আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। একটা শামুক জাতীয় শক্ত খোলা তুলে নিয়ে দৌড়ে গিয়ে দেখালাম কাকাকে।

শান্ত কণ্ঠে কাকা বললেন—"জানি। ট্রাইলোবাইটস এর খোলা। এখন এরা লোপ পেয়েছে।"

"কিন্তু বুঝছেন না কেন—?"

"বুঝেও কোনো উপায় নেই অ্যাকজেল। ভুল পথেও যদি এসে থাকি তো শেষ না দেখে ফিরছি না।"

"কিন্তু জল যে ফুরিয়ে এল।"

"রেশন করে জল খাও।"

১৯॥ কাণা গলি

বরাদ্দ কমিয়ে জল খাওয়া ছাড়া আর উপায়ও ছিল না। তিন দিনের বেশী জল ছিল না ফ্লাস্কে।

পরের দিন নিঃশব্দে হেঁটে চললাম। পথ চলতে চলতে ট্রাইলোবাইটস-এর চাইতেও উন্নত প্রাণীর জীবাশ্ম চোখে পড়ল। মাছ এবং আদিমতম

সরীসৃপ-প্রাণীর দেহাবশেষও দেখলাম। পাথরের গায়ে তারা হাজারে হাজারে শিলীভূত হয়ে রয়েছে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে।

কাকা দেখেও দেখলেন না। হান্স কোনো কথা বলল না।

পরের দিন শুক্রবার। তেষ্টার কষ্ট অনুভব করলাম। দশ ঘণ্টা এক নাগাড়ে হাঁটবার পর দেখলাম, লণ্ঠনের আলো আর তেমন উজ্জ্বল ভাবে দেওয়াল থেকে ঠিকরে আসছে না। ক্রমশ: ম্যাড়মেড়ে পলস্তারায় ছেয়ে যাচ্ছে সুড়ঙ্গের দেওয়াল।

এক জায়গায় এসে দেওয়াল ধরে বসে পড়েছিলাম। হাতটা চোখের সামনে ধরে চমকে উঠলাম ভূত দেখার মত। হাত কালো হয়ে গিয়েছে।

"কয়লাখনি!" বললাম অস্ফুট কণ্ঠে।

"হ্যাঁ। কয়লাখনি," সায় দিলেন কাকা। "প্রকৃতির হাতে গড়া খনি।"

আরো কিছুদূর এগিয়ে এসে পড়লাম যেন একটা প্রকাণ্ড গর্ভগৃহে। চারিদিকে কেবল কয়লা, কয়লা আর কয়লা। একশ ফুট চওড়া আর দেড়শ ফুট উঁচু বিশাল কয়লা-খনি। ছাদটা আশ্চর্যভাবে ঝুলছে—থামজাতীয় কোনো ঠেকা নেই।

কয়লা-দেওয়ালে কয়লা-ইতিহাস লেখা রয়েছে বিভিন্ন স্তরের মধ্যে। ভূতত্ত্ববিদের চোখে তা অতি স্পষ্ট—সাধারণের চোখে বালি পাথর আর কাদামাটি ছাড়া কিছুই নয়।

সন্ধ্যে ছটা নাগাদ পথ ফুরোলো। সামনে দেওয়াল। কাকার আশাও নিভে গেল। উনি ভেবেছিলেন, পায়ের তলায় খাড়াই গহ্বর পাবেন নীচে নামার জন্যে।

শান্ত কণ্ঠে বললেন কাকা— "কাল সকাল হলেই ফেরার পথ ধরব। তিন দিন লাগবে ফিরতে।"

"যদি শক্তি থাকে তদ্দিন," বললাম আমি।

"কেন থাকবে না শুনি?"

"জল আর নেই।"

"সাহসও কি নেই?" কঠোর চোখে তাকালেন কাকা।

জবাব দিতে পারলাম না।

২০॥ নব কলম্বাস

ফিরতি পথের দুরবস্থার বর্ণনা দিয়ে কাহিনী দীর্ঘ করতে চাই না। সে যে কী অসহ্য কষ্ট, অবর্ণনীয় যন্ত্রণা, তা সত্যিই বুঝিয়ে বলবার মত ভাষা আমার

নেই। কাকার কথা আলাদা। অসাধারণ কষ্টসহিষ্ণু উনি। আর হান্স তো সব কিছুতেই নির্বিকার।

আমার হিসেব মত জল ফুরোলো প্রথম দিনেই। জলের বদলে জিন খেতে গিয়ে গলা যেন পুড়ে গেল। শেষকালে এমন হল যে আকণ্ঠ পিপাসা সত্ত্বেও জিনের বোতল দেখলেই পিপাসা যেন আরো বেড়ে যেতে লাগল।

শেষটা আর পারলাম না। কতবার যে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লাম, তা বলতে পারব না। প্রতিবারেই কাকা আর হান্স আমার জ্ঞান ফিরিয়ে ধরে ধরে নিয়ে চললেন। কাকার মুখ দেখে বুঝলাম তাঁর অবস্থাও বিলক্ষণ কাহিল। তেষ্টায় ক্লান্তিতে উনিও আর পারছেন না।

শেষের দিকে প্রায় বুকে হেঁটে পৌছোলাম সুড়ঙ্গের প্রবেশ মুখে। ঠোঁট ফুলে গিয়েছিল আমার। কাৎরানি ছাড়া কোনো আওয়াজ কণ্ঠ দিয়ে বেরোলো না। কাকা আর হান্স যখন হাঁপাতে হাঁপাতে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে বিস্কুট বার করে চিবুতে বসল, আমি তখন গভীর ঘুমে এলিয়ে পড়েছি পাথরের ওপর।

কিছুক্ষণ পরে কাকা কাছে এলেন। আমাকে দু'বাহুর মধ্যে তুলে ধরে বললেন—"বাছারে!" নির্জলা অনুকম্পা ধ্বনিত হল তাঁর কণ্ঠে।

কাকার কাছে নরম ব্যবহার কোনোদিন পাইনি। তাই এই সমবেদনা আমার অন্তর স্পর্শ করল। আঁকড়ে ধরলাম ওঁর কাঁপা হাত। দুই চোখে জল নিয়ে আমার দিকে চেয়ে রইলেন কাকা।

তারপর কাঁধে ঝোলানো জলের ফ্লাস্কটা খুলে উপুড় করে দিলেন আমার গলায়। সেই মুহূর্তে অমৃতর আস্বাদ লাভ করলাম! ওঃ! সেকী সুখ! স্বর্গ সুখ কি একেই বলে? মাত্র এক ঢোঁক জল ছিল ফ্লাস্কে—কিন্তু ঐটুকু জলই নবজীবন দিল আমাকে—ফিরিয়ে দিল আমার কথা বলার শক্তি।

গাঢ় কণ্ঠে বললেন কাকা—"অ্যাকজেল, আমি জানতাম ফিরে আসার পর আর খাড়া থাকতে পারবে না তুমি। তাই অনেক লোভ সামলে শুধু তোমার জন্যেই আগলে রেখেছিলাম জলটুকু।"

"কাকা!" দুই চোখে জল এসে গেল আমার। রসকষহীন কাকার প্রাণেও দয়ামায়া আছে? উনি এত ভালবাসেন আমাকে?

এক ঢোঁক জল খেয়েই ফোলা ঠোঁট অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এল।

বললাম—"এবার ফিরে চলুন।"

চোখ ফিরিয়ে নিলেন কাকা—"তা হয় না, অ্যাকজেল। আমি শেষ না দেখে যাবো না।"

"তাহলে কি এই ভাবেই মরব আমরা ?"

"না, না, তুমি আর হান্স ফিরে যাবে। আমি যে-কাজ নিয়ে এসেছি, তা শেষ না করে ফিরব না," আবার কাকার উগ্রমূর্তি দেখলাম। একরোখা, গোঁয়ার প্রফেসর লিডেনব্রকের এ-স্বর আমি চিনি।

দৌড়ে গেলাম হান্সের কাছে। ইঙ্গিতে দেখালাম চিমনীর দিকে।

নির্বিকার ভাবে হান্স শুধু কাকাকে দেখিয়ে বলল—"মাস্টার!"

খেপে গেলাম আমি—"তুমিও কি মরতে চাও ? জল পাব কিনা তার ঠিক নেই—এখনো দুঃসাহস ? কাকাকে নিয়ে চলো সবাই ফিরে যাই।"

নীরবে ঘাড় নাড়ল হান্স। এতো দেখছি আরেক গোঁয়ার !

কাকা বললেন—"অ্যাকজেল, আমার প্রস্তাবটা শুনবে ?"

আমি বেপরোয়া ভাবে চোখ রাখলাম ওঁর চোখের ওপর।

কাকা বললেন—"আমাদের একমাত্র সমস্যা হল জল। তুমি যখন জ্ঞান হারিয়ে পড়েছিলে, আমি নতুন সুড়ঙ্গের ভেতর ঢুকেছিলাম। দেখলাম, এ গহ্বর সোজা পৃথিবীর খোলের দিকে নেমে গেছে। তার মানে ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে জলের সন্ধান আমরা পাবই পাব। শিলাস্তর দেখে তা বুঝেছি আমি। আমাকে আর একটা দিন সময় দাও। কলম্বাসের সঙ্গীরা বেঁকে বসলে কলম্বাস মাত্র তিন দিন সময় চেয়েছিলেন 'নতুন জগতে' পৌঁছোনোর—না পেলে ফিরে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কলম্বাসের কথা শুনেছিল সবাই। তিন দিনের মধ্যেই কলম্বাস ডাঙায় পৌঁছেছিলেন। আমি এই পাতালের কলম্বাস, আমি ভিক্ষা চাইছি মাত্র আর একটা দিন। এক দিনের মধ্যে জল না পেলে কথা দিচ্ছি তিনজনেই ফিরে যাবো।"

মেজাজ তিরিক্ষে হয়ে থাকা সত্ত্বেও কাকার কথা আমার অন্তর স্পর্শ করল। কি কষ্টে যে এ-কথা বললেন কাকা, তা উপলব্ধি করলাম।

বললাম—"বেশ, ঈশ্বর আপনার অতি-মানবিক উৎসাহর পুরস্কার যেন দেন। চলুন, যাওয়া যাক !"

২১ ॥ মূর্ছিত হলাম

নতুন সুড়ঙ্গ পথে একশ গজ যেতে না যেতেই কাকা চেঁচিয়ে উঠলেন—"এই তো আদ্দিকালের পাথর ! এবার ঠিক পথে চলেছি আমরা।"

নামতে নামতে আদ্দিকালের পাথরের আরো নমুনা চোখে পড়ল। ভূতত্ত্ববিদদের চোখে এ-পাথরের মানে অনেক। পৃথিবীর খোসা নাকি এইসব

পাথরের ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে। তিনটি স্তরে তাঁরা ভাগ করেছেন এই পাথরের রাজ্যকে।

হাঁটতে হাঁটতে আবার বেদম হয়ে পড়লাম আমি। শেষকালে আর না পেরে পড়ে গেলাম পাথরের ওপর।

অস্ফুট কণ্ঠে শুধু বললাম—"বাঁচান! আমি মারা যাচ্ছি।"

তখন রাত আটটা। পাতাল স্রোতস্বিনীর ঝির ঝির শব্দ শোনার আশায় এতক্ষণ উন্মত্তের মত দৌড়োচ্ছিলেন কাকা। আমার ঐ অবস্থা দেখে উনি ফিরে তাকালেন। জ্বলন্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে কেবল বললেন —"সব শেষ!"

জ্ঞান হারালাম আমি।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখলাম, কাকা আর হ্যান্স কম্বল পেতে শুয়ে আছেন। ঘুমোচ্ছেন কিনা বুঝলাম না।

আমার তখনকার অবস্থা মৃত্যুর চেয়েও ভয়ংকর। ঢালু সুড়ঙ্গের অন্ধকারের পানে চেয়ে রইলাম ফ্যালফ্যাল করে। জানি এই শেষ। কথামত কাকা এবার ফিরবেন। কিন্তু চার মাইল পথ পেরিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা আমাদের আছে কী?

গেল আরও কয়েকটা ঘণ্টা। টুঁ টি-টেপা স্তব্ধতা চারিদিকে—কবরের মধ্যে বুঝি এমনি নৈঃশব্দ বিরাজ করে। কোনোদিকে ক্ষীণতম শব্দও নেই। থাকবে কি করে? সব চাইতে পাতলা দেওয়ালটাও তো কমসে কম পাঁচ মাইল পুরু। কোনো শব্দের পক্ষেই সে দেওয়াল ভেদ করে নেমে আসা সম্ভব নয়।

ঢুলছিলাম। আচমকা একটা শব্দ শুনলাম। ঠাহর করে দেখলাম অন্ধকারের মধ্যে। হ্যান্সকে দেখলাম পা টিপে টিপে অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে।

সে কী! হ্যান্স আমাদের ফেলে পালাচ্ছে? কিন্তু পালানোর পথ তো ওপরে—নীচের দিকে তো নয়!

হ্যান্স লণ্ঠন হাতে নেমে গেল সেই নীচের পথেই।

২২॥ জল পেলাম

ঘণ্টাখানেক অনেক উদ্ভট চিন্তা করলাম হ্যান্সকে নিয়ে। সেইসব ফ্যানট্যাসটিক কল্পনার কণামাত্রও হ্যান্স জানলে ওর ঠাণ্ডা মেজাজও তেতে লাল হয়ে যেত।

এক ঘণ্টা পরে ফের পদশব্দ শুনলাম সুড়ঙ্গের অন্ধকারে। অচিরে

আলোর রেখা দেখলাম দূরে। দেখতে দেখতে লণ্ঠন হাতে আবির্ভূত হল হ্যান্স। সটান গেল কাকার পাশে। কাকাকে ঠেলে তুলে বলল একটিমাত্র শব্দ—"Vatten!"

নিঃসীম কষ্ট বোধহয় মানুষকে ভাষাবিদ করে তোলে। নইলে ড্যানিশ-ভাষার বিন্দুবিসর্গ না জেনেও কি করে বুঝলাম কি বলতে চাইছে গাইড?

"জল! জল!" দুই হাত মুঠো পাকিয়ে উন্মত্তের মত চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।

"জল!" পুনরাবৃত্তি করলেন কাকা। "Hvar?" শুধোলেন গাইডকে।

"Nedat," জবাব দিল হ্যান্স।

কোথায়? নীচে! প্রতিটি শব্দের মানে ধরে ফেললাম আমি। খামচে ধরলাম হ্যান্সের হাত। সে কিন্তু প্রশান্ত চোখে চেয়ে রইল আমার পানে।

তৎক্ষণাৎ শুরু হল নীচে নামা। আধঘণ্টার মধ্যে নেমে এলাম সোয়া মাইল – মানে দুহাজার ফুট।

ঠিক তখনি শব্দটা স্পষ্ট শুনতে পেলাম। অপরিচিত একটা শব্দ গ্র্যানাইট দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে ভেসে আসছে। যেন বহুদূরে গুরগুর করে মেঘ ডাকছে।

কাকা বললেন—"পাতাল নদীর জল বয়ে চলেছে কোথাও। হ্যান্স ঠিক খবর দিয়েছে।"

কিন্তু সে নদী কোথায়? আরো সোয়া মাইল নামলাম। কিন্তু জলধারার গর্জন ছাড়া আর্দ্রতার চিহ্ন কোথাও পেলাম না। বুঝলাম, হ্যান্স ওর সহজাত অনুভূতি দিয়ে বুঝেছে জল কোথাও না কোথাও আছে—স্বচক্ষে দেখেনি।

আরও নীচে নামলাম। ক্ষীণ হয়ে এল জলের শব্দ।

ফিরে এলাম ওপরে। দেওয়ালে কান পেতে পেতে হ্যান্স এক জায়গায় বসে পড়ল। জলের আওয়াজ সেখানেই সব চাইতেই বেশী। তারপর আলগা পাথর সরিয়ে সরিয়ে দেখল ঠিক কোন জায়গায় ছেঁদা করলে জল মিলবে। অবশেষে মেঝে থেকে তিনফুট উঁচুতে গাঁইতির ঘা দিল হ্যান্স। ঘণ্টা খানেক মেহনতের পর দেওয়ালের মধ্যে থেকে তোড়ে বেরিয়ে এল জলের একটা ধারা। আর্তনাদ করে মেঝেতে ঠিকরে পড়ল হ্যান্স।

চীৎকারের কারণটা বুঝলাম জলে হাত দিতেই। জল যেন ফুটছে!

কাকা বললেন—"তাতে কী! এখুনি ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।"

ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ার পর আকণ্ঠ পান করলাম পাতাল-নদীর জল। জলের

স্বাদটা কালির স্বাদের মত—কিন্তু লোহা থাকায় পেটের পক্ষে বিষম উপকারী।

কাকার ইচ্ছে মত হজমী জল ধারার নাম দেওয়া হল হ্যান্সের নামে। এ-জল স্রোতের আবিষ্কর্তা সে। সুতরাং পাতাল প্রস্রবণের নাম হল "হ্যান্সবাক"।

কাকা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন—"ভালই হল। জলের ধারা গড়িয়ে গড়িয়ে পাতাল পর্যন্ত যাবেই। আমাদেরও আর পথ ভুল হবে না। জলের অভাবও হবে না।

সোল্লাসে বললাম—"তাহলে চলুন এখুনি যাই।"

স্মিত মুখে আমার পানে তাকালেন কাকা—"তাহলে আমার পথেই আসছো? যা বলেছিলাম, তা সত্যি, বলে মানছো?"

"আসছি মানে? এসে গেছি। সব সত্যি, সব সম্ভব।"

কিন্তু তখন আর রওনা হওয়া গেল না। ক্রোনোমিটারে দেখা গেল রাত গভীর হয়েছে। অতএব কম্বল পেতে টেনে ঘুমোলাম আমরা।

২৩॥ সমুদ্রের তলায়

পরের দিন বেমালুম ভুলে গেলাম এই কদিনের দুর্ভোগ। প্রাতরাশ দিয়ে উদরপূর্ণ করে লোহা মিশোনো হজমী জল খেলাম আকণ্ঠ। খুশীর জোয়ার এসেছিল যেন আমার মনে। পণ করে ফেললাম, শেষ না দেখে ফিরছি না। ফিরবই বা কেন? কাকার মত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মানুষের সঙ্গে হ্যান্সের মত পরিশ্রমী গাইড আর আমার মত অনুরক্ত ভাইপো থাকলে সফল হবেই আমাদের অভিযান। এই ধরনের ভালো ভালো চিন্তা মাথার মধ্যে যেন খুশীর হিল্লোল তুলছিল। এই সময়ে কেউ যদি বলত, এবার ফেরা যাক। আমি সঙ্গে সঙ্গে বিষম চটে গিয়ে তাকে বিমুখ করতাম নিশ্চয়।

চেঁচিয়ে বললাল—"চলুন, এগোনো যাক।" বলেই চমকে উঠলাম আমার চেঁচানির সৃষ্টিছাড়া প্রতিধ্বনি শুনে। একটার পর একটা প্রতিধ্বনি এমন অদ্ভুত শব্দ লহরী সৃষ্টি করল গুহার গোলক ধাঁধায় যা দুনিয়ার কেউ কখনো শোনেনি।

বৃহস্পতিবার সকাল আটটায় রওনা হলাম আমরা। গ্র্যানাইট সুড়ঙ্গ কত রকমভাবে এঁকে বেঁকে, আচমকা মোড় নিয়ে গোলক ধাঁধায় ঘুরপাক খেয়ে হয়রানির একশেষ করে এগিয়ে চলল কিন্তু দক্ষিণ পূব দিকেই।

মোটামুটি সমান্তরাল ভাবেই চলেছিল সুড়ঙ্গর মেঝে। পায়ের কাছে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে চলেছিল জলের ধারা। এ-যেন পাতাল-বাসী কোনো অধিদেবতা—পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে আমাদের।

সেদিন এবং তার পরের দিন সমান্তরাল পথে আমরা যতটা এগোলাম, পৃথিবীর অভ্যন্তরে সে তুলনায় প্রবেশ করলাম নাম মাত্র।

জুলাই মাসের দশ তারিখে শুক্রবারে হিসেব করে দেখা গেল আমরা রিকজাভিক থেকে পঁচাত্তর মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে চলে এসেছি। পৃথিবীর গর্ভে নেমেছি মাত্র সাত মাইল।

এর পরেই আচমকা একটা পিলে চমকানো পাতকুয়ো দেখা দিল পায়ের কাছে। দেখেই তো মহানন্দে হাততালি দিয়ে উঠলেন কাকা।

বললেন—"যাক, এবার ঝটপট নামা যাবে। গর্তটার গায়ে কার্নিশগুলো ঠিক সিঁড়ির ধাপের মতই। বাঃ বাঃ চমৎকার!"

প্রতি পনের মিনিট অন্তর কার্নিশে দুপা ঝুলিয়ে বসে জিরিয়ে নিলাম আমরা। পায়ের মাংসপেশীগুলোকেও ডলাই মলাই করলাম টনটনানি কমানোর জন্যে। পাশ দিয়ে ক্ষুদে জলপ্রপাতের মত ঝরঝরে করে ঝরতে লাগল 'হ্যান্সবাক' ঝর্ণা!

এগারোই আর বারোই জুলাই ভূত্বকের মধ্যে দিয়ে নামলাম আরো পাঁচ মাইল। সব মিলিয়ে সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে তেরো মাইল।

পনের তারিখে রইলাম ভূত্বকের আঠারো মাইল নীচে আর স্নেফেল থেকে ১২৫ মাইল দূরে। ক্লান্ত হলেও স্বাস্থ্য তখনও দিব্বি অটুট। ওষুধের বাক্স ছোঁওয়ার দরকারও হয়নি।

ঘণ্টায় ঘণ্টায় ক্রোনোমিটার, ম্যানোমিটার, থার্মোমিটার আর কম্পাস নিয়ে হিসেব করে চলেছিলেন কাকা। তাই যখন উনি বললেন সমান্তরাল হিসেবে আমরা স্নেফেল থেকে ১২৫ মাইল দূরে চলে এসেছি! তখন দারুণ অবাক হয়ে বললাম—"তাহলে তো আমরা আর আইসল্যাণ্ডের তলায় নেই।"

শুনে কাকাও অবাক হয়ে গেলেন। আমি অবশ্য তক্ষুনি কম্পাস দিয়ে ম্যাপের ওপর মাপজোখ করে দেখিয়ে দিলাম আমরা কোথায় রয়েছি।

"আমাদের মাথার ওপর রয়েছে আটলান্টিক সমুদ্র," বললাম আমি।

"সমুদ্রের তলায়," শুনে পরমানন্দে দুহাত ঘসতে লাগলেন কাকা।

"সর্বনাশ!" আমার কিন্তু বুক কেঁপে উঠল নিজের হিসেব দেখেই—"মাথার ওপর সমুদ্র!"

"কেন থাকবে না শুনি?" বললেন কাকা—"নিউ ক্যাসল-এর অনেক কয়লাখনিই তো সমুদ্রের তলা পর্যন্ত চলে গিয়েছে।"

তা তো গিয়েছে, কিন্তু আমার বুকটা গুর গুর করতে লাগল মাথার ওপর আস্ত একটা সমুদ্র চেপে রয়েছে কল্পনা করায়! গ্র্যানাইট ছাদের দৌলতে জল রাশি নেমে আসবেনা ঠিকই, তবুও মন তো মানে না!

চারদিন পর আঠারোই জুলাই শনিবার বিশাল গহ্বরের মত একটা গুহায় এসে পৌছোলাম আমরা। হপ্তা শেষের পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে দেওয়া হল হ্যান্সকে। ঠিক হল পরের দিন স্রেফ বিশ্রাম নেওয়া হবে।

২৪॥ একদিনের বিশ্রাম

রোববার ঘুম ভাঙল ধীরে সুস্থে। অন্যান্য দিনের মত তাড়াহুড়ো করলাম না। পাতাল বাস করছি বটে, কিন্তু বেশ লাগছিল। সূর্য, নক্ষত্র, চাঁদ, গাছ, বাড়ী, শহরের কথা মনেই আসত না। অথচ পৃথিবীর ওপরে যাদের নিবাস, তারা এ-সব ছাড়া বাঁচতেই পারে না। কিন্তু জীবাশ্মদের মত জীবন্ত জীবাশ্ম হয়ে থাকাটা কি মজাদার, তা কাকে বোঝাবো?

বিশাল হলঘরের মত গহ্বরের মেঝে দিয়ে চলেছে আমাদের পরম বিশ্বাসী প্রস্রবণ। এখন আর তা গরম নেই অবশ্য।

প্রাতরাশ খেয়ে প্রফেসর বসলেন তাঁর এই কদিনের লেখাগুলো গুছিয়ে নিতে।

বললেন—"প্রথমেই একটা ম্যাপ তৈরী করা দরকার। পথের প্রতিটি মোড় আর কোণের হিসেব আমি রেখেছি। ভূগোলকের কেন্দ্র পর্যন্ত সড়কের একটা ম্যাপ বানিয়ে নিলেই ল্যাটা চুকে যায়। অ্যাকজেল, কম্পাস নিয়ে দেখো তো আমরা ঠিক কোনদিকে চলেছি।"

কম্পাস দেখে বললাম কোন দিকে যাচ্ছি।

দ্রুত হিসেব করলেন কাকা বললেন—"বাঃ, আমরা তাহলে স্নেফেল থেকে ২১৩ মাইল এসেছি। পৃথিবীর ভেতরে ঢুকেছি ৪৮ মাইল।"

"কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা তো বলেন ভূস্তরের এইটাই হল শেষ সীমা। অর্থাৎ মাত্র ৪৮ মাইল পুরু হয় পৃথিবীর বাইরের আবরণ। অথচ তাঁদের হিসেব অনুযায়ী এখানে টেম্পারেচার হওয়া উচিত ১৫০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড—যে তাপমাত্রায় এখানকার সমস্ত গ্র্যানাইট পাথর গলিত অবস্থায় থাকা উচিত ছিল।"

"কিন্তু তা নেই। তাই তো বলি, থিওরীকে একমাত্র ঘটনাই নস্যাৎ করতে পারে। থার্মোমিটার কি বলে?"

"২৭ পয়েন্ট ৬ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড।"

"সুতরাং পৃথিবীর কেন্দ্রে যত নামবো, ততই টেম্পারেচার বৃদ্ধি পাবে—এ-তত্ত্ব ভুল। সুতরাং হামফ্রি ডেভী যা বলেছেন, তা সত্যি। সুতরাং তাকে বিশ্বাস করে আমি ঠিকই করেছি। কিছু বলার আছে?"

"না।"

যদিও বলার অনেক কিছুই ছিল। ডেভী যা কিছু বলেছেন, সব ধ্রুব সত্যি, এ কথা মানতে মোটেই রাজী নই আমি। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থিত ভয়ংকর তাপমাত্রার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এখনো আমি বিশ্বাস করি। এমন হতে পারে যে জমাট লাভার পুরু আবরণ এই গুহার দেওয়াল ফুঁড়ে ভূগর্ভের সেই ভয়াবহ তাপমাত্রাকে আসতে দিচ্ছে না—ঠিকরে ফিরিয়ে দিচ্ছে।

কিন্তু নতুন করে বাদানুবাদের মধ্যে না গিয়ে অন্য প্রসঙ্গ টেনে আনলাম। কাকাকে বললাম, আইসল্যাণ্ডের কাছে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ হল ৪৮০০ মাইল। তার মধ্যে আমরা নেমেছি মোটে ৪৮ মাইল। অর্থাৎ একশ ভাগেব মাত্র এক ভাগ। এই এক ভাগ নামতেই ২১৩ মাইল পথ হাঁটতে হয়েছে মোট বিশ দিনে। সেই হিসেবে ভূকেন্দ্রে পৌঁছোতে লাগবে দু হাজার দিন অর্থাৎ সাড়ে পাঁচ বছর!

শুনে প্রফেসর কোনো জবাব দিলেন না।

ফের বললাম আমি—"আবও একটা ঘটনা ঘটতে পারে। প্রতি ৪০ মাইল খাড়াই অবতবণেব জন্যে যদি ২০০ মাইল সমান্তরাল পথ যেতে হয়, তাহলে শীগগির আমরা ভূপৃষ্ঠে পৌঁছে যাবো ভূকেন্দ্রে আর যাওয়া হবে না। কেননা, পৃথিবীটা কিন্তু গোল। ভূত্বকও গোল।"

এই পর্যন্ত শুনেই কাকা বোমার মত ফেটে পড়লেন:

"জাহান্নমে যাক তোমার হিসেব! তোমাব অনুমান-সিদ্ধান্ত! কিসের ভিত্তিতে এত কপোলকল্পনা? যে-পথ দিয়ে চলেছি, সে-পথ সোজা গন্তব্যস্থানে পৌঁছেছে কিনা জানছ কি করে? সব চেয়ে বড় কথা, এ-পথে আমি নতুন নই—আরো একজন গিয়েছে। সুতরাং তিনি যদি সফল হন, আমিও হব।"

"আমার কিন্তু বলা উচিত—"

"তোমার জিভটাকে এখন বন্ধ করা উচিত। বাজে কথা না বলে মুখে চাবি এঁটে থাকো।"

দেখলাম কাকা পুরোনো দিনের মত অগ্নিশর্মা হয়ে যাচ্ছেন। সুতরাং

আমি বুদ্ধিমানের মত একান্ত আজ্ঞাবহ অনুচর হয়ে গেলাম। তাঁর সব হুকুম তামিল করলাম—তর্কাতর্কির ধার দিয়েও গেলাম না। শুধু ভাবলাম, আহারে! হ্যান্সের মত যদি বোকাসোকা ভাগ্যনির্ভর হতে পারতাম!

২৫ ॥ একা

পরের পনের দিনে একটা সিরিয়াস ঘটনা ঘটল।

সাতই অগাস্ট আমরা সবশুদ্ধ পঁচাত্তর মাইল গভীরতায় পৌছোলাম। ঘুরিয়ে বললে, আমাদের মাথার ওপর পঁচাত্তর মাইল জুড়ে রইল পাথর, মহাসমুদ্র, মহাদেশ, শহর। আইসল্যাণ্ড থেকে পাঁচশ মাইল হেঁটে তবে এই গভীরতায় পৌছেছিলাম।

সেদিন সুড়ঙ্গে ঢাল কম। আমি আর কাকা দুটো লণ্ঠন নিয়ে চলেছি। গ্র্যানাইটের স্তর পরীক্ষা করার জন্যে লণ্ঠনটা হাতে রেখেছিলাম আমি এবং তাই নিয়েই তন্ময় ছিলাম অনেকক্ষণ।

আচমকা পেছন ফিরলাম। দেখি, সুড়ঙ্গে আর কেউ নেই। আমি একা।

ভাবলাম, "একটু জোরে হেঁটে ফেলেছি নিশ্চয়। তাই এগিয়ে পড়েছি। হ্যান্স আর কাকা পেছনে কোথাও জিরোচ্ছেন নিশ্চয়। আমি বরং পিছু হটে যাই।"

তাই করলাম। মিনিট পনের হাঁটবার পরেও কারও চিহ্ন দেখলাম না। এ-বার ভয়-ভয় করতে লাগল শির-শির করতে লাগল শিরদাঁড়ার মধ্যে।

মনকে প্রবোধ দিলাম—"ধড়ফড় করো না। মাথাটা ঠাণ্ডা রাখো। রাস্তা তো একটাই। ঠিক দেখা হবে! আমি যেখানে আগে ছিলাম, সেখানে ফিরে গেলেই ওদের দেখতে পাব।"

আরো আধঘণ্টা উঠলাম চড়াই বেয়ে। চীৎকার করে ডাকলাম। কিন্তু নির্জন গহ্বরে আমার স্বর কি রকম জানি শোনালো। এরকম কদাকার ভয়াবহ প্রতিধ্বনি আমি কখনো শুনি নি। গা-হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল আমার।

তারপরেই সন্দেহ হল, আমি কি সত্যিই এগিয়েছিলাম? এমনও তো হতে পারে যে আমি পেছনে ছিলাম—ওরা এগিয়ে গেছে? কিন্তু তা তো নয়। বেশ মনে আছে কাকার সামনে হ্যান্স, হ্যান্সের সামনে আমি। এ-ও মনে আছে, কাঁধের স্ট্র্যাপ বাঁধার জন্যে ও একটু দাঁড়িয়েছিল। তখনি

নিশ্চয় আমি এগিয়ে পড়েছি শিলা-বিন্যাস দেখতে দেখতে। তাছাড়া এত ঘাবড়াবার কি আছে? পায়ের তলায় 'হ্যান্সবাক' স্রোতস্বিনী যতক্ষণ বয়ে চলেছে পরম-বিশ্বাসী পথপ্রদর্শকের মত, ভয় কি আমার? জলের ধারা অনুসরণ করে গেলেই তো হল।

ভাগ্যিস দেওয়ালের ফুটো বন্ধ করে জলের ধারা বন্ধ করে দেয় নি হ্যান্স। ঠিক করলাম, একটু মুখ ধুয়ে নিয়ে দ্বিগুণ তেজে রওনা হব পেছন দিকে।

হেঁট হয়ে মাথা ডোবাতে গেলাম হ্যান্সবাক-য়ে। ভয়ে বিস্ময়ে মাথার চুল পর্যন্ত খাড়া হয়ে গেল হ্যান্সবাককে না দেখে।

আমি দাঁড়িয়ে আছি কর্কশ শুকনো গ্র্যানাইট্ পাথরের ওপর। স্রোতস্বিনী নেই আমার পায়ের তলায়!

২৬॥ পথভ্রষ্ট এবং আতংকিত

মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল যেন। কেতাবি ভাষায় এরই নাম কি জীবন্ত সমাধি?

কখন যে অন্যমনস্কভাবে ভুল পথে চলে এসেছি, তা খেয়াল ছিল না। জলের ধারাটা শুদ্ধ হারিয়ে বসে আছি। সুড়ঙ্গের গায়ে আরেকটা সুরঙ্গ বেরিয়েছিল নিশ্চয়। পাথর নিয়ে তন্ময় থাকার তার মধ্যে ঢুকে পড়েছি। ঘুরে মরছি অজ্ঞাত পথে।

এখন উপায়? ফেরা যায় কি করে? কান পেতে শুনলাম, কারও পায়ের শব্দ পেলাম না। মাথার ওপরকার পঁচাত্তর মাইলের গুরুভার যেন এখন সত্যি সত্যিই চেপে বসল কাঁধের ওপর।

"কাকা!" অস্ফুট কণ্ঠে আর্তনাদ করলাম আমি। জানি, এই মুহূর্তে কাকার মনের অবস্থাও কি শোচনীয়। আমাকে না দেখে উনি তো স্থির থাকতে পারবেন না।

নিরুপায় হয়ে ভগবানকে ডাকলাম। ছেলেবেলায় যাকে হারিয়েছি, সেই জননীকে স্মরণ করলাম। মন অনেকটা শান্ত হল।

ঠাণ্ডা মাথায় রসদ পরীক্ষা করলাম। ফ্লাস্কের জল আর থলির খাবারে তিন দিন স্বচ্ছন্দে চলে যাবে। এখন থেকেই যদি হাঁটতে শুরু করি, জলধারার পাশে হাজির হবই হব। তারপর ফিরে যাওয়া যাবে স্নেফেলের চূড়োয়।

তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে কাঁটাবাঁধানো লাঠি ঠুকে ঠুকে এগোলাম। আধ [illegible] আঁকার, পাথরের খোঁচ, মোড়গুলোর

চেহারা স্মরণ করবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু চেনা কিছুই চোখে পড়ল না। তারপর এক সময়ে মাথা ঠুকে গেল দেওয়ালে। আছড়ে পড়লাম মেঝেতে।

উঠে দেখলাম, সুড়ঙ্গ শেষ হয়ে গেছে। আর পথ নেই। তখনকার নিঃসীম-হতাশা আর নিতল আতংকের বর্ণনা দেবার ভাষা আমার নেই। গ্র্যানাইটের গোলকধাঁধায় কোথায় ঘুরে মরব? অসংখ্য গলিপথ এঁকে-বেঁকে যে মরণ-লোক সৃষ্টি করেছে, তার মধ্যে থেকে ইহজীবনে আমার পরিত্রাণ নেই। বহু বছর পরে হয়ত আমার শিলীভূত অস্থি আবিষ্কৃত হবে। বিজ্ঞান তাই নিয়ে কত গবেষণাই না করবে।

নতুন আতংকের কারণ দেখা দিল এবার। আছাড় খেয়ে লণ্ঠনটাকেও ভেঙে ফেলেছি। মেরামতও সম্ভব নয়। ফিলামেন্ট থেকে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে ইলেকট্রিক কারেন্টের দ্যুতি। তিমিরাবৃত দেওয়ালে যেন কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে আসছে কালো কালো ছায়া। চোখের পাতা ফেলতেও সাহস হল না। চোখ খুলে যদি দেখি আলোর শেষ দ্যুতিটুকুও মিলিয়ে গিয়েছে?

অবশেষে দপ করে জ্বলে উঠে নিভে গেল লণ্ঠন। অমনি রন্ধ্রহীন অন্ধকার সব দিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। পৃথিবীর ওপরে গাঢ় অন্ধকারেও চোখ চলে। কিন্তু পৃথিবীর ভেতরে গাঢ় অন্ধকার যে কি ভয়াবহ জিনিস, তা উপলব্ধি করলাম চক্ষের নিমেষে। আমি অন্ধ হয়ে গেলাম।

বিকট চীৎকার বেরিয়ে এল গলা চিড়ে। এতক্ষণে যা হয়নি, অন্ধকারের আতংকে তাই হল। আমার মস্তিষ্ক বিকৃত হল সাময়িকভাবে। দাঁড়িয়ে উঠে অন্ধকারে হাতরাতে হাতরাতে ছুটতে লাগলাম অন্ধ-উন্মাদের মত। জটিল গোলোকধাঁধায় নিরন্ধ্র অন্ধকারে ক্রমাগত নেমে চললাম ছুটতে ছুটতে··· আছাড় খেলাম ··মাথা ঠুকে গেল···নাক মুখ থেঁৎলে গেল···নিজের রক্ত নিজেই পান করতে চেষ্টা করলাম জিভ দিয়ে···প্রতি মুহূর্তে দেওয়ালের খোঁচায় ধাক্কা খেয়ে, ক্ষতবিক্ষত হয়ে, চেঁচিয়ে, কেঁদে, ককিয়ে, বহু-ঘণ্টা পরে ক্লান্ত অবসন্ন শক্তিশূন্য হয়ে লুটিয়ে পড়লাম পাথরের ওপর জ্ঞান হারিয়ে।

২৭॥ কার কণ্ঠ?

জ্ঞান ফিরে পেয়ে বুঝলাম চোখের জল মুখ ভেসে গেছে আমার। রক্তও ঝরেছে বিস্তর। আশ্চর্য! এখনো মরলাম না কেন আমি? মড়ার মতই অবশ্য পড়েছিলাম। কতক্ষণ সে হিসেব আমি বলতে পারব না।

গড়িয়ে গেলাম দেওয়ালের ধারে। ঠিক সেই সময়ে একটা ভীষণ শব্দ শুনলাম। ঠিক যেন বজ্রগর্জন। বাজপড়ার আওয়াজ যেন গুর-গুর গুম-গুম শব্দে দূর হতে দূরে মিলিয়ে যায়, জোরালো এই শব্দটাও তেমনি সুরঙ্গের মধ্যে দিয়ে সুদূর গভীরতায় মিলিয়ে গেল।

কোত্থেকে আসছে শব্দটা? নিশ্চয় পাতালের নতুন কোনো কাণ্ডকারখানা! হয়ত গ্যাস বিস্ফোরিত হল অথবা ভূগোলকের কোনো থাম স্থানচ্যুত হয়ে গড়িয়ে পড়ল।

উৎকর্ণ হয়ে রইলাম নতুন কোনো শব্দ শোনার প্রতীক্ষায়। সোয়া ঘণ্টা কেটে গেল রক্তহীন নীরবতার মধ্যে দিয়ে। পাতালপুরী আহার যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার বুকের ধুকপুকুনি পর্যন্ত যেন বন্ধ হয়ে গেছে।

দেওয়ালে কান দিয়ে এলিয়ে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলো অস্পষ্ট শব্দ আছড়ে পড়ল কানের পর্দায়। অস্পষ্ট দুর্বোধ্য এবং বহুদূরাগত হলেও শব্দই বটে। আমি ধড়মড় করে উঠে বসলাম।

"ভুল শুনছি!" বললাম নিজের মনেই।

কিন্তু তাতো নয়। কান পেতে শুনতে আবার বিড়বিড় বকুনি শুনতে পেলাম। স্পষ্ট শোনবার মত শক্তিও ছিল না দেহে। কিন্তু বেশ বুঝলাম কে যেন কথা বলছে। কতকগুলো কথা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল। তার মধ্যে একটা শব্দ গভীর দুঃখের সঙ্গে বারবার বলা হচ্ছিল। শব্দটা forlorad।

ব্যাপার কী? কে কথা বলছে? নিশ্চয় আমার কাকা অথবা হ্যান্স।

গলা ফাটিয়ে চেঁচালাম—"বাঁচান! বাঁচান!"

কিন্তু কেউ জবাব দিল না। উৎকণ্ঠায় টান টান হয়ে রইলাম মিনিটের পর মিনিট। কত চিন্তাই ভীড় করে এল মনের মধ্যে। কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। কিন্তু কাকা আর হ্যান্স ছাড়া আর কেউ হতেই পারেন না। এত নীচে কে আর আসবে?

দেওয়ালের কাছে কান নিয়ে যেতে ফের forlorad শব্দটা শুনতে পেলাম। পরক্ষণেই সেই বজ্রগর্জন—দূর হতে দূরে মিলিয়ে গেল গুরগুর শব্দে।

আচমকা শব্দ রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল আমার কাছে। আওয়াজটা দেওয়াল ফুঁড়ে আসছেনা। নিরেট গ্র্যানাইটের মধ্যে দিয়ে প্রলয়ংকর বিস্ফোরণ ধ্বনিও পথ খুঁজে পায় না। এ-শব্দ আসছে সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে—দেওয়ালের গা দিয়ে!

তার মানে আমাকে কথা বলতে হলে দেওয়ালে মুখ লাগিয়ে কথা বলতে হবে। তাহলেই তা পৌছোবে কাকা আর হ্যান্সের কাছে। তার যেমন

বিদ্যুৎশক্তি বয়ে নিয়ে যায়, দেওয়াল তেমনি বহন করবে আমার কথার শব্দ-তরঙ্গকে।

আর দেরী করা যায় না। কাকা আর হ্যান্স দূরে সরে যাওয়ার আগেই কথা বলতে হবে।

"লিডেনব্রক কাকা!" চীৎকার করলাম দেওয়ালে মুখ দিয়ে।

নিদারুণ উদ্বেগের মধ্যে দিয়ে কাটল কয়েকটা সেকেণ্ড। শব্দ আলোর মত দ্রুতবেগে পথ ছোটে না। সুতরাং কয়েকটা সেকেণ্ড অতিবাহিত হল কয়েকটা শতাব্দীর মত। তারপর ভেসে এল এই কটি কথাঃ

"অ্যাকজেল! অ্যাকজেল! কথা বলল কে? তুমি?"

"আমি! আমি!" জবাব দিলাম আমি।

"বাছারে! কোথায় তুমি?"

"পথ হারিয়েছি। অন্ধকার। লণ্ঠন নিভে গেছে জলের ধারা খুঁজে পাচ্ছি না।"

"অ্যাকজেল, বাবা অ্যাকজেল, ভেঙে পড়ো না!"

"একটু দাঁড়ান। কথা বলার শক্তি নেই আমার। আপনি বলুন, আমি শুনি!

"মনে সাহস আনো," বললেন কাকা। "কথা বলার দরকার নেই, শুধু শুনে যাও। সারা সুড়ঙ্গ টহল দিয়ে ফিরেছি তোমার খোঁজে। কেঁদেছি হাউ হাউ করে! বাবা অ্যাকজেল, শেষকালে ভাবলাম হয়ত হ্যান্সবাক বরাবর তুমি এগিয়ে গিয়েছো। তাই বন্দুক ছুঁড়তে ছুঁড়তে নেমে এলাম জলের ধারার পাশ দিয়ে। এখানে এসে তোমাকে না পাই, তোমার গা ছুঁতে না পাই, কথা তো শুনছ। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, অ্যাকজেল-শব্দ-বিজ্ঞানের ভোজবাজি বলতে পারো। ভেবো না, শীগগিরই দেখা হবে আমাদের।"

আমি কথা শুনছিলাম আর ভাবছিলাম কি করা যায়। একটা ক্ষীণ আশা মাথায় এল। দেওয়ালে ঠোঁট ঠেকিয়ে বললাম—"কাকা!"

"কী বলছো?" জবাব ভেসে এল সেকেণ্ড কয়েক পরে।

"আগে জানা দরকার আমরা কত তফাতে রয়েছি।"

"সে আর এমন কথা কি।"

"ক্রোনোমিটার কাছে আছে তো?

"আছে।"

"ক্রোনোমিটার হাতে নিন। আমার নাম ধরে ডাকুন। কখন ডাকলেন—সময়টা মনে রাখুন। আপনার ডাক আমার কানে আসার সঙ্গে একই শব্দ আমিও উচ্চারণ করব। শব্দ আপনার কাছে পৌছোনো মাত্র ক্রোনোমিটারে সময় দেখুন।"

"বারে ছেলে আমার। আমার ডাক আর তোমার জবাব—এই দুইয়ের মাঝে যে সময়—তাকে অর্ধেক করলেই পাওয়া যাবে আমার কথা কতক্ষণে তোমার কাছে পৌছোচ্ছে। কেমন?"

"হ্যাঁ, কাকা।"

"তুমি তৈরী?"

"হ্যাঁ।"

"এই ডাকলাম তোমাকে।"

দেওয়ালে কান পাতলাম। যেই 'অ্যাকজেল' নাম কানে এল, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলাম 'অ্যাকজেল' বলে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। তারপর বললেন কাকা—"চল্লিশ সেকেণ্ড এর অর্ধেক হল বিশ সেকেণ্ড। অর্থাৎ আমার কাছ থেকে বিশ সেকেণ্ডে শব্দ পৌছোচ্ছে তোমার কাছে। শব্দের গতি সেকেণ্ডে ১,০২০ ফুট। বিশ সেকেণ্ডে হল ২,৪০০ ফুট। তার মানে চার মাইলের একটু কম।"

"চার মাইল!" স্বগতোক্তি করলাম আমি।

"বাবা অ্যাকজেল, দূরত্বটা পেরোনো অসম্ভব কিছু নয়।"

"কিন্তু নীচে নামব, না, ওপরে উঠবো?"

"নীচে নামবে। কেন নামবে তাও বলছি। আমরা একটা মস্ত গহ্বরের মধ্যে রয়েছি। গহ্বর থেকে চারিদিকে রশ্মিরেখা সুড়ঙ্গ বেরিয়েছে। এর একটিতে তুমি পথ হারিয়েছো। সটান নীচের দিকে নামলে এই গহ্বরেই এসে পড়বে তুমি। উঠে পড়ো, বাবা, উঠে পড়ো।"

কথাগুলো শুনে মনের বিষাদ কোথায় যে উধাও হল কে জানে। আমি

বললাম—"বিদায় কাকা। আমি যাচ্ছি। দেখা হওয়ার আগে আর কথা বলা যাবে না। বিদায়।"

"বিদায়, অ্যাকজেল, বিদায়!"

শেষ কথা শুনে উঠে পড়লাম। চার মাইল তফাৎ থেকে পাতাল পুরীর গোলোক ধাঁধার মধ্যে দিয়ে এই যে আশ্চর্য কথাবার্তা, এর মধ্যে অলৌকিক রহস্য কিছু নেই। শব্দ-বিজ্ঞানে শব্দের এই বিস্ময়কর কেরামতির ব্যাখ্যা আছে বইকি। এতদূর থেকে শব্দ ভেসে আসার জন্যে দায়ী সুড়ঙ্গের বিশেষ গড়ন আর পাথরের শব্দ পরিচালন ক্ষমতা। চার মাইল তফাতে থেকে যে শব্দ শোনা যাচ্ছে তা কিন্তু মাঝখানের কোনো জায়গা থেকে শোনা যাবে না। এ রকম নজীর আরো আছে। লণ্ডনের সেন্টপলসে 'হুইসপারিং গ্যালারী'তে এমনি আজব ফিসফিসানি শোনা যায়। সিসিলির সিরাকুজ অঞ্চলে অদ্ভুত গুহা আছে অনেকগুলি। আশ্চর্য শব্দের এই ভুতুড়ে খেলা সেখানে আরও বেশী প্রকট—বিশেষ করে যে গুহাটির নাম 'ইয়ার অফ ডায়নোসিয়াস'—তার মধ্যে।

সুতরাং ভ্যাবাচাকা না খেয়ে উঠে পড়লাম আমি। ঢালু পথ বেয়ে দ্রুত হেঁটে চললাম অন্ধকারের মধ্যে। ঢালটা একটু বেশী রকমের। কিছুক্ষণের মধ্যেই দৌড়ে চললাম পায়ের টানে। শেষকালে গতিবেগ এমন বিপজ্জনক অবস্থায় পৌঁছোলো যে পায়ের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ আর রইল না। আমি যেন কক্ষচ্যুত উল্কার মত খসে পড়তে লাগলাম ওপর থেকে নীচে। নিজেকে থামানোর ক্ষমতাও হারিয়ে ফেললাম।

আচম্বিতে মাটি সরে গেল পায়ের তলা থেকে। ফস্ করে যেন গলে গেলাম খাড়াই পাতকুয়োর মত গভীর গর্ত দিয়ে। পড়তে পড়তে দেহটা নতুন করে ক্ষতবিক্ষত হল দেওয়ালের চোখা চোখা খোঁচার সঙ্গে বারংবার সংঘাতে।

পরমুহূর্তেই একটা ধারালো পাথরের সঙ্গে ঠুকে গেল মাথার খুলি এবং জ্ঞান হারালাম আমি।

২৮ ॥ বেঁচে গেলাম

জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখলাম আমি শুয়ে আছি মোটা কম্বলের ওপর। উদ্বিগ্ন চোখে কাকা আমার দিকে তাকিয়ে আছেন—বেঁচে আছি কিনা দেখছেন। আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলতেই উনি আমার হাত চেপে ধরলেন। চোখ খুলতেই আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন।

"বেঁচে আছে! বেঁচে আছে!"

"হ্যাঁ," ক্ষীণ কণ্ঠে বললাম আমি।

দুবাহু দিয়ে আমাকে জাপটে ধরলেন কাকা—"বাছারে! বেঁচে গেলে এ-যাত্রাও!"

কাকার ভেতরে এত স্নেহ আছে? বিশেষ মুহূর্ত ছাড়া তাঁর রুক্ষ মুখোস খসে পড়ে না—ভেতরকার নির্ভেজাল স্নেহ মমতা প্রকাশ পায় না। আমি অভিভূত হলাম ওঁর অকৃত্রিম ভালবাসায়।

এই সময়ে হ্যান্স এল। কাকার বাহু মধ্যে আমাকে দেখে খুশী উজ্জ্বল চোখে শুধু বলল—"গড ড্যাগ।"

"গুড ডে, হ্যান্স, গুড ডে," বিড়বিড় করে জবাব দিলাম আমি। "কাকা, বলুন তো আমি কোথায়? এখন কটা বাজে?"

"এখন রাত এগারোটা। তারিখ হল ৯ই আগস্ট, রবিবার। আর কোনো কথা নয়। ঘুমোও।"

ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমের আগে অবাক হয়ে শুধু ভাবলাম, তিন-তিনটে দিন একলা ঘুরে মরেছি পাতাল-গুহার গোলক ধাঁধায়?

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙবার পর দেখলাম আমি যে কম্বলের বিছানায় শুয়ে আছি, তা পাতা হয়েছে মস্ত একটা পর্বত-গহ্বরের মধ্যে। ভারী সুন্দর দেখতে গহ্বরটি। ছাদ থেকে ঝুলছে বাহারি সুতোর মত লাইম কারবোনেট অর্থাৎ স্ট্যালাগমাইট। ওপরে ঝলমলে জমকালো স্ট্যালাগমাইটের ঝালর, তলায় মিহিবালির কার্পেট। গহ্বরটি আধা-আলোয় আলোকিত। মশাল বা লণ্ঠনের চিহ্নমাত্র দেখলাম না, অথচ গহ্বরের মত একটা গবাক্ষর মত ছিদ্রপথে অবর্ণনীয় এক ধরনের আলোক-দ্যুতি প্রবেশ করছে গহ্বরে। আরও শুনলাম, একটা অস্পষ্ট রহস্যজনক গুঞ্জনধ্বনি—যেন সমুদ্রতীরে ঢেউ ভেঙে পড়ছে—মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ শব্দে শিস দিয়ে উঠছে জোর হাওয়া।

আমি কি জেগে আছি? না, স্বপ্ন দেখছি? অভিযান কি সাঙ্গ হয়েছে? কাকা কি সবাইকে নিয়ে পৃথিবীর ওপরে ফিরে এসেছেন? নাকি, পড়ে গিয়ে মাথায় চোট পেয়ে আমার ব্রেন বিগড়েছে—আবোল তাবোল কাল্পনিক শব্দ শুনছি? কিন্তু আমার চোখ কানকে প্রতারণা করা সহজ নয়—যা দেখছি তা সত্যি। আলোটা দিবালোকই বটে। পাহাড়ের ফাটল দিয়ে রশ্মি আকারে ঢুকছে পর্বত কন্দরে! আওয়াজগুলোও ঢেউ ভেঙে পড়ার শব্দ আর হাওয়ার শিস্ দেওয়ার শব্দ!

এমন সময়ে কাকাকে আসতে দেখলাম। আমাকে জেগে থাকতে দেখে

উনি বললেন—"গুড মর্ণিং অ্যাক্‌জেল। তোমার ঘাগুলো হাল্‌ দারিয়ে দিয়েছে আইসল্যাণ্ডের একটা গুপ্ত মলম মালিস করে। এখন দরকার টানা বিশ্রাম।"

"এখানে এলাম কি করে?"

"পাথর খসে পড়েছিল তোমার পায়ের তলায়। ঝুরি পাথরের সঙ্গে সঙ্গে তুমি সটান নেমে এসেছিলে খাড়াই সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে। কপাল ভাল অ্যাকজেল। ঐরকম দুর্ঘটনায় পড়েও তুমি বেঁচে আছো। আরো কপাল ভাল ওপর থেকে ঝপাং করে আমার দুহাতের মধ্যেই এসে পড়েছিলে। নইলে কি যে হত। দৈব তোমার সহায় হয়েছে অ্যাকজেল। যাক, এই শেষ। এবার থেকে আর কাছছাড়া হবে না আমার।"

আর কাছছাড়া হব না? তার মানে কি অভিযান এখনো বাকী?

বিমূঢ় কণ্ঠে শুধোলাম—"কাকা, পড়ে গিয়ে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, তাই না?"

"মাথা খারাপ! তোমার! সে কী কথা?"

"নইলে আমি দিনের আলো দেখছি কেন? সমুদ্রসৈকতে ঢেউ ভাঙার শব্দ শুনছি কেন? বাতাসের সোঁ-সোঁ আওয়াজ পাচ্ছি কেন?"

"কেন—এ প্রশ্নের জবাব দেবার ক্ষমতা আমার নেই, অ্যাকজেল। নিজেই দেখবে'খন। ভূতত্ত্ববিদদের শেখার এখনো অনেক বাকী হে।"

"চলুন তাহলে, দেখি।"

"এখন? না। খোলা হাওয়ায় ক্ষতি হবে তোমার।"

"খোলা হাওয়া?"

"হ্যাঁ। ঝড়ো হাওয়া বইছে তো, সহ্য হবে না তোমার।"

"ঝড়ো হাওয়া?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। একটু সবুর করো, বাবা। অতখানি জলযাত্রা সইবার মত শক্তি সঞ্চয় করো।"

"জলযাত্রা?"

"আরে হ্যাঁ···আজকের দিনটা জিরিয়ে নাও। কালকেই বেরিয়ে পড়ব পাল তুলে।"

"পাল তুলে?"

তড়াক করে উঠে বসলাম আমি। কি বলতে চান কাকা? বাইরে কি আছে? নদী? সরোবর? সমুদ্র? কি ভাসছে সেখানে? জাহাজ? পাতাল-বন্দরে নোঙর ফেলে প্রতীক্ষায় আছে দূর পথে পাড়ি দেওয়ার জন্যে?

কাকা আমাকে আর আটকাতে পারলেন না। জামাকাপড় পরে সারা গায়ে কম্বল জড়িয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমি।

২৯॥ পাতাল সমুদ্র

প্রথমে কিছুই দেখতে পেলাম না। অন্ধকারে থেকে থেকে আলোয় অনভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল আমার চোখ। তাই চোখ বন্ধ করে ফেললাম গহ্বরের বাইরে পা দিয়ে। তারপর যখন কোনমতে চোখ মেলে তাকালাম, খুশী যত না হলাম, তার চাইতে বেশী হলাম স্তম্ভিত।

"সমুদ্র! সমুদ্র!" চীৎকার বেরিয়ে এল গলা দিয়ে।

"হ্যাঁ, সমুদ্র," বললেন কাকা। "নাম দিয়েছি লিডেনব্রক সমুদ্র। আর কেউ যখন আসবে না আবিষ্কারের কৃতিত্ব দাবী করতে, সুতরাং এ সমুদ্রের নাম হোক আমার নামেই।"

সুবিশাল জলপৃষ্ঠ, সমুদ্র কি সরোবর বলতে পারব না, পায়ের তলা থেকে শুরু হয়ে বিলীন হয়েছে দৃষ্টিরেখার বাইরে। সৈকতভূমি দারুণ ভাবে এবড়ো-খেবড়ো। ঢেউ ভেঙে পড়ছে অতি-মিহি সোনালী বালুকাবেলার ওপর। বেলাভূমিতে বিক্ষিপ্ত রয়েছে শামুকজাতীয় খোলা—সৃষ্টির আদিমতম জীবন্ত প্রাণীরা নিবাস রচনা করেছিল এইসব শক্ত আবরণের মধ্যে। সৈকতভূমি খুব ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে গিয়ে মিলেছে সাগরের জলে। ঢেউ থেকে প্রায় দুশ গজ দূরে সারি সারি এঁকাবেঁকা চোরাপাহাড় অবিশ্বাস্য উচ্চতায় মাথা তুলে রয়েছে। কয়েকটা পাহাড়ের সারি সৈকতভূমি পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে। সমুদ্রের ফেণায়, তরঙ্গের সংঘাতে পাহাড়গুলোর কিনারা ক্ষয়ে ধারালো হয়ে উঠেছে। আরও দূরে, দিগন্তর কুয়াশাবৃত পটভূমিকায় দেখা যাচ্ছে এইসব দানবিক সমুদ্র-পর্বতের ধোঁয়াটে বহিরেখা।

সমুদ্রই বটে। সত্যিকারের সমুদ্র। পৃথিবীর সমুদ্রের খামখেয়ালী সৈকতভূমি দিয়ে পরিবৃত। তফাৎ শুধু এখানকার মরুভূমিসম নির্জনতা আর ভয়ংকর বন্য উদ্দামতা।

সমুদ্রের বহু দূর পর্যন্ত দেখতে পেলাম বিশেষ এক ধরনের আলোর জন্যে। দূরদিগন্ত পর্যন্ত সব কিছু সমানভাবে উদ্ভাসিত করে রেখেছিল আশ্চর্য এই আলো। এই-আলো সূর্যের আলো নয়—সেরকম অত্যুজ্জ্বল চোখ ধাঁধানো নয়—সূর্যরশ্মির মত জমজমাটও নয়। এ-আলো চাঁদের আলোর মত ফ্যাকাশে, আবছা দীপ্তি নয়—তুহিনশীতল নিছক প্রতিফলন নয়। এ-আলোর তেজ,

কম্পমান বিভূতি, পরিষ্কার ঝকঝকে শুভ্রতা, স্নিগ্ধতা আর চন্দ্রালোকের শতগুণ বেশী দীপ্তি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় এর উৎপত্তি ইলেকট্রিক শক্তির উৎস থেকে। এ যেন আরেকটা অরোরা বোরিয়ালিস—মেরুজ্যোতি—বিরামহীন মহাজাগতিক বিস্ময়—গোটা একটা মহাসমুদ্রকে ধরে রাখতে পারে এমনি বিরাট গহ্বর জুড়ে বিরাজ করছে বিস্ময়কর এই আলোকচ্ছটা।

খিলেনের মত গহ্বরের ছাদে, আকাশও বলা যায় তাকে, থরে থরে সাজানো কাতারে কাতারে মেঘ। মুহুর্মুহু স্থান পরিবর্তন করছে মেঘরাশি, পালটাচ্ছে বাষ্পের পরিমাণ এবং দেখে শুনে মনে হচ্ছে ঘনীভূত বাষ্পের দরুণ যে-কোনো মুহূর্তে মুষলধারে বৃষ্টি নামলেও নামতে পারে।

বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলাম এই প্রাকৃতিক বিস্ময়ের দিকে। মুখ দিয়ে কোনো কথা কথা বেরুলো না। অপার্থিব সেই দৃশ্যের বর্ণনা করি, এমন ভাষাও যে ছাই জানি না আমি, মনে হল, আমি পৃথিবীতে নেই—দাঁড়িয়ে আছি মহাশূন্যের দূরবর্তী কোনো গ্রহে— নেপচুন বা ইউরেনাসে—পার্থিব দৃশ্য বলতে যা বোঝায়, তার বদলে ধ্যানধারণায় আসে না এমনি অনৈসর্গিক বিস্ময়রাজি প্রত্যক্ষ করছি বিমূঢ় চাহনি দিয়ে। যে অনুভূতি হৃদয়মন আচ্ছন্ন করছিল অদৃষ্টপূর্ব সেই দৃশ্যের সামনে দাঁড়িয়ে, তা বুঝতে হল চাই নতুন শব্দ, চাই নতুন কল্পনা। আমি শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলাম, বিস্ময়বিমুগ্ধ মনে তারিফ করলাম, অসাড় অবশ চেতনায় থেকে থেকে উঁকি দিতে লাগল অবশ্য নামহীন ভয়।

প্রকৃতির এই অপ্রত্যাশিত রূপ মুহূর্তের মধ্যে স্বাস্থ্যের আভা ফিরিয়ে এনেছিল আমার পাণ্ডুর গালে। বিস্ময় নামক টোটকা দিয়ে যেন চিকিৎসা করছিলাম নিজেকে - অত্যাশ্চর্য দাওয়াইয়ের গুণে সেরেও উঠছিলাম দ্রুত। তাছাড়া আতীক্ষ্ণ ঘন বাতাসের বাড়তি অক্সিজেনও নবজীবন দান করছিল আমার ফুসফুস জোড়াকে।

চল্লিশ দিন সঙ্কীর্ণ সুড়ঙ্গপথে বন্দী জীবন যাপন করার পর এই আর্দ্র, নোনতা বাতাস নিঃশ্বাসের সঙ্গে টেনে নেওয়ার মধ্যে যে এতটা স্বর্গ সুখ আছে, তা কে জানত। গহ্বর ছেড়ে বাইরে আসার জন্যে তাই কোনো পরিতাপ ছিল না মনের মধ্যে। কাকা অবাক হচ্ছিলেন না আমার মত— কেন না এ-সবই তিনি আগেভাগে দেখে নিয়েছেন।

"অ্যাকজেল, একটু হাঁটবার মত শক্তি আছে?" শুধোলেন কাকা।

"নিশ্চয় আছে। হাঁটতেই তো চাই আমি।"

"আমার হাত ধরো, অ্যাকজেল। তীর ধরে এগোই চলো।"

সাগ্রহে ধরলাম কাকার বাহু। নতুন মহাসমুদ্রের উপকূল বরাবর শুরু হল

পদব্রজে অভিযান। বাঁ দিকে খাড়াই পাহাড় একটার ওপর একটা স্তূপীকৃত হয়ে যেন প্রকাণ্ড দৈত্যলোক সৃষ্টি করেছে। পাহাড়গুলোর ধার দিয়ে ঝরে পড়ছে অগণিত জলপ্রপাত—পড়ছে গর্জনশীল ফেনিল সমুদ্রের উত্তাল জলরাশির ওপর। বাষ্প দিয়ে গড়া কয়েকটা হাল্কা মেঘ ভেসে যাচ্ছে এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ে—সংকেতে বুঝিয়ে দিচ্ছে কাছাকাছি রয়েছে গরম জলের ফোয়ারা। ক্ষুদে ক্ষুদে স্রোতস্বিনী মহানন্দে নেচে গেয়ে কলকল শব্দে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে মহাসমুদ্রের জলে।

স্রোতস্বিনীগুলোর মধ্যে একটিকে আমি চিনতে পারলাম। আমাদের বিনে মাইনের পরম বিশ্বাসী পথপ্রদর্শক—হ্যান্সবাক। ঝিরঝির করে এমন নির্বিকার ভাবে সাগরের সাথে মিশিয়ে দিচ্ছে নিজেকে যেন কিছুই সে জানে না-- অনাদি অনন্ত কাল ধরে সাগরের জলে একাকার হয়ে যাওয়াই যেন তার একমাত্র কাজ।

সেই মুহূর্তে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হল অবশ্য শ'পাঁচেক গজ দূরের একটা আশ্চর্য অরণ্যের ওপর। জঙ্গলের গাছগুলো দেখতে অবিকল মেয়েদের ছাতার মত। এক মাপের গাছ দিয়ে সমস্ত বনতল যেন জ্যামিতির নক্সায় মাপজোখ করে সাজানো। তার চাইতেও তাজ্জব ব্যাপার হল, এমন ঝড়ো বাতাসেও অদ্ভুতদর্শন পাদপশ্রেণীর একটি পাতাও কাঁপছে না, দুলছে না, নড়ছে না। নিথর নিস্পন্দ দেহে তারা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে শিহরিত দেবদারুর মত।

দ্রুতচরণে এগিয়ে গেলাম কিম্ভুতকিমাকার জঙ্গলটার দিকে। কি নাম দেব বিদঘুটে গাছগুলোর ? পৃথিবীবাসী মানুষ দুলক্ষ বিভিন্ন শ্রেণীর পাদপকুলের সন্ধান পেয়েছে। এরা কি তাদের অন্যতম ? না। কাছে গিয়ে প্রশংসা না করে পারলাম না। যা দেখলাম, তা পৃথিবীরই গাছ—তবে দানবিক আকারে বর্ধিত। কাকা অবশ্য ঝটিতি নাম দিয়ে ফেললেন অতিকায় ছত্র-বৃক্ষগুলোর।

বললেন—"ঠিক যেন ব্যাঙের ছাতার জঙ্গল।"

কথাটা ঠিক। বিশেষ এই উদ্ভিদ শ্রেণী আর্দ্রতা আর উত্তাপের বিষম ভক্ত। এখানে তা পেয়েছে অপর্যাপ্ত ভাবে। পরিণামটা চোখের সামনেই দেখা যাচ্ছে।

আধ ঘণ্টা হাঁটলাম আশ্চর্য এই অরণ্যের ভেতর দিয়ে। সে কী ঠাণ্ডা সেখানে! অবশেষে সমুদ্রতীরে বেরিয়ে এসে বাঁচলাম হাঁফ ছেড়ে।

পাতালরাজ্যে উদ্ভিদ বলতে শুধু এই দৈত্যাকার ব্যাঙের ছাতাই নেই। ঘুরে আরো অনেক বিরঙ পাতাওলা গাছের জঙ্গল দেখলাম। চিনতে কষ্ট

হল না। পৃথিবীর ওপরে এরাই খাটো আকারের ঝোপঝাড় গুল্ম। এখানে তারাই মহাকায় আকার নিয়েছে। লাইকোপোডিয়াম হয়েছে একশ ফুট ঢ্যাঙা। উত্তর লঘিমা অঞ্চলের তালঢ্যাঙা ফার গাছের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে ফার্ণ গাছগুলো, সিজিলারিয়ারা হয়েছে দৈত্যবিশেষ, লেপিডোডেনড্রনদের কাণ্ডগুলো হয়ে দাঁড়িয়েছে চোঙার মত—লম্বা লম্বা পাতা ঝুলছে তা থেকে।

"কাকা, প্রকৃতি মহাপ্লাবনের আগের গাছপালা সযত্নে রক্ষা করে চলেছেন তাঁর প্রকাণ্ড বৃক্ষ রক্ষণাগারে! আশ্চর্য! পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকরা এসব উদ্ভিদের হদিশ খুঁজে না পেয়ে মন থেকে বানিয়ে নিয়েছেন—কিন্তু এখানে দেখছি সশরীরে উপস্থিত প্রত্যেকে।"

"শুধু উদ্ভিদ রক্ষণাগার বললেই তো চলবে না, বাবা। বন্য জন্তুর মেলাও বলতে পারো জায়গাটাকে। পায়ের তলায় তাকালেই বুঝবে। কিসের ওপর দাঁড়িয়ে আছো অ্যাকজেল? হাড়গোড়গুলো মহাপ্লাবনের আগেকার জন্তু-জানোয়ারের কি না?"

"কিন্তু চতুষ্পদ জন্তু ওখানে এল কি করে বুঝছি না। পৃথিবীর ওপরে মহাপ্লাবনের পর তলানি থিতিয়ে মাটির আকারে ঢেকে দিয়েছিল আদিকালের আগ্নেয়শিলাকে, জন্তুর আবির্ভাব ঘটেছিল তখনি।" অস্থিগুলোর গড়ন নিরীক্ষণ করতে করতে বললাম আমি।

"তোমার কৌতূহলের জবাবটা কিন্তু অতি সোজা। পায়ের তলায় যা দেখছো, তা পলিমাটি।"

"সে কী! ভূপৃষ্ঠের তলায় এত গভীরে পলিমাটি!"

"ভূতত্ত্ববিদরা অবশ্য এ হেঁয়ালীর সমাধান করে দেবেন এইভাবে। মাধ্যাকর্ষণের অমোঘ নিয়মে এক সময়ে ভূপৃষ্ঠ সঙ্কুচিত হয়েছে প্রসারিত হয়েছে পর্যায়ক্রমে। সেইসময়ে ভূপৃষ্ঠে নিশ্চয় ফাটল ধরেছিল, রাশি রাশি পলিমাটি সেই ফাঁক দিয়ে নেমে এসে জমা হয়েছিল পৃথিবীর ভেতরকার এই গহ্বরে।"

"তা বটে। কিন্তু পলিমাটির প্রাণীরা যদি পাতালে এখনো থাকে? এই মুহূর্তে তারা দৈত্যাকার চেহারা নিয়ে যদি তেড়ে আসে?"

এই না বলে সভয়ে তাকালাম দূর দিগন্তের পানে। কিন্তু পাহাড়প্রমাণ জানোয়ারদের চেহারা নজরে পড়ল না। ধূ-ধূ করছে চারদিক। জীবন্ত প্রাণী কোথায়? কোথায় শেষ বিপুল এই জলধির? আমরা কি পৌঁছোতে পারব অন্য প্রান্তে?

সে সম্বন্ধে কাকার মনে অবশ্য তিলমাত্র সন্দেহ ছিল না। ভয়ে-আশায়-উৎকণ্ঠায় আধমরা হচ্ছিলাম কেবল আমি-ই।

ঘণ্টাখানেক একটা পাথরে বসে আশ্চর্য সেই দৃশ্য উপভোগ করলাম মনপ্রাণ দিয়ে। তারপর সৈকতভূমি দিয়ে হেঁটে ফিরে এলাম গহ্বর-নিবাসে। সৃষ্টি-ছাড়া বিদঘুটে চিন্তারাশির ঘূর্ণিপাকে কিছুক্ষণের মধ্যেই দিশেহারা হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম অকাতরে।

৩০। ভেলা

পরের দিন ঘুম থেকে উঠলাম ঝরঝরে শরীর নিয়ে। দেহমনে কোথাও কোনো গ্লানি নেই। ভাবলাম, সমুদ্র-স্নান করলে শরীরটা আরো তাজা হবে। তাই ভূ-মধ্য সাগরের ঢেউয়ে অবগাহন করলাম মিনিটকয়েক। সাগরের নামটা কি রকম দিলাম? উপযুক্ত নাম নয় কি?

ফিরে এলাম দারুণ ক্ষিদে নিয়ে। প্রাতরাশ খেলাম গোগ্রাসে। রান্নাবান্না অবশ্য হান্স করল। জল আর আগুন দুটোই হাতের কাছে থাকায় একঘেয়ে খাবার না দিয়ে অন্য স্বাদের কিছু কিছু খাবার বানিয়ে দিল হান্স।

খাওয়া দাওয়া শেষ হলে কাকা বললেন—"অ্যাকজেল, চলো সমুদ্রের জোয়ার পর্যবেক্ষণ করা যাক।"

"সে কী! চাঁদ আর সূর্যের আকর্ষণ এখানেও পৌছোবে নাকি?"

"কেন পৌছোবে না শুনি? বিশ্বের সব বস্তুই যখন আকর্ষণের শক্তির আওতায় পড়ছে, একই নিয়মের বাইরে থাকবে কেন এই জলটুকু?"

কথা বলতে বলতে সৈকতভূমিতে পৌছোলাম। দেখলাম, সত্যিসত্যিই ঢেউগুলো ক্রমে ক্রমে এগিয়ে আসছে বেলাভূমির ওপর।

বললাম—"কাকা, ঠিক বলেছেন। জল বাড়ছে।"

"পাথরের ওপর ফেনার দাগ দেখে বলতে পারি জল বাড়বে দশ ফুটের মত।"

"চোখকেও যে বিশ্বাস করতে পারছি না, কাকা," বিস্ময়বিমূঢ় কণ্ঠে বললাম আমি। "কেউ কোনোদিন ভাবতেও পেরেছিল কি পৃথিবীর ভেতরে সত্যিকারের সমুদ্র আছে, জোয়ার ভাঁটা আছে, ঝড় আছে, বাতাস আছে?"

"না পাবার তো কোনো কারণও দেখি না। কোনো বিরুদ্ধ বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে কী?"

"একদম না। যা ছিল, তাও নাকচ করছি। মানে, পৃথিবীর কেন্দ্রে উত্তাপ আছে, এ-থিওরী আর মানি না।"

"তাহলে ডেভীর থিওরী সত্যি?"

"আলবাৎ সত্যি। আরও ভেতরে আরো সমুদ্র আর মহাদেশ আছে কিনা, তাই বা কে বলতে পারে?"

"থাকলেও জনপ্রাণী নেই অবশ্য।"

"কিন্তু কাকা, মাছও তো থাকতে পারে এই জলে? অজানা মাছ—যাদের ঠিকুজীকুষ্ঠির ঠিকানা পায়নি পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকরা?"

"এখনো পর্যন্ত তো দেখলাম না।"

"ছিপ বানিয়ে নিয়ে দেখব মাছ ধরা পড়ে কিনা?"

"নিশ্চয় দেখব, অ্যাকজেল। সদ্য আবিষ্কৃত এই দুনিয়ার সব কিছুই আমাদের দেখতে হবে।"

"কিন্তু কাকা, একটা কথা এখনো জিজ্ঞেস করা হয়নি। আপনার যন্ত্রপাতির হিসেব অনুসারে আমরা এখন কোথায়?"

"আইসল্যাণ্ড থেকে ৮৭৫ মাইল দূরে—সমান্তরাল হিসেবে অবশ্য।"

"কম্পাসের কাঁটা কি এখনো দক্ষিণ-পূবদিকে?"

"একটু সরেছে পশ্চিমদিকে ১৯ ডিগ্রী ৪৫ মিনিট—ভূ-পৃষ্ঠের মতই। তবে একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখা দিয়েছে ক্রমনিম্নতার ক্ষেত্রে। উত্তর গোলার্ধে দেখা যায় কম্পাসের কাঁটা যেন সব সময়ে ঘাড় গুঁজে থাকে মেরুর দিকে। কিন্তু এখানে দেখছি তা মাথা উঁচিয়ে রয়েছে ওপর দিকে।"

"তার মানে কি এই নয় যে চৌম্বক কেন্দ্রটা রয়েছে আমরা রয়েছি যেখানে সেখান থেকে ভূ-পৃষ্ঠের মাঝামাঝি কোথাও?"

"খাঁটি কথা বলেছো। মেরু অঞ্চলের যেখানে চৌম্বক কেন্দ্র আবিষ্কার করেছিলেন জেমস রস, ঠিক তার তলায় পৌঁছোলে দেখব নিশ্চয় কম্পাসের কাঁটা সোজা ওপর দিকে উঠে রয়েছে। কাজেই, রহস্যজনক আকর্ষণের সেই কেন্দ্রটা খুব গভীরে নেই, তাই তো?"

"যা বলেছেন। এ-তত্ত্ব কিন্তু বিজ্ঞান কোনোদিন আঁচ করতেও পারে নি।"

"বাবা অ্যাকজেল, বিজ্ঞান শাস্ত্রটা হল ভুলে ভরা। ভুলটা আছে বলেই অবশ্য অল্প অল্প করে তা শুধরে নিয়ে চরম সত্যের দিকে এগোনো যায়।"

"মাটির কত নীচে রয়েছি, কাকা?"

"৮৮ মাইল।"

ম্যাপ দেখে বললাম—"তাহলে স্কটল্যাণ্ডের পর্বত অঞ্চলের ঠিক নীচেই রয়েছি আমরা। আমাদের মাথার ওপরেই গ্রামপিয়ানের বরফ-ঢাকা চুড়োগুলো অবিশ্বাস্য উচ্চতায় পৌঁছেছে?"

হেসে ফেললেন কাকা—"যা বলেছো। তবে ছাদটা নিরেট তো, পাহাড় পর্বতের ওজন বইতে পারবে ঠিকই।"

"কাকা, আমি ছাদ ভেঙে পড়ার কথা ভাবছি না। এবার আপনার প্ল্যান কী? ভূ-পৃষ্ঠে ফিরবেন?" .

"ফিরব? নিশ্চয় না! বরং আরও এগোবো।"

"কিন্তু জলের তলায় ঢুকব কি করে?"

"জলের তলায় ডুব দিতে যাব কেন? সব সমুদ্রই বড় আকারের সরোবর। অর্থাৎ এই ভূ-মধ্য সাগরের চার পাশে গ্র্যানাইট পাথরের বেড় নিশ্চয় আছে।"

"তা থাকবে না কেন।"

"তাহলে বিপরীত দিকের উপকূলে পৌঁছোলে ভূ-কেন্দ্রে পৌঁছোনোর নতুন পথ পাওয়া যাবেই।

"সমুদ্রটা কত বড় বলে মনে হয়?"

"সত্তর থেকে একশ মাইল।"

কাকার হিসেব যে ডাহা ভুল, তা শুনেই বুঝলাম।

কাকা বললেন—"কালকেই পাল তুলে দিয়ে দরিয়ায় ভাসব আমরা।"

"পাল তুলে দেবেন? নৌকো কোথায়?"

"নৌকো না হলেও, মজবুত ভেলা তো পাচ্ছি।"

"ভেলা!" চোখ কপালে তুললাম আমি। "বলেন কী! নৌকো বা ভেলা ছুটোই তৈরী করা একেবারে অসম্ভব ব্যাপাব—"

"অ্যাকজেল, কান পেতে শোনো। হাতুড়ি ঠোকার আওয়াজ পাচ্ছো? হ্যান্স কাজ এগিয়ে এনেছে অনেকটা।"

"সে কী কথা! হ্যান্স গাছ কাটল কি করে?"

"গাছ তো পড়েই রয়েছে। যাও, গিয়ে দেখে এসো।"

মিনিট পনের হাঁটতেই পৌঁছোলাম ক্ষুদে বন্দরের মত একটা নিভৃত অঞ্চলে। অবাক হয়ে দেখলাম বালির ওপর পড়ে রয়েছে একটা অর্ধ-সমাপ্ত ভেলা। বিশেষ এক ধরনের কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরী হচ্ছে ভেলাটা। বালির ওপর ছড়িয়ে রয়েছে একই কাঠের ফ্রেম, জয়েন্ট এবং আরো কত কী! এত কাঠ সেখানে পড়ে যা দিয়ে একটা ভেলা কেন, একটা গোটা নৌবহর বানিয়ে নেওয়া যায়।

"কাকা, এটা কি কাঠ?"

"উত্তর অঞ্চলে মোচার মত গড়নের যত গাছ দেখা যায়, মানে, পাইন,

ফার, বার্চ গাছ এরা। সমুদ্রের জলে মিশোনো খনিজ ধাতুর সংস্পর্শে এসে এ-কাঠ এখন লোহার মত মজবুত। একেই বলে শিলীভূত কাঠ অর্থাৎ সার্টার ব্র্যাণ্ড কাঠ।"

"তাহলে তো এ-কাঠ লিগনাইটের মত ভাসতে চাইবে না? পাথরের মত ডুবে যাবে।"

"মাঝে মাঝে তা হয় বটে; এই জাতীয় কিছু কাঠ খাঁটি অ্যানথ্রাসাইট কয়লা হয়ে যায়। কিন্তু কিছু কাঠ পুরোপুরি শিলীভূত হয় না। যেমন এই কাঠটা," বলে একটা মহামূল্যবান গোল কাঠ তুলে নিয়ে জলে নিক্ষেপ করলেন কাকা।

ঢেউয়ের তলায় ডুবে গেল কাঠের টুকরোটা। একটু পরেই কিন্তু ভেসে দুলতে লাগল ঢেউয়ের দোলায়।

"বিশ্বাস হল?" শুধোলেন কাকা।

"একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা বিশ্বাস হল!"

পরের দিন হান্সের পাকা হাতে সম্পূর্ণ হল ভেলা। লম্বায় তা দশ ফুট চওড়ায় পাঁচ ফুট। বড় বড় সার্টার ব্র্যাণ্ড কাঠের গুঁড়িকে মজবুত দড়ি দিয়ে বেশ করে বেঁধে বানানো ভেলাটা দিব্বি ভাসতে লাগল লিডেনব্রক সাগরের জলে।

৩১॥ পাল তুলে দিলাম

তেরোই আগস্ট। খুব ভোরে উঠলাম। আজ থেকে শুরু হবে নতুন পন্থায় অভিযান। কম কষ্ট করে বেশী পথ যাওয়া যাবে ভেলায় চেপে।

দুটো গুঁড়ি এক সঙ্গে বেঁধে মাস্তুল হয়েছিল ভেলার। আর একটা আড়াআড়ি বেঁধে তা থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হল আমাদের কম্বলগুলো। খাসা পাল হল। দড়িদড়ার অভাব নেই। সুতরাং চলন সই হলেও জলযানটি মজবুত হল রীতিমত।

জিনিসপত্র এবং প্রচুর খাবার জল ভেলায় চাপিয়ে সকাল ছটায় বেরিয়ে পড়লাম। হ্যান্স হালে বসল। পাল খাটিয়ে জল কেটে এগিয়ে চললাম আমরা।

কাকার যা বাতিক, বন্দর ছেড়ে বেরোনোর আগেই বন্দরটার নাম দিতে চাইলেন আমার নামে।

আমি বললাম—"তা কেন? আরো ভাল নাম দিতে পারি।"

"কি নাম?"

"গ্রোবেন বন্দর।"

"বেশ, আজ থেকে ম্যাপেতে উঠে গেল গ্রোবেন বন্দরের নাম।"

জোর হাওয়া বইছিল উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে। ঘন বাতাসের তেজ বেশী। বন বন করে শক্তিশালী পাখা ঘুরছিল যেন। হাওয়ার ধাক্কায় সাঁ-সাঁ করে তেড়েমেড়ে ধেয়ে চলল ভেলা। একঘণ্টা পরে গতিবেগ হিসেব করে কাকা বললেন "এইভাবে চললে চব্বিশ ঘণ্টায় কমসে কম পঁচাত্তর মাইল পথ পেরিয়ে যাব। বিপরীত উপকূলে পৌছোতে খুব বেশী সময় লাগবে না দেখছি।"

আমি জবাব না দিয়ে ভেলার সামনের দিকে বসে দেখলাম যাত্রা পথের মনোহর দৃশ্য। উত্তর উপকূল ক্রমশঃ মিলিয়ে আসছে দিগন্তে। পুব আর পশ্চিম উপকূল আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে দূর হতে দূরে। সামনে যতদূর দু চোখ যায় কেবল জল আর জল। সুবিশাল সমুদ্রর ওপর ভাসছে মেঘবাশির ধূসর ছায়া। বিষণ্ণ জলেব ওপর সঞ্চরমান ছায়াপাত জলরাশিকে আরও নিরানন্দ করে তুলছে যেন। বৈদ্যুতিক দ্যুতির রূপোলী রশ্মিরেখা ঝিলিক দিয়ে উঠছে সমুদ্রের জলকণার ওপর·· আলোকময় স্ফুলিঙ্গ ছড়াচ্ছে ভেলার চারপাশে ভাঙা ঢেউয়ের শীর্ষে। দেখতে দেখতে জমির সবচিহ্ন মুছে গেল চোখের সামনে থেকে। ভেলার সামনে ফেণায়িত তরঙ্গ ভঙ্গ না থাকলে মনে হত বিশাল জলধির মধ্যে স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে আছি আমরা।

দুপুর নাগাদ প্রকাণ্ড সামুদ্রিক গুল্ম ভাসতে দেখলাম জলের ওপর। এ জাতীয় জলজ উদ্ভিদের খেয়ালী স্বভাবের বৃত্তান্ত আমি জানি। এরা বারো হাজার ফুট জলের তলায় জন্মায়, ভূ-পৃষ্ঠে বায়ুমণ্ডল যে চাপ সৃষ্টি করে, তার চারশ গুণ বেশী চাপ সহ্য করে জলের মধ্যে থেকে বাড়তে বাড়তে এমন বেড়ে ওঠে যে জাহাজের গতিরোধ করে দেয়। কিন্তু সেদিন লিডেনব্রক সাগরে যে দানবিক সামুদ্রিক উদ্ভিদ দেখলাম, তার সমতুল্য কিছু কোনোদিন দেখিনি।

রাত নামল। কিন্তু অন্ধকার তো দূরের কথা, সারা আকাশ জুড়ে স্নিগ্ধ, শীতল, শুভ্র আলোকচ্ছটা তিলমাত্র কমতির দিকে গেল না। আশ্চর্য এই আভা ম্লান হবে না একটি মুহূর্তের জন্যেও। মাস্তুলের গোড়ায় শুয়ে এইসব ভাবতে ভাবতে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লাম আমি।

হ্যান্স পাথরের মূর্তির মত হাল ধরে বসে রইল নিজের জায়গায়। হাওয়ার টানে তরতর করে এগিয়ে চলল কাঠের ভেলা।

পোর্ট গ্রোবেন ছেড়ে আসার পরেই কাকা একটা কাজ দিয়েছিলেন

আমাকে। আমি যাত্রার খুঁটিনাটি লিখে রাখি খাতায়। কৌতূহলোদ্দীপক দৃশ্যাবলী, হাওয়ার গতি, ভেলার গতিবেগ, কত পথ এলাম ইত্যাদি—অদ্ভুত অভিযানের যাবতীয় তথ্য যেন বিশদভাবে লেখা থাকে খাতার পাতায়।

অক্ষরে অক্ষরে হুকুম মেনে চলেছিলাম আমি। যা লিখেছিলাম, খাতার পাতা থেকে তা হুবহু তুলে দিচ্ছি নীচে:

শুক্রবার, আগষ্ট ১৪। একরোখা উত্তর-পশ্চিম বাতাস। ভেলা দ্রুতবেগে সিধে চলেছে। উপকূল পঁচাত্তর মাইল দূরে। দিগন্তে কিছু দেখা যাচ্ছে না। আলোর তীব্রতা একরকম রয়েছে। আবহাওয়া চমৎকার; মেঘগুলো পেঁজা তুলোর মত বহু উঁচুতে রয়েছে—ঠিক যেন গলিত রৌপ্যধারায় গড়া শ্বেত বায়ুমণ্ডলে স্নান করে উঠেছে। থার্মোমিটারে দেখা যাচ্ছে তাপমাত্রা ৩২ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড।

দুপুর নাগাদ সরু দড়ির প্রান্তে একটুকরো মাংস বেঁধে জলে ডুবিয়ে রেখেছিল হ্যান্স। দু ঘণ্টা ঠায় বসে থাকবার পর টান পড়ল দড়িতে। টানাটানি করে একটা মাছ তুলে আনল হ্যান্স।

"আরে, এ যে স্টার্জন মাছ! খেতে চমৎকার!" সোল্লাসে বললাম আমি।

প্রফেসর মাছটাকে খুঁটিয়ে দেখে অন্য কথা বললেন। মাছটার মাথা চ্যাপ্টা, গোলাকার। সামনের অংশ কাঁটার মত আঁশে ঢাকা। পাখনা আছে, কিন্তু দাঁত বা ল্যাজ নেই। স্টার্জন যে-শ্রেণীর মাছ, এ-মাছ সেই শ্রেণীভুক্ত হলেও মাছটা স্টার্জন নয়—অন্য জাতের।

কাকা বললেন—"এ-মাছ অনেক আগে লোপ পেয়েছে। ডেভোনিয়ান শিলাস্তরে এদের শিলীভূত কংকাল আজও পাওয়া যায়।"

"বলেন কী!" বিস্ফারিত চোখে বললাম আমি—"প্রাগৈতিহাসিক সমুদ্র থেকে জীবন্ত প্রাণী উঠে এসেছে দড়ির ডগায়?"

"শুধু তাই নয় হে। এ-জাতীয় মাছেরা অন্ধ হয়। এদের চোখ বলে কোনো প্রত্যঙ্গই থাকে না।"

চেয়ে দেখি, সত্যিই তাই। মাছটার চোখ নেই!

কিন্তু একটা মাছ দিয়ে তো সব মাছেদের বিচার করা চলে না। তাই আবার দড়ি ফেলা হল সমুদ্রে। এ-অঞ্চলে মাছ বিস্তর। ফলে, ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই মাছের স্তূপ হয়ে গেল ভেলার মধ্যে Pterychtis আর Dipterides—এই দু'জাতের মাছ উঠল দড়ির ডগায়। দুটি শ্রেণীই ভূ-পৃষ্ঠের সাগর থেকে লোপ পেয়েছে অনেক আগে। এ-ছাড়াও উঠল এক শ্রেণীর মাছ—যাদের জাত নির্ণয় করতে পারলেন না আমার পণ্ডিত কাকাও। সব মাছেদেরই

দেখলাম চোখ বলে কিছু নেই। না থাক, আমাদের খাদ্য ভাণ্ডার তো পূর্ণ রইল!

একটা জিনিস প্রমাণ হয়ে গেল। পাতাল সমুদ্রে যারা খেলে বেড়াচ্ছে, ভূ-পৃষ্ঠে তারা বহু আগে শিলীভূত কংকালে পরিণত হয়েছে। এখানে তারা টিঁকে আছে এখনো। সরীসৃপ শ্রেণীর সামুদ্রিক দানবও তাহলে আছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে তারা ছিল পৃথিবীর আতংক স্বরূপ। এ-যুগের বৈজ্ঞানিকরা তাদের হাড়ের টুকরো থেকে গোটা দেহটা কল্পনা করার চেষ্টা করেছেন।

টেলিস্কোপ দিয়ে সমুদ্র পর্যবেক্ষণ করলাম। ধূ-ধূ করছে যেদিকে দু চোখ যায়।

জল আর মেঘের মাঝে কিছুই আর চোখে পড়ল না।

৩২॥ রাক্ষুসে জীবদের লড়াই

শনিবার, আগস্ট ১৫। সমুদ্রের একঘেয়ে ভাব পাল্টায় নি। ডাঙার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। দিগন্ত যেন আরো দূরে সরে গেছে।

কাকা আবার আগের মত খিটখিটে হয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু মেজাজ তিরিক্ষে হল কেন? বেশ তো চলেছি আমরা।

বারবার টেলিস্কোপ দিয়ে দিগন্ত নিরীক্ষণ করছিলেন কাকা। তাই দেখে জিজ্ঞেস করেছিলাম—"আপনি কি উদ্বিগ্ন?"

"উদ্বিগ্ন? না, মোটেই না।"

"অধৈর্য?"

"ধৈর্য হারানোর কারণ আছে বই কি।"

"কিন্তু আমরা তো বেশ জোরে যাচ্ছি…"

"তাতে লাভটা কী? গতিবেগ কম হলেই বা কী, সমুদ্রটা যে বড্ড বড়!"

তখন মনে পড়ল জলযাত্রার শুরুতে কাকা বলেছিলেন, সমুদ্রটা লম্বায় পঁচাত্তর মাইলের মত হবে। আমরা এসেছি তার তিনগুণ পথ। অথচ দক্ষিণ দিকে স্থল ভাগের চিহ্নমাত্র নেই।

"তাছাড়া আমরা তো নীচের দিকেও নামছি না!" ফের খেঁকিয়ে উঠলেন কাকা। "বৃথা সময় নষ্ট করছি। পুকুরে নৌকো বিহার করার জন্যে আমি আসিনি!"

বলছেন কি কাকা? সমুদ্রটা হল পুকুর, সমুদ্রযাত্রা হল নৌকো বিহার!

আমি বললাম—"কিন্তু সাকনুজম যে-পথ দেখিয়ে ছিলেন, সেই পথেই যখন যাচ্ছি…"

"প্রশ্নটা তো সেইখানেই। সাকন্যুউজম নির্দিষ্ট পথে কি সত্যিই-যাচ্ছি আমরা? সাকন্যুউজম কি এই জলরাশির সামনে পড়েছিলেন? জল পেরিয়ে ছিলেন? যে জলের ধারা অনুসরণ করে নীচে নামলাম, সেটা আমাদের ভুল পথে নিয়ে আসেনি তো?"

"কিন্তু এ-জায়গাটাও তো খারাপ নয়। এমন চমৎকার দৃশ্য…"

"জাহান্নমে যাক তোমার সুন্দর দৃশ্য! আমি একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে অভিযান শুরু করেছি। সুন্দর দৃশ্যের কথা ফের যদি শুনি…"

আমি বোবা হয়ে গেলাম। কাকা অধীরভাবে ঠোঁট কামড়ে চেয়ে রইলেন দূর দিগন্তে।

রবিবার, আগস্ট ১৬। নতুন কিছু ঘটেনি। আবহাওয়া সেই রকমই। বাতাস আরো একটু টাটকা।

সমুদ্রটা কি অনন্ত? ভূ-পৃষ্ঠের ভূ-মধ্য বা আটলান্টিকের মতই প্রকাণ্ড নিশ্চয়। না হওয়ার তো কোন কারণ দেখি না।

বার কয়েক জলের গভীরতা মাপবার চেষ্টা করলেন কাকা। একটা গাঁইতি দড়ি বেঁধে ডুবিয়ে দিলেন জলে। দুশ ফ্যাদম্ বা বারোশ ফুট পর্যন্ত দড়ি ছেড়েও তলা পাওয়া গেল না। দড়ি টেনে তোলবার সময়ে একটু বেগ পেতে হয়েছিল।

ভেলার ওপর গাঁইতি তোলার পর হ্যান্স দেখালো গাঁইতির গায়ে কতকগুলো দাগ। যেন দুটো কঠিন বস্তুর মধ্যে থেকে দুমড়ে গিয়েছে লোহার টুকরোটা।

"ট্যাণ্ডার," ড্যানিশ ভাষায় বলল হ্যান্স। তারপর বারকয়েক হাঁ বন্ধ করে এবং খুলে বুঝিয়ে দিলে শব্দটার অর্থ কী।

"দাঁত!" অস্ফুট কণ্ঠে বলে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলাম লোহার পাতটার দিকে।

দাঁতের দাগই বটে। অত্যন্ত শক্তিশালী কোনো চোয়ালের ফাঁকে পড়েছিল দাঁতটা। হাঙর, তিমির চাইতেও ভয়ংকর কোনো প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী দাঁত দিয়ে যেন চিবিয়েছে গাঁইতিটা।

সোমবার, আগস্ট ১৭। পৃথিবীর স্তন্যপায়ী জীবরা যাদের বংশধর, প্রাগৈতিহাসিক সেই সরীসৃপ দানবদের স্বভাব প্রকৃতি স্মরণ করবার চেষ্টা করলাম। সে-যুগে সরীসৃপ দৈত্যরা দাপিয়ে বেড়িয়েছে সসাগরা পৃথিবী।

জুরাসিক সমুদ্রে ছিল তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য। প্রকৃতি তাদের পাহাড়ের মত বিশাল দেহে শক্তি দিয়েছিলেন সেই অনুপাতে। আসুরিক শক্তিতে শক্তিমান ছিল বিরাটকায় জীবগুলো।

ভাবতেই গায়ে রোমাঞ্চ দেখা দিল। মানুষ আজ পর্যন্ত তাদের জীবন্ত দেহ দেখেনি। শিলীভূত কংকাল থেকে বানিয়ে নেওয়া হয়েছে অবলুপ্ত শরীরের মোটামুটি একটা আদল।

হামবুর্গ মিউজিয়ামে আমি একটা তিরিশ ফুট লম্বা প্রকাণ্ড কংকাল দেখেছিলাম। প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপ দানোর কংকাল। সশরীরে এদেরই একজনের সামনে উপস্থিত হব কি শেষ পর্যন্ত ? কপালে কি এই লেখা ছিল আমার ?

আতংকে কাঠ হয়ে সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইলাম। না জানি কখন সমুদ্র-গহ্বর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে জলের রাক্ষস মাথা তোলে জলের ওপর! কাকার মনেও দেখলাম একই ভয় দেখা দিয়েছে। গাঁইতির দাগগুলো পরীক্ষা করার পর উনিও ভ্রূকুটি করে চেয়ে বইলেন সমুদ্রের দিকে।

বন্দুক-টন্দুকগুলো চালু আছে কিনা দেখে নিলাম। আমার কাণ্ড দেখে কাকা নীরবে ঘাড় হেলিয়ে সায় দিলেন।

বহুদূর পযন্ত জলপৃষ্ঠ আন্দোলিত হতে শুরু করেছে। জলের গভীরে যেন একটা বিপুল অশান্তি চলছে। বিপদ পায়ের কাছে এসে গেছে। সজাগ থাকা ছাড়া আর পথ নেই।

মঙ্গলবার, আগস্ট ১৮॥ রাত্রি এল, রাত মানে ঘুমের সময়। ঘুম পেলেই বুঝি এবার রাত হল। কেন না, অন্ধকার বস্তুটা এখানে একেবারেই নেই। একঘেয়ে আলোয় চোখ টনটনিয়ে ওঠে। এ-যেন মেরু অঞ্চলের সূর্য। আমি ঘুমোলে হান্স হাল ধরে বসে থাকে নিশ্চল দেহে।

দু ঘণ্টা পরে একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় ঘুম ভেঙে গেল আমার। অবর্ণনীয় একটা শক্তি ভেলাকে জল থেকে তুলেছে এবং ঠিকরে ফেলেছে শ'খানেক ফুট দূরে।

"কী হল ?" কাকা চেঁচিয়ে উঠলেন—"ডাঙায় ভেলা ঠেকেছে নাকি ?"

প্রায় সিকি মাইল দূরে একটা কালো বস্তুর দিকে আঙুল তুলে দেখাল হান্স। জিনিসটা জল থেকে উঠছে, ফের ডুব দিচ্ছে। দেখেই ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি :

"অতিকায় শুশুক !"

"ঠিক ধরেছো," বললেন কাকা। "ওদিকে একটা প্রকাণ্ড সামুদ্রিক গিরগিটিও দেখা যাচ্ছে।"

"তারও ওদিকে একটা কুমীর· দৈত্যের মত প্রকাণ্ড! উফ! কী বিশাল চোয়াল আর দাঁতের সারি! এই যাঃ! তলিয়ে গেল দেখছি!"

"তিমি! তিমি!" এবার চেঁচানোর পালা কাকার। "প্রকাণ্ড পাখনাগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দ্যাখো, দ্যাখো, নাক দিয়ে কি সাংঘাতিক তোড়ে শূন্যে জল ছুঁড়ছে দ্যাখো!"

সত্যিই তাই! দু'দুটো জলস্তম্ভ সিধে উঠে যাচ্ছে সমুদ্র থেকে অনেক উঁচুতে। একপাল সামুদ্রিক দৈত্য এসে জুটেছে দেখছি। আমরা ভয়ে বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম স্তম্ভিতের মত। অলৌকিক আকার তাদের। সবচাইতে ক্ষুদে রাক্ষসটাও এক কামড়ে দু' টুকরো করে দিতে পারে ভেলাটা। বিপজ্জনক এলাকা ছেড়ে চটপট চম্পট দেবার চেষ্টা করছিল হ্যান্স। কিন্তু উল্টো দিকেও দেখা গেল একটা চল্লিশ ফুট লম্বা কচ্ছপ আর তিরিশ ফুট লম্বা সাপকে। ঢেউয়ের ওপর দানবিক মাথা তুলে কি যেন তারা দেখছে!

পালানোর প্রশ্ন আর ওঠে না। এক্সপ্রেস ট্রেনের চাইতেও দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে সরীসৃপদানোরা, ভেলাকে প্রদক্ষিণ করছে ক্রমশঃ ছোট হচ্ছে ঘুরপাক খাওয়ার বৃত্ত। আমি রাইফেল তুললাম বটে, কিন্তু ওদের সারা গায়ে বর্মের মত ঐ আঁশের ওপর বুলেট কোনো আঁচড় কাটতেও পারবে কী?

ভয়ের চোটে কথা বলতে ভুলে গেলাম আমরা। আরো কাছে এগিয়ে এসেছে ওরা। একদিকে কুমীর—অপর দিকে সাপ। দলের অন্যান্য রাক্ষসগুলো অদৃশ্য হয়েছে। আমি বন্দুক ছুঁড়তে যাচ্ছি, এমন সময়ে বাধা দিল হ্যান্স। আঙুল তুলে দেখালো, ভেলার শ'খানেক গজ দূর দিয়ে দৈত্যদুটো ধেয়ে গিয়ে বিপুল বিক্রমে লাফিয়ে পড়ল পরস্পরের ওপর। ঝটাপটির ফলে কাউকেই আর ভালো করে দেখতে পেলাম না।

লড়াই চলল দুশ গজ দূরে। দেখলাম দুজনেই মরছে কামড়াকামড়ি করে। তারপরেই মনে হল যেন অন্যান্য দৈত্যগুলোও ফের আবির্ভূত হচ্ছে রণস্থলে। শুশুক, কচ্ছপ, গিরগিটি আর তিমি মুহুর্মুহু জল থেকে উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল যুদ্ধমান দুই দানবের আশেপাশে।

"আইভা," বললে হ্যান্স।

"দুটো দৈত্য! সে কী, অতগুলো জানোয়ার দেখছি স্পষ্ট, অথচ হ্যান্স বলছে মাত্র দুটো⋯" বললাম আমি।

কাকা বললেন—"হ্যান্স ঠিক বলেছে।" চোখ থেকে তখনো টেলিস্কোপ

নামাননি কাকা। "প্রথম দৈত্যটার নাকটা হল শুশুকের মত, মাথাটা গিরগিটির মত, দাঁতের সারি কুমীরের মত। প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপ-দানোদের মধ্যে সবচাইতে ভয়ংকর যে, এ-হল সে-ই—ইকথিওসরাস!"

"অপরটা?"

"একটা সাপ—খোলসটা কচ্ছপের মত। এ-হল ইকথিওসরাসের যমের মত শত্রু—প্লেসিওসরাস!"

হান্স তাহলে ধরেছে ঠিকই। মাত্র দুটো দানব মৃত্যুপণ লড়াইয়ে নেমেছে। জল তোলপাড় করছে আদ্দিকালের দু'দুটো কিম্ভূতকিমাকার রাক্ষস। ইকথিওসরাসের রক্তচক্ষু দুটো মানুষের মাথার মত প্রকাণ্ড। গভীর জলে এদের বাস। সেখানকার প্রচণ্ড জলচাপেও এদের চোখ দেখতে পায় সবকিছু অতি স্পষ্ট। এদের আর একটা নাম আছে—সরীসৃপ-তিমি। কারণ তিমির মতই এরা আকারে প্রকাণ্ড, গতিবেগে ক্ষিপ্র। সামনে যাকে দেখলাম, তার দৈর্ঘ তো কম করেও একশ ফুট। চোয়ালটা মস্ত। প্রকৃতিবিদরা বলেন, ঐ চোয়ালে দাঁতের মোট সংখ্যা নাকি ১৮২।

প্লেসিওসরাসের দেহটা চোঙার মত, ল্যাজটা খাটো। চারটে চ্যাপ্টা পাখনা দিয়ে নৌকোর দাঁড়ের মত জল কেটে ছুটছে। এর সারা দেহ কচ্ছপের খোলার মত শক্ত আবরণে ঢাকা। ঘাড়টা তিরিশ ফুট উঁচু। রাজহাঁসের ঘাড়ের মত যেদিকে খুশী বেঁকানো যায়। প্লেসিওরাস আসলে সাপ—কিন্তু এরকম বিদঘুটে সাপ যে কল্পনাতেও আনা যায় না!

দুই দৈত্যের কুস্তির ফলে জল তোলপাড় হল, বহুবার ভেলা উলটোতে উলটোতে রক্ষে পেল, ফোঁসফাঁস গর্জনে কানে তালা লাগার উপক্রম হল। দুজনেই তখন এমন সেঁটে রয়েছে পরস্পরের সঙ্গে যে কাউকেই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না।

আচম্বিতে দুই দৈত্যই অদৃশ্য হল জলের তলায়। ডোববার সময়ে মস্ত ঘূর্ণিপাক বানিয়ে গেল জলের ওপর। গেল কয়েকটা মিনিট। ব্যাপার কী? শেষ যুদ্ধটা কি জলের তলায় লড়বে ঠিক করেছে ওরা?

হঠাৎ জল ঠেলে বেরিয়ে এল একটা অতিকায় মাথা—প্লেসিওসরাসের মাথা। মারাত্মক জখম হয়েছে বেচারা। বিশাল বপুটা চোখে পড়ল না। শুধু দেখলাম লম্বা ঘাড়টা পাকসাট দিচ্ছে জলের ওপর। মোচড় খাচ্ছে, কুণ্ডলী পাকাচ্ছে, ডুব দিচ্ছে, ফের ভেসে উঠছে। দানবিক চাবুকের ঘায়ে যেন জল তোলপাড় করে ছাড়ছে। জলের তোড়ে আমরা প্রায় অন্ধ হয়ে গেলাম। তারপরেই অবশ্য মৃত্যু যন্ত্রণা শেষ হয়ে এল দানব-সরীসৃপের। স্থির

হয়ে এল তার ছটফটানি, খড়ফড়ানি। মৃদু মৃদু কম্পিত সুবিশাল সর্প-দেহটা ভাসতে লাগল প্রশান্ত সমুদ্রে।

কিন্তু ইকথিওসরাসটা গেল কোথায়? ডুবো-গহ্বরে ফিরে গিয়েছে, না, আবার ফিরে আসবার মতলব আঁটছে দ্বিগুণ তেজে?

৩৩॥ সুবিশাল উষ্ণ প্রস্রবণ

বুধবার, আগস্ট ১৯। অব্যাহত রয়েছে সমুদ্রযাত্রা। গতকালের মত নতুন বিপদ যেন আর না আসে।

বৃহস্পতিবার, আগস্ট ২০। বাতাস এলোমেলো। তাপমাত্রা বেশীর দিকে। গতিবেগ ঘণ্টায় ন মাইলের মত।

দুপুর নাগাদ একটা নতুন শব্দ শুনলাম। অনেক দূর থেকে একটানা গর্জন ভেসে আসছে।

প্রফেসর বললেন—"দূরে কোথাও পাহাড় বা দ্বীপ আছে মনে হচ্ছে।"

হ্যান্স মাস্তল বেয়ে উঠল দূর সমুদ্র দেখবার জন্যে। দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্রে প্রথমে কিছু দেখা যায় নি। তারপরেই দেখা গেল একটা মস্ত জলের ফোয়ারা জল থেকে ঠেলে উঠছে বহু উঁচুতে।

আচমকা চেঁচিয়ে উঠল হ্যান্স—"হোম।"

"দ্বীপ!" এবার চেঁচালেন প্রফেসর।

"কিন্তু ঐ জলের স্তম্ভটা কিসের?"

"গাইসার," বলল হ্যান্স।

জলের তোড়ে ভেলা ডুবে যেতে পারে চক্ষের নিমেষে। তাই হুঁশিয়ার হয়ে জলস্তম্ভকে নিরাপদ ব্যবধানে রেখে দ্বীপের কিনারায় ভেলাকে নিয়ে এল হ্যান্স।

লাফিয়ে নামলাম পাথরের ওপর। খোঁড়াতে খোঁড়াতে পিছু পিছু এলেন কাকা। হ্যান্স যেন সব কৌতূহলের উর্ধ্বে, এমনিভাবে ঠায় বসে রইল ভেলায়।

মেঝেটা গ্র্যানাইট পাথরের। কিন্তু পায়ের তলায় পাথর কাঁপছে থরথর করে। ঠিক যেন স্টীম ইঞ্জিনের বয়লার কাঁপছে। যেন ভেতরে অবরুদ্ধ বাষ্প মাথা খুঁড়ছে গ্র্যানাইট আবরণে। জমি বেশ গরম।

ঢালু হয়ে পাথুরে মেঝে নেমে গিয়েছে মাঝখানে—যেন একটা মস্ত গামলা। গামলার কেন্দ্র থেকে উঠছে জলের মস্ত ফোয়ারা।

কাছে থার্মোমিটার ছিল। জলে ডোবালাম। ফুটন্ত জলের তাপমাত্রা ১৬৩ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড।

তার মানে, এ-জলের উৎস গনগনে চুল্লীর ওপর থেকে। প্রফেসরের থিওরী কি তাহলে নস্যাৎ হতে চলল?

উনি কিন্তু বললেন—"আমার থিওরী বানচাল করার মত কিছু প্রমাণ পাওয়া গেছে কি?"

"কিচ্ছু না," বলে ভয়ের চোটে চুপ মেরে গেলাম। যা গোঁয়ার কাকা!

আমার কিন্তু মনে হল, এই ক'দিনের অভিযানে উচ্চ তাপমাত্রার মধ্যে পড়তে হয়নি বলেই যে পরেও তাপমাত্রা বাড়বে না, তা ঠিক নয়। একসময়ে এমন একটা অঞ্চলে আমরা পৌঁছোবো যেখানকার টেম্পারেচার এই থার্মোমিটার দিয়ে আর মাপা যাবে না।

আগ্নেয়দ্বীপের নাম দেওয়া হল আমার নামে। সঙ্গে সঙ্গে ভেলায় চেপে ফের ভাসলাম অকূল দরিয়ায়।

একদৃষ্টে চেয়েছিলাম উষ্ণ প্রস্রবণের দিকে। দেখলাম, জলের তোড় কমছে বাড়ছে। কখনো অনেক উঁচুতে উঠছে, কখনো বেশ নেমে পড়ছে। অর্থাৎ, মাটির তলায় বন্দী বাষ্প কখনো ঠেলে উঠতে চাইছে, আবার চাপ কমে গেলে ঝিমিয়ে পড়ছে। ঠিক যেন বয়লারের স্টীম বেরুচ্ছে থেকে থেকে বিপুল বেগে।

হিসেব করে দেখলাম, গ্রোবেন বন্দর থেকে আমরা এসেছি ৬৭৫ মাইল, আইসল্যাণ্ড থেকে ১,৫৫০ মাইল। আমাদের ঠিক মাথার ওপর রয়েছে ইংলণ্ড।

৩৪ ॥ ঝড়

শুক্রবার, আগস্ট ২১। জমকালো উষ্ণ প্রস্রবণটি আর দেখা যাচ্ছে না। হাওয়ার তেজ ফের বেড়েছে। অ্যাকজেল দ্বীপ থেকে আরো বেগে নিয়ে চলেছে অজানা পথে। গরম জলের ফোয়ারার সেই গুরু-গুরু গর্জন ক্ষীণ হয়ে এসেছে।

আবহাওয়ায় পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। বায়ুমণ্ডল ভারী হচ্ছে তাল তাল বাষ্পের আবির্ভাবে। এ-বাষ্প উঠছে নোনা জল থেকে। বাষ্পের মধ্যে বইছে তড়িৎ প্রবাহ। মেঘরাশি বেশ খানিকটা নেমে এসেছে, জলপাই রঙের ছোঁয়া লেগেছে যেন মেঘপুঞ্জে। বৈদ্যুতিক আলোর ক্ষমতা নেই অস্বচ্ছ এই আবরণ ভেদ করে নীচে বিচ্ছুরিত হওয়ার। একটু পরেই এই মেঘ আর

বাষ্পের মধ্যেই শুরু হবে অত্যাশ্চর্য এক নাটক—ভৌতিক পদার্থদের তাণ্ডবনৃত্য।

প্রলয়ের আবির্ভাবে পৃথিবীর মানুষমাত্রই ভয়ে আধমরা হয়ে যায়। আমারও মুখ শুকিয়ে গেল দক্ষিণ দিগন্তে সহসা আবির্ভূত করাল মেঘের পুঞ্জ দেখে। এ-যে ঝড় ওঠার পূর্ব লক্ষণ। চারদিক তাই যেন থমথম করছে। শান্ত হয়ে এসেছে সমুদ্র, বাতাসের ভারও যেন বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারা বায়ুমণ্ডল ভরপুর হয়ে রয়েছে তড়িৎপ্রবাহে। আমার শরীর ডুবে রয়েছে সেই প্রবাহের মধ্যে। তড়িৎ-যন্ত্রের কাছে গেলে মাথার চুল যেমন খাড়া হয়ে যায়, তেমনি ভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছে আমার মাথার চুল। সেই মুহূর্তে আমাকে ছুঁলে বুঝি কাকা আর হ্যান্সও দারুণ ইলেকট্রিক শক খেতেন।

সকাল দশটা নাগাদ লক্ষণগুলো আরো সুস্পষ্ট হল। মেঘের চেহারা দেখে বুঝলাম, তুফানের প্রস্তুতি চলছে সেখানে।

"ঝড় বৃষ্টি এল বলে," বললাম আমি।

মুখের কথা খসতে খসতেই দক্ষিণ দিগন্তে অকস্মাৎ একটা পরিবর্তন দেখা গেল। সঞ্চিত বাষ্প নিমেষ মধ্যে জল হয়ে ঝরে পড়ল। শূন্যস্থান পূর্ণ করার জন্যে গহ্বরের নানা দিক থেকে বাতাস ছুটে গেল হ্যারিকেন ঝড়ের বেগে। অন্ধকার ঘনিয়ে এল দেখতে দেখতে। খাতার পাতায় ঐটুকু সময়ের মধ্যেই লিখে নিলাম আরো দুচারটে কথা।

বাতাসে ভর করে যেন শূন্যে উঠে পড়ল আমাদের ভেলা—ঝড়ের মুখে খড়কুটোর মতই ছিটকে গেল সামনের দিকে। ঝাঁকুনির চোটে মুখ থুবড়ে পড়লেন কাকা। পড়ে গিয়েও কিন্তু তিনি একটা তার আঁকড়ে ধরে মহানন্দে দেখতে লাগলেন শূন্য মাঝে ভৌতিক পদার্থদের লীলাখেলা।

হ্যান্স কিন্তু একটুও টসকায়নি। ঝড়ো হাওয়ায় ওর ঝাঁকড়া চুল উড়ছিল মুখের সামনের দিকে। বিদ্যুৎকণা স্ফুলিঙ্গের মত জ্বলছিল চুলের ডগায়। দ্যুতিময় চুলের অন্তরালে ওর নিস্পন্দ মুখ দেখে মনে হচ্ছিল ও-যেন এ-যুগের মানব নয়; লক্ষ কোটি বছর আগেকার অ্যান্টিডিলুভিয়ান মানব—ইকথিওসরাস আর মেগাথিরিয়ামের সমসাময়িক।

মাস্তুলটা তখনো ভেঙে পড়েনি। পাল ফুলে উঠেছিল বুদবুদের মত—এই বুঝি ফেটে ছিঁড়ে উড়ে যাবে ঝড়ের মুখে। ভেলা চলছে আশ্চর্য গতিবেগে—জল ছিটকে যাচ্ছে সিধে সরলরেখায়।

"পাল! পাল!" আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে ইসারায় পাল নামিয়ে নিতে বললাম সঙ্গীদের।

"না!" জবাব দিলেন কাকা।

"নেভ!" মাথা নেড়ে বলল হান্স।

এর মধ্যেই বৃষ্টির ধারা জলপ্রপাতের মত গভীর গর্জন করে নামতে শুরু করেছে দূর দিগন্তে। উন্মত্তের মত সেইদিকেই ধেয়ে চলেছি আমরা। কিন্তু মুষলধারে বৃষ্টির জল আমাদের কাছে এসে পৌঁছোনোর আগেই মেঘরাশি চৌচির হয়ে ফেটে গেল, টগবগ করে ফুটে উঠল সমুদ্রের জল এবং উর্ধ্ব অঞ্চলে বিপুল রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে শুরু হয়ে গেল তড়িৎ শক্তির ম্যাজিক। অত্যুজ্জ্বল বিদ্যুৎঝলক মিশে গেল বজ্রগর্জনের সাথে, তারি মাঝে চোখে পড়ল সগর্জন সংঘাত। আশ্চর্য আভায় প্রদীপ্ত হল বাষ্পপুঞ্জ, ঠকাঠক শব্দে শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল ভেলার ওপর। বন্দুক আর যন্ত্রপাতির ধাতুর ওপর শিলাখণ্ড পড়ে ছিটকে গেল স্ফুলিঙ্গর ফুলঝুরি ঝরিয়ে। ফুলে উঠল তরঙ্গরাশি। প্রতিটি ঢেউ যেন এক-একটি ক্ষুদে ভলক্যানো, তাদের ভেতরে আগুনের ডেলা-মাথায় লকলকে অগ্নিশিখা।

আলোর তীব্রতায় চোখ ধাঁধিয়ে গেল আমার, বজ্রপাতের প্রচণ্ড নিনাদে বধির হল কান। ঝড়ের দাপটে হেলে পড়া মাস্তুল আঁকড়ে পড়ে রইলাম আমি ভেলার মধ্যে।

(এইখান থেকে আমি ভাসা ভাসা বর্ণনা দিয়ে গেছি লোমহর্ষক সেই অভিযানের। লিখেছি অর্ধ-অচেতন অবস্থায়। সংক্ষেপে, কখনো এলোমেলো-ভাবে লিখে আমার আবেগকেই প্রকাশ করেছি। লেখার এই ছন্নছাড়া ধরন থেকে সেদিনের বায়ুমণ্ডলের প্রলয়ংকর দৃশ্য খানিকটা অনুমান কবা যাবে।)

রবিবার, আগস্ট ২৩। এলাম কোথায়? অবর্ণনীয় গতিবেগে ভেলাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে ক্যাপা ঝড়।

কাল রাত আতংকের মধ্যে কেটেছে। বিরাম বিহীন ভাবে এখনো বাজ পড়ছে, আওয়াজে কানে তালা লেগে রয়েছে। ঝড় এখনো থামেনি। কানের মধ্যে রক্ত ঝরছে বোধহয়। কেউ কারো সঙ্গে কথা বলতে পারছি না।

মুহূর্তে মুহূর্তে বিদ্যুৎ ঝলসাচ্ছে। নীচে, পাশে, উর্ধ্বে মুহুর্মুহু বিদ্যুৎশিখা লকলকে জিভ মেলে ছুটে যাচ্ছে। গ্র্যানাইট ছাদেও নিশ্চয় ধাক্কা মারছে। ছাদ ভেঙে পড়বে না তো?

চলেছি কোথায়? কাকা তো ভেলার সামনের দিকে চিৎপাত হয়ে পড়ে আছেন।

গরম বাড়ছে। থার্মোমিটার দেখলাম। এখন……ডিগ্রী (কত ডিগ্রী তা বোঝা যাচ্ছে না)।

সোমবার, আগস্ট ২৪। এর কি শেষ নেই? ঘন বায়ুমণ্ডলে আর কি পরিবর্তন আসবে না?

আমাদের দম ফুরিয়েছে, শক্তি ফুরিয়েছে। হান্স আগের মত প্রস্তরবৎ বসে রয়েছে। ভেলা দক্ষিণ-পশ্চিমে ছুটে চলেছে এখনো। অ্যাকজেল দ্বীপ থেকে ৫০০ মাইল পথ পাড়ি দিয়েছি।

দুপুর নাগাদ বৃদ্ধি পেল ঝড়ের তেজ। ভেলার সঙ্গে মালপত্র বেঁধে রাখলাম দড়ি দিয়ে। নিজেদেরও বাঁধলাম। মাথার ওপর দিয়ে যাচ্ছে ঢেউয়ের পর ঢেউ।

তিন দিন হল কেউ কারো সঙ্গে কথা বলতে পারিনি। হাঁ করলাম, ঠোঁট নাড়লাম, কিন্তু কেউ কারও কথা শুনতে পেল না। এমন কি পরস্পরের কানের কাছে মুখ নিয়ে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করেও কারও কথা কাউকে শোনানো গেল না।

কাকা গড়িয়ে এলেন আমার কাছে। কি যেন বললেন। ঠোঁট নাড়া দেখে মনে হল উনি বলতে চাইছেন—"আমরা মরতে চলেছি।"

আমি খাতায় লিখলাম—"পালটা নামিয়ে ফেলা যাক।" লেখাটা ওঁর উদ্দেশেই লেখা। উনি দেখলেন। ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন।

উনি হাত তুলেছেন কি তোলেন নি, এমন সময়ে আচম্বিতে কোত্থেকে একটা আগুনের বল এসে পড়ল ভেলার ওপর। নিমেষ মধ্যে অদৃশ্য হল মাস্তুল আর পাল। দেখলাম, বহু উঁচু দিয়ে তারা উড়ে যাচ্ছে কদাকার টেরোড্যাকটিলের মত। প্রাগৈতিহাসিক যুগের উড়ন্ত বিভীষিকা টেরোড্যাকটিল পাখীর মত সাঁ-সাঁ করে পাল আর মাস্তুল কোথায় যেন মিলিয়ে গেল সেকেণ্ডের মধ্যে।

ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেছি আমরা। পক্ষাঘাতগ্রস্ত রুগীর মত অবশ সর্বাঙ্গ। আগুনের বর্তুলটার অর্ধেক সাদা রঙের, বাকী অর্ধেক নীল রঙের। দশ-ইঞ্চি কামানের গোলার সাইজ। ধীরে ধীরে ভেলার ওপর সরে সরে যাচ্ছে অগ্নি-গোলক। আস্তে আস্তে সরছে বটে, কিন্তু বন্ বন্ করে ঘুরছে বিস্ময়কর-গতিতে—ঝড়ের দাপটে আবর্তন গতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভাসতে ভাসতে কোনো কিছুর ওপর ভর না দিয়ে লাফিয়ে গিয়ে পড়ছে খাবার দাবারের থলিতে। সেখান থেকে আলতোভাবে লাফিয়ে নেমে নাচতে নাচতে গিয়ে ঠেকল বারুদের টিনে। মুহূর্তের জন্যে মনে হল—এই শেষ। বিপুল বিস্ফোরণে এই বুঝি রেণু রেণু হলাম আমরা। কিন্তু সে কী ভয়ংকর উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে

কাটল একটি সেকেণ্ড—পরমুহূর্তেই অত্যুজ্জ্বল গোলকটা গড়িয়ে গেল হ্যান্সের দিকে। হ্যান্স নিমেষহীন চোখে কেবল চেয়ে রইল সেদিকে। গোলক গড়িয়ে গেল কাকার কাছে। কাকা হাঁটু গেড়ে বসে এড়িয়ে গেলেন তার ছোঁয়া। আর আমি? আমার পায়ের কাছে গনগনে বলটা বন্ বন্ করে ঘুরে দুলতে লাগল, আঁচ লাগল পায়ের পাতায়, পা সরিয়ে নিতে গেলাম—পারলাম না। ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হয়ে গিয়ে ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইলাম বর্ণনার অতীত সেই উত্তপ্ত দীপ্তির পানে।

বাতাসে যেন নাইট্রাস গ্যাস ভাসছে। তীব্র গন্ধ নাকে আসছে। গ্যাস ফুসফুসে ঢুকছে। দম আটকে আসছে।

পা নড়াতে পারছি না কেন? ভেলার সঙ্গে পা কি পেরেক দিয়ে এঁটে দিয়েছে কেউ? তারপরেই পরিষ্কার হল রহস্যটা। ইলেকট্রিক অগ্নিগোলক চুম্বক বানিয়ে দিয়েছে ভেলার যাবতীয় লোহাকে। হাতুড়ি, গাঁইতি, যন্ত্রপাতি, বন্দুক রাইফেল—সবকিছুই চুম্বকের টানে পরস্পরের ওপর ঠনাঠন শব্দে আটকে যাচ্ছে। কাঠের গায়ে একটা লোহার পাত লাগানো ছিল। আমার বুট জুতোর পেরেক আটকে গিয়েছে সেই পাতটার সঙ্গে।

বন্ বন্ করে লাট্টুর মত পাক খেতে খেতে অগ্নিগোলক আমার পায়ের ওপর এসে আমাকে শুদ্ধ ছাই করে দেওয়ার পূর্বমুহূর্তে হ্যাঁচকা টান মারলাম পায়ে। লোহার পাত থেকে খুলে এল জুতো।

তীব্র আলোকবন্যা চোখ ধাঁধিয়ে গেল ঠিক সেই মুহূর্তে। আচম্বিতে অসংখ্য লেলিহান শিখা দানবিক সর্পের মত জিভ মেলে দিল আমাদের সর্বাঙ্গে। আগুনের বলটা আচম্বিতে ফেটে গিয়ে আগুন ছড়িয়ে দিল দিকে দিকে।

পরমুহূর্তেই অন্ধকার নামল চোখের পাতায়। জ্ঞান হারানোর আগে দেখলাম কাকাকে টলতে টলতে ভেলার ওপর দাঁড়িয়ে উঠতে। আর হ্যান্স হাল ধরে তেমনিভাবেই বসে থু-থু করে আগুন ছিটোতে লাগল মুখ দিয়ে। আসলে তড়িৎ প্রবাহে নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে হ্যান্সের সর্বাঙ্গ।

চলেছি কোথায়? যাচ্ছি কোথায়?

মঙ্গলবার, আগস্ট ২৫। দীর্ঘকাল অজ্ঞান থাকার পর জ্ঞান ফিরল এইমাত্র। ঝড় এখন গোঁ-গোঁ করে ফুঁসছে দিকবিদিকে। বিদ্যুতের লকলকে জিভ আশেপাশে ডাইনে বাঁয়ে মুহুর্মুহু ঝলসে উঠছে। যেন এক দঙ্গল সাপ ছাড়া পেয়েছে আকাশে বাতাসে। তড়িৎ-জিহ্বা দিয়ে তারা রুদ্রলীলায় প্রমত্ত।

এখনো কি সমুদ্রে ভাসছি? হ্যাঁ, শুধু ভাসছি না, হিসেবে আনা যায় না এমনি গতিবেগে বন্দুকের গুলির মত জল কেটে ছুটে চলেছি। মাথার ওপর দিয়ে উধাও হল ইংলণ্ড, ইংলিশ চ্যানেল, ফ্রান্স, হয়ত গোটা ইউরোপটাই।

নতুন একটা শব্দ শুনছি! পাথরের কঠিন বুকে মাথা কুটে মরছে সমুদ্রের ঢেউ! হ্যাঁ…ঢেউ ভেঙে পড়ার শব্দই বটে! কিন্তু…

৩৫॥ মানসিক ধাক্কা

দ্রুত লিখন এইখানেই ফুরিয়েছে। ভেলা ডুবি হয়ে আমরা মরিনি।

পাথরের ওপর কক্ষচ্যুত উল্কার মত আছড়ে পড়েছিল ভেলা। তারপর কি হয়েছিল, মনে নেই। শূন্য পথে আমার দেহটা ছিটকে গিয়ে চোরাপাহাড়ে লেগে টুকরো টুকরো হওয়ার আগে হ্যান্স ওর বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে আমাকে বেঁধে ফেলেছিল। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে আমাকে বাঁচিয়েছিল।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখলাম, হ্যান্স আমাকে জল থেকে তুলে এনে বালির ওপর শুইয়ে রেখেছে। আমার পাশেই চিৎপটাং হয়ে পড়ে আছেন আমার কাকা!

হ্যান্স নিজের কিন্তু বিশ্রাম নেই। আশ্চর্য মানুষ বটে! ফুঁসে ওঠা ঢেউয়ের মধ্যে একা নেমে গেছে। ভেলার ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করেছে। আমাদের মালপত্র টেনে টেনে এনে বালিতে তুলেছে। আমি দেখলাম ওর অমানুষিক লড়াই… ঢেউয়ের সঙ্গে হাতাহাতি · নিজে কিন্তু একটা আঙুল তুলতে পারলাম না—কথাও বলতে পারলাম না। শক্তির শেষ বিন্দুটুকুও নিংড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল শরীর থেকে। ঝাড়া একটি ঘণ্টা লাগল এই অবস্থা কাটিয়ে উঠতে।

বৃষ্টি যেন এবার জলপ্রপাতের আকারে হুড়হুড় করে ঝরছে আকাশ থেকে। মহাপ্লাবনের বৃষ্টি বুঝি এমনিভাবেই হয়। মাথার ওপর কতকগুলি পাথর কানিশের আকারে ঠেলে বেরিয়ে এসে আড়াল করে রেখেছিল আমাদের। বৃষ্টির জল তাই গায়ে লাগল না। হ্যান্স খাবার তৈরী করছে দেখলাম। আমি কিন্তু খেতে পারলাম না। দুঃস্বপ্নময় তিন রাত্রি জাগরণের পর তিনজনেই তখন ঘুমোতে পারলে বাঁচি। খাওয়া পড়ে রইল। ঘুমিয়ে কাদা হলাম খাবার সামনে রেখে।

পরের দিন ফের ঝলমলে আবহাওয়া দেখা দিল আকাশে বাতাসে। একসঙ্গে চুক্তি করে যেন শান্ত হয়েছে আকাশ আর সমুদ্র। অদৃশ্য হয়েছে প্রলয়ংকর ঝড়। কাকার প্রফুল্ল কণ্ঠের ডাকে ঘুম ভাঙল আমার। আনন্দে যেন নাচছেন তিনি।

"কী বাবা? ঘুমোলে কেমন?"

"ভালই," বললাম আমি। "গায়ের ব্যথা মরতে আরো দু'একদিন যাবে। কিন্তু আপনি তো দেখছি বেশ খুশী, কাকা?"

"খুশী কি বাবা? বলো উল্লসিত। ভীষণ উল্লসিত। সীমাহীন মনে হয়েছিল যে সমুদ্রকে, আমরা তার অপর পারে পৌঁছেছি। আর কী? পৃথিবীর কেন্দ্রে পৌঁছোনোর অভিযান ফের শুরু হল বলে!"

"ফেরার কি হবে?"

"ফেরা? পৌঁছোনোর আগেই ফেরার কথা ভাবছ কি করে?"

"তা নয়। ফিরব কি করে, আমি তাই ভাবছিলাম।"

"সোজা পথেই ফিরব'খন। আগে পৌঁছোই ভূকেন্দ্রে, সেখান থেকে ভূপৃষ্ঠে ফেরার সিধে সড়ক পাবই পাব। না পাই, যে পথে যাচ্ছি, সেই পথেই ফেরা যাবে'খন। এ-পথ তো আর বন্ধ হচ্ছে না।"

"তাহলে তো ভেলাটা মেরামত করা দরকার।"

"তা তো বটেই।"

"কিন্তু অভিযান চালানোর মত খাবার দাবার যথেষ্ট আছে কী?"

"আমার তো মনে হয় আছে। হ্যান্স বড় কাজের লোক। নিশ্চয় সব মালপত্র উদ্ধার করেছে। চলো, দেখে আসা যাক।"

পর্বত-গহ্বর ছেড়ে রওনা হলাম কাকা ভাইপো।

তীরে পৌঁছে দেখি রাশি রাশি মালপত্র চারধারে সাজিয়ে মাঝখানে চুপ করে বসে আছে হ্যান্স। অতিমানুষ না হলে এ-কাজ কি সম্ভব? আমরা যখন ঘুমিয়ে কাদা, সে-তখন মালপত্র রসদ উদ্ধারে ব্যস্ত। জীবন পণ করে প্রায় সবই উদ্ধার করেছে হ্যান্স। কাকা করমর্দন করলেন ওর সাথে—নিঃসীম কৃতজ্ঞতায় ভাবারুদ্ধ হল তাঁর কণ্ঠ।

ক্ষতি কিছু হয়েছে বইকি। উদাহরণ স্বরূপ, বন্দুকগুলো খোয়া গেছে। কিন্তু অভিযানের শেষ পর্বে বন্দুকের দরকার নাও হতে পারে। বারুদের টিনটা অটুট রয়েছে। ম্যানোমিটার, কম্পাস, ক্রোনোমিটার, থার্মোমিটার জল থেকে তুলে এনেছে হ্যান্স। দড়ির মই, দড়ির বাণ্ডিল, গাঁইতিও দেখলাম সাজানো রয়েছে বালির ওপর। খাবার দাবারের বাক্সে জল ঢোকেনি। শুঁটকি মাছ, মাংস, জিন বিস্তর আছে। মাস চারেক স্বচ্ছন্দে চলে যাবে।

"চার মাস!" সোল্লাসে বললেন কাকা। "আরে বাবা! চার মাসে তো যাতায়াত হয়ে যাবে। বাড়ী গিয়েও যা খাবার বেঁচে যাবে, তা দিয়ে জোহান্নিয়ামের বন্ধুদের ভূড়ি ভোজে আপ্যায়ন করা যাবে!"

কাকা যে কি ধাতু দিয়ে গড়া, তা কি আমি জানি না। তবুও তাঁর সেই কথা শুনে আক্কেল গুড়ুম হয়ে গিয়েছিল সেদিন।

"চল। প্রাতরাশ খেয়ে নেওয়া যাক," বললেন কাকা।

গিয়ে দেখি, হান্স প্রফেসরের ফরমাস মত নানা রকম খাবার সাজিয়ে বসে আছে। শুকনো মাংস, বিস্কুট আর চা সহযোগে সেদিন যে খানা খেলাম, তার চেয়ে ভাল খানা জীবনে আর খাইনি। ক্ষিদে, টাটকা বাতাস, গত কয়েক-দিনের অস্বাভাবিক উত্তেজনার পর শান্তি ফিরে পাওয়া—এই সব মিলে আমার উদরে যেন দাবানল জ্বালিয়ে ছেড়েছিল। সুতরাং, খাওয়াটা জমল ভাল।

খেতে খেতে কাকাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমরা এখন কোথায়?

বললাম—"দূরত্বটা হিসেব করা আর সম্ভব নয় বলেই মনে হচ্ছে।"

কাকা বললেন—"তা যা বলেছো। সঠিক বলা মুস্কিল। কেন না, তিন দিনের ঝড়ে ভেলা কোন দিকে কত গতিবেগে ছুটেছিল, সে-হিসেব রাখতে পারি নি। তবে, আন্দাজে একটা মোটামুটি হিসেব খাড়া করা যায়।"

"শেষ হিসেবটা করেছিলাম গরম জলের সেই ফোয়ারা দ্বীপে··· !"

"ফোয়ারা দ্বীপ না বলে বলো অ্যাকজেল দ্বীপ। পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রথম দ্বীপ আবিষ্কারের গৌরবটা তোমার নামেই ইতিহাসের পাতায় যখন উঠে গেল, তখন·· ··· !"

"বেশ, অ্যাকজেল দ্বীপে গিয়ে আমরা হিসেব কষে দেখেছিলাম সমুদ্র পথে ৬৭৫ মাইল আর আইসল্যাণ্ড থেকে ১৫০০ মাইল এসেছি।"

"গুড। হিসেবটা সেইখান থেকেই ফের শুরু করা যাক। ঝড়ের মধ্যে কেটেছে চারটে দিন। প্রতিদিন আন্দাজ ২৮০ মাইল পথ পাড়ি দিয়েছি।"

"তার মানে ৮০০ মাইল যোগ করুন।"

"তাহলে লিডেনব্রক সাগরের বিস্তার হল ১৫০০ মাইল! অর্থাৎ, ভূমধ্যসাগরের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার ক্ষমতা রাখে লিডেনব্রক সাগর!"

"আরেকটা অদ্ভুত কাণ্ড হল," বললাম আমি, "আমাদের হিসেব নির্ভুল হলে ভূমধ্যসাগর কিন্তু এখন ঠিক মাথার ওপর।"

"সত্যি?"

"রিকজাভিক থেকে আমরা যে ২,২৫০ মাইল পথ চলে এসেছি।"

"বাবা অ্যাকজেল, ভূমধ্যসাগরের তলায় আছি কি তুর্কী অথবা আটলান্টিকের তলায় আছি, তা সঠিক বলা যাবেনা শুধু একটা বিষয় না জানা পর্যন্ত। তা হল, আমরা যেদিকে যাচ্ছিলাম, সেইদিকেই গিয়েছি, না দিক পালটেছি।"

"বাতাস একই দিকে ঠেলে নিয়ে গেছে ভেলাকে। কাজেই আমরা এখন রয়েছি গ্রোবেন বন্দরের দক্ষিণ-পূব দিকে।"

"কম্পাস দেখলেই ল্যাটা চুকে যায়।" বলে আনন্দে হনহন করে কম্পাস দেখতে ছুটলেন কাকা। খুশীর চোটে তিনি যেন হঠাৎ ছোকরা বনে গেছেন—লম্বা লম্বা পা ফেলছেন, দুহাত ঘসছেন, ফুর্তি উপচে পড়ছে চোখে মুখে। আমি রইলাম পেছনে।

একটা পাহাড়ে যন্ত্রপাতি সাজিয়ে বসেছিল হান্স। কম্পাসটা নিয়ে কাঁটা দেখলেন কাকা। দুলতে দুলতে একদিকে স্থির হয়ে গেল কাঁটা।

চোখ রগড়ে ফের তাকালেন কাকা। তারপর হতভম্ব মুখে ফিরলেন আমার পানে।

"কি ব্যাপার বলুন তো?" শুধোলাম আমি।

নীরবে আঙুল তুলে দেখালেন উনি। দেখেই আমি চেঁচিয়ে উঠলাম অবাক কণ্ঠে। একী কাণ্ড! কম্পাসের উত্তর মুখো কাঁটা ঘুরে গেছে দক্ষিণ দিকে। কাঁটার মুখ স্থল ভাগের দিকে—সমুদ্রের দিকে নয়!

ঝাঁকিয়ে নিয়ে ফের ফের কম্পাস দেখলাম। না যন্ত্র বিগড়োয় নি! ভালই আছে। কিন্তু কাঁটাটা উত্তর মুখো না হয়ে কাঠ গোঁয়ারের মত দক্ষিণ মুখো হয়ে আছে।

আর কোনো সন্দেহ নেই। চারদিনের তুমুল ঝড়ে নিশ্চয় দিক পরিবর্তন করেছিল পাগলা হাওয়া। আমরা বুঝতে পারিনি। হাওয়ার টানে ভেলা ফিরে এসেছে যেখান থেকে রওনা হয়েছিলাম সেই উপকূলেই—গ্রোবিন বন্দরের ধারে কাছে!

৬৩॥ মানুষের মাথার খুলি

প্রফেসর লিডেনব্রকের মুখের ওপর দিয়ে পর-পর যে-সব ভাবের খেলা দেখা গেল, তা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। হতবুদ্ধি, অবিশ্বাস, সবশেষে ক্রোধ। এই রকম হতভম্ব এবং পরে অগ্নিশর্মা হতে আমি কোনো মানুষকে কোনোদিন দেখিনি। আবার নতুন করে সমুদ্র পেরোতে হবে, বিপদের মুখে পা বাড়তে হবে, পুনরাবৃত্তি ঘটবে প্রতিটি দিনের দুঃসহ কষ্টের।

কিন্তু আমার কাকার ধাতই আলাদা! চকিতে সামলে নিলেন নিজেকে।

তারস্বরে বললেন—"বটে! নিয়তি ল্যাজে খেলছে আমাকে নিয়ে! বাতাস, আগুন, জল দল বেঁধে পথ আটকাচ্ছে আমার—ষড়যন্ত্র করে পণ্ড

করতে চায় আমার অভিযানকে! ঠিক আছে, আমার মনের জোর যে কতখানি, তা ওদের বুঝিয়ে ছাড়ব! এক পা-ও পিছু হটব না, হাল ছাড়ব না! দেখা যাক, মানুষ জেতে কি প্রকৃতি জেতে!"

অ্যাজাক্স যে-ভাবে দেবতাদের নস্তি জ্ঞান করেছিলেন, তাদের তোয়াক্কা রাখেন নি, ঠিক সেই ভাবেই যেন অটো লিডেনব্রক পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে হুমকি দিতে লাগলেন প্রাকৃতিক শক্তি সমূহের অধিদেবতাদের। আমার কিন্তু এত বাড়াবাড়ি ভাল মনে হল না। কাকাকে একটু রুখে দেওয়া দরকার মনে করলাম। এত লম্ফঝম্প ভাল নয়।

শক্তগলায় বললাম—"কাকা, অনেক উচ্চাশা শেষ পর্যন্ত দুরাশাই থেকে যায় এ-সংসারে। অসম্ভবকে সম্ভব করার সাধ্য মানুষের নেই। আমাদের অবস্থা হয়েছে ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দারের মত। কতকগুলো পচা কাঠের গুঁড়িকে দড়ি দিয়ে বেঁধে হাজার মাইল সমুদ্র পেরোনোর প্রতিজ্ঞা বাতুলতা ছাড়া কিছুই নয়। হাওয়ার খেয়াল খুশীর ওপর নির্ভর করে কম্বল দিয়ে পাল খাটিয়ে, লাঠি দিয়ে মাস্তুল বানিয়ে সমুদ্র যাত্রা করা যায় না। যে ভেলাকে দাঁড় টেনে চালানো যায় না, ঝড় উঠলে যে ডুবু-ডুবু হয়, তাকে অবলম্বন করে অসম্ভবকে সম্ভব করা যায় না। একবার সাহস করা গিয়েছে, আক্কেলও হয়েছে যথেষ্ট। দ্বিতীয়বার আর না। ন্যাড়া কখনো দুবার বেলতলায় যায় না।"

ঝাড়া দশ মিনিট ধরে একনাগাড়ে আমার যুক্তিগুলো মেলে ধরলাম কাকার সামনে। কিন্তু উনি আমার কোনো কথাই কানে তুললেন না। আমার দিকে চেয়েও দেখলাম না।

শুধু বললেন—"ভেলায় চলো!"

এ-ছাড়া আর কোনো জবাব নেই তাঁর। বৃথাই আমি যুক্তি দেখলাম, অনুনয় বিনয় করলাম, মেজাজ খারাপ করলাম। গ্র্যানাইট পাথরের দেওয়ালে লেগে যেন ঠিকরে গেল আমার সব প্রচেষ্টা। সত্যিই, পাথর-কঠিন জেদ তাঁর।

কাকার মনোভাব আঁচ করেই যেন হান্স নামক অদ্ভুত জীবটি এই ফাঁকে মেরামত করে ফেলেছিল ভাঙা ভেলাটা। নতুন কয়েকটা সার্টার ব্র্যাণ্ড কাঠ দিয়ে মজবুত করে নিয়েছিল পাটাতন, আর একটা কাঠের মাস্তুল বানিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছিল কম্বলের পাল।

কাকা সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিলেন, কি করতে হবে হান্সকে। সে-ও রামভক্ত হনুমানের মত তৎক্ষণাৎ জিনিসপত্র সাজিয়ে ফেলল ভেলার ওপর। হাওয়ায় পাল ফুলে ফুলে উঠছে। এখন বেরিয়ে পড়লেই হয়।

আমি নিরুপায়, একেবারে নিরুপায়। আইসল্যাণ্ডদ্বীপবাসী গাইডটিও যদি আমার দলে আসত, কাকার মনোবল ভেঙে দেওয়া যেত। কিন্তু মনিব বলতে সে অজ্ঞান! ক্রীতদাসের মতই তার প্রভুভক্তি।

ধুত্তোর! ভেলায় উঠতে যাচ্ছি, এমন সময়ে আমার কাঁধে কাকার হাত পড়ল।

বললেন—"এখন নয়, কাল রওনা হব আমরা।"

পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে—এইরকম একটা ভাব করে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি!

কাকা বললেন—"ভাগ্য যখন এখানে টেনে এনেছে আমাদের, তখন এখানকার সবকিছু না দেখে আমি নড়ছি না।"

তাতো বটেই! মনে মনে ভাবলাম আমি। পোর্ট গ্রোবেন এখান থেকে নিশ্চয় বহু পশ্চিমে। সুতরাং এ-তল্লাটটা তন্নতন্ন করে দেখার দরকার আছে বইকি।

"চলুন তাহলে বেরিয়ে পড়ি!" বললাম আমি।

লিডেনব্রক সমুদ্রের সৈকত বরাবর মাইল খানেক হাঁটবার পর অকস্মাৎ পায়ের তলায় জমির চেহারা পালটে গেল। মাটির তলায় শিলাস্তর যেন দুমড়ে, কেঁপে, ঢেউ খেলে গেছে, সাংঘাতিক রকমের ওলট পালট কিছু ঘটেছে যেন নীচে মাটির তলায়। বহু জায়গায় পাহাড় সরে গিয়ে বিরাট খাদ বেরিয়ে পড়েছে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গ্র্যানাইট, চকমকি পাথর, শিলাস্ফটিক আর পলিমাটির পুরু স্তরের ওপর দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ এমন একটা অঞ্চলে এসে পড়লাম যেখানে পর্বতপ্রমাণ হাড়গোর পড়ে আছে খোলা হাওয়ায়। এ-যেন একটা প্রকাণ্ড কবরখানা। দু হাজার মানব সভ্যতাকে গোর দেওয়া হয়েছে সেখানে। অস্থিস্তূপ সারি বেঁধে বিস্তৃত দূর দিগন্ত পর্যন্ত। দিগন্তরেখায় কুয়াশার মত দেখা যাচ্ছে কেবল হাড়ের পাহাড। প্রায় তিন বর্গ মাইল অঞ্চল জুড়ে বিধৃত রয়েছে প্রাণী জগতের সমগ্র ইতিহাস।

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম ভ্যাবা গঙ্গারামের মত। আকাশ বলতে যা বোঝাচ্ছে, সুবিশাল সেই খিলেনের দিকে লম্বা লম্বা হাত তুলে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলেন আমার খুড়া মহাশয়। চশমার আড়ালে চকচক করতে লাগল বিস্ফারিত দুই চক্ষু, মুণ্ড দুলতে লাগল ওপর-নীচে। মানুষ যখন আচমকা দারুণ ভড়কে যায়, পিলে চমকে ওঠে এবং বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়ে—এই রকমই হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায় তার মূর্তি। প্রফেসরের ছানাবড়া চক্ষুর সামনে থরে থরে সাজানো মূল্যহীন সম্পদ। লেপথোথেরিয়া, মেরিকোথেরিয়া,

লোফিওডিয়া, অ্যানোপ্লোথেরিয়া, মেগাথেরিয়া, ম্যাসটোডন্স, প্রোটোপিথেসিয়া, টেরোড্যাক্টিল এবং আরো অনেক অ্যান্টিডিলুভিয়ান দৈত্য পর্বতাকারে জড়ো করা অবর্ণনীয় সেই গোরস্থানে। আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত গ্রন্থাগার ওমর পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছিলেন। আচম্বিতে যদি কোনো গ্রন্থকীটের সামনে ছাইয়ের মধ্যে থেকে নতুন করে গজিয়ে ওঠে গোটা গ্রন্থাগারটা, তখন তার যা মনের অবস্থা হয়—প্রফেসর লিডেনব্রকের অবস্থাও হল তাই।

কিন্তু তাঁর সব বিস্ময়কে ছাপিয়ে উঠল আরেকটা বিস্ময়। প্রাগৈতিহাসিক কবরখানার ধূলোয় পা ডুবিয়ে ক্ষিপ্তের মত এদিক-সেদিক দৌড়োতে দৌড়োতে হঠাৎ একটা নরকরোটি তুলে ধরলেন তিনি। পরক্ষণেই চেঁচিয়ে উঠলেন চিলের মত :

"অ্যাকজেল! অ্যাকজেল! মানুষের মাথা!"

"মানুষের মাথা?" উজবুকের মত তাকিয়ে রইলাম আমি।

"হ্যাঁ, বাবা। মানুষের মাথা!"

মানুষের মাথাই বটে। কোয়াটারনারি মানব—এক পলকেই চেনা যায়। অজ্ঞাত উপায়ে বহু শতাব্দী পার করে এসেও অবিকৃত থেকে গেছে মাথাটা। বিশেষ ধরনের মাটির গুণ হতে পারে। বোর্দোর সেন্ট মাইকেলের গোরস্থানে এমনি ঘটনার নজীর আছে। সঠিক কারণটা আমার জানা নেই। শুধু দেখলাম দেহ সমেত মাথাটা যেন সজীব। পার্চমেন্টের মত খসখসে এঁটে থাকা চামড়া, হাতে পায়ের মাংসের স্তর, দাঁতের সারি, ঝাঁকরা চুল, হাত-পায়ের ভয়ংকর লম্বা নখ—সবকিছুই যে জীবিত প্রাণীর মধ্যেই দেখা যায়!

ভিন্ যুগ থেকে আবির্ভূত প্রেতমূর্তির দিকে চেয়ে রইলাম বোবা হয়ে। কাকা, যিনি বকবক করতে না পারলে সুস্থ থাকেন না, তিনিও কথা বলতে ভুলে গেলেন। নামী ভূতত্ত্ববিদরা কোয়াটারনারি মানবের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন। অন্যান্য নামী বৈজ্ঞানিকরা কিন্তু মেনে নিয়েছেন। কিন্তু আমাদের চোখের সামনে প্রমাণ পেলাম কোয়াটারনারি মানবের—কোয়াটারনারি যুগের জীবজগতে মানুষও যে-এসেছিল—এই তো তার চাক্ষুস প্রমাণ! দেহটা সযত্নে তুলে নিয়ে পাথরের গায়ে দাঁড় করিয়ে রাখলাম।

প্রমাণ আরো পেলাম। দিগন্ত বিস্তৃত কবরখানায় শিলীভূত কোয়াটারনারি মানব আরও রয়েছে। প্রতিপদে হোঁচট খেতে লাগলাম তাদের ওপর।

আশ্চর্য দৃশ্য! বিগত যুগের জানোয়ার আর মানুষ পাশাপাশি শুয়ে আছে এক গোরস্থানে। তারপরেই গুরুতর প্রশ্ন উঁকি দিল মনের মধ্যে। জবাব দেবার মত বুকের পাটা দেখা গেল না কারোরই। ভূ-স্তরের কোনো ফাটল

দিয়ে কোয়াটারনারি মানবরা মৃত অবস্থায় পাতাল রাজ্যে এসে পড়েনি তো ? তা যদি না হয়, তাহলে ধরে নিতে হবে অন্যান্য প্রাগৈতিহাসিক দানবদের মত কোয়াটারনারি মানবরাও অদ্ভুত এই দুনিয়ায় জন্মেছে, বড় হয়েছে, মারা গেছে। নকল আকাশের নীচে পাতাল-পৃথিবীতে যুগ যুগ ধরে অব্যাহত রয়েছে তাদের জীবন ধারা। দুটি ভয়াবহ প্রাণীর দেখা পেয়েছি লিডেনব্রক সাগরে, নির্জন এই স্থলভাগে তাদের সমসাময়িক দু পেয়ে কোয়াটারনারি মানবরা বিচরণ করছে না তো ?

৩৭॥ জীবন্ত মানব

উদগ্র কৌতূহল নিয়ে হাড়গোর মাড়িয়ে হাঁটলাম আরও আধঘণ্টা। ভূ-গর্ভের এই আশ্চয গহ্বরে এমনি আরো বিস্ময় জমা আছে নাকি ? বিজ্ঞানকে উপহার দেওয়ার মত আরো কিছু নতুন সম্পদ পাওয়া যাবে কী ?

এক মাইল হাঁটবার পর পৌঁছোলাম একটা জঙ্গলের প্রান্তে। এ-জঙ্গল কিন্তু ব্যাঙের ছাতার জঙ্গল নয়। ছত্রাক-অরণ্য দেখেছিলাম গ্রোবিন বন্দরে। কিন্তু এখানে দেখলাম অন্য দৃশ্য।

টারসিয়ারি যুগের জমকালো উদ্ভিদে ছেয়ে আছে অরণ্য অঞ্চল। তালঢ্যাঙা তালগাছ অনেক দেখেছি, কিন্তু বিশেষ শ্রেণীর এ-গাছ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে ভূ পৃষ্ঠ থেকে। নয়ন মনোহর পালমাসাইট, পাইন, যুজ, সাইপ্রেস— অর্থাৎ মোচার মত গড়ন বিশিষ্ট কণিফার গোষ্ঠীভুক্ত প্রায় সব গাছই হাজির দেখলাম সেখানে। গাছগুলোকে আস্টে পৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে জটিল লতাজাল। পায়ের তলায় মস আর হেপাটিকার কার্পেট। ঝিরঝিরে জলের ধারা বয়ে চলেছে গাছের তলা দিয়ে। ছায়া নেই গাছের, নইলে বৃদ্ধি পেত অরণ্য শোভা। জলধারার দু তীরে গজিয়েছে বিস্তর ফার্ন। ওপরের পৃথিবীর পাদপ শ্রেণীর সঙ্গে এদের প্রভেদ শুধু এক জায়গায়। রঙের সমারোহ দেখা যায় ভূ-পৃষ্ঠের গাছপালায়। সূর্যরশ্মির কৃপায় সবুজ রঙ তো উথলে ওঠে উদ্ভিদ সাম্রাজ্যে। কিন্তু ভূ-গর্ভে এই অরণ্যের গাছপালাগুলি সূর্যপ্রসাদ বঞ্চিত হওয়ায় রঙের খেলা দেখাতে অপারগ। রঙ বলে কিছু নেই এদের পাতায়, ঝোপে, মহীরুহে। একঘেয়ে বিবর্ণ বাদামী রঙ যেন একচেটিয়া আসন পেতেছে ভূগর্ভ-অরণ্যে। সবুজের বালাই নেই। ফুলের গন্ধ নেই, বর্ণও নেই। দেখে মনে হয় যেন কাগজের ফুল।

কাকা হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লেন জঙ্গলে। পেছনে আমি। আমি কিন্তু

ভয়ে কাঁটা হয়ে রইলাম সর্বক্ষণ। উদ্ভিদ রাজ্যের নিরামিষ খাদ্যের লোভে ভয়ংকর স্তন্যপায়ী প্রাণীরা হানা দেবে না তো?

হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলাম, কাকাকে চেপে ধরলাম পেছন থেকে।

মোলায়েম আলোয় অরণ্য প্রদেশ ছেয়ে থাকায় ঘন ঝোপের তুচ্ছতম বস্তুগুলোও ঠাহর করতে পারছিলাম স্পষ্টভাবে। মনে হল…না, না, মনে হল না—স্পষ্ট দেখলাম, নিজের চোখে দেখলাম, গাছপালার নীচে নড়ছে কতকগুলো অতিকায় বপু।

১৮০১ সালে ওহিওর বাদায় কতকগুলো অতিকায় অস্থি পাওয়া গিয়েছিল। মহীরুহের তলায় যাদের বিচরণ করতে দেখলাম, তারা কিন্তু ওহিওর হাড়ের মত শিলীভূত কংকাল নয়—সজীব প্রাণী, দানব জন্তু। একটা দুটো নয়, দলে দলে ঘুরছে তারা গাছের তলায়। অজগর সাপের মত বিশাল শুঁড় দুমড়ে নেড়ে ডালপালা ভেঙে খেতে দেখলাম প্রকাণ্ড হাতীদের। মস্ত দাঁত দিয়ে গাছের গুঁড়ি ভাঙার আওয়াজ পেলাম। মড় মড় শব্দে ডালপালা ভেঙে পড়ছে দেখলাম এবং পর্বত প্রমাণ পাতাকে অদৃশ্য হতে দেখলাম দৈত্যগুলোর মুখ গহ্বরে।

সর্বনাশ! টারসিয়ারি আর কোয়াটাবনারি যুগের যে দুঃস্বপ্ন আমি দেখেছিলাম, তা তাহলে সত্যি হল! পৃথিবীর উদরে আমরা সহায় সম্বল হীন, একেবারে একা—আয়ু নির্ভর করছে বিপুলকায় বাসিন্দাদের করুণার ওপর!

বারবার দেখেও কাকার যেন আশ মিটছিল না।

আচমকা আমার হাত খামচে ধরে চীৎকার করে উঠলেন কাকা:

"এগিয়ে চলো! এগিয়ে চলো!"

"না,!" বেঁকে বসলাম আমি। "না! অস্ত্র না নিয়ে ঐ চারপেয়ে দৈত্যদের সামনে যাওয়া আত্মহত্যার নামান্তর মাত্র। কাকা, পালিয়ে আসুন! ওরা খেপে গেলে মানুষের সাধ্য নেই ওদের সামনে দাঁড়ায়!"

"মানুষ!" আচম্বিতে খাটো গলায় বললেন কাকা—"ভুল বললে অ্যাকজেল! মানুষ তো ওদের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। ঐ দ্যাখো! দেখছো? গাছের তলায় দাঁড়িয়ে অবিকল আমাদের মত একটা জীবন্ত জীব —মানুষ!"

অবিশ্বাসী চোখে তাকিয়েছিলাম। কিন্তু নিজের চোখকে বিশ্বাস না করে পারলাম না।

সিকি মাইল দূরে একটা অতিকায় করিস মহীরুহের গুঁড়িতে হেলান

দিয়ে দাঁড়িয়ে মানুষের মতই এক প্রাণী—ভূ-গর্ভের প্রোটিয়াস—নেপচুনের নব সন্তান—মাসটোডন হাতীর বিরাট দলটাকে চোখে চোখে রেখেছে পাতাল—মানব।

রাখালই বটে! হাতীদের চাইতেও মাথায় লম্বা সে। কিছুক্ষণ আগে গোরস্থানে শিলীভূত যে মানব দেখে এলাম, তার মত নয়। হাতীর পালকে চরানোর মত লম্বা চওড়া তার দেহ। মাথায় বারো ফুটেরও বেশী। মুণ্ডটা মোষের মত বড়। না-আঁচড়ানো ঝাঁকড়া চুল দিয়ে ঢাকা মুখের বেশীর ভাগ অংশ—ঠিক যেন সিংহের কেশর। প্রাগৈতিহাসিক হাতীদের এ-রকম কেশর ছিল অবশ্য। রাখালদের মত লাঠি ঘোরাচ্ছে হাতে। লাঠিটা অবশ্য মস্ত গাছের আস্ত একটা শাখা!

চলৎশক্তিহীন হতভম্ব হয়ে দেখছিলাম আমরা। কিন্তু এ-ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা তো আরো বিপজ্জনক। দানব-মানব দেখে ফেলতে পারে আমাদের। সুতরাং চম্পট দিতে হবে এখুনি।

"আসুন! আসুন!" কাকাকে হিড় হিড় করে টানতে টানতে ফিসফিসিয়ে উঠলাম আমি। জীবনে সেই প্রথম কাকা অন্যের কথায় বিনা তর্কে তৎপর হলেন।

মিনিট পনেরর মধ্যেই দানব-শত্রুকে চোখের আড়াল করে ফেললাম।

ঠাণ্ডা মাথায় এখনো আমি ভাবি সেদিনের সেই দৃশ্য। অদ্ভুত, অসাধারণ সেই মোলাকাতের পর বহু মাস অতিবাহিত হয়েছে। আবেগহীনভাবে তাই মাঝে মাঝে ভাবি, যা দেখেছিলাম, তা সত্যই দেখেছিলাম তো? আদৌ কোনো মানব-শরীর দেখেছিলাম কী? না, অসম্ভব! অনুভূতি-ইন্দ্রিয়গুলো সেদিন বেইমানি করেছিল নিশ্চয় আমাদের সঙ্গে। ভূ-পৃষ্ঠের সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে, পৃথিবীর ওপরকার মানবকুলের সঙ্গে কোনোরকম যোগাযোগ না রেখে ভূগর্ভ-দুনিয়ায় মানুষ থাকতেই পারে না—পাতাল-গহ্বরে মানুষ নেই! নেই! নেই! উদ্ভট এ-কল্পনা একমাত্র উন্মাদের মস্তিষ্কেই আসতে পারে!

বরং বিশ্বাস করতে পারি, আমি সেদিন যাকে দেখেছিলাম, সে দুপেয়ে জীব সন্দেহ নেই—কিন্তু মানুষ নয়—বাঁদর গরিলা জাতীয় কোনো আদ্দি-কালের বৃহৎ প্রাণী। ভূপৃষ্ঠ থেকে মানুষের একটা গোটা জাত গড়িয়ে নেমে গেছে ভূগর্ভের দুনিয়ায়—এ-থিওরীও অসম্ভব, অবিশ্বাস্য, হাস্যকর।

উজ্জ্বল আলোকময় জঙ্গল পরিত্যাগ করে আমি ছুটে পালিয়ে এলাম লিডেনব্রক সমুদ্রের দিকে। বিস্ময়ে বোবা হয়ে, অবিশ্বাস্য দৃশ্য দর্শনের

আকস্মিক আঘাতে মুহ্যমান অবস্থায় আমরা দৌড়োলাম। ভীষণ আতংক তাড়িয়ে নিয়ে গেল আমাদের অবশ দেহগুলোকে।

ছুটতে ছুটতে আমার কেন জানি মনে হল, জায়গাটা আমার চেনা। এ-যেন গ্রোবিন বন্দরের পাশের অঞ্চল। এখানকার পাহাড়, জলের ধারা, জলপ্রপাত, জমির চেহারা—সব যে আমার চেনা। এমন কি যে সার্টান ব্র্যাণ্ড দিয়ে ভেলা বানিয়েছে হ্যান্স, তাও চিনতে পারলাম না। 'হ্যান্সবাক' স্রোতস্বিনীকেও যেন অচেনা মনে হল না। আরো একটু এগিয়ে বিশেষ একটা ঝর্না আর পাহাড়ের খাঁজ দেখে সন্দেহটা ঘনীভূত হল।

কাকাকে বললাম আমার মন কি বলছে। উনি নিজেও লক্ষ্য করেছিলেন গ্রোবিন বন্দর অঞ্চলের সঙ্গে এখানকার পাহাড় পর্বত জমি স্রোতস্বিনীর ঐক্য। তবে কিছুতেই মনস্থির করতে পারছিলেন না শুধু একটি কারণে। একই উপকূলে ভূপ্রকৃতির সাদৃশ্য একটু-আধটু থাকবেই।

আমি বললাম—"আমার তো মনে হয় উপকূল বরাবর হাঁটলে যেখান থেকে রওনা হয়েছিলাম, সেইখানেই ফিরে যাবো। পোর্ট গ্রোবিনে পৌঁছে যাবো।"

কাকা বললেন—"তাই যদি হয় তো হাঁটবার দরকারটা কী? ভেলায় চেপে গেলেই তো হয়।"

চকচকে বস্তুটা ঠিক সেই সময়ে চোখে পড়ল আমার। বালির ওপর কি যেন চিকমিক করছে দেখে দৌড়ে গিয়ে তুলে নিলাম আমি।

জিনিসটা একটা ছোরা!

কাকা বললেন—"তোমার ছোরা?"

"মোটেই না। আপনার।"

"আমার? মোটেই না। হ্যান্সের।"

কিন্তু ছোরাটা হ্যান্সেরও নয়।

আমি হকচকিয়ে গিয়ে বললাম—"তাহলে কি বলব এ-ছোরা প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোনো যোদ্ধার? রাখাল-দৈত্যর সমসাময়িক কারও? কিন্তু তা কি করে হয়। এ-জিনিস প্রস্তর যুগে ছিল না, লৌহযুগেও ছিল না। কেন না, স্টীল দিয়ে তৈরী এর ফলা…"

কাকা ঠাণ্ডা গলায় বললেন—"অ্যাকজেল, ষোড়শ শতাব্দীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের কোমরবন্ধনীতে এ ধরনের পনিয়ার্ড ছোরা গোঁজা থাকত। ছোরাটা তোমারও নয়, আমারও নয়, হ্যান্সেরও নয়—এমন কি ভূগর্ভ দুনিয়ায় যাদের নিবাস—সেই দানব-মানবদেরও নয়।"

"তাহলে ?"

"ছোরাটা বেঁকে গেছে। গলা কাটতে গিয়ে নিশ্চয় ফলা বেঁকে না। মর্চেতে ঢেকে গেছে গোটা ফলাটা। এ মর্চে এক-আধ বছরের নয়, একশ বছরের মচে বলেই তো মনে হচ্ছে। অ্যাকজেল, আরেকটা আবিষ্কার হাতের মুঠোয় এল বলে", ভীষণ উত্তেজিত হয়ে বললেন কাকা। "ছোরাটা একশ, দুশ, তিনশ বছর ধরে পড়েছিল বালির ওপর। বালিতে পড়ার আগে ছোরা দিয়ে সমুদ্রের ধারে কোনো পাথরে কিছু কারুকাজ করা হয়েছিল—ফলাটা বেঁকেছে সেই কারণেই।"

লাফিয়ে উঠে বললাম—"ছোরা নিশ্চয় আপনা থেকেই এখানে আসেনি! আপনা থেকেই তার ফলা বেঁকে যায়নি! আমাদের আগে কেউ না কেউ হাজির হয়েছিল এখানে!"

"ঠিক বলেছো। যে এসেছিল, সে পুরুষ।"

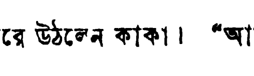
"কে সে ?"

"সে ছোরা দিয়ে পাথরেব গায়ে লিখে গেছে ভূকেন্দ্রে পৌঁছোনের সিধে সড়কের ঠিকানা। খোঁজো সেই ঠিকানা।"

দারুণ উত্তেজিত হয়ে পাহাড়টাব প্রতিটি ফাটল, গর্ত, সুড়ঙ্গ তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগলাম আমরা।

এক জায়গায় তীরভূমি সঙ্কীর্ণ হয়ে গিয়ে পৌঁছেছে জলের ধারে। দুটো পাথর ঠেলে বেরিয়ে এসেছে জলের ওপব। মাঝে একটা অন্ধকারময় সুড়ঙ্গ।

সুড়ঙ্গের প্রবেশ মুখে একটা গ্র্যানাইট পাথরের খোদিত দুটো রহস্যজনক হবফ। ঝড়জলে ক্ষয়ে এসেছে অক্ষর দুটি। এ হরফ সেই দুর্মদ দুঃসাহসী পর্যটকের নামের আদ্যাক্ষর :



"A. S." চীৎকার করে উঠলেন কাকা। "আর্ন সাকনুসেম! আবার আর্ন সাকনুসেম!"

৩৮ ॥ বাধা পেলাম

অভিযানের শুরু থেকে এত বেশী বিস্ময়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে আমাকে যে বিস্ময়টা যেন গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল অবাক হওয়ার অনুভূতি। তা সত্ত্বেও তিনশ বছর আগে খোদাই করা হরফ

দুটোর দিকে তাকিয়ে ফের হতভম্ব হলাম। অসাড় হল স্নায়ুমণ্ডলী। চোখের সামনে রয়েছে বিখ্যাত অ্যালকেমিস্টের স্বাক্ষর—হাতের মধ্যেই রয়েছে তাঁর ছোরা—যে ছোরা দিয়ে হরফ দুটো খোদাই করেছেন তিনি পাথরের বুকে। ডানপিটে পর্যটকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে, ভূকেন্দ্রে তাঁর ফ্যানটাসটিক অভিযানের সত্যতা সম্বন্ধে তিলমাত্র সন্দেহও আর রইল না মনের মধ্যে।

চিন্তার আবর্তে মাথা যখন বন্ বন্ করে ঘুরছে, প্রফেসর লিডেনব্রক তখন অসংলগ্নভাবে গুণকীর্তন করে চলেছেন আর্ন সাকন্যুউজমের।

"হে অলোকসামান্য প্রতিভাধর, সব দিকেই নজর ছিল আপনার। ভূত্বক ফুঁড়ে ভূগর্ভে প্রবেশ করতে হবে কি ভাবে, সুকৌশলে সে ঠিকানা রেখে গিয়েছিলেন কেবলমাত্র অনুসন্ধিৎসু বৈজ্ঞানিকের জন্যে গোপন সাংকেতিক লিপির মধ্যে। তারপর তিনশ বছর কেটে গেছে। আপনার দেখানো পথেই এখানে এসে পাচ্ছি আপনার হুঁশিয়ার মনের আর একটা নিদর্শন। ভাবীকালের পর্যটক যাতে ঠিক পথে ভূকেন্দ্রে পৌঁছোতে পারে, যাতে আশ্চর্য এই দৃশ্য এবং আরো অনেক দৃশ্য স্বচক্ষে দেখে যেতে পারে আপনার পদচিহ্ন আঁকা সড়ক বেয়ে—তাই নিজের নাম পাথরের বুকে খোদাই করে রেখেছেন। বুকের পাটা যার আছে, একমাত্র সেই ধরনের পর্যটকই এই পথে নেমে যাবে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে। গিয়ে দেখবে, সেখানেও আপনার স্বহস্ত-খোদিত স্বাক্ষর। আমিও লিখে রাখছি আমার নাম আপনার নামের তলায় গ্র্যানাইট পাথরের পাতায়। আর, আজ থেকে এই অন্তরীপের নাম হল আপনার নামে। এই সমুদ্র, এই অন্তরীপ—সবই আপনার আবিষ্কার। সাকন্যুউজম অন্তরীপের নাম অক্ষয় হয়ে থাকুক ইতিহাসের পাতায়।"

এই ধরনের আরো অনেক উচ্ছ্বাস তুবড়ির মত তেড়ে ফুঁড়ে বেরিয়ে এল কাকার মুখ দিয়ে। উৎসাহ জিনিসটা বড় সংক্রামক। আমিও সংক্রামিত হলাম জলন্ত উৎসাহে। উৎসাহের আগুন জলতে লাগল আমার ভেতরেও। সব ভুলে গেলাম আমি। ভুলে গেলাম পথের বিপদ এবং ফেরার সংকট। একজন যখন এই বিপদ মাথায় নিয়ে ভূকেন্দ্র দর্শন করে ফিরে গিয়েছে ভূপৃষ্ঠে, তখন আমিও তা পারব। মনে হল কিছুই আর অসম্ভব নয় আমার কাছে। অতি-মানবিক ক্ষমতায় সহসা যেন বুঁদ হয়ে গেলাম আমি।

গলা ফাটিয়ে বললাম—"এগিয়ে চলুন! এগিয়ে চলুন!"

তিমিরাবৃত সুড়ঙ্গে দৌড়ে ঢুকতে যাচ্ছি, খপ করে পেছন থেকে চেপে ধরলেন কাকা। তাঁর মত অধীর মানুষকেও দেখলাম ধীর স্থির শান্ত ভাবে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করতে।

বললেন—"আগে চলো হ্যান্সের কাছে যাই। ভেলাটাকে ঠিক এইখানে নিয়ে আসি।"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও হুকুম তামিল করলাম। দৌড়ে গেলাম সমুদ্রতীরে। গিয়ে দেখি আমাদের সুযোগ্য গাইড জিনিসপত্র পরিপাটি করে সাজিয়ে ফেলেছে ভেলার ওপর। পাল তুলে দিয়ে তৎক্ষণাৎ রওনা হলাম সাকস্যুউজম অন্তরীপের দিকে।

ঘণ্টা তিনেক বাদে সন্ধ্যে ছটার সময়ে পৌছোলাম গন্তব্যস্থানে। লাফ দিয়ে নীচে নামলাম। তিন তিনটে ঘণ্টাও আমার জ্বলন্ত উৎসাহকে স্তিমিত করতে পারেনি। পক্ষান্তরে, আমি প্রস্তাব করলাম, ভেলাটা পুড়িয়ে ফেলে ফিরে যাওয়ার প্রলোভন খতম করে দেওয়া হোক। কাকা কিন্তু রাজী হলেন না। আমার তুলনায় ওঁকে অনেক ঠাণ্ডা দেখলাম।

শেষকালে বললাম—"তাহলে এখুনি বেরিয়ে পড়া যাক।"

হুঁশিয়ার কাকা কিন্তু ধড়ফড় করলেন না। লণ্ঠন জ্বালালেন। গহ্বরের ভেতরটা আগে দেখা দরকার তো। দড়ির মই আদৌ লাগবে কিনা ইত্যাদি অনেক জিনিস জানা দরকার হুড়মুড় করে ঢুকে পড়বার আগে।

সুড়ঙ্গর মুখ গোলাকার, আড়াআড়ি ভাবে পাঁচ ফুট চওড়া। আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোত গুহার চারিদিক মসৃণ করে গিয়েছে।

মেঝে দিব্বি সমতল। কিন্তু ছ'পা যেতে না যেতেই নাক ঠুকে গেল পাথরের দেওয়ালে। রাস্তা বন্ধ।

"এ কী আপদ!" আচমকা পাথরের বাধা আসায় মেজাজ খিঁচড়ে গেল আমার।

বৃথাই ডাইনে বাঁয়ে ওপরে নীচে পথের খোঁজ করলাম। কোথাও এতটুকু ফাটল নেই, ছেঁদা নেই। দারুণ দমে গেলাম আমি। পাথরের নীচে উঁকি দিয়েও কোনো ফাঁক দেখতে পেলাম না। ওপরেও নেই। হ্যান্স লণ্ঠন নিয়ে আশেপাশে তন্ন তন্ন করে দেখল। কোথাও এতটুকু পথ খুঁজে পেল না। নাঃ, আর কোনো উপায় নেই! এ-বাধা পেরিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় কোনমতেই।

ধপ করে মেঝেতে বসে পড়লাম আমি। কাকা পায়চারী করতে লাগলেন সুড়ঙ্গের মধ্যে।

"সাকস্যুউজম কি বলেন?" প্রশ্ন করলাম আমি।

"আমিও তাই ভাবছি," বললেন কাকা। "উনিও কি পাথর দেখে ফিরে গিয়েছিলেন?"

"না, না। এ-অঞ্চলে চৌম্বক ঝড় যে কি ভয়ানক জিনিস, হাড়ে হাড়ে সে

জ্ঞান হয়েছে আমাদের। সেই ধরনের কোনো ঝড়ে অথবা ভূমিকম্পের ঝাঁকুনিতে পাথরটা খসে পড়ে পথ আটকে দিয়েছে। সাকাম্যুউজম এই পথ দিয়ে ভূকেন্দ্র দেখে ফিরে যাবার পর এতগুলি বছরের মধ্যে ঘটেছে এই দুর্ঘটনা। ভুলে যাবেন না, এককালে লাভাস্রোত বয়েছে এই সুড়ঙ্গ দিয়ে। মাথার ওপর তাকিয়ে দেখুন। বড় বড় পাথর সাজানো—যেন কোনো দৈত্য টুকরোটাকরা পাথর দিয়ে সুড়ঙ্গ বানিয়েছে। তিনশ বছরে নিশ্চয় কোনো ঝাঁকুনি গোটা পাহাড়টাকে নাড়া দিয়েছে। আলগা পাথরটা ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ে নিরেট পাল্লার মতই বন্ধ করে দিয়েছে সুড়ঙ্গের মুখ। সাকম্যুউজম এ বাধার সম্মুখীন হয়নি। কাকা, পাথর সরাতে না পারলে ভূকেন্দ্রে পৌঁছোনোর কথা ভুলে যান।"

ঠিক এইভাবে সেদিন কথার ফুলঝুরি ছুটিয়েছিলাম আমি। প্রফেসরের আত্মা যেন অনুপ্রবেশ করেছিল আমার অন্তরাত্মার মধ্যে। আবিষ্কারের নেশায় বুঁদ হয়ে কত কথাই না বলেছিলাম। অতীত ভুলে গিয়েছিলাম। সাগ্রহে তাকিয়েছিলাম ভবিষ্যতের দিকে। ভূপৃষ্ঠের কোনো কথাই ঠাঁই পাচ্ছিল না মনের মধ্যে। হামবুর্গের কথা, কনিগ্‌স্ট্রাফ স্ট্রীটের কথা এমন কি আমার মনের মানুষ গ্রোবেনের কথা পর্যন্ত বিস্মৃত হয়েছিলাম ভূকেন্দ্রে পৌঁছোনোর আতীব্র উত্তেজনায়।

কাকা বললেন—"তাহলে গাঁইতি দিয়ে রাস্তা বার করে নেওয়া যাক।"

"গাঁইতি দিয়ে ও কাজ হবে না।"

"তাহলে খন্তা আনা যাক।"

"অনেক সময় লাগবে।"

"তাহলে কি আনব?"

"গান-কটন! উড়িয়ে দিন পাথরের ব' ।।"

"গান-কটন!"

"হ্যাঁ। গান-কটন। পাথর ওড়াতে যার জুড়ি নেই।"

"হান্স, লেগে যাও!" হুকুম দিলেন কাকা।

ভেলা থেকে গাঁইতি নিয়ে এল হান্স। পাথর খুঁড়ে বড় সড় একটা ছেঁদা করতেই হিমসিম খেয়ে গেল সে। বড় গর্ত হওয়া চাই—পঞ্চাশ পাউণ্ড গান-কটন রাখতে হবে তো। গান পাউডারের চার গুণ বেশী শক্তিশালী এই গান-কটন যখন ফাটবে, নিমেষ মধ্যে উড়িয়ে নিয়ে যাবে পাথরের পাল্লাকে!

নিদারুণ উত্তেজনা নিয়ে সেই ফাঁকে পলতে বানিয়ে নিলাম আমি। ন্যাকড়ার নলের মধ্যে ড্যাম্প গান-কটন রেখে তৈরী হল ধীর-গতি পলতে।

"যেতে আমাদের হবেই!" বললাম আমি।

"যেতে আমাদের হবেই!" সায় দিলেন কাকা।

মাঝ রাতে শেষ হল উদ্যোগপর্ব। গর্তের মধ্যে গান-কটন ঠেসে পলতের মুখটা রাখা হল সুড়ঙ্গের বাইরে।

শুধু একটা স্ফুলিঙ্গ দরকার এখন! প্রস্তর বাধা চূর্ণ হবে পলক ফেলার আগেই!

কাকা বললেন—"আগামী কাল।"

নিরুপায় হয়ে দীর্ঘ ছটি ঘণ্টা সবুর করতে হল আমাকে।

৩৯। সুড়ঙ্গের অতলে

পরের দিন বৃহস্পতিবার, সাতাশে অগাস্ট - তারিখটা পাতাল পথের পাঁচালীতে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সেদিনের কথা ভাবলে আজও ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে। সেইদিন থেকে আমাদের যুক্তি বুদ্ধি বিচার তালগোল পাকিয়ে একাকার হয়ে গিয়েছিল—প্রকৃতির একাধিক শক্তি আমাদের নিয়ে যেন লোফালুফি খেলায় মেতেছিল।

সকাল ছটা বাজতেই কোমর বেঁধে তৈরী হলাম। গ্র্যানাইট বাধা গুঁড়িয়ে দেওয়ার সময় হয়েছে।

কাকার কাছে বায়না ধরলাম, পলতেতে আগুন ধরানোর বাহাদুরি আমাকে দিতে হবে। আগুন ধরিয়েই ছুটে গিয়ে ভেলায় উঠে পড়ব। তৎক্ষণাৎ তীর ছেড়ে দূরে সরে যাবে ভেলা। বিস্ফোরণের সংহার ক্রিয়া শুধু পাহাড়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না নিশ্চয়। সুতরাং দূরে সরে যাওয়াই মঙ্গল।

হিসেব করে দেখা গেল, পলতে পুড়ে গান-কটনের গাদায় পৌঁছোতে সময় লাগবে দশ মিনিট। ভেলায় ফিরে যাওয়ার পক্ষে দশ মিনিট যথেষ্ট সময়।

ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে গেলাম পলতেতে অগ্নিসংযোগ করতে। সুড়ঙ্গের মুখে গিয়ে লণ্ঠনের ঢাকনি খুলে ফেললাম। পলতের মুখটা এগিয়ে আনলাম শিখার কাছে।

ক্রোনোমিটার হাতে নিয়ে বসেছিলেন কাকা।

"রেডি?" হেঁকে জিজ্ঞেস করলেন কাকা।

"হ্যাঁ।"

"দাও বাবা, আগুন দাও!"

আগুনের মধ্যে ঠেলে ধরলাম পলতের মুখ। ফুস্ ফুস্ করে আগুন এগোলো অগ্নিসর্পের মত স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে। তাই না দেখেই আমি ভোঁ দৌড় দিলাম ভেলার দিকে।

লগি দিয়ে প্রচণ্ড ঠেলা মেরে ভেলাকে নিমেষ মধ্যে তীর থেকে ষাট ফুট দূরে নিয়ে গেল হ্যান্স।

উৎকণ্ঠায় টান-টান হয়ে বসে রইলাম। প্রফেসরের হাতে ক্রোনোমিটার। কাঁটার দিকে চোখ রেখে বলে চলেছেন কাকা— "আর পাঁচ মিনিট···চার মিনিট···তিন মিনিট···।"

আমার হৃদস্পন্দন দ্রুত হল। বুকে যেন ঢেঁকির পাড় পড়ছে সেকেণ্ডে দুবার।

"দু মিনিট···এক মিনিট। ওহে গ্র্যানাইট পাহাড়, জাহান্নমে যাও এবার!"

কি ঘটল এর পর? বিস্ফোরণের আওয়াজটা শুনতে পেয়েছিলাম বলে তো মনে হয় না। হঠাৎ দেখলাম পাল্টে যাচ্ছে পাহাড়ের চেহারা। যেন সর সর করে দুপাশে সরে গেল স্টেজের পর্দা। চোখের সামনে এক লহমার জন্যে ভেসে উঠল একটা নিতল গহ্বর—সমুদ্রের গা ঘেঁসে বিকট হাঁ করে রয়েছে অতলস্পর্শী সেই গহ্বরের প্রবেশ পথ···আর যেন শব্দহীন অট্টহাসিতে বিদ্রুপ করছে আমাদের। পরমুহূর্তেই সমুদ্র যেন মাতাল হয়ে গেল। উন্মত্ত বেগে আকাশচুম্বী একটিমাত্র তরঙ্গের আকারে ধেয়ে গেল তলহীন সেই খাদের দিকে···তরঙ্গশীর্ষে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে গেল আমাদের কাঠের ভেলা।

তিনজনেই মুখ থুবড়ে পড়লাম ভেলার ওপর। এক সেকেণ্ডও গেল না, অন্ধকার গ্রাস করল আমাদের—তিরোহিত হল আলোর জগৎ। পরক্ষণেই মনে হল, শুধু আমি কেন, গোটা ভেলাটাই যেন কিছুর ওপর আর ভর করে নেই। যেন শূন্য পথে উড়ে চলেছি আমরা। তলিয়ে যাচ্ছি কী? কিন্তু তাতো নয়। জলে ডুবলে তো নাকানিচোবানি খেতাম। কাকার সঙ্গে কথা বলতে গেলাম, কিন্তু কে কার কথা শোনে তখন। জল নির্ঘোষ ডুবিয়ে দিল আমার কণ্ঠস্বর।

অন্ধকার, আওয়াজ, বিস্ময় আর আতংকের মধ্যেই আমি আঁচ করে ফেলেছিলাম কি ঘটে গেল এবং ঘটনার স্রোত কোনদিকে নিয়ে চলেছে আমাদের।

যে-পাথরের চাঁইটা এইমাত্র বিস্ফোরক ফুটিয়ে উড়িয়ে দিলাম আমরা, ঠিক তার পেছনেই ছিল একটা অতলস্পর্শী খাদ। প্রলয়ংকর বিস্ফোরণে বহু ফাটলযুক্ত পর্বত ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছে, খাদের মুখ খুলে গিয়েছে। এবং

সমুদ্র জলপ্রপাতের আকারে আমাদের টেনে নিয়ে সগর্জনে নেমে চলেছে খাদের নীচে।

আর কী! সব শেষ হয়ে এল!

এক ঘণ্টা গেল · দু'ঘণ্টা গেল···সঠিক কঘণ্টা গেল, সে হিসেব বলার সাধ্য আমার নেই। ঘেঁসাঘেঁসি হয়ে বসে আঁকড়ে রইলাম পরস্পরকে-- ছাড়াছাড়ি বসলে যদি ছিটকে বেরিয়ে যাই ভেলা থেকে! মাঝে মাঝে দেওয়ালে লেগে সাংঘাতিক ভাবে কেঁপে উঠছিল ভেলা—কিন্তু ক্রমশঃ যেন ধাক্কার সংখ্যাও কমে এল। তা থেকেই বুঝলাম গহ্বর আস্তে আস্তে চওড়া হয়ে যাচ্ছে। আর্ন সাকনুসেউজম এই পথেই গিয়েছিলেন, সন্দেহ নেই তাতে। কিন্তু এ আমরা কি করলাম? অবিবেচকের মত গোটা সমুদ্রটাকে সঙ্গে নিয়ে এলাম!

এ-সব চিন্তা দানা বাঁধবার অবসর পাচ্ছিল না মগজের কোষে। আবছা ভাবনাগুলো ধোঁয়াটে আকারে যেন হুড়োহুড়ি করছিল মস্তিষ্কের মধ্যে। স্পষ্ট হওয়ার সুযোগ পাচ্ছিল না কোনো চিন্তাই। তলিয়ে চিন্তা করার মত মনের অবস্থাও আমার ছিল না। বেশ বুঝছিলাম খাড়াইভাবে ওপর থেকে নীচে পড়ছি সাঁ-সাঁ করে। পতনের বেগ যে কি প্রচণ্ড, তা আঁচ করতে পারছিলাম মুখের ওপর হাওয়ার ঝাপটা থেকে। হাওয়া তো নয়, যেন চাবুক। ফালাফালা করে দিতে চাইছিল মুখের চামড়া। সবচাইতে বেগবান এক্সপ্রেস ট্রেনের চাইতেও যদি কিছু থাকে, তবে তার থেকেই বেশী গতিবেগে আমরা পড়ছিলাম। এ পরিস্থিতিতে মশাল জ্বালানো অসম্ভব। সর্বশেষ ইলেকট্রিক লণ্ঠনটিও বিস্ফোরণের ফলে ভেঙে গেছে।

হঠাৎ চমকে উঠলাম একটা আলো দেখে। আলোটা জ্বলছে আমার কাছেই। হান্স ··ওস্তাদ হান্স আশ্চর্যভাবে জ্বালিয়ে ফেলেছে ভাঙা লণ্ঠনটা টিমটিম করে জ্বলছে যদিও···মনে হচ্ছে এই বুঝি গেল নিভে·· কিন্তু বুক-কাঁপানো সেই রন্ধ্রহীন অন্ধকারের মধ্যে ঐটুকু আলোই যে কতখানি, তা বোঝানোর ভাষা আমার নেই। আলোর আভায় দেখলাম হান্সের অটল মুখাবয়ব। এতটুকু ঘাবড়ায়নি সে।

কাকা ভাইপো উদভ্রান্তের মত চেয়ে রইলাম পরস্পরের দিকে। দুজনেই প্রাণপণে আঁকড়ে আছি ভাঙা মাস্তুলের খোঁটাটা—জল-প্লাবনের পূর্বমুহূর্তে বিপুল বিপর্যয়ের মধ্যে ভেঙে উড়ে গিয়েছিল মজবুত মাস্তুল। হাওয়ার ঝাপটার দিকে পিঠ দিয়ে বসেছিলাম শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার ভয়ে···বাতাসের সেই বর্ণনাতীত গতিবেগকে সামাল দেওয়ার ক্ষমতা কোনো মানুষের ছিল না। এই অবস্থাতেই

কাটতে লাগল একটির পর একটি ঘণ্টা। পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটল না বটে, তবে আমি একটা আবিষ্কার করে বসলাম। ফলে, জটিল হল আমাদের অবস্থা।

ভেলার জিনিসপত্রগুলো গোছগাছ করার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু মালপত্র কোথায়? সভয়ে দেখলাম, বিস্ফোরণের ধাক্কায় ভেলায় যা-যা তুলেছিলাম, তার অধিকাংশই অদৃশ্য হয়েছে জলের তলায়। খাবার-দাবার বলতে আছে শুধু একটু করে নুন-মাখানো মাংস আর খানকয়েক বিস্কুট।

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম ঐ সামান্য আহার্যর দিকে। আহাম্মকের মত ভাবছিলাম, সর্বনাশ। তাহলে অনাহারে মরতে হবে? পরক্ষণেই ভাবছিলাম, মৃত্যু তো অবধারিত। এখনও খাওয়ার ভাবনা? বিপদের ভয়? খাবার-দাবার বিস্তর থাকলেও কি রক্ষে পেতাম এই জলস্রোতের খপ্পর থেকে? মৃত্যু ওৎ পেতে রয়েছে নানারূপ ধরে। অনাহারে মৃত্যু নিয়ে এখন তো এত উদ্বেগ সাজে না!

ঠিক এই সময়ে দপ্ দপ্ করে উঠে নিভে গেল লণ্ঠন। সলতে ফুরিয়েছে। ফলে, অন্ধকার ঝাঁপিয়ে পড়ল চারদিক থেকে। মশালটা জ্বালানো সম্ভব নয় এই হাওয়ার মধ্যে চোখ বন্ধ করে বসে রইলাম আমি।

অনেকক্ষণ পরে বৃদ্ধি পেল আমাদের গতিবেগ। মুখের ওপর হাওয়ার ঝাপটা বেড়ে যাওয়ায় তা টের পেলাম। বোধহয় নক্ষত্রের মতই এবার খসে পড়ছি শূন্যপথে হু-হু করে। কাকা আর হান্স শক্তহাতে চেপে আছেন আমাকে।

আচম্বিতে, কতক্ষণ পরে তা বলতে পারব না, প্রচণ্ড ঝাঁকুনি অনুভব করলাম। সংঘর্ষটা কঠিন বস্তুর সাথে না লাগলেও আমাদের পতন বেগ-রুদ্ধ হয়েছে। বিশাল থামের আকারে একটা জলস্তম্ভ এসে পড়ছে ভেলার ওপর। মনে হল, দমবন্ধ হয়ে আমি ডুবে যাচ্ছি।

সাময়িক তলিয়ে যাওয়াটা অবশ্য বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না। সেকেণ্ড কয়েক পরে আবার তাজা বাতাস টেনে নিলাম ফুসফুস ভরে। দেখলাম, এত জোরে আমাকে আঁকড়ে আছেন কাকা আর হান্স যে আমার হাড় গুঁড়িয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে।

সব চাইতে বড় কথা, ভেলা আবার ভাসছে আমাদের তিনমূর্তিকে নিয়ে।

৪০ ॥ ঊর্ধ্ব গতি

তখন নিশ্চয় রাত দশটা। প্রথম যে ইন্দ্রিয়টি ফের কার্যকর হল,—তা হল শ্রবণেন্দ্রিয়। শোনার অনুভূতিটাই ফিরে এল সবার আগে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কর্ণবধিরকারী নির্ঘোষের পর সহসা নৈঃশব্দ নেমে এল অন্ধকারের অজ্ঞাত রাজ্যে। শব্দহীন নিশ্চুপ আঁধারে ধ্বনিত হল কাকার স্বগতোক্তি ঃ

"ওপরে উঠছি আমরা!"

হাত বাড়িয়ে দিলাম। দেওয়ালে দারুণভাবে হাত ঘসে গেল আমার। বাস্তবিকই বিপুল বেগে ওপরে উঠছি আমরা।

"মশাল! মশাল! চেঁচিয়ে উঠলেন কাকা।

বাহাদুর হান্স এবারও বাহাদুরি দেখালো অক্লেশে। ফস করে জ্বালিয়ে ফেলল মশালটা। ঊর্ধ্বগতি সত্ত্বেও দাউ দাউ করে জ্বলছে মশাল—সেই আলোয় দেখলাম আশপাশের দৃশ্যাবলী।

কাকা বললেন—"যা ভেবেছিলাম। গহ্বরটা আড়াআড়ি ভাবে বিশ ফুট। গর্তের তলায় জল পৌঁচেছে। এবার জল উঁচুতে উঠছে—সমুদ্রপৃষ্ঠের সমান সমান না হওয়া পর্যন্ত জল উঠবে। সেই সঙ্গে উঠবো আমরা।"

"কোথায়?"

"তা তো বলতে পারব না। তবে যে কোনো অবস্থার জন্যে তৈরী থাকা দরকার। আমরা উঠছি সেকেণ্ডে বারো ফুট। তার মানে ঘণ্টায় মাইল আষ্টেক। কম নয়। এই ভাবে উঠলে দেখতে দেখতে বহুদূর পৌঁছে যাব।"

"যদি না কোথাও ধাক্কা খাই। গর্তের মুখটাও যেন খোলা থাকে। কিন্তু যদি ওপরের মুখ বন্ধ থাকে, আর এইভাবে জল উঠতে থাকে ওপরে, তাহলে বাতাস ক্রমশঃ ঘন হবে, চাপ বৃদ্ধি পাবে, আমরাও থেঁতো হয়ে যাব।"

"অ্যাকজেল," প্রশান্ত কণ্ঠে বললেন কাকা। "আমাদের জীবন এখন সুতোর ওপর ঝুলছে। কিন্তু আশা এখনো ত্যাগ করিনি। বাঁচবার পথ পাবই পাব। মৃত্যু যেমন যে কোনো মুহূর্তে পিষে মারতে পারে, জীবনও তেমনি যে কোনো মুহূর্তে বাঁচবার রাস্তা দেখিয়ে দিতে পারে। সুতরাং সুযোগ পাওয়া মাত্রই যাতে তা কাজে লাগাতে পারি, সেইদিকেই সজাগ রাখা যাক।"

"এখন তাহলে কি করব বলুন?"

"পেটে কিছু দিয়ে শক্তি সঞ্চয় করো।"

শুনে, বিভ্রান্ত চোখে চাইলাম কাকার পানে।

কাকা ড্যানিশ ভাষায় হান্সকে কি যেন বললেন। ঘাড় নাড়ল হান্স।

শুনেই সেকী চীৎকার কাকার—"কী! সব খাবার ভেসে গেছে?"

"স-ব। আছে শুধু একটুকরো নুন মাখানো মাংস।"

এমনভাবে কাকা চাইলেন আমার পানে যেন কথাটা তাঁর মাথায় ঢুকছে না।

বললাম—"আপনার কি মনে হয়, প্রাণে বাঁচব?"

জবাব এল না।

গেল একটি ঘণ্টা। ক্ষিদেয় চোটে পেটের মধ্যে যেন মোচড় দিচ্ছিল। কাকা আর হান্সের অবস্থাও শোচনীয়। কিন্তু মাংসেব একটি মাত্র টুকরোর দিকে কাউকেই হাত বাড়াতে দেখা গেল না।

ইতিমধ্যে আরো জোরে ওপরে উঠছি। মাঝে মাঝে হাওয়ার ধাক্কায় নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। বিমান নিয়ে বেগে আকাশে ওঠবার সময়ে এমনি দম আটকানো অনুভূতির মধ্যে বৈমানিকদের যেতে হয় শুনেছি। কিন্তু তারা যতই ওপরে ওঠে, ততই ঠাণ্ডার রাজ্যে গিয়ে পড়ে। আমাদের ক্ষেত্রে ঘটছে ঠিক তার উল্টো। বিপজ্জনকভাবে বেড়ে চলেছে তাপমাত্রা। সেই মুহূর্তেব টেম্পারেচার ৪০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডেব কম নয় কোন মতেই।

গেল আরও একটি ঘণ্টা। তাপমাত্রার সামান্য বৃদ্ধি ছাড়া পরিস্থিতি পাল্টায় নি। নৈঃশব্দের মাঝে হঠাৎ কথা বললেন কাকা।

"শোনো। আমাদের শক্তি-সঞ্চয় করা দরকার। মাংসের টুকরোটা আগলে ঠায় বসে থাকলে ঘণ্টা কয়েক পরে তো একেবারেই কাহিল হয়ে পড়ব।"

"ঘণ্টা কয়েক পবে বেঁচে থাকব কী?"

"নাও থাকতে পারি। কিন্তু তাব আগেই যদি বাঁচবার সুযোগ পেয়ে যাই, গায়ে জোর না থাকলে সুযোগটা নেব কি করে? শুধুমুধু ক্ষিদে চেপে দুর্বল হওয়াটা ঠিক নয়।"

"আপনি দেখছি এখনো আশা ছাড়েন নি!" রেগে গিয়ে বললাম আমি।

"তা তো ছাড়িই নি," দৃঢ় কণ্ঠে বললেন প্রফেসর। "যতক্ষণ পর্যন্ত আমার হৃদপিণ্ড চলবে, ততক্ষণ পযন্ত আমার ইচ্ছাশক্তিও থাকবে। আশা ছাড়তে যাবো কোন দুঃখে?"

কী সুন্দর কথা! নিরাশার নিঃসীম তিমিরে দাঁড়িয়ে, মৃত্যুকে প্রতিপদে অনুভব করেও এমন কথা যাঁর মুখ দিয়ে এত সহজে বেরোয়, তিনি সাধারণ মানুষ নন।

"বলুন কি করতে হবে।"

"মাংসটা তিনভাগ করে এসো তিনজনে খেয়ে নিই। এই খাওয়াই হয়ত আমাদের শেষ খাওয়া। কিন্তু খিদেয় নেতিয়ে পড়লে তো চলবেনা, পুরুষের মত সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে।"

"আসুন খাবার" বললাম আমি।

মাংসের টুকরোটা সমান তিনভাগ করলেন কাকা। এক-এক ভাগে পড়ল পাউণ্ড খানেক মাংস। গোগ্রাসে কিন্তু ভীষণ উত্তেজিতভাবে খাওয়া শেষ করলেন কাকা। আমি মুখে কোনো স্বাদ পেলাম না। খিদে সত্ত্বেও খেলাম নিরানন্দভাবে। হান্স খেল বেশ তারিয়ে তারিয়ে। প্রতিটি গরস রীতিমত উপভোগ করে। আশ্চর্য লোক যা হোক! ভবিষ্যতেব উদ্বেগ কিছুতেই টলাতে পারেনা তার ধীর স্থির শান্ত মূর্তিকে। খাওয়া শেষ করে এক ফ্লাস্ক জিন এগিয়ে দিল সে। খুঁজে পেতে ভেলার মধ্যে থেকেই ফ্লাস্কটা উদ্ধার করে রেখেছিল এত বিপদের মধ্যেও।

তিনজনে ভাগ করে খালি করে ফেললাম ফ্লাস্কটা। খেয়ে দেয়ে হান্স ড্যানিশ ভাষায় বলল—"আঃ! চমৎকাব!" ধরে সঙ্গে সঙ্গে একই কথা মাতৃভাষায় উচ্চারণ করলেন কাকা। আমি কিছু বললাম না বটে, তবে আশার ক্ষীণ আলো দেখলাম মনের মধ্যে। শেষ খাওয়া খেলাম ভোর পাঁচটার সময়ে।

কাকা কিন্তু কাজে ঢিলে দেন না কখনো। মশালের আলোয় উনি দেখছিলেন শিলাস্তরের বিন্যাস, প্রকৃতি এবং আমরা কি ধরনের গুহাপথে ওপরে উঠছি। বিড়বিড় করে নিজের মনেই ভূবিদ্যাসংক্রান্ত যে সব নাম আউড়ে চলেছিলেন, তা আমিও বুঝছিলাম। ঐ অবস্থার মধ্যেও আমিও কিন্তু শেষ গবেষণায় অংশ না নিয়ে পারলাম না।

"আগ্নেয় শিলা—গ্র্যানাইট," বললেন কাকা। "এখনো আদিমযুগ পেরোইনি দেখছি। কিন্তু ওপরে তো উঠছি। কোথায় যাচ্ছি? কে জানে!"

না, আশা ছাড়েন নি কাকা। হাত বাড়িয়ে খাড়াই দেওয়াল স্পর্শ করে ফের বললেন—"আরে। এযে দেখছি নিস্…স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে অভ্র, শিলাস্ফটিক আর ফেল্ড্‌সপারের স্তর। এই তো অভ্রর শিলাস্তর! যাক; রূপান্তর যুগে এসে পড়লাম বলে। তারপরেই…"

কি বলতে চান কাকা? মাথার ওপর ভূত্বক আর কতখানি পুরু, তা মাপবার যন্ত্র তো কাছে নেই। ম্যানোমিটার কোন কালে উধাও হয়েছে।

ইতিমধ্যে টেম্পারেচার কিন্তু বেড়েই চলেছে। ধাতু কারখানায় গলিত ধাতু ছাঁচের ওপর ঢালবার সময়ে যে-রকম আঁচ গায়ে লাগে, সেই রকম আঁচে যেন সেদ্ধ হতে বসেছিলাম আমি। শেষকালে এমন হল যে তিনজনেই জ্যাকেট, ওয়েস্টকোট খুলে হালকা পোশাক রাখলাম গায়ে। তা সত্ত্বেও চামড়া যেন ঝলসে যাচ্ছিল গনগনে আঁচে।

"ব্যাপার কী? আমরা কি ফার্নেসের দিকে চলেছি?" শুধোলাম আমি।

"মোটেই না।" বললেন কাকা।

সুড়ঙ্গের দেওয়ালে হাত দিয়ে বললাম—"একী! দেওয়াল যে তেতে আগুন!"

বলতে বলতে হঠাৎ হাত ঠেকে গেল জলে। সঙ্গে সঙ্গে হাত টেনে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম চিলের মত—"জল ফুটছে!"

শুনে হাত-পা ছুঁড়লেন কাকা। অর্থাৎ রেগে টং হয়েছেন তিনি।

দুর্জয় আতংকে অসাড় হয়ে এল আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। সমস্ত সত্তা দিয়ে উপলব্ধি করলাম একটা মহাপ্রলয়ের দিকে দুর্বার বেগে এগিয়ে চলেছি আমরা। দুরন্ততম কল্পনা দিয়েও মানুষ সেই মহাবিপর্যয়কে ধারণায় আনতে পারেনা। প্রথমে অস্পষ্ট কুয়াশার আকারে মনের কোনো উঁকি দিয়েছিল শংকাটা··· কিছুক্ষণের মধ্যেই তা করাল মূর্তি নিয়ে অন্ধকার করে দিল আমার মনের আকাশ শংকা কুহেলী রূপান্তরিত হল বিশ্বাসে। ধ্রুব বিশ্বাসটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইলাম, কিন্তু সেটা জোঁকের মত আঁকড়ে রইল আমার আতংকিত চেতনাকে। ভাষায় তা প্রকাশ করার ক্ষমতা ছিলনা। দুচারটে নিদর্শন যা দেখলাম, তা থেকেই প্রমাণিত হল আমার আশংকা অমূলক নয়। মশালের কম্পমান আলোয় দেখলাম গ্র্যানাইট স্তরে থিরথিরে চাঞ্চল্য·· পাথর যেন দুমড়ে মুচড়ে ঢেউ খেলে যাচ্ছে। এর পরেই জানি কি ঘটবে। বৈদ্যুতিক শক্তি আসবে নামবে। হাতে হাত মেলাবে অসহ্য উত্তাপ, ফুটন্ত জল ঠিক করলাম, কম্পাস দেখে বিচার করব আমার অনুমান অভ্রান্ত কিনা।

একী! কম্পাসটাও কি উন্মাদ হয়ে গেল?

৪১॥ আগ্নেয়গিরি থেকে ছিটকে গেলাম

পাগল হয়ে গিয়েছে কম্পাস! কাঁটাটা ঝাঁকুনি দিয়ে ঘুরছে এক অক্ষপ্রান্ত থেকে আরেক অক্ষপ্রান্তে·· কম্পাসের প্রতিটি পয়েন্ট ছুঁয়ে ছুঁয়ে বন্‌বন্‌ করে ঘুরছে মাতালের মত।

ভূগোলকের খনিজত্বক কখনো একভাবে থাকেনা। এ সম্পর্কে অনেক থিওরী মেনে নিয়েছেন সবাই। তত্ত্বটা আমিও জানতাম। ভূপৃষ্ঠের বাসিন্দারা হয়ত ভাবছেন, পায়ের তলায় বুঝি কোথাও কোনো পরিবর্তন নেই। যা ছিল, তাই আছে এবং থাকবে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে খনিজ পদার্থরা ক্রমাগত নিজেরা ভেঙেচুরে যাচ্ছে, অন্য পদার্থ সৃষ্টি হচ্ছে, তরল পদার্থর বিরাট বিরাট প্রবাহ বইছে এবং সব কিছুর ওপর নিরন্তর পরিবর্তন এনে চলেছে পৃথিবীর চৌম্বক শক্তি। এ-তত্ত্ব ভয়াবহ নয় মোটেই। আমি তার জন্যে ঘাবড়াইনি। কিন্তু অন্য একটা ঘোর সন্দেহ দেখা দিল গ্র্যানাইট স্তরের নড়াচড়া আর কম্পাসের পাগলামি দেখে।

শোনা যাচ্ছে মুহুর্মুহু বিস্ফোরণের শব্দ। ঠিক যেন পাথর বাঁধানো রাস্তা মাড়িয়ে চলেছে অনেকগুলো ঘোড়ায় টানা মালগাড়ী। বিস্ফোরণ ধ্বনি বেড়েই চলেছে · ঘনঘন গভীর গর্জন শেষকালে একটানা বজ্র নির্ঘোষ হয়ে দাঁড়াল। বিস্ফোরণ! বিস্ফোরণ! বিস্ফোরণ! পরের পর পর বিস্ফোরণ হয়ে চলেছে বহু দূরে কোথাও! গুরু গুরু গুম গুম শব্দে কানে বুঝি তালা লেগে যাচ্ছে।

তড়িৎ প্রবাহের প্রভাবে উন্মাদ কম্পাসের পাগলামি থেকে একটা জিনিস এবার পরিষ্কার হয়ে গেল। খনিজত্বক ফেটে চৌচির হয়ে যেতে চাইছে, গ্র্যানাইট পাথরও আর পারছেনা—ভেঙে পড়তে পারলেই যেন বাঁচে। অসংখ্য ফাটল সৃষ্টি হতে চলেছে এবং সুড়ঙ্গ পথ বন্ধ হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। পরিণাম? ভেলা সমেত আমরা থেঁতলে পিষে তালগোল পাকিয়ে নিশ্চিহ্ন হব যে কোনো মুহূর্তে। গ্র্যানাইটের ভয়ংকর আলিঙ্গন থেকে রেহাই পাব না কেউই।

"কাকা! কাকা!" তারস্বরে চেঁচিয়ে বললাম আমি "প্রাণের আশা ছেড়ে দিন! ঐ দেখুন দেওয়াল কাঁপছে, পাথর নড়ছে, উত্তাপ বাড়ছে, জল ফুটছে। বাষ্প মেঘ হয়ে উঠছে, কম্পাস কাঁটা পাগলের মত ঘুরছে। লক্ষণ-গুলো চেনেন নিশ্চয়—ভূমিকম্প শুরু হয়েছে!"

আস্তে আস্তে ঘাড় নেড়ে কাকা বললেন—"ভুল করলে, বাবা। ভূমিকম্পের চাইতে ভাল একটা ব্যাপারের আশায় বসে আছি আমি।"

"তার মানে ?"

"অগ্ন্যুৎপাত।"

"অগ্ন্যুৎপাত ? কি বলতে চান আপনি ? জীবন্ত আগ্নেয়গিরির নল বেয়ে উঠছি আমরা ?"

"এই তো বুঝে ফেলেছো।" হেসে বললেন কাকা। "অগ্ন্যুৎপাত আমাদের মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল করবেনা, অ্যাকজেল।"

মঙ্গল করবে ! কাকার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি ? কি বলতে চান উনি ? তা ছাড়া, উনি এত শান্তই বা রয়েছেন কেন ? মুখে হাসিও তো আসছে !

"কাকা !" গলা চিড়ে গেল আমার চেঁচাতে গিয়ে—"আমরা অগ্ন্যুৎপাতের সঙ্গী হয়ে বসেছি। জলন্ত লাভা, গলিত পাথর, ফুটন্ত জল এবং অগ্নিবমনের অন্যান্য সব কিছু উপাদানের সঙ্গে আমাদেরকেও মিলিয়ে দিয়েছেন নিষ্ঠুর নিয়তি। একটু বাদেই আমবা ছিটকে যাবো আকাশে। আগ্নেয়গিরি থু-থু করে আমাদের ছুঁড়ে দেবে শূন্যের মধ্যে, আগুন বমি করে উগড়ে দেবে ছাই, পাথর, লাভা, জলন্ত অঙ্গার আর লেলিহান শিখার ঘূর্ণিপাক আর আপনি কিনা বলছেন, মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল হবে না কারো ?"

চশমার ওপরের ফাঁক দিয়ে আমাকে নিরীক্ষণ করে কাকা বললেন—"পৃথিবীর বুকে ফিরে যাওয়ার সেইটাই তো একমাত্র পথ।"

কত চিন্তা যে ভীড করে এল মাথার মধ্যে, তা সাজিয়ে গুছিয়ে লেখবার ক্ষমতা আমার নেই। কাকা ঠিকই বলেছেন। খাঁটি কথাই বলেছেন। নির্জলা সত্যি বলেছেন। অগ্ন্যুৎপাতের সুযোগ নিয়ে কিভাবে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, সেই চিন্তা নিয়ে তাই তিনি ধীর স্থির শান্ত। তাঁর এ-রকম স্থিতধীরূপ এর আগে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়নি।

আমরা উঠেই চলেছি। সারারাত ধরে অব্যাহত রইল আমাদের উর্ধ্বগতি। চারপাশে একটানা বজ্রগর্জন বেড়েই চলেছে। দম আটকে আসছে আমার। মনে হচ্ছে শেষ মুহূর্তের আর বুঝি দেরী নেই।

অগ্ন্যুদগারের ওপরমুখো ঠেলার চোটে যে আমরা সাঁ-সাঁ করে ওপরে উঠছি, তাতে আর সন্দেহ নেই। ভেলার তলায় রয়েছে টগবগে জল। তার তলায় লাভাপিণ্ড, রাশিরাশি ভাঙা পাথর। জ্বালামুখ থেকে প্রক্ষিপ্ত হয়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে যাবে সব কিছুই। আমরা উঠছি আগ্নেয়গিরির চিমনীর মধ্যে দিয়ে।

তবে স্নেফেলের মত মৃত আগ্নেয়গিরি এটা নয়। রীতিমত সজীব আগুন-পাহাড়ের পেটের মধ্যে দিয়ে নক্ষত্রবেগে ছুটে চলেছি আমরা পৃথিবীর আকাশের দিকে। কিন্তু পৃথিবীর কোন অংশের আগ্নেয়গিরি এটা? ভূগোলকের কোন অঞ্চলের শূন্যপথে ঠিকরে যাবে আমাদের রক্তমাংসের দেহগুলো?

সকাল নাগাদ আরও বাড়ল উর্ধ্বগতির বেগ। তাপমাত্রাও বাড়ছে। ভলক্যানো বাড়াবাড়ি শুরু করলেই তা হয়। যেভাবে উঠছি, বেশ বুঝছি পৃথিবীর খোল থেকে বাষ্পপিণ্ড ঠেলে উঠছে…ঠেলে নিয়ে চলেছে আমাদের জ্বালামুখের দিকে। না জানি তারপর কপালে কি আছে!

কিছুক্ষণের মধ্যেই ম্যাড়মেড়ে আলো ফুটল খাড়াই সুড়ঙ্গের মধ্যে। চওড়া হয়ে দুপাশে সরে যাচ্ছে সুড়ঙ্গের দেওয়াল। ডাইনে বাঁয়ে বিস্তর সুড়ঙ্গমুখ চোখে পড়ছে…ভলকে ভলকে বাষ্পপুঞ্জ বেরিয়ে আসছে সুগভীর গহ্বরগুলো থেকে দেওয়ালে পট্‌পট্‌ শব্দে লকলক করছে অগ্নিশিখা।

"কাকা দেখেছেন?" চিলের মত চেঁচিয়ে বললাম আমি।

"দেখেছি, অ্যাকজেল। গন্ধকের আগুন জ্বলছে। অগ্ন্যুদগার আরম্ভ হলে এ-আগুন দেখা যাবেই।"

"আগুনে চাপা পড়লেই তো গেছি।"

"চাপা পড়বে না।"

"দম বন্ধও হতে পারে কিন্তু।"

"না তা হবে না। চিমনীর মুখ ক্রমশঃ চওড়া হয়ে যাচ্ছে।"

"জল কি এখনো উঠছে?"

"জল বিদায় নিয়েছে, অ্যাকজেল। ভেলার তলায় এখন কাদার মত স্তর। লাভার ঠেলাতেই জ্বালামুখের দিকে চলেছি।"

জলের যে স্তম্ভ ঠেলে নিয়ে এসেছে আমাদের, দেখলাম তার জায়গা দখল করছে থকথকে লাভা। ফুটন্ত লাভা। তাপমাত্রাও আর সওয়া যাচ্ছে না। থার্মোমিটার থাকলে নিশ্চয় ৭০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের ঘরে পৌঁছোতো। খুব জোরে উঠছি বলে রক্ষে, নইলে নির্ঘাৎ দমবন্ধ হয়ে মারা যেতাম।

সকাল আটটা নাগাদ একটা নতুন ঘটনা ঘটল। হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল ভেলা। বন্ধ হল উর্ধ্বগতি, বন্ধ হল নড়াচড়া।

"কী হল?" শুধোলাম আমি।

"বিরাম", বললেন কাকা।

"আগ্নেয়গিরি কি নিস্তেজ হতে চলেছে?"

"মনে হয় না।"

উঠে দাঁড়িয়ে কারণটা বার করার চেষ্টা করলাম। পাথরের খোঁচে ভেলা আটকে গেলে এখুনি ছাড়িয়ে দেওয়া দরকার।

কিন্তু তা তো নয়। ছাই, পাথর, লাভা—সবকিছুই চুপচাপ দাঁড়িয়ে।

"অগ্ন্যুৎপাত কি তাহলে বন্ধ হয়ে গেল?"

দাঁত কিড়মিড় করে কাকা বললেন - সেই ভয়েতে মাথা খারাপ হয়ে গেল বুঝি? অত ঘাবড়ানোর কিছু নেই। এ হল সাময়িক বিরতি। পাঁচ মিনিট তো হল, এখুনি দেখবে ফের উঠছি।"

কাকার কথা সত্যি হল। ক্রোনোমিটার নিয়ে উনি নির্বিকার ভাবে সময় দেখছেন, আচমকা আবার লিফটের মত উঠতে লাগল ভেলা। তবে মসৃণ গতিতে নয়—ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়ে। মিনিট দুয়ের উঠেই কিন্তু দাঁড়িয়ে গেল আগের মত।

ক্রোনোমিটারের দিকে তাকিয়ে কাকা বললেন—"বাঃ! এখন থেকে দশ মিনিট পরেই আবার চালু হবে ভেলা। এই আগ্নেয়গিরির অভ্যেস হল থেকে থেকে আগুন বমি করা। তাতে আমাদেরই লাভ। জিরিয়ে নেওয়া যাবে মাঝে মাঝে।"

আবার নির্ভুল হল প্রফেসরের ভবিষ্যদবাণী। ঠিক দশ মিনিট পরে ঝাঁ করে ওপরে ঠেলে উঠল ভেলা। খপ করে কাঠ আঁকড়ে না ধরলে নির্ঘাৎ ছিটকে পড়তাম ঐ ধাক্কায়। কিছুক্ষণ উঠেই অবশ্য ফের দাঁড়িয়ে গেল আমাদের আজব লিফট।

আগ্নেয়গিরি এই খেয়ালের কথা নিয়ে অনেক ভেবেছি পরে। আমার তো মনে হয় ভলক্যানোর মূল অগ্নিপথের মধ্যে আমরা ছিলাম না। অন্য কোনো শাখাপথে থাকার দরুন ঐ রকম থেমে থেমে শক্তি সঞ্চয় করে ঠেলে উঠতে হয়েছে লাভা স্রোতকে।

কতক্ষণ এবং কতবার এইভাবে ঝাঁকুনি মেরে মেরে উঠলাম, তা বলতে পারব না। শুধু মনে আছে প্রতিটি ঝাঁকুনির পরেই একটু একটু করে বৃদ্ধি পেয়েছে গতিবেগ। যতবার দাঁড়িয়েছে ভেলা, ততবার দমবন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে উত্তপ্ত গ্যাসে। আবার ওঠবার সময়ে গরম বাতাসেও নিঃশ্বেস আটকে এসেছে। ভাবছিলাম, এই মুহূর্তে যদি মেরু অঞ্চলে পৌঁছে দেখি তাপমাত্রা শূন্য তাপাঙ্কের তিরিশ ডিগ্রী নীচে? কল্পনায় দেখলাম তুষার ছাওয়া পাহাড়। আমি যেন গড়াগড়ি খাচ্ছি তুষার গালিচায়। আসলে উপর্যুপরি আঘাতে একটু একটু করে বিকল হয়ে যাচ্ছিল আমার মস্তিষ্ক। হান্স আমাকে জাপটে

না থাকলে কোন কালে গ্র্যানাইট দেওয়ালে লেগে গুঁড়িয়ে যেত আমার মাথার খুলি।

এই কারণেই এরপর কি-কি ঘটেছিল, তা সঠিক বলা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। আবছা মনে আছে, মুহুর্মুহু বিস্ফোরণ গর্জন চলন্ত পাথর আর লাট্টুর মত পাকসাট খাওয়া ভেলা। লাভাস্রোতের ওপর বন্‌বন্‌ করে ঘুরছি আমরা। মাথার ওপর ঝরঝর করে ঝরছে ছাই। চারপাশে লকলক করছে অগ্নিশিখা। পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে যেন তেড়েফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে সেই আগুন। ভীষণ গর্জন করে তাথৈ তাথৈ নাচ জুড়েছে আমাদের ঘিরে। শেষবারের মত আগুনের লাল আভায় দেখলাম হ্যান্সের নির্বিকার মুখ। শেষ অনুভূতি দিয়ে উপলব্ধি করলাম, আমি যেন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামী, আমাকে কামানের মুখে বেঁধে রাখা হয়েছে; আতংকে তেউড়ে গেছে আমার সর্বাঙ্গ, পর মুহূর্তেই কামান দাগা হল। আমার দেহটা নিক্ষিপ্ত হল শূন্যে। হাত-পাগুলো যেন নিমেষ মধ্যে উড়ে গেল বাতাসের সঙ্গে।

৪২ ॥ পৃথিবীপৃষ্ঠে

চোখ খুলে দেখলাম, শক্ত মুঠোয় আমার বেল্ট আঁকড়ে রয়েছে গাইড। আরেক হাতে ধরে আছে কাকাকে। আমার যে খুব একটা চোট লেগেছে তা নয়, তবে সারা দেহ ছড়ে গেছে, থেঁতলে গেছে, কালসিটে পড়েছে, শুয়ে আছি একটা পাহাড়ের গায়ে। মাত্র কয়েক ফুট দূরে একটা খাদ। একটু নড়াচড়া করলেই খাদে পিছলে যেতে পারি, এই ভয়ে হ্যান্স আমার বেল্ট ধরে আছে। জ্বালামুখের গা দিয়ে গড়িয়ে পড়ার সময়ে এই হ্যান্সই জীবনরক্ষা করেছে আমার।

"এলাম কোথায়?" কাকা এমনভাবে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলেন যেন ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসায় বিলক্ষণ ক্ষুব্ধ হয়েছেন তিনি।

কাঁধ ঝাঁকাল হ্যান্স। না, এ-জায়গা সে চেনে না।

"আইসল্যাণ্ডে", বললাম আমি।

"নেজ," একটু জোরেই বলল হ্যান্স। আইসল্যাণ্ডকে সে চিনবে না, একি হতে পারে?

পাতাল অভিযানে অগণিত বিস্ময় বিস্মিত করেছে আমাকে। পাতাল থেকে মর্ত্যে ফিরেও দেখছি বিস্ময়ের শেষ নেই। ভেবেছিলাম, বরফঢাকা পাহাড় দেখব, ধূ-ধূ প্রান্তর দেখব, উত্তর মেরু অঞ্চলের ম্যাড়মেড়ে রোদ্দুর

দেখব। কিন্তু এ-পাহাড় তো দেখছি কড়া রোদে ভাজা-ভাজা হতে বসেছে!

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে না পারলেও সারা গায়ের ফোস্কা আর ঝলসানির দাগগুলো তো উড়িয়ে দিতে পারি না। সামান্য অন্তর্বাস পরে অর্ধনগ্ন অবস্থায় আমরা প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছি জ্বলন্ত অগ্নিগিরির জঠর থেকে!

প্রখর আলোয় চোখ বন্ধ করে ফেলেছিলাম। আস্তে আস্তে আলো সয়ে যেতে ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম আমার হিসেবের সঙ্গে পাহাড়-পর্বতগুলো মিলে যাচ্ছে কিনা। ভেবেছিলাম, বড়জোর স্পিট বার্জেন পৌঁছোবো। কিন্তু এ জায়গা তো একেবারেই অচেনা।

কাকা বললেন—উত্তর অঞ্চলের ভলক্যানোর ঢালু গা গ্র্যানাইট পাথরের হয়। চূড়োয় থাকে বরফের টুপী। সুতরাং এদেশ আইসল্যাণ্ড নয়।

মাথার ওপর প্রায় পাঁচশ ফুট ওপরে একটা আগ্নেয়গিরি থেকে পনের মিনিট অন্তর প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যাচ্ছে। সেইসঙ্গে বেরোচ্ছে আগুন, ছাই, পাথর আর লাভা। গোটা পাহাড়টা কাঁপছে বিস্ফোরণের ধাক্কায়। ঠিক যেন তিমির নিঃশ্বাস। থেকে থেকে নাসিকাগহ্বর থেকে আগুন আর বাতাস নিক্ষেপ করছে শূন্যে। নীচে প্রায় সাত আটশ ফুট জায়গা জুড়ে তরল লাভার স্রোত নামছে খাড়াই ঢাল বেয়ে। পাহাড়টার উচ্চতা প্রায় ১৮০০ ফুট। সানুদেশ সবুজ গাছপালায় ঢাকা। থোকা থোকা আঙুর ঝুলছে। জলপাইগাছও রয়েছে।

এ-দৃশ্য তো মেরু অঞ্চলে দেখা যায় না।

মায়াকাননের মত সুন্দর অঞ্চলটা কিন্তু সাগর বা হ্রদের জল দিয়ে ঘেরা। মাইল কয়েক চওড়া একটা দ্বীপ। পূবদিকে ছোট্ট একটা বন্দর, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কয়েকটা বাড়ী। অদ্ভুত গড়নের খানকয়েক জাহাজ ভাসছে নীল জলে। পশ্চিমের দিগন্তে আবছা উপকূলের রেখা; পাহাড়ের সারি—আকাশচুম্বী একটা শিখরের শীর্ষে কুণ্ডলীপাকানো ধোঁয়া। উত্তরে দিগন্তবিস্তৃত জল; মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে জাহাজের পাল বা মাস্তুল।

অপরূপ দৃশ্য! চোখ জুড়িয়ে যায়। কিন্তু এ-দৃশ্য তো আশা করিনি?

"এ-কোথায় এলাম? এ-কোথায় এলাম?" আপন মনেই বকে যাচ্ছিলাম আমি। হান্স উদাসীন ভাবে চোখ বন্ধ করে বসেছিল। কাকার চাহনি দেখে বুঝলাম, সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে তাঁর।

অবশেষে বললেন কাকা—"পাথরে ঠুকে মাথাটা ছাতু হয়নি, এই যথেষ্ট।

খিদের চোটে অন্ধকার দেখছি। রোদের তাতও সহ্য হচ্ছে না। চলো, নীচে গিয়ে জিজ্ঞেস করা যাক কোথায় এলাম।"

লাভাস্রোত কাটিয়ে সাবধানে নীচে নামতে লাগলাম তিনজনে। নামতে নামতে উৎফুল্ল কণ্ঠে বললাম—"কাকা, আমরা এশিয়ায় এসে পড়েছি। ভূগর্ভ এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে উঠেছি অন্য দিকে।"

"কিন্তু তোমার কম্পাস কি বলে ?" বললেন কাকা।

ভড়কে গিয়ে বললাম—"কম্পাস! কম্পাসের দিকনির্দেশ অনুযায়ী আমরা আগাগোড়া উত্তর দিকেই এগিয়েছি।"

"তাহলে কম্পাস মিথ্যে বলেছে ?"

"কম্পাস আবার মিথ্যে বলবে কি ?"

"তাহলে কি এটা উত্তর মেরু ?"

"মেরু ? মোটেই না—"

রহস্য তো সেইখানেই। কি বলব ভেবে না পেয়ে চুপ করে গেলাম।

পাহাড়ের গোড়ায় নেমে গাছের ফল পেড়ে খেলাম মহানন্দে। থোকা থোকা আঙুর দিয়ে মেটালাম তৃষ্ণা। সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে ছুটে গিয়ে ছোট্ট একটা নদীতে মুখ হাত ধুচ্ছি, এমন সময়ে জলপাই গাছের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল একটা বাচ্চা ছেলে।

গরীবের ছেলে সন্দেহ নেই। জামা-কাপড়ের অবস্থা ভাল নয়। রুগ্ন চেহারা। দাড়ি-গোঁফ ভর্তি অর্ধ-উলঙ্গ তিন-তিনটে অদ্ভুত মানুষকে দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিল ছেলেটা। হান্স দৌড়ে গিয়ে খপ করে ধরে ফেলল তাকে।

অনেকগুলো ভাষায় কাকা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ-জায়গার নাম কী ?

ইটালিয়ান ভাষায় প্রশ্ন করতেই রাখাল ছেলেটা বললে—"স্ট্রম্বলী।" বলেই ভোঁ-দৌড় দিল গাছপালার মধ্যে দিয়ে।

স্ট্রম্বলী! কল্পনার ঝুঁটি ধরে নাড়া দিয়ে গেল এই একটি মাত্র শব্দ। স্ট্রম্বলী! ভূমধ্যসাগরের মাঝে এসে উঠেছি আমরা! পূবের পাহাড়গুলো তাহলে ক্যালাব্রিয়া! দক্ষিণ দিগন্তে ধোঁয়া ছাড়ছে ভয়ংকর এটনা! স্ট্রম্বলী! এক আগ্নেয়গিরি দিয়ে ভূগর্ভে ঢুকে বেরিয়ে এসেছি আরেক আগ্নেয়গিরি দিয়ে। আশ্চর্য অভিযান বটে!

স্নেফেল থেকে স্ট্রম্বলী যে তিন হাজার মাইল দূরে! কোথায় তুষারাবৃত মেরু-অঞ্চল। আর কোথায় শস্য-শ্যামলা সবুজ সিসিলি!

স্ট্রম্বলী বন্দরে পৌঁছে গোপন করে গেলাম কেন এরকম ভূতের মত চেহারা হয়ে আমাদের। সত্যি কথা বললেই তো কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইটালিয়ানরা

ধরে নেবে আমরা পাতাল থেকে উঠে আসা ভূত-প্রেত-দৈত্য-দানো। কি দরকার অত ঝামেলায়। মিথ্যে করে বললাম, জাহাজ-ডুবির ফলে এই হাল হয়েছে আমাদের।

জাহাজে উঠেও কিন্তু কাকার বকবকানি থামল না—"কম্পাস! বরাবর কম্পাসটার কাঁটা ছিল উত্তর দিকে। এ-রহস্যের ব্যাখ্যা কে করবে?"

"করার দরকারটা কি?" উৎফুল্ল কণ্ঠে বললাম আমি।

"বললেই হল? জোহান্নিয়ামে বক্তৃতা দেব কি করে? মহাজাগতিক রহস্যের ব্যাখ্যাটা না দিলে মাথা কাটা যাবে না?"

বলতে বলতে কাকা আগেকার মত বদমেজাজী হয়ে উঠলেন। খালি গায়ে, কোমরে টাকার ব্যাগ সমেত বেল্ট, নাকের ডগায় চশমা—প্রফেসর লিডেনব্রকের সেই তেরিয়া মূর্তি দেখে মানে মানে সরে পড়লাম আমি।

৪৭॥ বাড়ীতে

আশ্চর্য এই উপাখ্যান বিশ্বাস করা না করা পাঠক-পাঠিকার অভিরুচি। কিন্তু মানুষ জাতটা কি বিশ্বাস করে, আর কি করে না তা' নিয়েও আমার মাথাব্যথা নেই। অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখে পোড় খেয়ে গেছি তো।

হামবুর্গে পৌঁছোলাম সেপ্টেম্বরের ন তারিখে। মার্থা আমাদের দেখে চোখ কপালে তুলে ফেলল। আমরা যে পৃথিবীর কেন্দ্রে গিয়েছি, মার্থা সে কথাটি কাউকে বলতে বাকী রাখেনি। শুধু হামবুর্গ কেন সারা পৃথিবী জেনে গিয়েছিল আমরা কোথায় গিয়েছি। সুতরাং আমাদের সশরীরে ফিরে আসতে দেখে হামবুর্গ শহর ভেঙে পড়ল আমাদের দেখতে।

গ্রোবেন শুধু বললে—"অ্যাকজেল, তুমি বিখ্যাত হয়ে গেছো। ব্যস, আমাকে ছেড়ে আর কোথাও যাওয়া চলবে না।"

দারুণ নামডাক হল কাকার, সেই সঙ্গে তাঁর ভাইপোর। শেষেরটা হওয়া উচিত ছিল না। খাতির করে হামবুর্গ শহর আমাদের পেট ভরে একদিন খাইয়ে ছিল। ভোজ সভায় কাকা সাড়ম্বরে বর্ণনা করলেন পাতাল অভিযানের লোমহর্ষক কাহিনী। বাদ দিলেন শুধু একটা প্রসঙ্গ। কম্পাসের রহস্যজনক আচরণ।

মানুষের নামডাক হলেই শত্রু বাড়ে। কাকাকেও চ্যালেঞ্জ করে চিঠি আসতে লাগল বিস্তর। ভূকেন্দ্রের উত্তাপ অসহনীয়, এই থিওরীর প্রবক্তারা একযোগে আক্রমণ করলেন কাকাকে। সারা পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের বুঝিয়ে দিলেন কাকা—থিওরীটা নাকচ করা দরকার।

আমার কিন্তু এখনো বিশ্বাস, ভূকেন্দ্রে এখনো আগুন জ্বলছে। স্বচক্ষে অনেক কিছু দেখে আসার পরেও এ-বিশ্বাস আমার আছে এবং থাকবে।

আমাদের বন্ধু, পথপ্রদর্শক এবং পরম উপকারী হান্স দেশের জন্যে মন কেমন করায় আইসল্যাণ্ড ফিরে গেছে। হামবুর্গ তার ভাল লাগেনি।

'জার্নি টু দি সেণ্টার অফ দি আর্থ' সারা পৃথিবী জুড়ে সাংঘাতিক আলোড়ন এনেছে। সব ভাষাতে অনূদিত হয়েছে। সব চাইতে বেশী কাটতিওয়ালা খবরের কাগজগুলোর মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছিল চাঞ্চল্যকর কাহিনীটা সবার আগে ছাপবার জন্যে। ছাপবার পরেও বাদানুবাদ, আক্রমণ, প্রতি-আক্রমণের ঝড় উঠেছিল বিশ্বাসী আর অবিশ্বাসীদের মধ্যে। কাকা তো রাতারাতি পৃথিবী বিখ্যাত হয়ে গেলেন এবং আমেরিকায় তাঁকে একটা "প্রদর্শনী"তে নিয়ে যাওয়ার আমন্ত্রণও এল।

এত যশখ্যাতি গৌরব আনন্দর মধ্যেও একটা ব্যাপার নিরন্তর মুষড়ে রাখত তাঁকে। কম্পাসের সৃষ্টিছাড়া আচরণের অর্থটা কিছুতেই ধরতে পারছিলেন না উনি। বৈজ্ঞানিকের কাছে এ জাতীয় রহস্য মানসিক নির্যাতন ছাড়া কিছুই নয়। কাকা বড়ই বিড়ম্বনার মধ্যে ছিলেন কম্পাসের উল্টোপাল্টা ব্যবহারের জন্যে।

একদিন তার পড়ার ঘরে খনিজ আকর সাজিয়ে রাখতে রাখতে হঠাৎ আমার চোখ পড়ল কম্পাসটার ওপর। আরেকটা কম্পাসের পাশেই পড়েছিল পড়েছিল পাতাল অভিযানের নিত্য সঙ্গী সেই বিখ্যাত কম্পাসটি। ছমাস হল কম্পাসটি পড়ে সেখানে। অথচ তাকে নিয়ে ভেবে ভেবে পাগল হতে বসেছেন আমার কাকা।

আচমকা সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। দৌড়ে ঘরে ঢুকলেন কাকা--"কি হল?"

"কম্পাসটা!"

"কি হয়েছে কম্পাসের?"

"কাঁটা দক্ষিণ দিকে ফিরে আছে—উত্তর দিকে নয়!"

"কি বললে?"

"দেখুন, অক্ষপ্রান্ত দুটো পালটা পালটি হয়ে গিয়েছে।"

"পালটা পালটি হয়ে গিয়েছে!"

বিখ্যাত কম্পাসটির সঙ্গে পাশের কম্পাসটি মিলিয়ে দেখলেন কাকা। তারপর মহানন্দে এমন একটা চীৎকার ছাড়লেন যে কেঁপে উঠল ছোট্ট বাড়ীটা।

একই সঙ্গে কম্পাস-রহস্যের সমাধান দেখা দিল ওঁর আর আমার মধ্যে।

বললেন কাকা—"বটে! সাকন্যুউজম অন্তরীপে পৌঁছোনোর পর পাজী কম্পাসটা তাহলে উত্তর মুখো না হয়ে দক্ষিণ মুখো হয়েছিল?"

"যা বলেছেন।"

"আমাদের ভুলটাও তাহলে এবার ধরা পড়ল। কিন্তু অক্ষপ্রান্ত পালটা পালটি হল কেমন করে?"

"খুব সহজে।

"খুলেই বলো না বাবা।"

"লিডেনব্রক সাগরে ঝড়ের সময়ে আগুনেব গোলাটা ভেলার ওপর সমস্ত লোহাকে চুম্বক বানিয়ে ছেড়েছিল—ফলে পালটা পালটি হয়ে গিয়েছিল কম্পাসেব অক্ষপ্রান্ত।"

"তাই বলো।" হাসতে হাসতে গড়িয়ে পডলেন কাকা।

"তড়িৎ শক্তির ডাহা ফাজলামি নিয়ে অ্যাদ্দিন ভেবে মবছি আমি।"

সেইদিন থেকে সুখেব অন্ত বইল না আমার বৈজ্ঞানিক কাকার, সেই সঙ্গে আমান। কেন না, যথা সময়ে গ্রোবিনেব সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল আমাব। আমাদেব দুজনেব কাকা হয়ে বইলেন পৃথিবী বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রফেসর অটো লিডেনব্রক—বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব আর খনিজ তত্ত্ব সম্পর্কিত যাবতীয় সোসাইটিব সদস্য।

অ্যাডভেঞ্চার্স অফ ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস

প্রথম খণ্ড : অসম্ভবের অভিযান

....

মহাকাশ অভিযান নিয়ে আজকাল যেমন মাতামাতি, ঠিক এই রকম উন্মাদনা ছিল মেরু অভিযান সম্পর্কে উনবিংশ শতাব্দীতে এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। টাকা যায় যাক, জীবনহানিও ঘটুক, লাভক্ষতির চিন্তা শিকেয় থাকুক—কিন্তু বরফের দেশে যাওয়া চাই।

উত্তর মেরু অভিযান কিন্তু তখন খুবই দুর্ঘট। অথচ প্রাচ্যের সমৃদ্ধ দেশগুলোয় বাণিজ্য করার জন্যে একটা সোজা পথ চাই। কেপহর্ণ ঘুরে যেতে চায় না কেউই। এই সোজা পথ আবিষ্কার করার জন্যে দুঃসাহসীরা উত্তর মেরুর ওপর দিয়েও চীন যেতে প্রস্তুত ছিল।

এখন তা অসম্ভব মনে হলেও, সেযুগে কিন্তু মনে হত খুবই সম্ভব। সুমেরু সম্বন্ধে কেউই তখন বিশেষ কিছু জানত না। বরং, ধারণা ছিল সুমেরুর ঠিক কেন্দ্রে বরফশূন্য সমুদ্র আছে, উর্বর ভূমি আছে। এই ধারণা বহুবার প্রতিফলিত হয়েছে ভের্ণের রচনায়।

যদিও এই কাহিনীর নায়করা বৃটিশ, কিন্তু কাহিনীর শেষটা পড়ে কোনো বৃটিশই খুশী হবেন না।

জুল ভের্ণ রচিত 'অত্যাশ্চর্য অভিযান লহরী'র চতুর্থ কাহিনী এটি। কাহিনীটা কিন্তু 'ফাইভ উইকস ইন এ বেলুন', 'জার্নি টু দি সেণ্টার অফ দি আর্থ' এবং 'ফ্রম আর্থ টু দি মুন'য়ের মত নয়—'মিস্টিরিয়াস আয়ল্যাণ্ডে'র মত অ্যাডভেঞ্চার-ঠাসা।

....

১ ॥ ফরোয়ার্ড

পাঁচই এপ্রিল, ১৮৬০ তারিখে খবরটা বেরোলো 'লিভারপুল হেরাল্ডে'। পরের দিনই নাকি অজ্ঞাত অঞ্চলে রওনা হচ্ছে 'ফরোয়ার্ড' জাহাজটা।

নিউ প্রিন্স ডক থেকে রোজ অমন কত জাহাজ ছাড়ে, কে তার খবর রাখে? ৪ মাইল লম্বা ডকে দেশবিদেশের কত জাহাজ যে গায়ে গা দিয়ে

ভাসছে, কেউ তার হিসেবও রাখে না। তা সত্ত্বেও ছুটির তারিখে পিল পিল করে লোক আসতে লাগল ডেকে। মিনিটে মিনিটে বাসভর্তি লোক এসে নামতে লাগল ডেকে— প্রত্যেকেই 'ফরোয়ার্ডে'র সমুদ্রযাত্রা দেখে নয়ন সার্থক করতে চায়।

'ফরোয়ার্ড' জাহাজটা ইঞ্জিনে চলে, আবার পালেও চলে। এ ছাড়াও সে জাহাজে এমন কয়েকটা বৈশিষ্ট্য আছে, যা অভিজ্ঞ লোকের চোখ এড়ায়নি। এই নিয়েই জল্পনাকল্পনা হচ্ছিল পাশের জাহাজে। পালের আকার দেখে কেউ বলছিল—এ জাহাজ নিশ্চয় উত্তর মেরু যাচ্ছে। ভাসমান শিলায় হাওয়া আটকে যায় সেখানে। তাছাড়া জাহাজে নাকি পাঁচ ছ বছরের উপযোগী খাবারদাবার, কয়লা এবং বাণ্ডিল বাণ্ডিল উল আর সীলের চামড়ার জামা-কাপড় তোলা হয়েছে। অথচ ফরোয়ার্ড জাহাজের কেউ জানে না কোথায় যেতে হবে তাদের। কিন্তু পাঁচ গুণ মাইনে পেয়ে কেউ আর উচ্চবাচ্য করছে না।

বাস্তবিকই ব্যাপারটা রহস্যজনক। ফরোয়ার্ডের ক্যাপ্টেন নিপাত্তা। অথচ ক্যাপ্টেন হবার সব যোগ্যতা যার আছে, তাকে এনে 'মেট' করা হয়েছে, নাম তার শানডন। ঝুঁদে লোক। তিমি জাহাজে কাজ করেছে। কিন্তু পাঁচ গুণ মাইনে পেয়েও সে-ও সুড় সুড় করে উঠে এসেছে মেট-য়ের চাকরী নিয়ে—ক্যাপ্টেনকে দেখেওনি। কোথায় যেতে হবে, তাও জানে না।

সবচাইতে বেশী গুজব ছড়িয়েছে একটা কুকুরকে নিয়ে। শহরশুদ্ধ লোক ভেঙে পড়েছে সেই কারণেই। ফরোয়ার্ড জাহাজের ক্যাপ্টেন নাকি আসলে একটা কুকুর!

বেশ কিছুদিন ধরেই 'ফরোয়ার্ড' জাহাজটা ভাবিয়ে তুলেছে সবাইকে। রিচার্ড শানডন দেদার টাকা ঢেলে প্ল্যানমত জাহাজ বানিয়েছে ভীষণ মজবুত করে। ষোল পাউণ্ড কামান বসিয়েছে ডেকে। ১২০ অশ্বশক্তিসম্পন্ন ইঞ্জিন বানিয়ে এনেছে নিউক্যাসল-য়ের একটা কারখানা থেকে। একচক্কর টহল দিয়ে আসার পর জাহাজে তুলেছে ছ বছরের উপযুক্ত খাবারদাবার। ওষুধের বাক্সর ওপর বেশী নজর দিয়েছে শানডন। জাহাজে কামানবন্দুক তেমন কিছু না থাকলেও বারুদ তোলা হয়েছে বিস্তর। নেওয়া হয়েছে হাজার হাজার রকেট, সিগন্যাল-বাতি, বিরাট আকারের করাত এবং অদ্ভুত যন্ত্রপাতি।

পুরো ব্যাপারটাই একটা হেঁয়ালি। কোথায় যেতে চায় 'ফরোয়ার্ড' জাহাজ?

২॥ অপ্রত্যাশিত চিঠি

আট মাস আগে একটা রহস্যজনক চিঠি পেয়েছিল রিচার্ড শানডন। চিঠিটা এই :

অ্যাবারডন,
দোসরা আগস্ট, ১৮৫৯

রিচার্ড শানডন, লিভারপুল সমীপেষু

মহাশয়,

স্নাকুয়ার্ট কোম্পানীর ব্যাঙ্কে ষোল হাজার পাউণ্ড জমা রেখেছি। আমার সই করা অনেকগুলো চেক এই সঙ্গে দিলাম। যখন খুশী টাকা তুলবেন। আপনি আমাকে চেনেন না—কিন্তু আমি আপনাকে চিনি। সেইটাই যথেষ্ট।

'ফরোয়ার্ড' জাহাজে চীফ অফিসার হওয়ার প্রস্তাব জানাচ্ছি আপনাকে। রাজী থাকলে পাঁচশ পাউণ্ড বেতন পাবেন। ফি-বছর পঞ্চাশ পাউণ্ড মাইনে বাড়বে। অভিযানটা কিন্তু বিপদসঙ্কুল এবং দীর্ঘদিনের।

'ফরোয়ার্ড' জাহাজ এখনো তৈরীই হয়নি। জাহাজ তৈরীর প্ল্যান এইসঙ্গে দিলাম। হুবহু এই নক্সা অনুযায়ী জাহাজ বানিয়ে নিন।

তারপর বেছে বেছে পনেরো জন কর্মচারী নিয়োগ করুন। আপনাকে এবং আমাকে নিয়ে হবে সতেরোজন। আরেকজন আসবেন যথা সময়ে—নাম তাঁর ডক্টর ক্লবোনি।

মাঝিমাল্লা সবাই ইংরেজ হওয়া চাই। এ ছাড়াও প্রত্যেককে নিঃসন্তান এবং অবিবাহিত হতে হবে। মদ-ফদ একদম খাওয়া চলবে না জাহাজে। স্বাস্থ্য মজবুত হওয়া চাই। পাঁচ গুণ মাইনে দেবেন এদের—বছরে বছরে মাইনে বাড়বে শতকরা দশ ভাগ। অভিযান শেষে প্রত্যেকে পাবে পাঁচশ পাউণ্ড বাড়তি—আপনি পাবেন দু হাজার পাউণ্ড।

রাজী থাকলে চিঠি লিখে জবাব দিন। ঠিকানা—কে. জেড, পোস্ট রেস্তানডে, গোটবর্গ, সুইডেন।

পনেরোই ফেব্রুয়ারী একটা বিরাট ড্যানিশ কুকুর পৌঁছোবে আপনার কাছে। রক্ষণাবেক্ষণের ভার আপনার। কুকুর পেলেন কিনা, ইটালীর পোস্ট-মাস্টারের ঠিকানায় জানিয়ে দেবেন।

ফরোয়ার্ডের ক্যাপ্টেন আবির্ভূত হবেন তখনই যখন তাঁর দরকার হবে। তাঁকে ছাড়াই জাহাজ চালাবেন আপনি লিখিত নির্দেশ অনুসারে।

কে. জেড
ফরোয়ার্ডের ক্যাপ্টেন

৩॥ ডক্টর ক্লবোনি

রিচার্ড শানডন পাকা নাবিক। সুমেরু অঞ্চলে দীর্ঘকাল সে শিকার করেছে। বিয়ে করেনি, বাচ্চাকাচ্চা নেই, সংসারে আপনজন কেউ নেই। মাথাটি খুব ঠাণ্ডা বলেই অদ্ভুত এই চিঠি পড়ে উত্তেজিত হল না।

সটান গেল মার্ক্যাট ব্যাঙ্কে। গিয়ে যখন দেখল সত্যিই তার জন্যে ষোল হাজার পাউণ্ড জমা পড়েছে, সেইখানেই বসে এক তা কাগজ নিয়ে কে. জেডকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিল তার সম্মতি। তারপর গেল জাহাজ তৈরীর কারখানায়। চব্বিশ ঘণ্টা যেতে না যেতেই শুরু হয়ে গেল ফরোয়ার্ড নির্মাণ পর্ব।

রিচার্ড শানডনের বয়স চল্লিশ। অবিবাহিত। ভীষণ খাটতে পারে, খাটাতেও পারে। তা সত্ত্বেও কাজের লোকেব অভাব হয় না। কারণ, নেতৃত্ব তার রক্তে।

কে. জেড লোকটি যতই রহস্যময় হোক, তিনি যখন তাকে বিশ্বাস করেছেন অথচ গন্তব্যস্থান ফাঁস করেননি—রিচার্ড শানডন সেই বিশ্বাসের মর্যাদা পুরোপুরি দেবে—কিন্তু লোকজনকে গন্তব্যস্থান সম্পর্কে উচ্চবাচ্য করবে না।

তাই প্রথমেই সেকেণ্ড মেট অফিসারের পদে নিয়ে এল জেমস ওয়াল-কে। বছর তিরিশ বয়স তাব। উত্তরে গিয়েছে বহুবার। ঝানু নাবিক। কাজ-পাগল বলেই জেমস ওয়াল জিজ্ঞেসও করল না কোথায় যেতে হবে।

তারপর চাকরী পেল জনসন। ডেক-নাবিকদের অফিসার করা হল তাকে।

এবার তিনজনে মিলে বেরোলো অন্যান্য লোকজন খুঁজতে। কোথায় যেতে হবে জানতে না পেরে চম্পট দিল অনেকেই। তা সত্ত্বেও মজবুত চেহারাব নাবিক পাওযা গেল শেষ পর্যন্ত। ধর্মে প্রত্যেকেই প্রোটেস্ট্যাণ্ট। রিচার্ড শানডন জানে, সমুদ্রযাত্রায় সংকট মুহূর্তে সমবেত প্রার্থনা মনকে বলীয়ান করতে পারে। সেক্ষেত্রে সকলের ধর্মমত এক হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

লোকজন সংগ্রহের পর খাবারদাবার, যন্ত্রপাতি, জামাকাপড় ইত্যাদি কিনতে বেরোলো শানডন। ফাঁকে ফাঁকে জাহাজ কারখানায় গিয়ে দেখে আসত উল্টোনো তিমি মাছের মত পাঁজরা বার করা ফরোয়ার্ড জাহাজকে।

তেইশে জানুয়ারী সকালবেলা রোজকার মত ফেরী নৌকোয় চেপে জাহাজ কারখানায় রওনা হল শানডন। সেদিন এত কুয়াশা যে কম্পাস দেখে নৌকো

চালাতে হচ্ছে। অথচ পথ মাত্র দশ মিনিটের। অত কুয়াশার মধ্যেও এক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন শানডনের দিকে। ভদ্রলোক খর্বকায়, একটু মোটা, বুদ্ধিদীপ্ত মুখ, আমুদে চোখ, অমায়িক আচরণ। এগিয়ে এসেই সজোরে শানডনের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিলেন।

শানডন দেখল, লোকটার চোখ ছোট ছোট—ধীমান ব্যক্তিদের চোখের মত। কিন্তু আত্যন্তিক উত্তেজনা আর আত্মশক্তিতে ভরপুর। কথা বলছেন অনর্গল—কথা না বললে বুঝি দমাস করে ফেটে পড়বেন ভেতরকার শক্তিতে। কিন্তু এত দ্রুত কথা বললে কিছু বোঝা যায়? শানডনও তাঁর অনর্গল বক্তৃতার একটি বর্ণও বুঝতে পারল না।

আচম্বিতে একটা সন্দেহ বিদ্যুৎ ঝলকের মত খেলে গেল মাথায়। তুবড়ির বেগে কথা বলতে বলতে অচেনা ভদ্রলোক নিঃশ্বেস নেওয়ার জন্যে একটু থামতেই জিজ্ঞেস করল রুদ্ধশ্বাসে—"আপনিই কি ডক্টর ক্লবোনি?"

"বলা বাহুল্য! কম্যাণ্ডার, ঝাড়া পনেরো মিনিট আপনাকে খুঁজছি—আর পাঁচ মিনিট খোঁজবার পর ধবে নিতাম কম্যাণ্ডার রিচার্ড শানডন নামে কেউ নেই। যাক বাঁচা গেল, আপনি তাহলে আছেন? আমি তো ভেবেছিলাম রিচার্ড শানডন একটা কিংবদন্তী। হাতে হাত মেলান মশায়।"

"কিন্তু ডক্টর ক্লবোনি—"

"ফরোয়ার্ড জাহাজে শুরু হবে দুজনের অভিযান।"

"কিন্তু—"

"খবরদার! কোনো ছুতা-নাতায় ফিরে আসা চলবে না।"

"আমার কথাটা—"

"আপনাকে নিয়ে আমার ভয় নেই। মজবুত নাবিক আপনি।"

"আমাকে একটু—"

"সাহস আপনার অসীম। উপযুক্ত অফিসার নির্বাচন করেছেন ক্যাপ্টেন।"

"তা করেছেন। কিন্তু দয়া করে আমাকে একটু কথা বলতে দেবেন কি?"

"কেন দেবো না?"

"আপনি এই অভিযানে এলেন কি ভাবে?"

"এই ভাবে," বলে একটা চিঠি বাড়িয়ে ধরলেন ডক্টর ক্লবোনি। সংক্ষিপ্ত চিঠি।

ইনভারনেস
২২শে জানুয়ারী, ১৮৬০

ডক্টর ক্লবোনি, লিভারপুল

সমীপেষু—

ফরোয়ার্ড জাহাজে চেপে দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় যদি অভিরুচি থাকে, কম্যাণ্ডার রিচার্ড শানডনের সঙ্গে দেখা করুন।

কে. জেড

ফরোয়ার্ডের ক্যাপ্টেন

ডক্টর বললেন—"চিঠিখানা পেলাম একটু আগে।"

শানডন বললে—"কিন্তু যাচ্ছেন কোথায় জানেন কি ?"

"জানার দরকার কি ? লোকে বলে নাকি আমি মহাপণ্ডিত। কিন্তু কেউ খবর রাখে না, এখনও কিস্সু জানা হয়নি আমার। খানকয়েক বই লিখেছি ঠিকই—খুব খারাপ বিক্রী হয়নি। তবুও বলব আমি কিছু জানি না। তাই জানবার জন্যেই ফুরসৎ পেলেই বেরিয়ে পড়ি বাইরে। ওষুধপত্র, সার্জারি, ইতিহাস, ভূগোল, উদ্ভিদবিদ্যা, খনিজবিদ্যা, শঙ্খবিদ্যা, ভূতত্ত্ববিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, যন্ত্রবিদ্যা, সরোবর ইত্যাদি বিদ্যায় যা কিছু হাতেখড়ি, তা ঝালিয়ে নিতেই বেরিয়ে পড়তে চাই সমুদ্রে।"

"কিন্তু কোথায় ? কোন দিকে ?"

"যেদিকে অনেক কিছু শেখবার আছে, জানবার আছে—অনেক দেশ, অনেক মানুষ, রীতিনীতি দেখবার আছে—সেইদিকে।"

"কিন্তু সেটা কোন দিকে ?"

"শুনেছি তো উত্তর দিকে।"

"ক্যাপ্টেন কে, জানেন ?"

"না। না জানলেও বলব তিনি লোক অতিশয় ভাল।"

জাহাজ কারখানায় নেমে পড়ল দুজনে। পাঁজরা বার করা ফরোয়ার্ড দেখে উল্লসিত হলেন ডক্টর। ভদ্রলোক এ জাহাজে ডাক্তারীর চাকরী পেয়েছেন। পঁচিশ বছর বয়সে তিনি চিকিৎসক হয়েছিলেন—চল্লিশে দেখা গেল তিনি নানা বিষয়ে সুপণ্ডিত হয়ে উঠেছেন। ফরোয়ার্ড জাহাজে চাকরী নিয়ে অজানা দেশে পাড়ি দিতে যাচ্ছেন শুনে বন্ধুবান্ধবরা বাধা দিয়েও পারেনি। আরো গোঁ চেপে গিয়েছিল ডক্টরের।

পাঁচই ফেব্রুয়ারী জাহাজ ভাসল জলে।

পনেরোই মার্চ এডিনবরা থেকে একটা ড্যানিশ কুকুর এসে পৌঁছোলো। বিষাদ মাখা চোখ এবং একটু অদ্ভুত। গলায় তামার কলার। তাতে লেখা 'ফরোয়ার্ড'। শানডন কুকুর নিয়ে উঠল জাহাজে।

শেষ পর্যন্ত ফরোয়ার্ড জাহাজে আঠারোজন দুঃসাহসীর নামের লিস্ট তৈরী হল এইভাবে:

১, কে জেড, ক্যাপ্টেন; ২, রিচার্ড শানডন, ফার্স্ট মেট; ৩, জেমস ওয়াল, সেকেণ্ড মেট; ৪, ডক্টর ক্লবোনি; ৫, জনসন, ডেক নাবিকদের অফিসার; ৬, সিম্পসন, হার্পুনার; ৭, বেল, ছুতোর; ৮, ব্রানটন, চীফ ইঞ্জিনীয়ার; ৯, প্লোভার, সেকেণ্ড ইঞ্জিনীয়ার; ১০, স্ট্রং (নিগ্রো), রাঁধুনী; ১১, ফোকার, বরফ-সর্দার; ১২, ওলসটন, কামার; ১৩—১৭, বোল্টন, গ্যারী, ক্লিফটন, গ্রিপার, পেন, নাবিকগণ; ১৮, ওয়ারেন, কয়লা জোগানদার।

৪ ॥ কুকুর ক্যাপ্টেন

পাঁচই এপ্রিল রওনা হওয়ার কথা। শানডন ঝটপট বেরিয়ে পড়তে চায় সমুদ্রে—তা না হলে উদ্বেগ সইতে না পেরে খালাসীদের কেউ কেউ ভেগে পড়তেও পারে। একবার জলে ভাসলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

ইতিমধ্যে যে যার কেবিন সাজিয়ে নিয়েছে। রহস্যাবৃত ক্যাপ্টেনের ঘরে তালা ঝুলছে—চাবী পরিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁর লুবেকের ঠিকানায়। এই কেবিনের জানলার সামনে কুকুরের ঘর। কিন্তু অদ্ভুত কুকুরটা ঘরের চাইতে বাইরে টহল দেওয়াই বেশী পছন্দ করে। ঠিক যেন স্বয়ং ক্যাপ্টেন ঘুরছেন রেলিং বরাবর। সমুদ্র যাত্রায় যে সে অভ্যস্ত—চালচলন দেখলেই বোঝা যায়।

তবে বড় বেয়াড়া কুকুর। রাতবিরেতে এমন ককিয়ে কেঁদে ওঠে যেন মনিবের জন্যে বুক ফেটে যাচ্ছে। অথচ কারো পোষ মানতেও রাজী নয়। কুকুর অভিধানে যত নাম আছে, সব নামে তাকে ডাকা হয়েছে—কিন্তু সাড়া দেয়নি। ডক্টর ক্লবোনি বনের বাঘকেও পোষ মানাতে পারেন মিষ্টি কথায়—কিন্তু হার মানলেন সৃষ্টিছাড়া এক কুকুরটার কাছে। নাবিকরা তো কানা ঘুসো আরম্ভ করে দিল। এ-কুকুর শয়তানের চেলা। যথা সময়ে নাকি নররূপ ধারণ করবে এবং কুকুর-গলায় হুকুম জারী করবে।

পেন নামে এক নিষ্ঠুর নাবিক একদিন তাকে জখম করতে গিয়ে নিজেই নিজের মাথা ফাটিয়ে বসল। সেই থেকে রহস্যজনক কুকুর সম্বন্ধে ভীতি আরো

ব্যাপক হল জাহাজময়। কেউ কেউ তো বলতে লাগল, যথা সময়ে এই কুকুর মানুষের চেহারা নেবে।

ডক্টর ক্লবোনি তাঁর লম্বা চওড়ায় ছফুট কেবিনটির মধ্যে রাজ্যের বিজ্ঞান-শাস্ত্র জড়ো করেছেন। হাত বাড়ালেই পাবেন ওষুধপত্র থেকে আরম্ভ করে শব্দশাস্ত্র পর্যন্ত সব কিছুর রেফারেন্স। শিশুর মতই সরল ভদ্রলোক। জিনিসপত্র এমনভাবে গুছিয়েছেন এই কদিন—বৃটিশ মিউজিয়ামও সে তুলনায় কিছু নয়।

যাত্রার আগের দিন সন্ধ্যায় খেতে বসে কথা হচ্ছিল অদৃশ্য ক্যাপ্টেনের শেষ আদেশ সম্পর্কে। তিনি চিঠি লিখে আদেশ না দিলে জাহাজ ছাড়া সম্ভব নয়। অথচ নাবিকরা আতংকে কাঠ হয়ে আছে। পরিচিত বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনরা উস্কানি দিচ্ছে জাহাজ ছেড়ে লম্বা দেওয়াব জন্যে। কোন চুলোয় জাহাজ যাবে—কেউ জানে না; জাহাজের ক্যাপ্টেনও অদৃশ্য। কি দরকার অমন অভিযানে গিয়ে?

সুতরাং মহাভাবনায় পড়েছে শানডন। আগামীকাল চিঠি যদি নাও আসে, জাহাজ সে ছাড়বেই। নইলে, নাবিকরা পালাবে।

সকাল হল। জাহাজে দর্শক গিজগিজ করছে। দশটা বাজল। এগারোটা বাজল অথচ চিঠি এল না। বারোটার ডাক এসে গেল—তখনও চিঠি এল না।। এদিকে একটার সময়ে ভাঁটার টান শুরু হবে। জোয়ার থাকতে থাকতেই রওনা না হলে তো বেরোনো যাবে না!

শানডন আর সহ্য করতে পারল না। হুকুম দিল জাহাজ ছাড়ার। দর্শকদের হটিয়ে দেওয়া শুরু হল ডেক থেকে।

ঠিক সেই সময়ে কুকুরের ডাক শোনা গেল। ঘেউ ঘেউ করে চেঁচাতে চেঁচাতে রহস্যময় সেই কুকুরটা ভীড়ের মধ্যে থেকে তীরের মত ছুটে এল কর্তাদের দিকে—হাজার হাজার দর্শক দেখলে—কুকুরের দাঁতের ফাঁকে একটা খাম!

"চিঠি! চিঠি! চিঠি!" সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল শানডন—"সেকী! উনি কি তাহলে ডেকেই রয়েছেন!"

"ছিলেন এতক্ষণ, নেমে গেলেন এইমাত্র", পাতলা হয়ে যাওয়া ভীড়ের দিকে তাকিয়ে বলল জনসন।

ডক্টর হাঁক দিলেন সোল্লাসে—"এদিকে, ক্যাপ্টেন, এদিকে!"

কিন্তু আশ্চর্য কুকুরটা ডক্টরের হাতের মধ্যে দিয়ে গলে ছিটকে এল শানডনের পানে। চিঠিখানা টুপ করে তার পায়ের ওপর ফেলে দিয়ে গুরু গম্ভীর গলায় ডেকে উঠল গুণে গুণে তিনবার!

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল শানডন। সম্বিৎ ফিরল ডক্টরের কথায়—"চিঠিখানা দেখবেন তো?"

চিঠি তুলে নিল শানডন। খামের ওপর ডাকঘরের ছাপ নেই, তারিখ নেই। শুধু শানডনের নাম। ভেতরে একটি কাগজে লেখা:

ফেয়ারওয়েল অন্তরীপ অভিমুখে রওনা হোন। বিশে এপ্রিল পৌঁছোবেন সেখানে। ক্যাপ্টেন সেখানেও আবির্ভূত না হলে ডেভিস প্রণালী পেরিয়ে বাফিন উপসাগরের মধ্যে দিয়ে যাবেন মেলভিল উপসাগরে।- কে-জেড

৫ ॥ সমুদ্রে

জাহাজ জলে ভাসতেই সহজ হয়ে এল অশান্ত নাবিকরা। জলযাত্রার মজা তো এইখানেই। যত কিছু ভয় যাত্রার আগে—একবার বেরিয়ে পড়লে আর ভয় নেই।

দিন কয়েক পরে পাল তুলে দিয়ে জোর হাওয়ায় তরতরিয়ে ছুটে চলেছে ফরোয়ার্ড, এমন সময়ে ডেকের ওপর উড়ে এল পেট্রেল আর পাফিন পাখী। দুটোই সামুদ্রিক পাখী। পাফিন পাখীগুলো আকারে পায়রার চাইতে একটু বড়।

ডক্টর গুলি করে একটা পাফিন নামিয়ে আনলেন ডেকের ওপর। হার্পুনার সিম্পসন কুড়িয়ে আনল মরা পাখীটা।

বলল—"ডক্টর, খাবার হিসেবে একেবারেই অখাদ্য এ-পাখী। কেন মারলেন?"

অট্টহেসে বললেন ডক্টর—"সামুদ্রিক পাখীরা খেতে খারাপ জানি। বড্ড গন্ধ। কিন্তু এটিকে আমি এমন করে রাঁধবো যে তোমার জিভে জল এসে যাবে।"

অবাক হয়ে সিম্পসন বললে—"আপনি রান্নাবান্নাও জানেন?"

"তবে আর পণ্ডিত হলাম কিসে? চৌষোট্টি কলা জানতে হয় আমাদের।"

ডক্টর কিন্তু বাড়িয়ে বলেন নি। পাফিন পাখীর চামড়ার ঠিক নীচেই চাবর স্তর উনি তুলে ফেলে দিলেন, ডাবনা থেকেও চর্বি চেঁচে ফেললেন। এই চর্বির জন্যেই আঁশটে গন্ধ হয় সামুদ্রিক পাখীর মাংসে। তারপর মশলাপাতি দিয়ে এমন ঝোল রাঁধলেন যে সিম্পসন তো অবাক!

চোদ্দই এপ্রিল গালফস্ট্রীমে ঢুকল ফরোয়ার্ড। গ্রীনল্যাণ্ডের ছুঁচোলো প্রান্ত এখান থেকে দুশ মাইল দূরে।

ঠাণ্ডা এখনো পড়েনি। শীতের জামা কাপড়ের দরকারও হয়নি। ডক্টর কিন্তু চকচকে চামড়ার জ্যাকেট আর লম্বা বুট জুতোয় দুটো পা পুরোপুরি ঢেকে সামুদ্রিক জন্তুর মত ঘুরে বেড়াতে লাগলেন ডেকে। সে কি ফুর্তি তাঁর!

এই সময়ে দূরে দেখা গেল ভাসমান বরফ খণ্ড!

অবাক হল শানডন। উত্তরমেরু এখন কোথায়? কিন্তু এত দূরে হিমশিলা ভাসছে কেন?

হা-হা করে হেসে উঠে ডক্টর শুনিয়ে দিলেন ইতিহাস প্রসিদ্ধ কয়েকটি সমুদ্রযাত্রার কাহিনী। সাল তারিখ দিয়ে বলে দিলেন কবে কখন কোথায় ভাসমান বরফখণ্ড দেখা গেছে সুমেরু থেকে চল্লিশ বিয়াল্লিশ ডিগ্রী দূরেও। সুতরাং এত অবাক হবার কি আছে?

শানডন কিন্তু অবাক হল ডক্টর ক্লবোনির অগাধ পাণ্ডিত্য দেখে। লোকটা একটা সচল বিশ্বকোষ বললেও চলে।

একটা রহস্যর কিন্তু ব্যাখ্যা করতে পারলেন না ডক্টর ক্লবোনিও। তিমি শিকারীরাও লক্ষ্য করেছে সমুদ্রের এই রহস্য—কারণ খুঁজে পায়নি।

রহস্যটা এই: হাওয়া যখন শান্ত, সমুদ্রে তখন বড় বড় ঢেউ। কিন্তু তুমুল বৃষ্টি নামলেই সমুদ্র একদম শান্ত।

যাই হোক, হাওয়ার জোর বাড়ছে। বিশে এপ্রিল ফেয়ারওয়েল অন্তরীপে পৌঁছোতে হলে শুধু পালের ওপর নির্ভর করলে চলবেনা—স্টীম দিয়ে ইঞ্জিন চালাতে হবে।

সেইমত হুকুম দিল শানডন। জল ছিন্নভিন্ন করে ঘুরতে লাগল বেড-তীরবেগে ছুটে চলল ফরোয়ার্ড।

৬॥ মেরুস্রোত

ঝড়ো হাওয়া ঠেলে অতি কষ্টে বিশে এপ্রিল ফেয়ারওয়েল অন্তরীপ পৌঁছোলো ফরোয়ার্ড। দূরবীন দিয়ে দূরে দেখা গেল গ্রীনল্যাণ্ডের ঝাপসা চেহারা। দেড়শো ফুট উঁচু একটা অদ্ভুত বরফ পাহাড়ের স্কেচ এঁকে নিলেন ডক্টর। এর আগে মেরু অভিযানে যাঁরা এসেছেন—তাঁরাও দেখেছেন কিম্ভূতকিমাকার এই হিমপাহাড়।

রেলিংয়ে ঝুঁকে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন ডক্টর ক্লবোনি। এই সেই রহস্যময় অঞ্চল যেখানে ১৮৪৫ খৃস্টাব্দে স্যার জন ফ্রাঙ্কলিন ডিস্কো দ্বীপ পেরিয়ে আসার পর যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছিলেন দু'দুখানা জাহাজ সমেত।

৭ ॥ ডেভিস প্রণালী

একুশে এপ্রিল সকালে কেপ ডেজোলেসন দেখা গেল কুয়াশার মধ্যে দিয়ে। জনসন বললে—"ডক্টর, এ জায়গার নাম গ্রীনল্যাণ্ড হওয়া উচিত হয়নি। বছরে মাত্র কয়েকটা সপ্তাহ সবুজের আভা দেখা যায় এখানে—তারপর শুধু বরফ আর বরফ।"

ডক্টর বলে উঠলেন—"দশম শতাব্দীতে কিন্তু গ্রীনল্যাণ্ড সত্যিই 'গ্রীন' ছিল। আইসল্যাণ্ডের ইতিহাসে বলে নাকি অষ্টম অথবা নবম শতাব্দীতে এ অঞ্চলে শব্দই বেশ সমৃদ্ধ গ্রামও ছিল।"

"সব নামেরই কি মানে থাকে?"

"আছে বই কি," বললেন ডক্টর। "স্মরণাতীত কাল থেকে কত অভিযান এসেছে এখানে—কত দুঃখ কষ্ট মৃত্যু রহস্যর নিকেতন এই অঞ্চল। প্রতিটি নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সেই ইতিহাস", বলে গড়গড় বলে গেলেন একগাদা নাম আর নামের তাৎপর্য।

এর পরের কটা দিন দুর্ভোগের সীমা পরিসীমা রইল না। বরফ ভেসে আসতে লাগল চারদিকে। পাশ কাটিয়ে চলতে হল ফরোয়ার্ডকে। ধাক্কা লাগলেই সর্বনাশ। শেষকালে এমন হল যে লগি দিয়ে ঠেলে ঠেলে ভাসমান হিমশিলাকে সরিয়ে দিতে হল তফাতে।

শেষকালে দম ফুরিয়ে গেল নাবিকদের। সাতাশে এপ্রিল দেখা গেল মেরুবৃত্ত এখনো অনেক দূরে।

৮ ॥ গুজব

ডক্টরের এত পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও ভাসমান বরফ পাহাড়ের দূরত্ব নির্ণয় করতে অপারগ হচ্ছিলেন। এ-এক ধরনের মরীচিকা। অনভিজ্ঞ চোখে মনে হয় অমুক হিমশিলাটা তো খুবই কাছে—একটু এগোলেই ছোঁয়া যাবে লগি দিয়ে—প্রকৃতপক্ষে তখন তা দশ বারো মাইল দূরে!

এর ওপর রয়েছে চোখ ধাঁধানো দীপ্তি। চারিদিকে কেবল সাদা আর সাদা। অত্যুজ্জ্বল এই দীপ্তি চোখে সংক্রামক ব্যাধি জন্মাতে পারে। তাই সবুজ কাঁচের চশমা পরে রইলেন ডক্টর।

আকাশ বাতাস ক্রমশঃ উগ্ররূপ ধারণ করেছে। চেহারা পাল্টে যাচ্ছে

সমুদ্রের। বরফ এখন আর ছাড়া-ছাড়া নয়—দল বেঁধে কয়েক মাইল জুড়ে এগিয়ে আসছে জাহাজের দিকে।

অবস্থা খুবই সঙীন। দেখে শুনে ধাত ছেড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে নাবিকদের। নানা রকম গুজব শোনা যাচ্ছে। ক্যাপ্টেন এখনো অদৃশ্য, গন্তব্যস্থান অনিশ্চিত—তবুও জাহাজ ঠিক এগিয়ে চলেছে—কোথায়? কোন বিপদের বুকে? কেউ কেউ বললে, ক্যাপ্টেন নেই কে বললে? নিশ্চয় আছেন। ওঁর বন্ধ ঘরেই আছেন। হঠাৎ একদিন দরজা খুলে বেরিয়ে এসে বলবেন – এই তো আমি। আরেকজন বললে—দূর, দূর! ক্যাপ্টেন মানুষ নয়—কুকুর। চালচলন দেখেছো কুত্তাটার? যেন জাহাজের মালিক। টহল দেয় সেইভাবে। পাল খাটানো ঠিক হয়েছে কিনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। এমন কি একদিন হালের চাকা পর্যন্ত ধরে দাঁড়িয়েছিল অবিকল ক্যাপ্টেনের মত!

শুনে তো আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল কুসংস্কারাচ্ছন্ন নাবিকদের। তাদের মনে পড়ল আরো অনেক রহস্যজনক ঘটনা—এখনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় নি। যেমন, কুকুরটা খায় কোথায়? তার খাবারের থালা যেমন তেমনি পড়ে থাকে। তাহলে? মাঝে মাঝে বরফের পাহাড়ে নেমে বেড়িয়ে আসে কেন? ভালুকের ভয় নেই? অনেক দূর থেকে অদ্ভুত স্বরে ডেকে ওঠে কেন?

কুকুরটাকে নিয়ে সত্যিই ভাবনা আরম্ভ হল জাহাজময়।

এদিকে ভাসমান বরফের পাহাড় ক্রমশঃ চারদিকে এগিয়ে আসছে—পিষে মেরে ফেলবে ফরোয়ার্ড আর নাবিকদের। ভাসমান এবং চলমান এই বরফ স্তূপ যে-চাপ সৃষ্টি করতে পারে, তা এককোটি টন ওজনের সমান। সুতরাং বরফ-করাত হাতে নিয়ে তৈরী হয়ে রইল নাবিকরা। ভয়ে প্রাণ উড়ে গেলেও এ-ভাবে মরা যায় না। লড়ে মরতে হবে।

কিন্তু সারাদিন হাড়ভাঙা খেটেও এগোতে পারল না ফরোয়ার্ড। বরফের গায়ে লোহাব চোখা গলুই দিয়ে ঢুঁ মেরেও পথ করে নেওয়া গেল না। নোঙর ফেলা হল রাত্রে।

শনিবার তাপমাত্রা আরো নেমে এল পূবের বাতাস বইতে। সকাল সাতটায় দেখা গেল তাপমাত্রা নেমে এসেছে শূন্য তাপাঙ্কের ৮ ডিগ্রী নীচে।

সন্ধ্যের দিকে মাইল কয়েক উত্তরে এগোলো ফরোয়ার্ড। মাঝরাতে পৌঁছে গেল ডাঙা থেকে তিরিশ মাইল দূরে।

বরফের চাঙর এবার ভেঙে ভেঙে ভেসে যাচ্ছে। বিপদ আরো বাড়ল। যে-কোনো মুহূর্তে সংঘাত অনিবার্য। জাহাজ চালনায় সবচেয়ে পোক্ত গ্যারী

এগিয়ে এলে ধরল হালের চাকা। এঁকে বেঁকে অদ্ভুতভাবে গা বাঁচিয়ে ছুটে চলল ফরোয়ার্ড।

নাবিকরা দুভাগ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল জাহাজের সামনে আর পেছনে। হাতে লম্বা লগি। হিমশিলা কাছে এলেই ঠেলে দিচ্ছে।

কিছুক্ষণ পরেই নতুন বিপদ দেখা গেল। দুপাশে বড় বড় বরফের ভাসমান পাহাড়—সরু গলির মত রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলেছে ফরোয়ার্ড। এমন সময়ে সামনের পথ জুড়ে মূর্তিমান আতংকর মত এগিয়ে এল একটা প্রকাণ্ড হিমশিলা। ঘুরছে, আশপাশ থেকে বরফ ভেঙে ভেঙে পড়ছে, কামান গর্জনের মত শব্দ হচ্ছে।

এবার আর রক্ষে নেই। পেছোনো সম্ভব নয়—পাশে যাওয়াও সম্ভব নেই।

একশ ফুট উঁচু বরফ-পাহাড় ভেঙে পড়ল বলে ফরোয়ার্ডের ওপর!

বিকট চেঁচিয়ে উঠে নাবিকরা লগি ছুঁড়ে ফেলে শুয়ে পড়ল ডেকের ওপর।

আচম্বিতে ঝড়ের মধ্যে থেকে কে যেন অচেনা গলায় ধমকে উঠল ভীষণ কড়া গলায়—"চুপ! চুপ! একদম কথা নয়!"

একা গ্যারী হাল ধরে রইল শক্ত হাতে।

আচমকা জলস্তম্ভের মত তরঙ্গ ভঙ্গ ঘটল জাহাজের ওপর—তার মধ্যে দিয়েই এগিয়ে গেল ফরোয়ার্ড।

পরমুহূর্তে দেখা গেল অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে ভাসমান হিমশিলা। সামনে রৌদ্রালোকিত জলপথ।

মাথা চুলকে জনসন বললে—"ডক্টর, এটা কি হল?"

ডক্টর বললেন—"খুব সোজা। হিমশিলার গা থেকে ক্রমাগত বরফ ভেঙে ভেঙে পড়ছিল। তাই ভারকেন্দ্র সরে সরে আসছিল। শেষকালে এমন জায়গায় তা পৌঁছোলো যে উল্টে যেতে হল হিমশিলাকে। কিন্তু দু মিনিট পরে উল্টোলে দফারফা হয়ে যেত আমাদের।"

৯॥ আরেকটা চিঠি

অবশেষে পেরিয়ে আসা গেল মেরুবৃত্ত। সমুদ্র প্রায় বরফশূন্য বললেই চলে।

তিরিশে এপ্রিল ভোর ছটায় নিজের ঘরে টেবিলের ওপর একটা চিঠি পেল শানডন। খামের ওপর লেখা তার নাম।

ভ্যাবাচাকা খেয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল শানডন। তারপর ডেকে আনল ডক্টর, জেমস ওয়াল আর জনসনকে।

চিঠি দেখে জনসন বললে—"রহস্য কিন্তু বেড়েই চলেছে।"

পুলকিত কণ্ঠে ডক্টর অবশ্য বললেন—"চমৎকার! চমৎকার!"

"যাক, এবার জানা যাবে ক্যাপ্টেনের গুপ্তরহস্য," বলে, খাম ছিঁড়ে ফেলল শানডন।

ভেতরে একটা সংক্ষিপ্ত চিঠি।

"নাবিক আর অফিসারদের সাম্প্রতিক সাহস দেখে খুশী হয়েছেন ফরোয়ার্ডের ক্যাপ্টেন। কমাণ্ডার শানডন যেন নাবিকদের ডেকে ক্যাপ্টেনের অভিনন্দন জানিয়ে দেন।

"আরো উত্তরে এগোন -যান মেলভিল উপসাগরের দিকে। সেখান থেকে স্মিথ সাউণ্ডের মধ্যে ঢোকবার চেষ্টা করুন।—কে-জেড

ফরোয়ার্ডের ক্যাপ্টেন। ৩০শে এপ্রিল সোমবার।"

চিঠি পড়ে গুম হয়ে রইলেন সকলে। বেশ বোঝা গেল, ক্যাপ্টেন নামক অদৃশ্য মানবটি এই জাহাজেই রয়েছেন—রিচার্ড শানডন কিন্তু তা কিছুতেই মানতে চাইল না। জাহাদের প্রতিটি মানুষকে সে চেনে—লিভারপুলে কম করেও শ'খানেক বার দেখেছে। তবে এই চিঠি এল কোত্থেকে?

খবরটা আগুনের মত ছড়িয়ে গেল সারা জাহাজে। নাবিকদের ডাকা হল ডেকের ওপর। ক্যাপ্টেন তাদেব কাজে খুশী হয়েছেন জেনেও খুঁত খুঁত করতে লাগল সকলে।

চিঠিটা কে লিখেছে? কুকুরটা নয় তো?

পয়লা মে দেখা গেল তাপমাত্রা শূন্য তাপাংকের পঁচিশ ডিগ্রী নীচে নেমে এসেছে।

এই সময়ে ভাসমান হিমশিলায় একটি ভালুক আর দুটি বাচ্ছাকে দেখে বন্দুক নিয়ে তাড়া করলেন ডক্টর—কিন্তু কাপুরুষের মত চম্পট দিল ভালুক মা বাচ্ছাদের নিয়ে।

রাত্রে দূরদিগন্তে ডিস্কো দ্বীপের উঁচু পাহাড় ভেসে উঠল। দেখেই ফের অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন ডক্টর। ডিস্কো দ্বীপের আরেক নাম তিমি দ্বীপ। এই দ্বীপ থেকেই ১৮৪৫ সালের ১২ই জুলাই শেষ চিঠি লিখেছিলেন স্যার জন ফ্রাঙ্কলিন।

পরের দিন বেলা তিনটের সময়ে বেশ কয়েকটা পাখনাওয়ালা তিমি স্পাউটের ফুটো দিয়ে ফোয়ারা ছাড়তে ছাড়তে খেলা করতে লাগল জাহাজের আশেপাশে।

তেসরা মে সেই প্রথম ডক্টর লক্ষ্য করলেন, সূর্য আর দিগন্তে ডুব দিচ্ছে

না—দিগ্‌রেখা ঘেঁসে সরে যাচ্ছে। ৩১শে জানুয়ারী থেকেই বড় হচ্ছিল দিন—এখন সূর্য আর অস্তই যাচ্ছে না। এ-দৃশ্য দেখে যারা অভ্যস্ত নয়, তারা একটানা আলো দেখে প্রথমে অবাক হয়, পরে ক্লান্ত হয়। হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করে, অন্ধকার আছে বলেই আলো এত ভাল। ধবধবে সাদা বরফ-প্রান্তরের ওপর সূর্যের নিরন্তর প্রতিফলন কাঁহাতক সওয়া যায়?

১০ ॥ প্রাণান্ত

ছ'উই মে। সব চাইতে উত্তরের ড্যানিশ উপনিবেশে পৌছোলো জাহাজ। শানডন আর ডক্টর ক্লবোনি নেমে গেলেন তিন জন নাবিককে নিয়ে। স্ত্রী আর পাঁচটি ছেলে-মেয়ে নিয়ে গভর্ণর এলেন ওঁদের খাতির করতে। গভর্ণর হলেও ইনি জাতে এস্কিমো। একমাত্র এঁরই বাড়ীগুলো কাঠের—বাদবাকী সব ইগলু; অর্থাৎ এস্কিমোদের বরফ-কুঁড়ে। জানলা-টানলার বালাই নেই সরু সুড়ঙ্গ দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকতে হয়। মাথায় কেবল একটা ছেঁদা—ধোঁয়া বার করে দেওয়ার জন্যে। কিন্তু গন্ধ যায় না। এ-গন্ধ সীল মাছের মাংসের, এস্কিমোদের গায়ের এবং পচা মাছের। সব মিলিয়ে সে এক বিকট গন্ধ।

যাই হোক, জাহাজের দোভাষী মোট কুড়িটা এস্কিমো শব্দ জানত। তাই দিয়েই শুরু হল আলাপ আলোচনা। ডক্টর ক্লবোনি ভারী চালাক। উনি জানতেন, এস্কিমো শব্দটার অর্থ 'কাঁচা মাছখেকো' এবং এ-নাম শুনলেই এস্কিমোরা তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে। তাই উনি তোয়াজ করে ওদের ডাকলেন 'গ্রীনল্যাণ্ডবাসী' বলে। খুব খুশী হল এস্কিমোরা। ওদের ইগলু পর্যন্ত দেখিয়ে আনল ডক্টরকে। ভেতরে ঢুকে বোঁটকা গন্ধে প্রাণ যায় আর কি। তা সত্ত্বেও অসীম অনুসন্ধিৎসা নিয়ে সব কিছু দেখলেন ডক্টর। সব মৎস্য-ভোগীদের মত এরাও যে কুষ্ঠরোগে বড্ড বেশী ভোগে, তাও লক্ষ্য করলেন।

খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল, কেউ এ অঞ্চলে আসেনি। কোনো তিমিধরা জাহাজও আসেনি।

ভুরু কুঁচকে শানডন বললে—"মেলভিল সাউণ্ডেও যদি ক্যাপ্টেনকে না দেখি, আমি নিজেই ক্যাপ্টেন হয়ে বসব ফরোয়ার্ডের।"

সন্ধ্যের দিকে স্ট্রং গিয়ে বেশ কিছু ডিম জোগাড় করে আনল। সবুজ রঙের ডিম—আকারে মুরগীর ডিমের দ্বিগুণ। আইডার হাঁসের ডিম। নুন মাখানো মাংস খেয়ে অরুচি ধরেছে জাহাজশুদ্ধ সবাইয়ের—ডিমের ওমলেট জমবে ভাল।

পরের দিন হাওয়ার জোর বাড়ল। শানডন ঘণ্টায় ঘণ্টায় কামান দেগে নিশানা করে চলল, রাত হলে রকেট পর্যন্ত ছুঁড়ল। কিন্তু কেউ এল না। চমকে গিয়ে কেবল পাখীর দল উড়ল আকাশে।

আটুই মে ভোর ছটায় পাল তুলে দিয়ে রওনা হল ফরোয়ার্ড। সূর্যের দীপ্তিতে এর মধ্যেই চোখের অসুখ আরম্ভ হয়ে গেছে অনেকের। প্রায়-অন্ধ অবস্থা—এ থেকেই আসবে পুরোপুরি দৃষ্টি-শক্তি হীনতা। ডক্টর নিজে সবুজ আচ্ছাদন দিয়ে চোখে ঢাকলেন—সবাইকে নির্দেশ দিলেন সেইভাবে।

জাহাজ ছাড়বার আগেই কয়েক পাউণ্ড খরচ করে কুড়িটা কুকুর আর একটা স্লেজগাড়ী ডেকে তুলেছিলে শানডন। কুকুরগুলো বর্বর হলেও জাহাজের ভাল খাবার-দাবার পেয়ে শান্ত হয়ে এল। কুকুর-ক্যাপ্টেনের যেন এ দৃশ্য গা সওয়া—জাতভাইদের দেখেও দেখল না।

এরপর থেকেই শুরু হল ববফ বন্দী অবস্থা। চারদিকের বরফ ঘিরে ধবছে জাহাজকে—জল জমে বরফ হয়ে যাচ্ছে—এগোনোর পথ বন্ধ। কিন্তু শানডন তবুও এগোবেই। দাঁডালেই বিপদ—সামনের বসন্ত পর্যন্ত বন্দী হয়ে থাকতে হবে বরফ-কারাগারে।

মনোবল ভেঙে পডছে নাবিকদেব। ভয়, উদ্বেগ, কুসংস্কারে এর মধ্যেই অসন্তোষ দেখা দিয়েছে ওদের মধ্যে।

করাত দিয়েও আর বরফ কাটা যাচ্ছে না। ছ-সাত ফুট বরফ করাত দিয়ে কাটা যায় না। বরফের ফুটোয নোঙর আটকে ক্যাপস্টান ঘুরিয়ে একটু একটু করে গুণ টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জাহাজকে।

ষোলই মে দেখা গেল এত কষ্ট করে মাত্র দু মাইল উত্তরে এগিয়েছে জাহাজ। পরিস্থিতি যাচাই করার জন্যে বরফ-প্রান্তরে নামলেন ডক্টর। কিন্তু বরফের ওপরে আলোর প্রতিসরণ এ-বকম ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে কে জানত। ডক্টর মনে করছেন, এক ফুট লাফালেই গর্ত পেরোনো যাবে—আসলে সেখানে দরকার চার-পাঁচ ফুট লাফানোর। কখনো কখনো ঘটছে ঠিক তার উল্টো। ফলে, পদে পদে আছাড় খেতে হল ডক্টরকে।

জাহাজে ফির এসে ডক্টর একটা আশ্চর্য কথা বললেন।

বললেন—"বৈজ্ঞানিকরাও বুঝতে পারছেন না যুগ যুগ ধরে এখানে কি ঘটছে। ১৮১৭ সাল পর্যন্ত এখানে বরফের নিরঙ্কুশ রাজত্ব ছিল। সমুদ্র-পথ বরফ বন্ধ ছিল। তারপর হঠাৎ একটা কল্পনাতীত প্রলয় ঘটে। বরফ একদম সরে যায়। তিমি-শিকারীদের মরশুম আরম্ভ হয় বাফিন উপসাগরে। কিন্তু

গত বছর থেকে আবার শুরু হয়েছে বরফের উপদ্রব—আবার ফিরে আসছে হিম রাজত্ব।"

"তবে কি ফিরে যেতে বলেন?" বলল শানডন।

"আমি? আমি পিছু হটতে জানি না। গ্যারী, তুমি কি বল?"

"আমিও তাই বলি," ঠাণ্ডা গলায় বলল গ্যারী। "হুকুম দিন, তামিল করব।"

১১॥ শয়তানের বুড়ো আঙুল

গ্যারী আর ডক্টরকে নিয়ে শানডম নেমে গেল বরফ প্রান্তরে রাস্তার সন্ধানে।

ইতিমধ্যে একটা ঘটনা ঘটল জাহাজে।

নাবিকরা মনে মনে বিদ্রোহী হয়ে উঠলেও মুখে কিছু প্রকাশ করেনি। যত রাগ গিয়ে পড়ল হতচ্ছাড়া ঐ কুকুরটার ওপর। শয়তান ঐ কুকুরটার টুঁটি কাটতে পারলেই নাকি সব বিপদ কেটে যাবে। গোঁয়ার শানডনও আর সামনে না এগিয়ে ফিরে যাবে দক্ষিণে।

তৎক্ষণাৎ কয়েকজন ছুটল কুকুরটার সন্ধানে। একটু পরেই মুখ আর পা বেঁধে নিয়ে এল ধরাধরি করে। ঘুমোচ্ছিল বেচারী—তাই কাবু করা গেছে সহজেই।

অদূরে বরফ-প্রান্তরে একটা ফুটো দেখা গেল। সীল মাছ বরফের তলা থেকে ফুটো করে ওপরে উঠেছে। ওদের চোয়ালের গড়ন এমন যে নীচ থেকে বরফ কামড়াতে পারে।

কুকুরটাকে নিয়ে এই ফুটো দিয়ে ফেলে দেওয়া হল জলে। বরফ দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হল গহ্বরের মুখ।

জনমন পর্যন্ত জানতে পারল না কুকুর অন্তর্ধান রহস্য। কিছুক্ষণ পরেই জাহাজে ফিরে এল শানডন। মাইল দুয়েক দূরে একটা ফাঁক পাওয়া গিয়েছে। বরফ ভেঙে ঐ পর্যন্ত যেতে পারলেই আরো উত্তরে এগোনো যাবে বিনা বাধায়।

নাবিকরা হাত লাগাল বরফ ভাঙার কাজে। কেউ টুঁ শব্দটি করছে না। মনে মনে ফুঁসলেও বাইরে প্রকাশ করছে না। শানডন লক্ষণ দেখে হুঁশিয়ার হল। ঝড়ের পূর্বলক্ষণ।

সারা রাত গেল এইভাবে, গেল পরের দিনটাও। আঠারো তারিখে

কুয়াশার মধ্যে দিয়ে ভেসে উঠল কিম্ভূতকিমাকার একটা পর্বত-চূড়া—শয়তানের বুড়ো আঙুল!

এই সেই জায়গা যেখানে অতীতে বহু অভিযান এসে বরফবন্দী থেকেছে হপ্তার পর হপ্তা।

রাত নামল। চার-পাঁচ ফুট পুরু বরফ কেটে বিশ ফুট সুড়ঙ্গ বানাতে হিমসিম খেয়ে গেল নাবিকরা।

শনিবার সকাল থেকে প্রবল হল হাওয়া। কুয়াশার ফাঁক দিয়ে বিকট ছায়া-মূর্তির মত দেখা দিয়েই মিলিয়ে যাচ্ছে শয়তানের বুড়ো আঙুল।

আচমকা 'গেল গেল' রব উঠল জাহাজে। শয়তানের বুড়ো আঙুল সহসা দানবিক আকারে এসে পড়েছে ওদের ঠিক মাথার ওপর। শঙ্কুর মত একটা প্রকাণ্ড বরফ-খণ্ড দুলছে পর্বত-চূড়ায়—গড়িয়ে পড়ল বলে জাহাজের ওপর।

গোলমালের মধ্যে চীৎকার শোনা গেল ডক্টরের—"ভয় নেই! ভয় নেই! মরীচিকা!"

আচমকা হাওয়ার প্রচণ্ড ঝাপটায় ভয়ংকর সেই দৃশ্য সত্যিই মিলিয়ে গেল চক্ষের পলকে। মরীচিকাই বটে, বরফের ওপর প্রতিসরণের ভেল্কী।

আবার শুরু হল বরফ কাটার পর্ব। একটু একটু করে বরফ কাটা হচ্ছে—দূরে থেকে নাবিকরা গুণ টেনে নিয়ে যাচ্ছে ফরোয়ার্ডকে সেই ফাঁক দিয়ে।

আবার শোনা গেল ভীষণ হট্টগোল। নাবিকরা ঊর্ধ্বশ্বাসে দড়িদড়া ফেলে ছুটে আসছে জাহাজের দিকে। পেছনে দেখা যাচ্ছে একটা অতিকায় চারপেয়ে জানোয়ার। উচ্চতা কম করেও বিশ ফুট—ল্যাজটাই দশ ফুট!

"ভালুক! ভালুক!"

"ড্রাগন! ড্রাগন।"

দমাস করে গুলি চালালেন ডক্টর এবং শানডন। সঙ্গে সঙ্গে শূন্যে মিলিয়ে গেল প্রাগৈতিহাসিক দানব।

ছুটে এল হারিয়ে যাওয়া সেই কুকুরটা!

হ্যাঁ, সেই কুকুরটা। ফুটোর মধ্যে বন্দী হয়েও সাঁতরে অন্য ফুটো দিয়ে উঠে এসেছে বরফের ওপর। আলোক প্রতিসরণের জন্যে মনে হয়েছে যেন ডাইনোসরের মত দানব ধেয়ে আসছে!

নাবিকদের মনোবল একেবারেই ভেঙে গেল এই দৃশ্য দেখে। একে শয়তানের বুড়ো আঙুল, তার ওপর কুকুররূপী শয়তানের পুনরাবির্ভাব।

এ-যাত্রা আর রক্ষে নেই কারো!

১২॥ ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস

বরফ ছিন্নভিন্ন করে আরো উত্তরে এগিয়ে চলল ফরোয়ার্ড। এখন জাহাজ চলছে স্টীমের শক্তিতে। পেছনে বরফের ওপর দিয়ে দৌড়ে আসছে সেই কুকুরটা। মাঝে মাঝে পেছিয়ে পড়ছে—সঙ্গে সঙ্গে কোত্থেকে যেন একটা তীক্ষ্ণ শিস শোনা যাচ্ছে।

তৎক্ষণাৎ দ্বিগুণবেগে দৌড়ে এসে জাহাজের নাগাল ধরে ফেলছে পেছিয়ে পড়া কুকুর।

মুখ চাওয়-চাওয়ি করল নাবিকরা। একী রহস্য? শিস দিচ্ছে কে? যেই দিক না কেন, কুকুরের প্রভু সে। তাই শিস শুনেই দৌড়ে আসছে অত জোরে।

এই শিস দেওয়াকে কেন্দ্র করেই গুলতানি আরম্ভ হল নাবিকদের মধ্যে। ঢের হয়েছে। অনিশ্চিত, অজানিত পথে আর ছুটে চলতে কেউ রাজী নয়। সাক্ষাৎ শয়তান টেনে নিয়ে চলেছে ফরোয়ার্ডকে নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে। সুতরাং আর নয়।

শুরু হয়ে গেল বিদ্রোহ।

ঠিক সেই সময়ে ১৮০০ ফুট ব্যাস সম্পন্ন একটা সুবৃহৎ হিমশিলায় আটক হতে চলেছে ফরোয়ার্ড। শানডন দূরবীন নিয়ে দেখছে বেরোনোর পথ কোথায়, এমন সময়ে দলবল নিয়ে এল বোল্টন।

বলল কম্পিত কণ্ঠে—"কম্যাণ্ডার, আমরা আর যাবো না।"

"তার মানে?" বোমার মত ফেটে পড়ল শানডন।

"না। আর এক ইঞ্চিও যাবো না।"

শানডন তেড়ে যাচ্ছিল বোল্টনের দিকে, দৌড়ে এসে মেট বললে—"আর এক মিনিটও দেরী করলে বেরোতে পারবেন না। ঐ দেখুন।"

চকিতে চোখ তুলল শানডন। একটা প্রকাণ্ড বরফ পাহাড় ভাসতে ভাসতে আসছে বেরোনোর পথের দিকে। মুখটা বন্ধ হয়ে গেলেই সর্বনাশ।

"যে যার জায়গায় যাও - বেয়াদবির শাস্তি পরে পাবে," হুংকার ছাড়ল শানডন। নাবিকরা ছুটে গেল যে-যার জায়গায়। পুরোদমে দক্ষিণ দিকে ছুটল ফরোয়ার্ড। ছোটার বেগে থর থর করে কাঁপতে লাগল প্রতিটি পাটাতন। দৌড় প্রতিযোগিতায় কিন্তু জিতে গেল ভাসমান বরফটা। উত্তর

দিকে ভেসে এসে সশব্দে বন্ধ করে দিল বেরোনোর পথ। যেন বোতলের মুখে ছিপি বন্ধ হয়ে গেল।

"শেষ! সব শেষ!" নিঃসীম হতাশায় ভেঙে পড়ল শানডন।

"শেষ! সব শেষ।" প্রতিধ্বনি করল নাবিকরা! "পালাও! পালাও! নৌকো নামাও! মদের ভাঁড়ার লুট করো!..."

চক্ষের নিমেষে শুরু হয়ে গেল বিশৃঙ্খলা। হট্টগোলের মধ্যে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল শানডন। কথা বলতে গেল—জিভ জড়িয়ে গেল। ও ভাবতেই পারেনি নাবিকরা এ-ভাবে অকস্মাৎ বেঁকে বসবে।

পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলেন ডক্টর।

আচম্বিতে হট্টগোল ছাপিয়ে শোনা গেল বজ্রগর্ভ কণ্ঠস্বর—"যে যার জায়গায় যাও! জাহাজ ঘোরাও!"

যন্ত্র-চালিতের মত তৎক্ষণাৎ হালের চাকা ঘুরিয়ে দিল জনসন—বরফের গায়ে আছড়ে পড়তে পড়তে রক্ষে পেয়ে গেল ফরোয়ার্ড।

কিন্তু কে চেঁচালো? এমন কর্তৃত্ব-ব্যঞ্জক কণ্ঠস্বর কার হতে পারে?

চীৎকারে কাজ হল কিন্তু ম্যাজিকের মত। মন্ত্রমুগ্ধের মত নাবিকরা দৌড়ে গেল যে যার জায়গায়।

পরক্ষণেই দেখা গেল, খুলে যাচ্ছে ক্যাপ্টেনের কেবিন। ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন জমকালো সাজে স্বয়ং ক্যাপ্টেন।

না, কোনো সন্দেহ নেই। ইনিই ক্যাপ্টেন বটে! কেননা, কেবিনের চাবি শুধু তাঁর কাছেই ছিল। বেরিয়ে এসেই তীক্ষ্ণ শিস দিতেই কুকুরটা ক্যাওটার মত মুখ ঘসতে লাগল পায়ের ওপর।

আর কোনো সন্দেহ আছে কি?

ভ্যাবাচাকা খেয়ে প্রথমে 'স্যার' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল শানডন। পরক্ষণেই সামলে নিয়ে বললে—"একী, গ্যারী—"

হ্যাঁ, গ্যারীই বটে। এতদিন লম্বা জুলপী দিয়ে মুখের আধখানা ঢেকে রেখেছিল। এখন জুলপী কেটে ফেলায় কর্তৃত্ব-ব্যঞ্জক সুগঠিত মুখটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চেহারা দেখেই বোঝা যায়, হুকুম দিতেই জন্ম তাঁর এবং এ-জাহাজের মাস্টার তিনিই।

যেন বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হল স্নায়ুবৎ নাবিকদের দেহে। অকস্মাৎ একসাথে গলা মিলিয়ে হেঁকে উঠল জাহাজ-শুদ্ধ লোক—"থ্রি চিয়ার্স ফর দি ক্যাপ্টেন!"

"শানডন," হুকুম দিলেন ক্যাপ্টেন। "ডাকো সবাইকে—অনেক কথা আছে আমার।"

তৎক্ষণাৎ সকলে জড়ো হল ডেকের ওপর। প্রশান্ত মুখে সবাইকে দেখে নিয়ে থেমে থেমে বললেন ক্যাপ্টেন—"আমি ইংরেজ। তাই আমি এমন জায়গায় পা দিতে চাই যেখানে এর আগে কেউ পা দেয় নি। আমার দেশের এই পতাকা সুমেরুতে গেঁথে আসবো সবার আগে—এই আমার সংকল্প। টাকার অভাব নেই আমার। এখন থেকে হাজার পাউণ্ড পুরস্কার দেব এক-এক ডিগ্রী উত্তরে যাওয়ার জন্যে। আমরা এখন রয়েছি বাহাত্তর ডিগ্রীতে। শুধু টাকায় এ-কাজ হয় না—চাই দেশপ্রেম! সে-ক্ষেত্রে আমার নামেই কাজ হবে। কারণ, আমিই ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস!"

"ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস!" শানডন তো অবাক। মুখে মুখে ছড়িয়ে গেল ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের নাম। ইংরেজ মাত্রই চেনে এই নাম—পরিচয়ের দরকার নেই।

কিন্তু কে এই ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস?

অঢেল টাকার মালিক এবং নির্ভীক অ্যাডভেঞ্চারিস্ট। পুরো নাম জন হ্যাটেরাস। বাবা ছিলেন লণ্ডনের মদের কারবারী। মৃত্যুকালে রেখে যান ষাট লক্ষ পাউণ্ড। এই বিপুল সম্পত্তি বার বার বিভিন্ন অভিযানের পেছনে খরচ করেছেন তিনি। প্রচণ্ড সাহস তাঁর। তেমনি মজবুত শরীর। তাঁর জীবনের একমাত্র সংকল্প, ইংরেজ জাতটা অজ্ঞাত অঞ্চল আবিষ্কারে বড্ড পেছিয়ে আছে—এ কলঙ্ক ঘোচাতে হবে।

কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেছেন—তিনি কিন্তু জাতে জিওনিজ। পর্তুগীজ ভাস্কোডাগামা আবিষ্কার করেছেন ভারতবর্ষ। চীন দেশও আবিষ্কার করেছেন একজন পর্তুগীজ—ফার্নাণ্ডো ডি আনড্রাডা। কানাডা আবিষ্কার করেছেন একজন ফরাসী - জ্যাকুইস কার্টিয়ার। ইংরেজরা সে-রকম কিছুই করেনি। তবে মৌরসী পাট্টা গেড়ে বসেছে অস্ট্রেলিয়ায়, আমেরিকায়, ভারতবর্ষে, আফ্রিকায়।

হ্যাটেরাস তাই বেশ কয়েক বার দক্ষিণ সমুদ্রে অভিযান পরিচালনা করবার পর ১৮৪৬ সালে বাফিন উপসাগরে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। জাহাজের নাম ছিল 'হ্যালিফাক্স।' নিদারুণ কষ্ট পেয়েছিল নাবিকরা—প্রত্যেকের প্রাণ গলায় এসে ঠেকেছিল হ্যাটেরাসের উন্মাদ প্রচেষ্টায়। সেই থেকে হ্যাটেরাসের সঙ্গে সমুদ্র-যাত্রার কল্পনাতেও শিউরে উঠত সবাই।

তা সত্ত্বেও ১৮৫০ সালে ফের 'ফেয়ারওয়েল' জাহাজ নিয়ে উত্তরে পাড়ি জমালেন হ্যাটেরাস। এবার টাকার লোভ দেখিয়ে সঙ্গে নিলেন ডাকাবুকো বেশ কয়েকজন সঙ্গীকে। ডক্টর ক্লবোনি তখনি যেতে চেয়েছিলেন—জায়গার অভাবে হ্যাটেরাস সঙ্গে নিতে পারেন নি।

ভয়ংকর অভিজ্ঞতার পর 'ফেয়ারওয়েল' জাহাজ ধ্বংস হল বরফ সমুদ্রে—মারা গেল ডানপিটে সঙ্গীরা—একা হ্যাটেরাস ছ'শ মাইল বরফ প্রান্তর পায়ে হেঁটে, একটা ড্যানিশ তিমি-শিকারীর জাহাজে চেপে ফিরে এলেন স্বদেশে।

একি মানুষ, না, প্রেত? হ্যাটেরাস সম্বন্ধে কিংবদন্তীর শুরু তখন থেকেই। টাকার পাহাড়ে বসেও কোনো সঙ্গী জোটাতে পারলেন না হ্যাটেরাস পরবর্তী অভিযানের জন্যে।

তাই পুরো দুটি বছর নাম ভাঁড়িয়ে লিভারপুলে রইলে তিনি। নাবিক সেজে সবার সঙ্গে আলাপ জমালেন। রিচার্ড শানডনকে মনে ধরল। বেনামী চিঠি লিখে তাকে দিয়ে ফরোয়ার্ড জাহাজ তৈরী করালেন। কিন্তু মনে মনে ঠিক করলেন, চরম সঙ্কট না এলে কখনই সামনে আসবেন না।

১৩॥ ক্যাপ্টেনের প্ল্যান

ক্যাপ্টেনের নাটকীয় আবির্ভাবে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল নাবিকদের মধ্যে। কেউ খুশী হল, কেউ নাচার হয়ে মুখ বুঁজে রইল। যা একরোখা লোক, বিরুদ্ধাচরণ করতে গেলে বিপদ আছে।

পরের দিন রোববার। ছুটি। জনসন, ডক্টর, শানডনকে নিয়ে মিটিং করতে বসলেন ক্যাপ্টেন। বুঝিয়ে বললেন, তাঁর আগে অভিযানকারীরা উত্তর মেরুর ভেতর পর্যন্ত ঢুকতে না পারলেও বরফ-শূন্য সমুদ্র দেখে এসেছে। নাম-ধাম সাল-তারিখও বলে দিলেন ক্যাপ্টেন। সুতরাং হতাশ হবার কিছু নেই। আসলে সুমেরুর ঠিক মাঝখানে বরফশূন্য সমুদ্র বিরাজ করছে।

শানডন কিন্তু তা মানতে চাইল না। বললে—"নিছক অনুমান"

ডক্টর তখন বললেন, পৃথিবীতে সব চাইতে ঠাণ্ডা যে দুটো জায়গা তাদের একটা এশিয়ায় (৭৯ ডিগ্রী ৩০ মিনিট উত্তর এবং ১২০ ডিগ্রী পূব, আরেকটা আমেরিকায় (৭৮ ডিগ্রী উত্তর ৯৭ ডিগ্রী পশ্চিম)। বর্তমান অভিযান চলেছে শেষোক্ত অঞ্চলে যা কিনা মেরুবিন্দু থেকে প্রায় ১২ ডিগ্রী নীচে। সুতরাং বরফশূন্য সমুদ্র থাকবে না কেন? পৃথিবীর চৌম্বক-মেরুও তো ভৌগোলিক মেরু থেকে পূর্ব-পশ্চিমে কিছুটা সরে আছে।

অকাট্য যুক্তি। শানডনও তবুও বলল—"সবই তো অনুমান।"

হ্যাটেরাস ঠাণ্ডা গলায় বললেন—"বেশ তো, ববফশূন্য সমুদ্র থাকলে জাহাজে চেপে পৌছোবো মেরুবিন্দুতে। না থাকলে স্লেজগাড়ী চেপে পেবিয়ে যাবো ছ'শ মাইল।"

"ছ'শ মাইল বরফের ওপর দিয়ে!" হাঁ হয়ে গেল শানডন।

"অবাক হওয়ার কি আছে?" বললেন ডক্টর। "সামান্য একজন কশাক ৮০০ মাইল স্লেজগাড়ী চড়ে যায় নি? নাম তার আলেক্সি মারকফ।"

যাই হোক, পরের দিন সকালে ক্যাপ্টেন গিয়ে বরফ-জমি দেখে এলেন। হুকুম দিলেন হাজার পাউণ্ড বিস্ফোরক ক্ষমতাসম্পন্ন মাইন পুঁততে। পলতেটা টেনে আনলেন বেশ খানিকটা দূরে। গাটাপার্চা দিয়ে মোড়া রইল সলতে। এই সব করতেই গেল সারাটা দিন।

পরের দিন ভোরবেলা সলতেতে আগুন লাগিয়েই জাহাজ ফিরে এল জনসন। সলতে পুড়তে সময় লাগল ঠিক আধঘণ্টা। তারপর একটা চাপা গুমগুম শব্দ ভেসে এল দূর থেকে। ধোঁয়া ছিটকে গেল শূন্যে। বরফখণ্ড ঠিকরে এসে পড়ল জাহাজের আশেপাশে।

তবুও পথ পরিষ্কার হল না। আলগা বরফ অবরোধ করে রইল জল-পথ।

কামানে বারুদ ঠাসার হুকুম দিলেন হ্যাটেরাস। শুধু বারুদ—গোলা নয়। তাও একটু-আধটু নয়—তিনগুণ।

সবাই তো অবাক! মতলব কি হ্যাটেরাসের?

জাহাজ এগিয়ে চলল আলগা বরফ-স্তূপের দিকে। কাছাকাছি গিয়ে কামান দাগলেন হ্যাটেরাস। ফাঁকা আওয়াজ। বাতাস আলোড়িত হল সেই শব্দে। বাতাসের ধাক্কায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেল আলগা বরফের স্তূপ।

ভীমবেগে মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে এল ফরোয়ার্ড—আসতে না আসতেই আবার বরফ সরে এসে বন্ধ করে দিল পথ। নিঃসীম উৎকণ্ঠার মধ্যে নিষ্কম্পচিত্তে দাঁড়িয়ে রইলেন শুধু একজন—ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস।

১৪-১৯॥ অসম্ভবের সঙ্গে লড়াই

অসম্ভবের সঙ্গে লড়াইয়ের কি শেষ আছে? দিবসরজনীর প্রতিটি মুহূর্তে মরণপণ লড়াই চলেছে বরফ ব্যূহর সঙ্গে। কখনো ডিনামাইট দিয়ে কখনো করাত দিয়ে, কখনো ধাক্কা মেরে পথ করে নিতে হচ্ছে ভাসমান হিমশিলার মধ্যে দিয়ে।

এই ভাবেই সাতাশে মে রবিবার লিওপোল্ড বন্দরে পৌঁছোলো ফরোয়ার্ড। ডাঙায় পা দিয়ে পূর্ববর্তী অভিযাত্রীদের অনেক নিশানা খুঁজে পেলেন হ্যাটেরাস। দেখলেন ছটি কবর—দুঃসাহসী নাবিকদের নশ্বর দেহাবশেষ চাপা রয়েছে বরফের তলায়। পেলেন জেমস রস নির্মিত উদ্বাস্তু শিবির। যদি উত্তরকালে কোনো

অভিযাত্রী এ-অঞ্চলে আসে, তাদের জন্যে খাবার-দাবার, জ্বালানী এবং অন্যান্য জিনিস মজুদ ছিল সেখানে। ফ্রাঙ্কলিনের অভিযান এই পর্যন্তও পৌঁছোতে পারেনি - পারলে প্রাণে বেঁচে যেত সবাই।

হ্যাটেরাস যা পেলেন, জাহাজে তুলে নিলেন। ডক্টরের খুব ইচ্ছে ছিল, লিওপোল্ড বন্দরে তাঁদের আবির্ভাবের কোনো চিহ্ন রেখে যাওয়ার। কিন্তু রাজী হলেন না হ্যাটেরাস। পাছে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের উপকার হয়ে যায়, তাই কোনো চিহ্ন না রেখেই উঠে পড়লেন জাহাজে।

বৈচিত্র্যহীন বরফ ভাঙার মধ্যেও মাঝে মাঝে নূতনত্বের আমেজ পাওয়া গেল। যেমন, দুটো তিমিমাছের দর্শন। তারপরেও দেখা গেল, সূর্যকে ঘিরে অত্যাশ্চর্য জ্যোতির্বলয়—ঠিক যেন নকল সূর্য। টমাস ইয়ং অবশ্য কারণ নির্ণয় করেছেন অদ্ভুত সুন্দর এই জ্যোতির্বলয়ের। বরফ প্রিজম মেঘের আকারে শূন্যে ভাসে যখন, সূর্যালোকের ইন্দ্রজাল দেখা যায় তখনি।

পথিমধ্যে নতুন উৎকণ্ঠার সম্মুখীন হলেন হ্যাটেরাস। এবার আর সাধারণ নাবিকরা নয় - তারা তো উৎকোচে বশীভূত হয়েছে—অফিসাররা মনে মনে ক্ষেপে গেল তাঁর ওপর। হ্যাটেরাস নিজেও বুঝলেন, অফিসারদের সহযোগিতা না পেলে অভীষ্টসিদ্ধি অসম্ভব। শানডন পর্যন্ত অসন্তুষ্ট তাঁর গোঁয়ার্তুমির জন্যে। আর এগোনো সম্ভব নয়—তবুও তিনি এগোবেন।

এইভাবেই নানা সমস্যার মধ্যে আটুই জুন ভুঠিয়াল্যাণ্ড পৌঁছোলো জাহাজ। এইখানেই ম্যাগনেটিক পোলের সন্ধান পেয়েছিলেন জেমস রস। ডক্টর ক্লবোনিও দেখলেন, কম্পাশের কাঁটা এখানে একদম খাড়া হয়ে যায়—মাটির সঙ্গে সমান্তরাল থাকে না।

চুম্বকপাহাড়ের অস্তিত্ব তাহলে সত্যিই মিথ্যে! অথচ কত উপকথাই না রচিত হয়েছে কল্পিত চুম্বক পাহাড়কে কেন্দ্র করে। লোহার জাহাজে গেলে আছড়ে পড়ে সেই পাহাড়ের গায়ে, লোহার পেরেক খুলে বেরিয়ে যায় জাহাজের গা থেকে। প্রায় একশ মাইল লম্বা এই ম্যাগনেটিক মাউন্টেনের জন্যে নাকি কম্পাশের কাঁটা সবসময়ে ঘুরে থাকে উত্তর দিকে।

কিন্তু কোথায় সেই পাহাড়? সব অলীক কল্পনা!*

---

*এই আইডিয়া নিয়ে ভের্ন পরে লিখেছেন 'মিস্ট্রি অফ আর্থার গর্ডন পিম'—এডগার অ্যালান পো যে কাহিনী শেষ করে যেতে পারেন নি—ভের্ন তা সম্পূর্ণ করেছিলেন উপরোক্ত কাহিনীতে!

যাই হোক, তুমুল ঝড়বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে জাহাজ একদিন পৌঁছোল মেলভিল উপসাগরে। ডক্টর লক্ষ্য করলেন সেখানকার নীল জল মাঝে মাঝে সবুজ হয়ে গেছে। হার্পুনারকে ডেকে বুঝিয়ে দিলেন কারণটা। নীল জলে কীটাণু অথবা জেলীফিশ থাকে না।

হার্পুনারও এ ব্যাপারে কম যায় না। বললে---"শুধু তাই নয়, ডক্টর। ঐ যে তেলতেলে জিনিস ভাসছে দেখছেন, ওর মানে হল এখান দিয়ে তিমি গেছে একটু আগে। সবুজ জলেই তিমি থাকে।"

সত্যি সত্যিই কিছুক্ষণ পরে হাঁক এল মাস্তলের ডগা থেকে—তিমি দেখা গেছে দূরে।

সেদিন নৌকো নামিয়ে তিমি শিকার করতে গিয়ে অল্পের জন্যে প্রাণে বেঁচে গেল অভিযাত্রীরা। দুদিক থেকে দুটো ভাসমান বরফ পাহাড় প্রচণ্ড শব্দে এক হয়ে গেল—মাঝখানে পড়ে নিমেষে চিঁড়েচ্যাপ্টা হয়ে গেল ১৩০ ফুট লম্বা তিমিটা—শেষ মুহূর্তে হার্পুনের দড়ি কেটে দেওয়ায় বেঁচে গেল নৌকো।

২০ ॥ বীচি দ্বীপ

তেসরা জুলাই বীচি দ্বীপে জাহাজ ভিড়িয়ে নেমে পড়লেন হ্যাটেরাস। দ্বীপটা মেরু অভিযাত্রীদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৫৩ সালে জাহাজভর্তি খাবারদাবার এনে রাখা হয়েছিল এখানে যাতে ভবিষ্যতে অনাহারে বা জ্বালানীর অভাবে কোনো মেরু অভিযাত্রী যেন মারা না যায়। বরফের মধ্যে খাবার নষ্ট হওয়ারও ভয় নেই।

কিন্তু হ্যাটেরাসের দরকার এখন কয়লার। খাবার যা আছে, বছর কয়েক চলে যাবে।

ডাঙায় নেমে প্রথমেই চোখে পড়ল একটা কালো মার্বেলের স্মৃতিসৌধ। ফ্রাঙ্কলিন সঙ্গীসাথী সমেত অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন আবিষ্কারের স্বপ্ন চোখে নিয়ে। সেইকথাই উৎকীর্ণ রয়েছে মর্মরগাত্রে। পরবর্তী অভিযাত্রীরা এইভাবে শ্রদ্ধা জানিয়েছে অসমসাহসিক ফ্রাঙ্কলিনের স্মৃতির প্রতি।

কিন্তু যে-জন্যে দ্বীপে আসা, সে সব জিনিস কোথায়? কোথায় খাবারের ভাঁড়ার, কয়লার গুদোম?

খুঁজতে খুঁজতে তিনটে ঢিবি দেখলাম। ফ্রাঙ্কলিনের তিন সঙ্গীর কবর। কিন্তু কয়লার গুদোম কোথায়?

অনেক আশা নিয়ে এসেছেন হ্যাটেরাস। গোড়া থেকেই মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলেন, বীচি দ্বীপ থেকে কয়লা তুলে জ্বালানীর অভাব মিটোবেন। সেই কয়লা না পাওয়া গেলে যে মুস্কিল হবে।

উদ্বিগ্ন হলেন হ্যাটেরাস। সহসা দূরে দেখা গেল একটা ভগ্নস্তূপ। দৌড়ে গেলেন সকলে। গিয়ে পেলেন খানিকটা তাঁবু ছেঁড়া, ভাঙা লোহা, কাঠের টুকরো এবং অন্যান্য ধাতু।

কয়লা এক টুকরোও নেই!

ভীষণ সত্যটা আস্তে আস্তে উপলব্ধি করলেন হ্যাটেরাস। দুর্গত মেরু অভিযাত্রীদের জন্যে সঞ্চিত এই দুর্লভ ভাণ্ডারের সন্ধান পেয়েছিল এস্কিমোরা। লুঠপাট করেছে তারাই।

এদিকে কয়লা যা আছে, তাতে আর মাত্র দুমাস চলবে জাহাজ।

ডক্টর ক্লোবেন কিন্তু নির্বিকার। বিপদ নিয়ে কোনো ভাবনাই তাঁর মাথায়। মনের আনন্দে দ্বীপের নানা জায়গা থেকে হরেক রকম বুনো গাছ, শ্যাওলা, শেকড় তুলে আনলেন। এমনকি কয়েকটা ধূসর খরগোশ এবং একটা নীল শিয়াল শিকার করে ফেললেন হ্যাটেরাস কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে। নাগাল ধরতে পারলেন না কেবল ভালুক আর সীলমাছদের।

২১॥ বিদ্রোহ

চব্বিশে জুলাই থার্মোমিটারের পারা বাইশ ডিগ্রীতে নেমে গেল। বরফ জমতে শুরু করেছে সমুদ্রে। হ্যাটেরাস লক্ষণ দেখে শংকিত হলেন। সমুদ্র জমে গেলে পুরো শীতকালটা কাটাতে হবে এখানে। অথচ খালাসী আর অফিসাররা বেঁকে বসেছে। হ্যাটেরাসের পক্ষে কেবল ডক্টর, জনসন এবং বেল। বাকী চোদ্দ জন তাঁর বিপক্ষে।

সুতরাং ওদের দিয়ে দাঁড় টানানো আর সম্ভব নয়। স্টীমেই যেতে হবে— শীত নামবার আগেই আরো উত্তরে সরে যেতে হবে।

মনস্থির করে নিয়ে তৎক্ষণাৎ বয়লার চালু করতে হুকুম দিলেন হ্যাটেরাস।

শুনে তাজ্জব হয়ে গেল খালাসীরা! কয়লা রয়েছে অতি সামান্যই—বড় জোর দুমাস চলবে। সেই কয়লা দিয়ে জাহাজ চালানোর মত হঠকারিতা আর কিছু আছে কি?

অধীর কণ্ঠে ফের হুংকার ছাড়লেন হ্যাটেরাস—"কথাটা কানে গেল না মনে হচ্ছে? ব্রানটন—যাও, আগুন জ্বালো।"

"ব্রানটন, যেও না," কে যেন পাল্টা হুকুম দিল ভীড়ের মধ্যে থেকে।

"কার এত স্পর্ধা ?"

"আমার," এগিয়ে এল পেন। "ক্যাপ্টেন, ঢের হয়েছে। আর না। ঠাণ্ডায় আমাদের মারবার কোনো অধিকার আপনার নেই। আমরা আর উত্তরে যাবো না। বয়লারও চালু করব না।"

"শানডন," ধীর কণ্ঠে বললেন হ্যাটেরাস—"একে খাঁচায় রাখুন।"

"কিন্তু ক্যাপ্টেন," প্রতিবাদের স্বরে বলল শানডন—"ও যা বলছে—"

"ওর কথা আপনার মুখে শুনলে আপনিও খাঁচায় যাবেন। কে আছো, নিয়ে যাও ওকে।"

এগিয়ে গেল জনসন, বেল আর সিম্পসন। খপ করে একটা লোহার ডাণ্ডা তুলে নিয়ে মাথার ওপর ঘোরাতে ঘোরাতে ডাকাতে হুংকার ছাড়ল পেন—"খবরদার!"

এবার এগিয়ে গেলেন স্বয়ং ক্যাপ্টেন। পকেট থেকে পিস্তল বার করে সহজ গলায় বললেন—"ডাণ্ডা ফেলো—নইলে মরবে।"

পেন পর্যন্ত ভয় পেল সেই স্বর শুনে। হ্যাটেরাসের অসাধ্য কিছু নেই। পিঞ্জরাবদ্ধ শার্দুলের মত ডাণ্ডা ফেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল জ্বলন্ত চোখে। জনসন আর বেল তাকে নিয়ে গেল জাহাজের খোলে।

চালু হয়ে গেল বয়লার। ছদিন অত্যন্ত ধীর গতিতে যাওয়ার পর বীচার পয়েন্টে পৌঁছেও কিন্তু বহু আকাঙ্খিত বরফহীন সমুদ্র পাওয়া গেল না। ক্যাপ্টেন নিজে উঠে গেলেন মাস্তুলের ডগায়। চারদিক দেখলেন। নেমে এলেন মুখ অন্ধকার করে - একটি কথাও বলবেন না।

ষোলই অগাস্ট। এই প্রথম সূর্য অস্তাচলে গেল। সমাপ্তি ঘটল চব্বিশ ঘণ্টা-ব্যাপী বিরামবিহীন দিনের আলোর।

আধো-অন্ধকারে ডেকে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডায় হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে একদিন ডক্টর বললেন জনসনকে—"আকাশ দেখো, পাখীগুলোও ঠাণ্ডার ভয়ে দক্ষিণ দিকে উড়ে চলেছে। ওদের সঙ্গ ধরবার মত লোক কিন্তু এ-জাহাজেও আছে। তাই না ?"

"হ্যাঁ, ডক্টর। ওদের প্রাণের মায়া একটু বেশী।"

আঠারোই অগাস্ট। কুয়াশার মধ্যে দিয়ে দেখা গেল ব্রিটানিয়া পাহাড়ের আবছা আদল। পরের দিন নর্দামবাবল্যাণ্ড উপসাগরে বরফ পরিবৃত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল ফরোয়ার্ড।

২৩॥ হিমশিলাদের আক্রমণ

এই জায়গাতে এসেই স্যার এডোয়ার্ড বেলচার একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলেন। দেখেছিলেন দক্ষিণ-পূব দিকে শুধু বরফের প্রান্তর—কিন্তু উত্তর-পশ্চিম যতদূর দুচোখ যায় কেবল খোলা সমুদ্র। সুমেরু কেন্দ্রে উন্মুক্ত সমুদ্রের কল্পনা কি তাহলে কি নিছক কপোলকল্পিত নয়?

বিশে অগাস্ট কুয়াশা একটু সরে যেতেই সাগ্রহে দিগন্ত পর্যবেক্ষণ করলেন হ্যাটেরাস। কিন্তু মুখ দেখেই বোঝা গেল মনে মনে ভেঙে পড়েছেন। কোথায় খোলা সমুদ্র? চারিদিকে কেবল বরফ আর বরফ!

তা সত্ত্বেও নোঙর তুলে নিয়ে হুকুম দিলেন উত্তরে এগোতে। অবাধ্য হওয়ার মত সাহস ছিল না খালাসীদের। প্রাণের মায়া সকলেরই আছে। তেরো দিন অতি কষ্টে পেণী প্রণালী পর্যন্ত যাওয়ার পর খালাসীরা কিন্তু অদ্ভুত দৃশ্যটা নিজেরাও দেখতে পেল।

দক্ষিণ দিকের পথ একদম বন্ধ—কিন্তু ঠেলেঠুলে উত্তর দিকে যাওয়া যায়। সেদিকে বিপদ কম!

আড়ালে কিন্তু বিদ্রোহের ধোঁয়া পুঞ্জীভূত হচ্ছিল। পেন তো শানডনকে বলেই দিল—"পাগল ক্যাপ্টেনকে শায়েস্তা করার একমাত্র দাওয়াই হল আরেকজন ক্যাপ্টেনকে নিয়ে আসা! আপনি কি বলেন মিঃ শানডন?"

জবাবটা এড়িয়ে গেল শানডন। মনে মনে তার বড় আশা ছিল ফরোয়ার্ডের ক্যাপ্টেন হবে সে নিজে—হ্যাটেরাস সহসা আবির্ভূত হয়ে তার বাড়া ভাতে ছাই দেওয়ার পর থেকে মনে মনে সে রেগে আছে। সুতরাং—

হ্যাটেরাস কিন্তু হিসেব করে দেখলেন, তাঁর আগের অভিযাত্রীরা যে পথ পেরোতে দু তিন বছর সময় নিয়েছে, তিনি সেই পথ পেরিয়ে এলেন মাত্র পাচ মাসে! সুতরাং বিজয়লক্ষ্মী হয়ত আর দূরে নেই।

আটুই সেপ্টেম্বর। আবার বরফ পরিবৃত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল ফরোয়ার্ড। এবার আর করাত দিয়ে বরফ কাটা গেল না। বারুদভর্তি সিলিণ্ডার ফাটিয়ে বরফ উড়িয়ে পথ করে নিলেন হ্যাটেরাস।

সেই রাতেই ফুঁসে উঠল ঝড়। ঢেউয়ের মাথায় বরফ পাহাড়ের নাচন দেখে বুক শুকিয়ে গেল খালাসীদের। আচমকা একটা বিরাট হিমপর্বত বেগে ধেয়ে এল ফরোয়ার্ড লক্ষ্য করে।

"সামাল, সামাল" রব উঠল জাহাজে। কিন্তু পালিয়ে কোথায় যাবে

ফরোয়ার্ড? কামান দাগতে হুকুম দিলেন হ্যাটেরাস। কিন্তু কামানের গোলা দিয়ে পাহাড় ঠেকানো যায়? ভাসমান পাহাড় দমাস করে এসে পড়ল সামনের গলুইতে—গুঁড়িয়ে গেল সামনের অংশ।

হ্যাটেরাস কিন্তু চরম সঙ্কটেও মাথা ঠাণ্ডা রেখেছিলেন। আশ্চর্য মানুষ বটে! হেঁকে বললেন—"মাথার ওপর···মাথার ওপর···হুঁশিয়ার!"

যদিও অন্ধকার, তবুও সাদা বরফ ম্লান আলোতেও দেখা যাচ্ছিল স্পষ্ট। খালাসীরা সভয়ে দেখল বরফ পাহাড় বিপজ্জনকভাবে ঝুঁকে রয়েছে জাহাজের ওপর।

তারপরেই দমাদম শব্দে বরফের চাঁই ভেঙে পড়তে লাগল জাহাজের ওপর। বিপুল ভারে ডুবু ডুবু হল জাহাজ। প্রমাদ গুণলেন হ্যাটেরাস। জাহাজ গেঁথে আছে বরফের গায়ে—বেরোনোর পথ নেই। মাস্তুল ভেঙে পড়ল বলে!

আচমকা দুলে উঠল বরফ-পাহাড়—ভারকেন্দ্র সরে আসায় ঘুরে যাচ্ছে হিমশৈল—সহসা গোটা ফরোয়ার্ড জাহাজটা উঠে পড়ল জল থেকে শূন্যে! পরক্ষণেই মড মড শব্দ শোনা গেল তলদেশে!

উল্টোদিকে জাহাজকে নামিয়ে দিয়েছে ঘূর্ণমান শিলা। তলার বরফ জাহাজের ভারে ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল এইমাত্র—ফের জলের ওপর ভাসছে ফরোয়ার্ড!

হ্যাটেরাস এবার টের পেলেন, প্রায়-অক্ষত অবস্থায় গোটা জাহাজটা দ্রুত ছুটে চলেছে উত্তর দিকে! ভাসমান বরফ-প্রান্তর টেনে নিয়ে চলেছে জাহাজকে।

পনেরোই সেপ্টেম্বর আর একটা বরফ-প্রান্তরে ধাক্কা খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল ছুটন্ত বরফ-প্রান্তর। থর থর করে কেঁপে উঠল ফরোয়ার্ড।

যন্ত্রপাতি নিয়ে মেপে জুপে হ্যাটেরাস দেখলেন, ভৌগোলিকরা যে অজানা সমুদ্রের হদিশ পাননি—শুধু মানচিত্রের ওপর চিহ্নিত করে বলেছিলেন পৃথিবীর শীতলতম অঞ্চল কোনখানে—ফরোয়ার্ড এসে পড়েছে অজ্ঞাত সমুদ্রের সেই বিশেষ অঞ্চলটিতে।

২৪ ॥ শীতের প্রস্তুতি

বরফ-প্রান্তরে শীত কাটাতে হয় কি করে, জনসনের সে অভিজ্ঞতা আছে। হ্যাটেরাস নিজেও ভুক্তভোগী। সুতরাং দুজনে মিলে সেইভাবে শীতের প্রস্তুতি শুরু করলেন। কেন না, গ্র্যানাইট কঠিন এই বরফ কারাগার থেকে পরিত্রাণের পথ আবিষ্কার করা মানুষের সাধ্যাতীত।

মুষড়ে পড়েছে সকলেই। আতংকিতও বটে। একা ডক্টর ফূর্তিতে উজ্জ্বল! কপাল জোর না থাকলে মেরু অঞ্চলে শীতকাল কাটানোর সুযোগ ক'জন পায়!

তুষারের ধর্ম উত্তাপকে ঠেলে দেওয়া—শুষে নেওয়া নয়। তাই এস্কিমোরা বরফ চাঁই দিয়ে ইগলু বানিয়ে ভেতরে থাকে। ভেতরের উত্তাপ বেরিয়ে যেতে পারে না।

একই পন্থায় বরফ দিয়ে আবরণ সৃষ্টি করা হল জাহাজের চারধারে। ডেকের ওপর তেরপল খাটিয়ে নেওয়া হল।

দেখতে দেখতে তার ওপর তুষার জমে কঠিন হয়ে গেল। ভেতরকার উত্তাপ ভেতরেই রইল। শুধু একটা ফুটো রাখা হল বরফ ছাদে। প্রতিদিন বরফ পরিষ্কার করে উন্মুক্ত রাখা হত সেই ছিদ্রপথ।

জাহাজের আশপাশ থেকে বরফ কেটে খোলের অবস্থা দেখে নেওয়া হল। না, তেমন জখম হয়নি জাহাজ। দেদার টাকা খরচ করা হয়েছিল মজবুত জাহাজ তৈরীর জন্যে—ফল পাওয়া গেল এখন।

একটি বড় ঘরে স্টোভ জ্বালানো রইল অষ্টপ্রহর। জাহাজশুদ্ধ লোক স্টোভ ঘিরে বসে থাকত গা গরম করার জন্যে। এ ছাড়াও উদয়াস্ত নানাবিধ ব্যায়ামের হুকুম দিয়েছিলেন হ্যাটেরাস—গা গরম রাখার জন্যে এবং অসুখবিসুখ ঠেকিয়ে রাখার জন্যে। শীতের জড়তায় গুটিসুটি মেরে বসে থাকলে শীতের কামড়ে মরণ আসতে দেরী হবে না।

খাওয়াদাওয়ার দিকেও প্রখর নজর দিলেন হ্যাটেরাস। বেশী করে মাংস খেতে হয় এই অঞ্চলে। সেইসঙ্গে ফুটন্ত চা, কোকো ইত্যাদি।

ডাক্তার বুঝিয়ে বললেন সবাইকে—"বেশী করে তেল খাও। এস্কিমোরা দশ থেকে পনেরো পাউণ্ড তেল আর চর্বি খেয়ে সুস্থ থাকে বরফের রাজ্যে। তৈলাক্ত খাবার ভাল না লাগলে চিনি আর চর্বি খাও। মোটকথা, বাড়তি কার্বন চাই। স্টোভে যেমন জ্বালানী দরকার, তেমনি জ্বালানী দরকার তোমাদের দেহেও।"

শীতের প্রস্তুতি শেষ হল দশই অক্টোবর।

২৫ ॥ জেমস রস-য়ের শেয়াল

বেধড়ক প্রাণী-হত্যা আরম্ভ হয়ে গেল উদর পূজোর জন্যে, পাখীরা চম্পট দিয়েছে কোন কালে, কিন্তু মেরু-মোরগের অভাব নেই। মারতেও সুবিধে।

উনিশ তারিখে সিম্পসন একটা নীলমাছ মারল বেশ কয়েকবার গুলি করার পর। লম্বায় ন'ফুট, মাথাটা বুলডগের মত, চোয়ালে মোট বোলটা দাঁত। সমুদ্র-কুত্তাই বটে!

ডক্টর এককাণ্ড করলেন। মাথা আর চামড়া নিজের সংগ্রহশালায় রাখবেন বলে নীলমাছটাকে ডুবিয়ে রাখলেন বরফের গর্তে ঠাণ্ডা জলে। হাজার হাজার চিংড়ি আধদিনের মধ্যেই খুবলে খেয়ে নিল সমস্ত মাংস—মাথা আর চামড়া নিয়ে হাসতে হাসতে উঠে এলেন ডক্টর।

দিন যায়। বরফ-কারাগারে বন্দী জাহাজকে আর চেনা যায় না। মাস্তুলের ডগা থেকে খোল পর্যন্ত পুরো জাহাজটা পুরু বরফের আচ্ছাদনে ঢেকে গিয়েছে।

কঠোর নিয়মানুবর্তীতার মধ্যেও কিন্তু অসন্তোষ জাগ্রত রয়েছে খালাসীদের মধ্যে। জমাট বাঁধছে হ্যাটেরাসের প্রতি আকণ্ঠ ঘৃণা।

এই সময়ে একদিন স্থির হল ভালুক শিকার করতে হবে। ভালুকের মাংস এবং চর্বি দুটোই প্রয়োজন গা গরম রাখার জন্যে। কিন্তু ভালুক মারতে গিয়ে একটা শেয়াল মেরে বসল সবাই মিলে।

শিকারীদের দোষ নেই। বরফ-প্রান্তরে আলোক-প্রতিসরণের ভেল্কীর ফলে সাদা শেয়ালকেই দূর থেকে বিরাটকায় সাদা ভালুক মনে হয়েছিল। দমাদম গুলি চালিয়ে বেচারীকে শুইয়ে দেওয়ার পর দেখা গেল ভালুক নয়--শেয়াল।

শেয়ালের গলায় একটা কলার। তাতে কি যেন খোদাই করা ছিল—এখন আর পড়া যাচ্ছে না। না গেলেও ডক্টর ধরে ফেললেন কলার রহস্য।

বললেন গম্ভীর কণ্ঠে—"১৮৬৮ সালে জেমস রস কয়েকটা শেয়ালের গলায় কলার পরিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন। এরা খাবারের খোঁজে অনেক দূর পর্যন্ত ছুটে যায়। রস ভেবেছিলেন, একদিন না একদিন কারো চোখে তা পড়বে এবং তাঁদের উদ্ধার করে নিয়ে যাবে।—বারো বছর পরে শেয়াল ধরা পড়ল—কিন্তু রস আর নেই।"

২৬॥ শেষ কয়লা

খালাসীদের ওপর হুকুম ছিল রোজ দুঘণ্টা জোরে জোরে ডেকে পায়চারী করতে হবে এবং সেইখানেই ধূমপান করতে হবে। ঘরের মধ্যে আগুন জলত সব সময়ে—আঁচ একটু কমে এলেই তৎক্ষণাৎ বরফ জমা শুরু হয়ে যেত মেঝেতে, বল্টুতে, পেরেকে! নিঃশ্বেস পর্যন্ত নিমেষ মধ্যে জমে তরল এবং

পরক্ষণেই বরফ হয়ে ঝরে পড়ত! তাই সবাই আগুন ঘিরে বসে থাকব প্রাণের ভয়ে।

ডক্টরের প্রাণে কিন্তু ফুর্তির জোয়ার। শেয়াল বধ করে ফেরবার সময়ে দেখেছিলেন বৃষ্টির মত উল্কাপাতের আশ্চর্য দৃশ্য। তারপর থেকে প্রতি রাতেই দেখেন মেরু জ্যোতির স্বর্গীয় রূপ। অত্যাশ্চর্য সেই দৃশ্য যে না দেখেছে সে বুঝতে পারবে না বরফ রাজ্যে প্রকৃতি কি সুন্দর সাজেই না সেজে থাকেন। এ ছাড়াও মাঝে মাঝে দেখা যেত চাঁদ। মরা চাঁদ। এক চাঁদ অসংখ্য নকল চাঁদ হয়ে শোভা পেত আকাশে।

হ্যাটেরাস জ্বালানী বাঁচানোর জন্যে নিজের ঘরের স্টোভ নিভিয়ে বড় ঘরে এসে দাঁড়িয়ে থাকতেন। নাবিকরা জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে থাকত তাঁর পানে। একা তাঁর জন্যে এতগুলি মানুষের এই দুর্গতি। হ্যাটেরাস ভ্রূক্ষেপ করতেন না। লোহার মানুষের মত দুহাতে বুকে জড়ো করে দাঁড়িয়ে থাকতেন এক কোণে।

পেন এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা ক্যাপ্টেনের হুকুম শুনছে না ইদানীং। শারীরিক ব্যায়ামের ধার ধারে না। দিনরাত গুটিসুটি মেরে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকে দোলনা বিছানায়। কুফল দেখা দিল দিন কয়েকের মধ্যেই। মারাত্মক স্কার্ভি রোগে আক্রান্ত হল প্রত্যেকেই। অসহ্য সেই দৃশ্য দেখা যায় না। হাত পা ফুলে উঠল—নীল কালো ছোপে ঢাকা পড়ল সর্বাঙ্গ।

এই অবস্থায় অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করার পর আটই ডিসেম্বর ডক্টর দেখলেন থার্মোমিটারের পারা পর্যন্ত দারুণ ঠাণ্ডায় জমে গিয়েছে।

ভয় পেলেন ডক্টর। শূন্য তাপাংকের চুয়াল্লিশ ডিগ্রী নীচে পৌঁছেছে মৃত্যুরূপী শৈত্য!

সেই দিনই এল আরো মারাত্মক খবর - কয়লা ফুরিয়েছে স্টোভ জ্বালানো হয়েছে শেষ কয়লাখণ্ড দিয়ে।

২৭॥ বড়দিন

বিশে ডিসেম্বর এল সেই ভয়ংকর মুহূর্ত। স্টোভ নিভে গেল ক্ষুধার্ত শ্বাপদের মত খালাসীরা ঘিরে ধরল ক্যাপ্টেনকে।

শানডন এগিয়ে এসে বললে—"ক্যাপ্টেন, আর কয়লা নেই।"

চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। এই সময়ে বিকট চেঁচিয়ে পেন বললে —"কয়লা নেই তো কি হয়েছে—কাঠ আছে—জাহাজের কাঠ। পোড়াও জাহাজ!"

সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল মৃত্যুপথের যাত্রীরা। বিবর্ণ হয়ে গেলেন হ্যাটেরাস। কুঠার তুলে আচমকা কোপ মারলেন পেনের মাথা লক্ষ্য করে। ডক্টর ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিলেন পেনকে—কুঠার গেঁথে গেল কাঠের ওপর।

অতিকষ্টে নিজেকে সামলে নিলেন ক্যাপ্টেন। বললেন শুষ্ক কণ্ঠে "মূর্খ! জাহাজ পোড়ালে ফিরব কিভাবে? মদ আছে—অনেক মদ তাই দিয়ে জ্বালো আগুন।"

হৈ-হৈ করে উঠল নাবিকরা। খোল থেকে নিয়ে এল বাক্স বাক্স মদ।

সেইদিন থেকে কোমরে পিস্তল নিয়ে জাহাজময় পায়চারী করতে লাগলেন ক্যাপ্টেন। কুকুরটা রইল সঙ্গে। কাউকে আর তাঁর বিশ্বাস নেই।

পঁচিশে ডিসেম্বর ডক্টর নিজেই ধুঁকতে ধুঁকতে এসে বললেন—কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালতে হবে, নইলে মরবে প্রত্যেকেই।

"কক্ষনো না", হুংকার ছাড়লেন ক্যাপ্টেন। "নিজেরা যা পারেন করুন—আমি মত দেব না।"

ঐটুকু ইঙ্গিতই যথেষ্ট। কুঠার নিয়ে নাবিকরা ছুটল জাহাজের পাটাতন কাটতে। দমাদম শব্দ ভেসে এল নীচে। নিশ্চল দেহে দাঁড়িয়ে রইলেন হ্যাটেরাস—দুচোখ ভরে উঠল জলে।

পয়লা জানুয়ারী ডক্টর ছুটে এলেন একটা বই নিয়ে। স্যার বেলচার লিখেছেন—এখান থেকে একশ মাইল দূরে এক জায়গায় কয়লা আছে মাটির তলায়—সভ্য মানুষ লুকিয়ে রেখেছে সেই কয়লা। বেলচার নিজে দেখেছেন।

যন্ত্রপাতি নিয়ে দৌড়ে ওপরে গেলেন হ্যাটেরাস। অনেকক্ষণ পরে মুখ শুকনো করে নেমে এসে চুপিচুপি বললেন ডক্টরকে—"কাউকে বলবেন না—বরফপ্রান্তর আবো দু'ডিগ্রী উওরে ভেসে এসেছে—কয়লা এখান থেকে কম করে তিনশ মাইল দূরে।"

২৮॥ যাত্রার প্রস্তুতি

হ্যাটেরাস এতদিন পরে এই প্রথম উল্লসিত হলেন। কিন্তু অতিকষ্টে আনন্দ চেপে রাখতে হল মনের মধ্যে। ...জের অজান্তেই তিনি সুমেরু কেন্দ্র থেকে মাত্র আট ডিগ্রী দূরে এসে পৌঁচেছেন। কয়লার ডিপো যদিও এখান থেকে আড়াইশো মাইল দক্ষিণে—তা হোক।

এই আড়াইশ মাইল বরফ মাড়িয়ে যেতে সময় লাগবে প্রায় চল্লিশ দিন। সেইভাবে যাত্রার প্রস্তুতি আরম্ভ করল জনসন। ৩৫ ইঞ্চি চওড়া আর ২৪ ফুট

চওড়া স্লেজ গাড়ীটা ভরিয়ে ফেলল দরকারী জিনিসপত্রে। গ্রীনল্যাণ্ড টাইপের স্লেজগাড়ী—বিলক্ষণ মজবুত। এস্কিমোরা যেভাবে তলায় গন্ধক আর তুষার ঘসে স্পীড বাড়ায়—এর তলাতেও তা করা হয়েছে। কাজেই বরফের ওপর দিয়ে পিছলে যাবে আশ্চর্য গতিবেগে। গাড়ী টানবে ছ'টি কুকুর। ২০০০ পাউণ্ড ওজন টেনে নিয়ে যাবে অনায়াসে। সুতরাং হিসেব করে জিনিসপত্র তোলা হল গাড়ীতে। মদ, চা, বিস্কুট, শুকনো গরুর মাংস, বারুদ, বন্দুক, পোর্টেবল স্টোভ এই সব তুলতেই গেল চারটে দিন।

হ্যাটেরাস চিন্তায় পড়লেন অন্য একটি ব্যাপার নিয়ে। সঙ্গে যারা থাকছে, তাদের নিয়ে তো ভাবনা নেই—ভাবনা যাদের রেখে যাচ্ছেন তাদের নিয়ে। তাঁর অবর্তমানে না জানি কি কাণ্ড করে বসে এরা।

তাই জনসনকে আড়ালে ডেকে বললেন—"জনসন, তোমাকে ছাড়া আর কাউকে আমি বিশ্বাস করি না। তুমি জাহাজে থাকো। যদি সেরকম দরকার হয় তুমি নিজে আমার মতই হুকুম দেবে—অধিকার দিয়ে রাখলাম। চার পাঁচ হপ্তা পরে যদি না ফিরি, জাহাজ নিয়ে ইংল্যাণ্ডে ফিরে যাবে।"

মাথা নীচু করে জনসন বললে—"তাই হবে!"

ছ তারিখে শুরু হল যাত্রা। হ্যাটেরাসের সঙ্গে রইল তাঁর নিত্যসঙ্গী কুকুর ডাক, আর ক্লবোনি, বিল এবং সিম্পসন। যাত্রার মুহূর্তে প্রাণ খুলে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে গিয়েও থমকে গেলেন হ্যাটেরাস শানডনের মুখে বিদ্রুপতীক্ষ্ণ হাসির ঝলক দেখে।

কিন্তু আর ফেরা যায় না—দেখতে দেখতে আকাশের ঘনমেঘের মধ্যে হারিয়ে গেল ফরোয়ার্ডের বরফঢাকা মাস্তুল।

২৯॥ বরফের ওপর দিয়ে

মাথামুখ ঢাকা থাকলে কি হবে, বরফ জমছে নাকের আচ্ছাদনে নয়ত ঘাড়ের কলারে। কুঠার দিয়ে বরফ চাঁচতে হচ্ছে প্রতিবার। কথা বলাও এক ঝকমারি—নিমেষের মধ্যে বরফ জমে যাচ্ছে ঠোঁটের ফাঁকে—নিঃশ্বাসের উত্তাপ দিয়েও সেই বরফ গলানো যায় না।

প্রথম দিন বিশ মাইল পথ পেরিয়ে রাত্রে বরফ চাঁই দিয়ে ইগলু বানিয়ে নেওয়া হল। ভেতরে ঠাঁই পেল ডাক—বাকী কুকুররা খেয়ে নিয়ে বরফের মধ্যে ঢুকে ঘুমিয়ে পড়ল তৎক্ষণাৎ।

পরের দিন পথ চলতে চলতে গম্ভীর হয়েছিলেন হ্যাটেরাস। ক্লবোনির

কথার উত্তরে শুধু বললেন—"ক্যাপ্টেনের জায়গা জাহাজে। জাহাজ না ছেড়ে এলেই ভাল করতাম।"

স্লেজ ছুটে চলেছে বেশ জোরেই। ফসফোরেসেন্স আলোকচ্ছটা দেখা যাচ্ছে গাড়ীর তলায়। জমি যেন জ্বলছে। ফুলকি ছিটকোচ্ছে তলা থেকে।

পনেরোই জানুয়ারী একশ মাইল পথ পেরিয়ে এল দুঃসাহসীরা। সেই দিনই দুপুরের দিকে ঘটল একটা অভাবনীয় কাণ্ড।

আবহাওয়া মোটামুটি পরিষ্কার। বরফ প্রান্তরের অনেক দূর পর্যন্ত দৃশ্যমান। আচম্বিতে পায়ের তলা থেকে বরফ-বাষ্প ছিটকে উঠল শূন্যে—নব্বই ফুট ওপরে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল স্থির হয়ে!

ঘন আবরণের মধ্যে দিয়ে কেউ কাউকে দেখতে পেলনা—এক ফুট দূরেও কি আছে দেখা যাচ্ছে না। বিমূঢ়ের মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর চারজনেই ডেকে উঠল চারজনের নাম ধরে—কিন্তু কারও ডাক কারো কানে পৌঁছোলো না। পৌঁছোবে কি করে? রহস্যজনক এই বাষ্প যে শব্দ তরঙ্গ পর্যন্ত বহন করছে না!

মিনিট পাঁচেক চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবার পর দড়াম করে বন্দুক ছুঁড়লেন ক্লবোনি। ছুঁড়েই চমকে উঠলেন দুটি কারণে: প্রথমতঃ, বন্দুকের তীক্ষ্ণ আওয়াজ অদ্ভুত এই বাষ্পের মধ্যে যে এমন ভয়ংকর শব্দ লহরী সৃষ্টি করবে, তা কে জানত! কামান গর্জনের মত আওয়াজ কানের ওপর আছড়ে পড়তে লাগল বারংবার!

দ্বিতীয়তঃ, হেলেদুলে একটা সচল বরফ এগিয়ে এল তাঁর পানে। চোখ কপালে ক্লবোনি দেখলেন!—

ভালুক! সাদা ভালুক!

ক্ষিপ্তের মত সরে গেলেন ডক্টর। ভালুকেরও তাঁকে নিয়ে মাথাব্যথা দেখা গেল না। উধাও হল বাষ্পের মধ্যে।

সহসা পায়ের তলায় জমি যেন উঁচু হতে লাগল। ব্যাপার কি? হিম শৈল নাকি? উল্লসিত হলেন ডক্টর। দ্রুত উঠে এলেন বরফ পাহাড়ে। আশি ফুট উঠতেই এপাশ থেকে ওপাশ থেকে উঠে এল আরো তিনটে মুখ—ক্যাপ্টেন, বেল এবং সিম্পসন!

সহসা কুকুরদের হাঁকডাক ভেসে এল আশি ফুট নীচ থেকে। ডাক চেঁচাচ্ছে। খুব ক্ষীণ চীৎকার হলেও কুকুরগুলো যেন ভয় পেয়েছে।

"ভালুক! ভালুক!" গলার শির তুলে চেঁচিয়ে উঠলেন ডক্টর। পড়ি কি মরি করে নামতে লাগলেন নীচের দিকে। কি আশ্চর্য! পুকুরের জল

নেমে যাওয়ার মত ঘন বাষ্পও ঠিক তখনি নামতে লাগল নীচের দিকে। দেখতে দেখতে কুকুরদের মাথা ভেসে উঠল বাষ্পর ওপর।

আর দেখা গেল গোটা তিরিশ জন্তু। তার মধ্যে চার পাঁচটা ভালুক—বাকী সব শেয়াল। গন্ধে গন্ধে এসে পৌঁচেছে খাবারের ধারে এবং লুঠপাট আরম্ভ করে দিয়েছে খাদ্যসম্ভার নিয়ে।

গুলি চালালেন হ্যাটেরাস। চম্পট দিল ক্ষুধার্ত প্রাণীরা।

কিন্তু ক্ষতি যা হবার তা হয়ে গেছে!

৩০॥ স্তূপ

মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে ঘটে গেল সাংঘাতিক এই কাণ্ড। তুষার বাষ্পর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এর বেশী সময় লাগেনি। কিন্তু ঐটুকু সময়ই উপোষী শেয়াল আর ভালুকদের পক্ষে যথেষ্ট।

ক্ষয় খতিয়ান নিয়ে দেখা গেল ২০০ পাউণ্ড মাংস, ১৫০ পাউণ্ড বিস্কুট, এক পিপে মদ এবং বিস্তর চা নষ্ট করে গেছে জানোয়ারগুলো। তার মানে, এখন সামনে এগোতে হলে খাওয়া দাওয়া রেশন করতে হবে—যা বরাদ্দ, তার অর্ধেক খেতে হবে। নইলে দেড়শ মাইল পেছিয়ে জাহাজে ফেরার পরিণাম কি খুব ভাল হবে?

আশ্চর্য মানুষ হ্যাটেরাস কিন্তু সামনেই চললেন—কপালে যা থাকে থাকুক—মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনেও অগ্রসর হলেন সামনে।

সিম্পসনের শরীর কিন্তু ভেঙে পড়ছে। ওর ইচ্ছে ছিল ফিরে যাওয়ার। কিন্তু কাউকে দলে টানতে না পেরে এগোতে হল সামনে।

আঠারোই জানুয়ারী পালটে গেল বরফ প্রান্তরের চেহারা। সমতল ভূমি মিলিয়ে যাচ্ছে দ্রুত—চোখা চোখা বরফ অগুন্তি পর্বতশীর্ষের মত দাঁড়িয়ে পথ জুড়ে। অভিযাত্রীদের কালঘাম ছুটে গেল এই পথ পেরোতে। স্লেজ চলতে পারে না এমন বন্ধুর পথে—তাই দশ ফুট যেতে লাগল কয়েকঘণ্টা সময়। সারাদিনে এগোনো গেল মাত্র পাঁচ মাইল পথ।

হাড়ভাঙা পরিশ্রম গিয়েছে সারাদিন। বরফ চাঁই সাজিয়ে ইগলু সাজানোর মত শক্তিও আর নেই। তাই মোষের চামড়ার তাঁবু খাটিয়ে শুয়ে পড়ল সবাই। ডক্টর দেখলেন, থার্মোমিটারের পারা ফের শূন্য তাপাংকের ৪৪ ডিগ্রী নীচে নেমে জমে কঠিন হয়ে গেল।

বিশে জানুয়ারী দুর্যোগ দেখা দিল আকাশে বাতাসে। আচমকা ধাক্কায়

গুঁড়িয়ে গেল স্লেজগাড়ীর সামনের দিক। সেইখানেই বসে গাড়ী মেরামত করতে গেল অনেকটা সময়।

সিম্পসনের অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে। হ্যাটেরাসকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন ক্লবোনি—"স্কার্ভিতে ভুগছে সিম্পসন। শুধু হাত-পা নয়, মাড়ি পর্যন্ত ফুলেছে। ওকে আর হাঁটানো যাবে না—গাড়ীতে শুইয়ে নিয়ে যেতে হবে। দিন দুয়েক জিরিয়ে নিলে আরো ভাল হত।"

"জিরিয়ে নেবো!" হাটেরাস তো হতবাক। "আঠারো জনের জীবন নির্ভর করছে কয়লার ওপর—একজনের জন্যে জিরেন নেব! কক্ষনো না!"

সেদিন রাতে ডক্টর ঘুমোলেন না। সারারাত জেগে সেবা করলেন সিম্পসনকে।

পরের দিন সকাল হতেই সিম্পসন বললে—"আমাকে এখানেই রেখে যান। শান্তিতে মরতে দিন।"

কিন্তু তা কি হয়! জোর করে তোলা হল তাকে স্লেজগাড়ীতে। ঠিক এই সময়ে অন্ধকার হয়ে এল আকাশ। অন্ধকারের মধ্যেই চেঁচাতে চেঁচাতে ডাক কোথায় যেন ছুটে গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বার বার ছুটে যেতে লাগল একদিকে—যেন ঐদিকে কিছু আছে।

আশায় বুক বেঁধে অভিযাত্রীরা গেলেন ওর পিছুপিছু। ডাক গিয়ে দাঁড়াল একটা চুণাপাথরের তৈরী বরফ ঢাকা স্তূপের সামনে।

ক্লবোনি আর বেল তৎক্ষণাৎ গাঁইতির ঘায়ে ভেঙে ফেললেন স্তূপট, আর আগাগোড়া ভীষণ শব্দে চেঁচিয়ে গেল ডাক।

ভেতরে পাওয়া গেল গর্তের মধ্যে রাখা একটা স্যাঁতসেঁতে কাগজ! কাগজে লেখা শুধু দুটি লাইন,

"আলটাম পরপয়েজ, ১২ই ডিসেম্বর···১৮৬০ ১২ ডিগ্রী লঙ্গি·····৮ ···৩৫ মিনিট ল্যাটি··· "

ভুরু কুঁচকে হ্যাটেরাস বললেন—"কিন্তু পরপয়েজ নামে কোনো জাহাজের নাম তো শুনিনি।"

ডক্টর বললেন—"আপনি না শুনলেও মাস ছয়েকের মধ্যে জাহাজডুবী খালাসীরা এখান দিয়েই গেছে!"

৩১ ॥ সিম্পসনের মৃত্যু

সিম্পসনের অবস্থা এখন শোচনীয়। ডক্টর বেশ বুঝলেন, মৃত্যু আর

বেশী দূরে নেই। ডক্টর নিজেও চোখের যন্ত্রণায় ভুগছেন। বাড়াবাড়ি হলে অন্ধ হয়ে যেতেও পারেন।

মাটির চেহারায় অগ্ন্যুৎপাতের চিহ্ন। মাঝে মাঝে পাহাড় পর্বতও ডিঙোতে হচ্ছে। একবার তো একটা পর্বত শ্রেণী পেরোতে গিয়ে দেড়হাজার ফুট পাহাড়ের মাথায় উঠতে হল স্লেজ ঘাড়ে করে।

অভিযাত্রীদের অবস্থাও ভাল নয়। তুষার ঝড়ে এবং পথ পরিশ্রমে কাহিল হয়ে পড়েছেন সকলে।

পঁচিশে জানুয়ারী রাত্রে ইগলুর ছাদ ধ্বসে পড়ল। ঘুমন্ত অবস্থাতেই বরফের মধ্যে জ্যান্ত কবর হয়ে যেত প্রত্যেকেরই। উঠে বসতে গিয়ে ডক্টরের মাথা ঠুকে যাওয়ায় সন্দেহ হয়েছিল বলেই বেঁচে গেল সকলে!

পরের দিনও অব্যাহত রইল ঝড়ের দাপাদাপি।

ছাব্বিশে জানুয়ারী বেল দেখতে পেল পথের পাশে একটা বন্দুক পড়ে। আমেরিকান বন্দুক। নিশ্চয় পরপয়েজ জাহাজের নাবিকরা ফেলে গেছে।

হ্যাটেরাসের কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই এসব ব্যাপারে। তাঁর মুখে শুধু এক কথা—"এগিয়ে চলো…এগিয়ে চলো!"

সাতাশে জানুয়ারী পাওয়া গেল একটা সেক্সট্যাণ্ট এবং ফ্লাস্ক। পরপয়েজ জাহাজের লোকজন খুব বেশী দূরে নেই মনে হচ্ছে।

হ্যাটেরাসের কিন্তু কোনো মাথাব্যথাই নেই দুর্গতদের নিয়ে। বরং ওদের এড়িয়ে যেতে পারলেই যেন বাঁচেন।

সন্ধ্যের দিকে শেষ মুহূর্ত উপস্থিত হল সিম্পসনের। সেইসঙ্গে নতুন করে শুরু হল ঝড়ের হু-হুংকার! ছুঁচের মত বরফ কণা বিঁধতে লাগল অভিযাত্রীদের মুখে। তিনবার তাঁবু খাটানো হল—তিন বারই তা উড়ে গেল ঝড়ে। শেষকালে খোলা জায়গায় শুয়ে রইল মৃত্যুপথের যাত্রী সিম্পসন।

শুরু হল দাঁতের বাদ্যি। জ্বলন্ত চোখে হ্যাটেরাসের পানে চেয়ে রইল সিম্পসন। চরম মুহূর্তে দেহের সব শক্তি দিয়ে সহসা উঠে বসে হাত বাড়িয়ে ধরল হ্যাটেরাসের পানে—নিঃশব্দে তর্জনী সংকেতে দায়ী করল ক্যাপ্টেনকে তার মৃত্যুর জন্যে। পরক্ষণেই প্রাণহীন দেহটা গড়িয়ে পড়ল গাড়ীর ওপর।

এগোতে গেলেন হ্যাটেরাস—পারলেন না। ঝড় তাঁকে ঠেলে রাখল তফাতে। পলকহীন চোখে চেয়ে রইলেন মৃত সিম্পসনের পানে। অসম্ভবের অভিযানে প্রথম প্রাণবলি দিল আঠারো জনের একজন!

নিষ্ঠুর নির্মম ক্যাপ্টেনের পাণ্ডুর গালের ওপর গড়িয়ে পড়ল এক বিন্দু অশ্রু—মধ্যপথেই তা জমে বরফ হয়ে গেল—মাটি পর্যন্ত পৌঁছোল না!

সভয়ে ডক্টর আর বেল চেয়ে রইলেন তাঁর সেই মূর্তির পানে। মানুষ, না, অতি-মানুষ? সারারাত লাঠিতে ভর দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস—সুমেরু অভিযানের জীবন্ত বিস্ময়।

৩২॥ প্রত্যাবর্তন

ভোর ছটা নাগাদ ঝড়ের প্রকোপ কমল—দিন কয়েক পরে এই প্রথম সূর্যের মুখ দেখা গেল আকাশে।

বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন হ্যাটেরাস—"বন্ধুগণ, বেলচার যে জায়গার কথা বলেছেন, এখান থেকে তা এখনো ষাট মাইল দক্ষিণে। কিন্তু এ অবস্থায় আর এগোলে মৃত্যু অনিবার্য। চলুন, ফিরে যাই।"

"চমৎকার সিদ্ধান্ত," সায় দিলেন ডক্টর। একমত হল বেল।

"তাহলে দিন দুয়েক জিরিয়ে নেওয়া যাক," বললেন ক্যাপ্টেন।

চুপচাপ বসে না থেকে দুদিনে অভিযাত্রীরা ভাঙা স্লেজ মেরামত করল, বরফ এবং ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া কঠিন ছিন্ন পোশাক সেলাই করে নিল। ছেঁড়া বুট ফেলে দিয়ে নতুন বুট পরল। দুটো কুকুর মারা গেছে পথশ্রমে—ডাক এদের জায়গায় স্লেজ টানবে'খন মাল তো বেশী নেই—মাত্র ২০০ পাউণ্ড।

তিরিশ তারিখ সকাল পর্যন্ত এই সব নিয়েই ব্যস্ত রইল দুঃসাহসীরা। এই সময়ে ডক্টর লক্ষ্য করলেন, ডাক বড় অস্থির হয়ে উঠেছে। বারবার ছুটে যাচ্ছে দূরের একটা বরফ স্তূপের পানে। ভাবলেন, সিম্পসনের মৃতদেহ দেখেই বুঝি এত ছটফট করছে বেচারী! তাই ঠিক করলেন, সিম্পসনকে এবার কবর দেওয়া যাক।

ডাক যে স্তূপের কাছে গিয়ে ফিরে আসছিল বারবার, সিম্পসনকে নিয়ে যাওয়া হল সেখানে। আলগা তুষার সরিয়ে কঠিন বরফের ওপর গাঁইতির ঘা মারলেন ডক্টর। অমনি ঠং করে একটা বোতল গুঁড়িয়ে গেল গাঁইতির ঘায়ে।

চমকে উঠলেন ডক্টর। বোতল! বিজন মেরুতে মানুষের তৈরী বোতল! বেল ততক্ষণে গাঁইতির ঘায়ে তুলে এনেছে একটা ব্যাগ। ব্যাগের মধ্যে কিছু বিস্কুটের গুঁড়ো! জয় ভগবান! খাবারের গোপন ভাণ্ডার নাকি?

দমাদম গাঁইতি পড়তে লাগল বরফের ওপর। একটা বরফের চাঁই গড়িয়ে পড়তেই চেঁচিয়ে উঠল বেল!

মানুষের জোড়া পা দেখা যাচ্ছে বরফের নীচে!

টেনে আনা হল মানুষটাকে। বছর তিরিশ বয়স। মরে কাঠ হয়ে গেছে। খুঁড়তে খুঁড়তে পাওয়া গেল আরো একটা দেহ। বছর পঞ্চাশ বয়স। মৃত। দুটি দেহই আবৃত মেরু অভিযানের বিশেষ পোশাকে।

"বুঝলাম," গম্ভীর কণ্ঠে বললেন ডক্টর। "সেই রাতে ইগুলুর ছাদ ভেঙে পড়ে আমরাও মরতাম—বেঁচে গেছি কপাল জোরে। কিন্তু এঁরা বাঁচে নি। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই মারা গেছে।"

সবশেষে পাওয়া গেল আর একটা দেহ। বয়স আন্দাজ চল্লিশ। শক্ত সমর্থ চেহারা। এখনো মরে কাঠ হয়নি—প্রাণের উত্তাপ রয়েছে।

পকেট হাতরে পাওয়া গেল একটা আধপোড়া খাম। তাতে লেখা:

...টামণ্ট

...পয়েজ

...ইয়র্ক

"আলটামণ্ট... পরপয়েজ... নিউইয়র্ক!" সোল্লাসে বললেন ব্রবোনি— "নিউইয়র্কের পরপয়েজ জাহাজের আলটামণ্ট!"

"আমেরিকান," শুধু একটা কথাই বললেন হ্যাটেরাস এবং সব কথা বলা হয়ে গেল একটি শব্দের মধ্যে।

ডক্টর বললেন—"হোক আমেরিকান। আমি একে বাঁচিয়ে তুলব

সিম্পসনকে আলটামণ্টের জায়গায় রেখে কবর রচনা করে স্লেজ গাড়ী নিয়ে রওনা হল অভিযাত্রীরা। আলটামণ্ট সমস্ত পথটা শুয়ে রইল মড়ার মত। কিন্তু চেতনা নেই।

উনিশে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত নতুন কিছুই ঘটল না। অবর্ণনীয় কষ্ট, পথশ্রম এবং অকল্পনীয় বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে আসতে হল ডানপিটেদের।

চব্বিশে ফেব্রুয়ারী সহসা থমকে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন। সভয়ে দেখলেন দূর দিগন্ত লালে লাল হয়ে গিয়েছে আগুনের আঁচে এবং থামের মত কালো ধোঁয়া উঠে গিয়ে মিশছে ধূসর মেঘের স্তূপে।

"আগুন! আগুন! শয়তানরা ফরোয়ার্ড পোড়াচ্ছে।"

পাগলের মত আরো একঘণ্টা ছুটে যেতে হল সামনে। আগুনই বটে। ভয়ংকর সেই দৃশ্য ভাষার অতীত। গোটা ফরোয়ার্ড জাহাজটা পুড়ছে দাউ দাউ করে। আগুনের আঁচে চারপাশের বরফ গলে যাচ্ছে। পটপট শব্দ ভেসে আসছে এতদূরেও। শ-পাঁচেক গজ তফাতে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নিঃসীম হতাশায় দুহাত ছুঁড়ছে শূন্যে।

সে জনসন।

আচম্বিতে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটল জাহাজের বারুদঘরে। প্রলয়ংকর বিস্ফোরণে চক্ষের নিমেষে ধ্বংস হয়ে গেল ফরোয়ার্ড— লেলিহান আগুন আর ধোঁযা ছাড়া কিছুই রইল না। ভেঙে গেল হিমশৈল—ফেটে চৌচির হয়ে গেল বরফ প্রান্তর।

নিঝুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন হ্যাটেরাস। অনেকক্ষণ পরে সহসা মাথা তুলে বললেন উচ্চকণ্ঠে— "বন্ধুগণ! এখনো সব শেষ হয়নি। এখনো সাহস আছে বেল আর জনসনের মনে, ডক্টর জানেন বিজ্ঞান, আর আমার মধ্যে আছে প্রত্যয়। চলো যাই সুমেরু—আমরা ক'জনে!"

দ্বিতীয় খণ্ড

ধু-ধু বরফের রাজ্যে

১॥ ভাঁড়ার

নমাস! দীর্ঘ নটি মাস অসম্ভবের সঙ্গে মরণপণ লড়াইয়ের পর এই কি ছিল ভাগ্যে? দুঃসাহসীদের ইতিহাসে নতুন ইতিহাস রচনা করার সংকল্প বুকে নিয়ে বেরিয়েছিলেন হ্যাটেরাস, বরফরাজ্যে অজ্ঞাত সমুদ্র আবিষ্কার করে তাজ্জব করে দিতে চেয়েছিলেন বিশ্ববাসীকে—কিন্তু এত কষ্ট, এত আয়োজন, এত পথশ্রম সব ব্যর্থ হয়ে গেল! ফেটে উড়ে গেল ফরোয়ার্ড চোখের সামনে—ধূ-ধূ বরফের রাজ্যে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে রইলেন শুধু চারজন মানুষ। আঠারো জনের মধ্যে শুধু চারজন!

রইলেন বসনহীন, জ্বালানীহীন, আশ্রয়হীন অবস্থায়—গৃহ হতে ২৫০০ মাইল দূরে—মাঝে দুস্তর সমুদ্র আর বরফ প্রান্তরের ব্যবধান—পেরিয়ে যাওয়ার মত জাহাজ তো দূরের কথা—নৌকো পর্যন্ত নেই।

একটাই লম্বা নৌকো ছিল জাহাজে—বিশ্বাসঘাতক খালাসীরা চম্পট দেওয়ার সময়ে সেটি সঙ্গে নিয়ে গেছে

কয়েক শ গজ জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে জাহাজ ভাঙা টুকরো। ধ্বংসাবশেষে আগুন জ্বলছে এখনো হেথায় সেথায়—বরফ গলে গিয়েও ফের জমে কঠিন হতে আরম্ভ করেছে এর মধ্যেই। লোহালক্কর, কাঠ, তেড়াবেঁকা যন্ত্রপাতি, দুমড়োনো রড, ছেঁড়া তার বিক্ষিপ্ত হয়েছে বহুদূর পর্যন্ত। এত লোহা ছড়িয়েছে চারদিকে যা পেলে এস্কিমোরা হাতে স্বর্গ পেত—কিন্তু এখানে এ অবস্থায় সে সবের কোনো দাম নেই।

কামানটা ছিটকে গিয়েছে একটা হিমশৈলের ওপর—চোঙা উঁচিয়ে রয়েছে আকাশ পানে।

নিঝুম হয়ে দাঁড়িয়েছিল জনসন। বেচারা! অনেক চেষ্টা করেছে সে—কিন্তু বিশ্বাসঘাতক শানডনের নেতৃত্বে অতজনের সঙ্গে পারেনি।

সহসা শুধোলো চকিত কণ্ঠে—"সিম্পসন কোথায়?"

"সে নেই।" ভরাট গম্ভীর কণ্ঠে বললেন ডক্টর।

"মারা গেছে?"

"হ্যাঁ !—কিন্তু তার বদলে নিয়ে এসেছি আরেকজনকে। আমেরিকান। মরতে বসেছিল বরফ চাপা পড়ে।"

"মরতে বসেছিল ? কে সে ?"

"ক্যাপ্টেন আলটামণ্ট।"

"কয়লা এনেছেন ?"

"পাইনি।"

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল জনসন। সিম্পসন নেই, কয়লা নেই, জাহাজ নেই—ইংলণ্ড ফেরা আর কি সম্ভব হবে ?

কিন্তু অসীম মনোবল তার। তাই অচিরেই সামলে নিল নিজেকে। বললে—"চলুন, ধ্বংসাবশেষের মধ্যে কি পাওয়া যায় দেখে আসা যাক।"

ডক্টর গেলেন বাঁ দিক দিয়ে, জনসন ডান দিক দিয়ে এক চক্কর ঘুরে আসতে। ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন মার্বেল স্ট্যাচুর মত। বেল অসীম হতাশায় মুখ গুঁজড়ে শুয়ে পড়ল বরফের ওপর। তাই দেখে ছুটে এল জনসন—ঘাড় ধরে বেলকে টেনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললে—"মরবার সাধ হয়েছে নাকি ? বরফের ওপর ওভাবে শুলে কেউ আর তোমায় বাঁচাতে পারবে না। অত ভেঙে পড়ার কি আছে ? স্লেজ কোথায় ?"

"মাইলখানেক দূরে !"

ডক্টরকে ডেকে আনল জনসন। তাঁকে পাঠাল স্লেজ আনতে। একটু পরেই স্লেজ গাড়ী নিয়ে ফিরে এলেন ডক্টর হ্যাটেরাসের কাছে। কুকুরগুলো খিদের চোটে কামড়াকামড়ি করছে। ওদের খেতে না দিলেই নয়।

স্লেজ গাড়ীর মধ্যে তাঁবু দিয়ে মোড়া আলটামণ্ট কিন্তু এখনও হতচেতন।

এদিকে বরফের চাঁই সাজিয়ে একটা ইগলু বানিয়ে ফেলেছে জনসন আর বেল। ডক্টর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে থেকে একটা স্টোভ নিয়ে এলেন বিজয়-গৌরবে। প্রায় অক্ষত রয়েছে স্টোভটা। জ্বালানী-নলগুলো বেঁকে গিয়েছিল—হাতের চাপে সিধে করে নেওয়া হল। ইগলুর মাঝে স্টোভ বসিয়ে তাতে জাহাজ-ভাঙা কাঠ গুঁজে আগুন ধরিয়ে দিতেই জ্বলে উঠল পটপট শব্দে। আগুনের আঁচে গরম হয়ে উঠল ভেতরটা।

হ্যাটেরাস কিন্তু এখনো পায়চারী করছেন বাইরে—তাঁর প্রাণপ্রিয় জাহাজ যেখানে ধ্বংস হয়েছে—সে জায়গা ছেড়ে আসতে যেন প্রাণ আর চাইছে না।

খেয়েদেয়ে নিয়ে ডক্টর বেরিয়ে এলেন বাইরে জনসনকে নিয়ে।

বললেন—"এখনো অনেক দামী দামী জিনিস ছড়িয়ে আছে। এসো, এইবেলা দেখে নেওয়া যাক কি কি পাওয়া যায়।"

তখন চাঁদের আলোয় অনেক দূর পর্যন্ত বেশ দেখা যাচ্ছে। দুজনে দুদিক দিয়ে ধ্বংসভূমি প্রদক্ষিণ করে এলেন। দেখলেন, প্রলয়ংকর বিস্ফোরণে কিছুই আর আস্ত নেই—সব ছাই আর ধুলো হয়ে গিয়েছে। ইঞ্জিন, প্রপেলার, ব্লেড দুমড়ে মুচড়ে ব্যবহারের অযোগ্য হয়েছে। অনেক খুঁজে পেতে পাওয়া গেল কিছু শুকনো মাংস, আর চারটে পাথরের বয়েম। কপালক্রমে নরম তুষারের ওপর ছিটকে পড়ায় বয়েমগুলি ভাঙেনি—ভেতরে রয়েছে পাঁচ-ছ পাঁইট ব্র্যাণ্ডি। পাওয়া গেল কয়েক ব্যাগ বিস্কুট, চকলেট, কফি।

অর্থাৎ খাবার-দাবার যা পাওয়া গেল, তা দিয়ে হপ্তা তিনেক কোনমতে চলে যাবে। জাহাজভাঙা কাঠ দিয়েও হপ্তা তিনেক গা গরম রাখা চলবে। তারপর?

"ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।" বলল অসমসাহসিক জনসন।

২॥ আলটামণ্টের প্রথম কথা

রাত আটটা নাগাদ আকাশ একটু পরিষ্কার হতেই যন্ত্রপাতি হাতে বেরিয়ে গেলেন হ্যাটেরাস। দেখতে গেলেন বরফ-প্রান্ত আরো উত্তরে ভেসে গিয়েছে কিনা। আধ ঘণ্টা পরে মুখ চূণ করে ফিরে এসে এক কোণে বসে রইলেন নিস্পন্দ দেহে।

পরের দিন আবার শুরু হল তুষারপাত। বাড়ল হাওয়ার ঝাপটা। স্টোভটির দৌলতে কিন্তু চা-কফি খেয়ে চাঙ্গা রইল অভিযাত্রীরা।

আমেরিকান আলটামণ্ট কিন্তু এখনো নিশ্চুপ। স্কার্ভিতে কাহিল। মুখ দিয়ে কথা ফুটছে না।

দুপুরের দিকে আচ্ছন্ন অবস্থা কাটিয়ে উঠলেন হ্যাটেরাস। মাথা তুলে বললেন-"বন্ধুগণ, এবার আমরা স্থির করব আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। তার আগে শুনতে চাই জনসনের কাহিনী।"

জনসন তখন গুছিয়ে বলল, কিভাবে ক্ষমতালোভী শানডনের নেতৃত্বে জাহাজশুদ্ধ খালাসী জাহাজ ছেড়ে পালায় ২২শে ফেব্রুয়ারী। লম্বা নৌকোটা সঙ্গে নিয়ে গেছে এই মতলবে যে তিমি-জাহাজের চোখে পড়বেই—রক্ষে পেয়ে যাবে তাহলে। যাবার সময়ে মদে চুর-চুর হয়েছিল প্রত্যেকে। সেই অবস্থাতেই পেন এসে আগুন ধরিয়ে দেয় জাহাজে। পুরো দুদিন ধরে জ্বলেছে অত কষ্টে তৈরী ফরোয়ার্ড। তারপর এসেছেন হ্যাটেরাস। আগে না এসে ভালই করেছেন- মাল্লারা নির্ঘাত খুন করত তাঁকে।

কাহিনী শেষ করে জনসন জিজ্ঞেস করল—"আমরা এখন কোথায় ক্যাপ্টেন? সমুদ্র এখান থেকে কত দূর?"

"ছশ মাইল পশ্চিমে।"

ডক্টর বললেন—"তাহলে পশ্চিমেই যাওয়া যাক। উত্তরে যাওয়া এখন বাতুলতা। যদি হামাগুড়ি দিয়েও যেতে হয় তো পশ্চিমেই যাব—সুমেরু বিজয় মাথায় থাকুক—আগে প্রাণে বাঁচি।"

ক্যাপ্টেন বললেন—"কিন্তু ওপথ আমাদের অজানা।"

"হোক। উপোষ করেও থাকব—তবুও চলুন সমুদ্রের দিকে। হ্যাটেরাস, ইংলণ্ডে ফেরার রাস্তা উত্তরে নয়—পশ্চিমে।"

"বেল, জনসন, তোমাদেরও কি তাই মত?"

"হ্যাঁ ক্যাপ্টেন।"

ডক্টর বললেন—"ছ'শ মাইল বরফ পেরিয়ে যাওয়া খুব কঠিন কাজ নয়। স্লেজ বোঝাই কাঠ নেব। রোজ কুড়ি মাইল হাঁটব। ২৬শে মার্চ পৌঁছে যাব সমুদ্রের ধারে—"

"একটা দিন আর একটা দিন সবুর করলে হয় না?" হ্যাটেরাস বললেন।

"কিন্তু কেন?" জনসনের প্রশ্ন।

"জানি না কেন। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা কে জানে?"

তীব্র কণ্ঠে বেল বললে—"মৃত্যু সুনিশ্চিত জেনেও?"

"বন্ধুগণ," এবার মিনতি স্পষ্ট হল হ্যাটেরাসের কণ্ঠে—"এত সহজে ভেঙে পড়ো না। আমি জানি, বাঁচবার তাগিদে উত্তরে যেতে বললে এখন কেউ সেদিকে যাবে না। অথচ, উত্তরেই রয়েছে বাঁচবার উপায়। কত এস্কিমো বেঁচে রয়েছে আরো উত্তরে—মেরুর মধ্যে—সেইদিকেই রয়েছে স্মিথ প্রণালী—আর উন্মুক্ত সমুদ্র। প্রকৃতি কখনও নিদয় হন না। ঠাণ্ডা কমে গেলেই গাছপালা পাব—বেঁচে যাব।"

বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন হ্যাটেরাস—আবেগে প্রদীপ্ত হল চোখ মুখ।

কিন্তু জনসন হিসেবী মানুষ। আবেগ উত্তেজনায় বিচলিত হবার পাত্র নয়। সংক্ষেপে সে ডাক দিল বেলকে—"চল স্লেজে।"

"জনসন!" তীক্ষ্ণকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন হ্যাটেরাস—"তুমিও! তুমিও ওদের মত আমাকে ছেড়ে চলে যাবে? বেশ, যাও—যাও সব্বাই যাও। আমি থাকব—একা থাকব—শুধু ডাককে নিয়ে! আয়রে ডাক, কাছে আয়।"

প্রভুভক্ত ডাক তক্ষুণি গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়তে লাগল পরমানন্দে।

জনসন স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে গেল। কি করবে সে? চাইল ডক্টরের পানে। তিনিও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এতদিন যখন গেছে, হ্যাটেরাসের কথা রেখে আর একটা দিন থেকে গেলে ক্ষতি কী?

ঠিক এই সময়ে হাতের ওপর ছোঁয়া অনুভব করল জনসন। ফিরে চাইল। দেখল, আলটামণ্ট কম্বল সরিয়ে বরফের ওপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এসে হাঁটু গেড়ে বসে তুষার-জখম ঠোঁট নেড়ে কি যেন বলতে চাইছে। বিকৃত বীভৎস স্বর বেরোচ্ছে গলা দিয়ে—কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

ডক্টর পর্যন্ত তাই দেখে ভয় পেয়ে গেলেন।

মিনিট পাঁচেক আত্যন্তিক প্রচেষ্টার পর শুধু একটি শব্দই উচ্চারণ করতে পারল আলটামণ্ট—"পরপয়েজ।"

"পরপয়েজ।" সবিস্ময়ে বললেন হ্যাটেরাস।

ঘার কাৎ করে সায় দিল আলটামণ্ট।

"কোথায়? এখানে?" হ্যাটেরাসের প্রশ্ন।

ফের ঘাড় কাৎ করে সায় দিল আমেরিকান।

"ঠিকানা জানেন?"

ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলল আলটামণ্ট।

"ঠিক আছে," উত্তেজনাকম্পিত কণ্ঠে বললেন হ্যাটেরাস—"আমি ল্যাটিচিউড আর লজিচিউড বলে যাচ্ছি—আপনি ঘাড় নেড়ে বলবেন কোনটা ঠিক।"

সময় লাগল বটে, কিন্তু এইভাবেই জানা গেল পরপয়েজ ঠিক কোন জায়গায় আছে! সেখানকার ঠিকানা, একশ বিশ ডিগ্রী পনেরো মিনিট লজিচিউড এবং তিরাশি ডিগ্রী পঁয়ত্রিশ মিনিট ল্যাটিচিউড।

হ্যাটেরাস কিন্তু উল্লসিত হতে পারলেন না। ঈর্ষায় কালো হয়ে গেল মুখ। পরপয়েজ জাহাজ আরো তিন ডিগ্রী উত্তরে পৌঁছেছে—যেখানে তিনিও পৌঁছোতে পারেন নি।

কিন্তু কেন? কি উদ্দেশ্যে পরপয়েজ গিয়েছিল সেখানে?

৩॥ আঠারোদিনের কুচকাওয়াজ

কম করে শ চারেক মাইল বরফ মাড়িয়ে গেলে তবে পাওয়া যাবে পরপয়েজ জাহাজ। ইসারা ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল পরপয়েজ জাহাজ আমেরিকা থেকে এসেছে। মাস্তুলের সংখ্যা তিন, প্রচুর খাবার

খাবার এবং কয়লা আছে জাহাজে। পাহাড়ের গায়ে কাৎ হয়ে পড়লেও জাহাজ ভেঙে গুঁড়িয়ে যায়নি।

মাস দুই আগে পরপয়েজ থেকে আলটামণ্ট রওনা হয়েছিল স্মিথ প্রণালী অভিমুখে। কিন্তু একে একে মারা গেছে সঙ্গীসাথীরা।

হ্যাটেরাস জানতে চাইলেন, অত উত্তরে কি কারণে গিয়েছিল পরপয়েজ। আলটামণ্ট জানাল, নিজে থেকে যায়নি। ভাসমান বরফ প্রান্তরে বন্দী অবস্থায় জাহাজ পৌঁছেছে ঐ জায়গায়।

যাই হোক, জল্পনা-কল্পনার পর ডক্টর বললেন—"কাল হল ২৬শে ফেব্রুয়ারী। কালকেই যদি রওনা হতে পারি, পৌঁছে যাব ১৫ই মার্চ। নইলে মরব সদলবলে। হ্যাটেরাস রাজী?"

"রাজী", সন্দিগ্ধ মনে বললেন হ্যাটেরাস। "কিন্তু একটা প্রশ্ন। পরপয়েজ যদি বরফের টানেই অতদূর ভেসে গিয়ে থাকে, তাহলে কি সেখানে এখনো আছে? বরফের টানে আবো দূরে ভেসে যায়নি তো?"

সত্যিই তো! তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞেস করা হল আলটামণ্টকে। সে বললে, না, যায়নি। যেতে পারে না। কেননা, পরপয়েজ পাথুরে জমিতে কাৎ হয়ে পড়েছে।

শেষ প্রশ্ন করলেন হ্যাটেরাস—"তিরাশি ডিগ্রীতে খোলা সমুদ্র দেখেছিলেন?"

"না," ছোট্ট জবাব আলটামণ্টের।

পরের দিনই অভিযাত্রীরা নতুন করে পাড়ি জমাল অজানার অভিযানে। পথ সেরকম এবড়ো খেবড়ো নয়। সমুদ্র এখানে শান্তই ছিল—জমাট সমুদ্র পৃষ্ঠও তাই এত মসৃণ। এরকম বরফের ওপর দিয়ে হাঁটা খুবই বিপজ্জনক। কোথায় কখন পায়ের তলায় বরফ সরে যাবে কে জানে।

জনসন সেই কথাই বলছিল ডক্টরকে।

শুনে ডক্টর তো হেসেই অস্থির। তিনি বললেন "ওহে জনসন, এসব অঞ্চলে দশ দিনের মধ্যে ন দিনই তুষারপাত হয়। পায়ের তলার বরফ কম করেও তিরিশ থেকে চল্লিশ ফুট পুরু। তাছাড়া, জেনে রেখো দু ইঞ্চি পুরু বরফ ভার সইতে পারে একজন মানুষের; সাড়ে তিন ইঞ্চি পুরু বরফের ওপর অনায়াসে দাঁড়াতে পারে ঘোড়া সমেত একজন ঘোড় সওয়ার; পাঁচ ইঞ্চি পুরু হলে আট পাউণ্ড কামান পর্যন্ত রাখা যাবে সেখানে; আট ইঞ্চি পুরু বরফ সইবে রণক্ষেত্রের কামানের ভার এবং দশ ইঞ্চি পুরু বরফের ওপর দিয়ে মার্চ করতে পারবে পুরো একটা সৈন্যবাহিনী।"

সত্যিই খবর রাখেন বটে ক্লবোনি। যেন একটি সজীব বিশ্বকোষ। কিন্তু এহেন পণ্ডিত মানুষটিও পাঁচই মার্চ একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে গেলেন—ব্যাখ্যা খুঁজে পেলেন না। আকাশ দিব্বি পরিষ্কার, মেঘের চিহ্নমাত্র নেই, তারকারাজি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, তা সত্ত্বেও ঝুরঝুর করে ঘণ্টা দুয়েক তুষারপাত হল কেন?

হ্যাটেরাস কিন্তু গুম হয়ে রয়েছেন। ওঁর মনের ধোঁকা এখনো যায়নি। আমেরিকান আলটামণ্ট বিপথে চালিয়ে ওঁদের খতম করার তালে নেই তো?

১৪ই মার্চ এসে গেল। এখনও একশ মাইল পথ বাকি। অথচ শরীরে আর শক্তি নেই। গুলি বারুদও প্রায় শেষ হয়ে এল। সাতবার বন্দুক ছোঁড়বার মত বারুদ আর ছটি মাত্র কার্তুজ রয়েছে। গুটি কয়েক শেয়াল আব খরগোস দেখা গেল বটে—গুলি করেও মারা গেল না। আধপেটা খেয়ে পথ চলা যায়?

১৫ই মার্চ শুক্রবার বরফ প্রান্তরে একটা সীল মাছ দেখলেন ডক্টর। দমাদম গুলি চালিয়ে তক্ষুণি তাকে বধ করলেন বটে, কিন্তু পাতলা মাংস দিয়ে পেট ভরানো গেল না ক্ষুধার্ত মানুষ কজনের। এস্কিমোদের মত সীলের তেল খাওয়া তো আর সম্ভব নয়!

তা সত্ত্বেও সীলের চামড়াটা স্লেজ গাড়ীতে তুলে রাখলেন ডক্টর।

৪ ॥ শেষ বারুদটুকু

ইগলু তৈরী করে ভেতরে স্টোভ জ্বালিয়ে এলিয়ে পড়ল অভিযাত্রীরা। সীল মাছের কালচে মাংস একেবারেই অখাদ্য হওয়ায় কুকুরগুলোর সামনে তা ছুঁড়ে ফেলা হল। পরম তৃপ্তিতে তাই দিয়েই ভুড়িভোজ করে নিল ক্ষুধার্ত কুকুরগুলো। আশ্চর্য কিছু নয়! নর্থ আমেরিকার নর্থে উদ্ভিদভোজী ঘোড়াদের মূল খাদ্য হল মাছ। তাই যদি হয় তো মাংসাশী কুকুররা মাছ খাবে না কেন?

পরের দিন শনিবার। সকাল থেকেই শুরু হল পদযাত্রা। খাবারের ভাঁড়ার ফুরিয়েছে। ডক্টর বন্দুক নিয়ে মাইল কয়েক এদিক সেদিক ঘুরে এলেন—শিকার পেলেন না। আলোর প্রতিসরণে ভুল দেখে বার কয়েক বাজে গুলি খরচ করলেন—কাজ হল না।

গুলিবর্ষণের শব্দে আশায় উদ্দীপিত হয়েছিল সঙ্গীরা—কিন্তু রিক্ত হস্তে ফিরে আসতে দেখে কেউ তার কথা বলল না। টুঁ শব্দটি না করে শুয়ে পড়ল যে-যার জায়গায়। মাথার কাছে রইল অবশিষ্ট খাবার—আধপেটা খেয়েও যা দুদিনের বেশী যাবে না।

পরের দিন পথ কষ্ট আরো বাড়ল। শরীরে শক্তি না থাকলে হাটা যায়? সীল মাছের নাড়ি ভুঁড়ি পর্যন্ত খেয়ে নিয়েছে ক্ষুধার্ত কুকুরগুলো। এখন ক্ষিদের জ্বালায় কামড়াচ্ছে চামড়ার মুখবন্ধনী। দু'একটা শেয়াল চোখে পড়ল বটে, কিন্তু ডক্টর শেষ বুলেটটি খরচ করতে সাহস পেলেন না—যদি ফস্কে যায়?

শেষবারের মত আহারপর্ব সমাধা হ'ল রোববার রাতে। তাঁবুর মধ্যে কনকনে ঠাণ্ডা—আর বিষণ্ণ নীরবতা। ঈশ্বর যদি এখনো মুখ তুলে না চান—অনাহারে মৃত্যু অনিবার্য। হ্যাটেরাস আর কথা বলছেন না। বেল ভাবতেও পারছেনা। জনসন ধ্যানমগ্ন। ডক্টর এখনো আশা ছাড়েন নি।

সেই রাতেই শেয়াল ধরার জন্যে কয়েকটা ফাঁদ পাতল জনসন। কিন্তু টোপ না ফেললে ফাঁদে শেয়াল আসে না। তাই মুখ চুণ করে তাঁবুতে ফিরে আসছে জনসন, এমন সময়ে দেখতে পেল পঞ্চাশ ফ্যাদম দূরে স্লেজ গাড়ী শুঁকছে একটা অতিকায় ভালুক।

আনন্দে আটখানা হয়ে তক্ষুণি ডক্টরের বন্দুক ছিনিয়ে এনে জনসন দোড়োলো ভালুকের দিকে। কাছাকাছি গিয়েই লক্ষ্য স্থির করে ট্রিগার টিপতে গিয়ে দেখল আঙুল কাঁপছে ঠাণ্ডায়—হাতে দস্তানা থাকায় অসুবিধেও হচ্ছে। তাই ঝটিতি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে দস্তানা খুলে ফেলে ট্রিগারে আঙুল রেখেই বিকট চীৎকার করে উঠল জনসন।

হাত থেকে বন্দুক ছিটকে পড়ল বরফের ওপর এবং শেষ বুলেটটি সশব্দে নিক্ষিপ্ত হল শূন্য পানে।

কিন্তু হঠাৎ অমন চেঁচিয়ে উঠল কেন জনসন?

বন্দুকের ধাতব ট্রিগারে আঙুলের চামড়া ঠেকতে না ঠেকতেই নিদারুণ ঠাণ্ডায় আঙুল অসাড় হয়ে গিয়েছে জনসনের! আটকে গিয়েছে বন্দুকের ট্রিগারে!

চীৎকার আর বন্দুক-নির্ঘোষ শুনেই তাঁবু থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছিলেন ডক্টর। জনসনকে ধরাধরি করে টেনে নিয়ে গেলেন তাঁবুর মধ্যে। তাড়াতাড়ি এক গামলা ঠাণ্ডা জলে আঙুল ডুবিয়ে ধরলেন জনসনের। কিন্তু আঙুলের ছোঁয়া লাগতে না লাগতেই নিমেষে জল জমে বরফ হয়ে গেল।

ডক্টর বললেন—"দেখলে তো কি সর্বনাশ হতে যাচ্ছিল! আর একটু দেরী হলেই আঙুলটাকেই কেটে বাদ দিতে হ'ত।"

যাই হোক, সমানে ঘষাঘষি করে রক্ত সঞ্চালন অব্যাহত রাখলেন ডক্টর—কিছুক্ষণের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠল জনসন—কিন্তু অন্ত রইল না আক্ষেপের। তার হঠকারিতার জন্যেই তো শেষ বুলেটটি বাজে খরচ হল! এখন উপায়? অবশ্য ডক্টর ক্লবোনি যখন সঙ্গে আছেন, তখন উপায় একটা বার করবেনই।

বেল মুখ আমসি করে বলল—"কি করবেন উনি? বরফকে মাংস করতে পারবেন? উনি কি ম্যাজিশিয়ান?"

"দেখাই যাক না।"

আরো তিন মাইল মুখ বুঁজে হাটবার পর কারো শরীরে আর এতটুকু শক্তি রইল না। সারাদিনে মাত্র তিন মাইল! রাত্রে উপোস! এদিকে ক্ষিদের জ্বালায় কুকুরগুলো একে অন্যকে খাবার ফিকিরে কামড়া-কামড়ি শুরু করে দিয়েছে।

এই সময়ে জনসনের মনে হল অনেক দূর থেকে ছায়ার মত একটা ভালুক যেন ওদের পেছন পেছন আসছে। চোখের ভুল হতে পারে। তাই কাউকে কিছু বলল না।

মঙ্গলবার সকালে ফের শুরু হল অসম্ভবের অভিযান—ছত্রিশ ঘণ্টা পেটে খাবার পড়েনি—অথচ এই অক্ষরেখায় পেট ঠেসে না খেলে মানুষ বাঁচতে পারে না।

ঘণ্টা দুই যাওয়ার পর বেদম হয়ে পড়ল সকলেই। হ্যাটেরাসের তখনো ইচ্ছে সামনে যাওয়ার। কিন্তু সঙ্গীদের অবস্থা দেখে জনসনকে নিয়ে বরফ কেটে বানালেন ইগলু—যেন সমাধি রচনা করলেন সকলের।

বললেন—"না খেয়ে মরতে পারি—কিন্তু ঠাণ্ডায় মরব না।"

সারাদিন পাঁচটি মানুষ মড়ার মত পড়ে রইল ইগলুর মধ্যে।

রাত্রে ঘুমের ঘোরে ভালুকের স্বপ্ন দেখে চেঁচিয়ে উঠল জনসন। ঘুম ভেঙে গেল ডক্টরের। স্বপ্নবৃত্তান্ত জিজ্ঞেস করতে গিয়ে জানলেন—গত দুদিন ধরে নাকি একটা ভালুক পাছু নিয়েছে অভিযাত্রীদের। জনসন দুঃস্বপ্ন দেখছে সেই কারণেই।

সোল্লাসে বললেন ডক্টর—"কথাটা আগে বলতে হয়।"

"বললেই বা কি করতেন? বুলেট কোথায়?"

"বানিয়ে নেব।"

"সীসে কোথায়?"

"পারা তো আছে।"

"ডক্টর!"

"জনসন, কালকেই ভালুক বাছাধনকে খতম করব আমি এই দিয়ে—" বলে থার্মোমিটারটা তুলে ধরলেন ডক্টর! দেখা গেল পারা দাঁড়িয়ে আছে শূন্য তাপাংকের পঞ্চাশ ডিগ্রী ওপরে।

"থার্মোমিটার দিয়ে ভালুক মারবেন!"

জবাব না দিয়ে থার্মোমিটারটা বাইরে বরফের ওপর রেখে এলেন ডক্টর। বাইরের তাপমাত্রা তখন শূন্য তাপাংকের পঞ্চাশ ডিগ্রী নীচে। তাই দেখতে দেখতে পারা জমে গেল থার্মোমিটারের মধ্যে।

সকাল হতেই জনসনকে নিয়ে ছুটে গেলেন ডক্টর। থার্মোমিটারের মধ্যে পারা জমে কঠিন হয়ে গিয়েছে। সাবধানে থার্মোমিটারের কাঁচ ভেঙে ভীষণ কঠিন পারা হাতের তেলোয় রেখে ডক্টর বললেন—"জনসন, এই দিয়ে বধ করব ভালুক মহাপ্রভুকে।"

"ডক্টর, কি বলছেন—"

"জনসন, ক্যাপ্টেন রস মেরু অভিযানে এসে জমাট পারার বুলেট দিয়ে কাঠ ফুটো করে ছেড়েছিলেন। জমাট বাদাম তেলের বুলেট দিয়েও কাঠ ফুটো করেছিলেন—বুলেট কিন্তু আস্ত অবস্থায় ঠিকরে পড়েছিল বরফের ওপর —ভেঙেছিল কাঠের তক্তা!"

"অবিশ্বাস্য!"

"অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, জনসন! এই পারার বুলেটই আমাদের পাঁচ-জনের জীবন রক্ষে করবে।"

এই সময়ে ইগলু থেকে বেরিয়ে এলেন হ্যাটেরাস। ডক্টরের ফন্দী শুনে বললেন—"বুলেটটা আমাকে দিন।"

"কেন?"

"আমি মারব ভালুককে। খুব কাছে না গেলে গুলি ফস্কে যেতে পারে। ফসকালে পাঁচজনকেই মরতে হবে।"

"আপনি! তা হয় না ক্যাপ্টেন—আপনি আমাদের লীডার।"

"কোনো ভয় নেই ডক্টর—ভালুকের দশ হাত দূরে না গেলেই নয়। এমন ভাবে যেতে হবে যেন সে সন্দেহ করে পালিয়ে না যায়।"

"কি করে যাবেন?"

"সীলমাছের সেই চামড়াটা তো আছে?"

"আছে।"

"তাহলেই হবে। আসুন ইগলুতে—বলছি আমার প্ল্যান।"

৫॥ সীল এবং ভালুক

ক্যাপ্টেন বললেন—"আপনি তো জানেন, ভালুক সীল দেখে ভয় পায় না। সীলের গর্তের ধারে চুপচাপ বসে থাকে দিনের পর দিন—গর্ত থেকে মুখ তুললেই থাবা দিয়ে পিষে মেরে ফেলে।"

"বুঝলাম," বললেন ডক্টর—"কিন্তু বড় বিপজ্জনক ঝুঁকি নিচ্ছেন।"

"নিতেই হবে। সীলমাছের চামড়া মুড়ি দিয়ে বরফের ওপর হামাগুড়ি দিলে ভালুকের সন্দেহ হবে না। বন্দুকে গুলি ভরে দিন।"

কি আর করেন ডক্টর। গাদা বন্দুকের মধ্যে বেশ করে বারুদ ঠেসে নলচের মধ্যে গুঁজে দিলেন পারার বুলেট। জিনিসটা সত্যিই যেন বুলেট। লোহার মত শক্ত, সীসের মত ভারী। ইতিমধ্যে সীলমাছের চামড়া মুড়ি দিয়ে সাজগোজ সাজ করলেন হ্যাটেরাস। বন্দুকটা লুকিয়ে নিলেন চামড়ার তলায়।

পনেরো মিনিট পর।

সাদা বরফের ওপর দিয়ে গুঁড়ি মেরে যেতে দেখা গেল একটি সীলমাছকে। ইচ্ছে করেই বেশ কতকগুলো ঢিপি ঘুরে অন্যদিক দিয়ে ভালুকের নিকটবর্তী হচ্ছেন হ্যাটেরাস—যাতে ভালুকের সন্দেহ না হয়। সীলমাছের হাঁটবার ভঙ্গিমা অপূর্ব নকল করেছেন উনি। না জানা থাকলে ডক্টর পর্যন্ত সীলমাছ বলেই ধরে নিতেন ছদ্মবেশী ক্যাপ্টেনকে।

সীলমাছটা যেন ভালুককে দেখতে পায়নি। চলেছে বরফের ওপর ফাটা ফুটোর সন্ধানে—যাতে জলে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারে। ভালুকটা কিন্তু তাকে দেখেছে এবং অতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে এগোচ্ছে—ধ্বক ধ্বক করে জলছে দুই চোখ। বেচারী! খুব সম্ভব মাস দুই পেটে খাবার পড়েনি।

দশ হাত তফাতে পৌঁছোলো সীল। আচমকা তেড়ে এল ভালুক—কিন্তু সীলের সামনে এসেই বিষয় ভয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল পেছনের দুপায়ের ওপর—কেন না সীলমাছের খোলস ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সেই মুহূর্তে হ্যাটেরাসও হাঁটু গেড়ে বসে বন্দুক তাগ করেছেন তার বুক লক্ষ্য করে।

মাত্র তিন হাত তফাৎ থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পারে না। হলও না। দড়াম করে শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধড়াস করে আছড়ে পড়ল বিপুলকায় ভালুক এবং থাবা দিয়ে বরফ তুলে ঘসতে লাগল ক্ষতমুখে।

হৈ-হৈ করে আড়াল থেকে বেরিয়ে কুঠার হাতে দৌড়ে গেল জনসন আর ডক্টর। কিন্তু সাহায্যের দরকার ছিল না। মরণ মার মেরেছেন হ্যাটেরাস—গুলি বিদ্ধ করেছে প্রাণকেন্দ্র। যেটুকু বাকি ছিল, তাও হাতের ছুরি দিয়ে শেষ করে দিলেন—বাঁট পর্যন্ত ফলা ঢুকে গেল গলায়।

মেপে দেখা গেল, ভালুকটা লম্বায় ন ফুট, পেটের পরিধি ছ ফুট। হিংস্র দাঁতদুটো লম্বায় ইঞ্চি তিনেক। ওজন দেড়শ পাউণ্ড। পেট কাটবার পর দেখা গেল, পেটের মধ্যে জল ছাড়া কিছু নেই। সত্যিই বেচারী দীর্ঘদিন অনাহারে থেকেছে—মরবার পর অনাহারীদের খাদ্য হতে চলেছে।

টুকরো টুকরো করা হল গায়ের মাংস। এক-একটা টুকরোর ওজন প্রায় দশ পাউণ্ড। প্রচুর চর্বি ফেলে দিতে হল। সঙ্গে আনা হল কেবল হৃদপিণ্ড—মৃত্যুর তিন ঘণ্টা পরেও সচল রইল হৃদযন্ত্র—অব্যাহত রইল ধুকপুকুনি।

ক্ষিদের জ্বালা বড় জ্বালা। কাঁচা মাংসর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল অভিযাত্রীরা—কিন্তু ঠেকিয়ে রাখলেন ডক্টর। মাংস না সেঁকে খাওয়া ঠিক হবে না।

কিন্তু সেঁকবেন কিসের ওপর? আগুন কোথায়? ইগলুতে ফিরে দেখলেন সর্বনাশ হয়েছে। সকাল থেকেই শিকার করার উত্তেজনায় স্টোভের দিকে নজর ছিল না কারোরই। ফলে, নিভে গেছে স্টোভ! ইগলুর ভেতরে কনকনে ঠাণ্ডা।

অনুতপ্ত হল জনসন। তারই দোষে আগুন নিভেছে। ডক্টর তাড়াতাড়ি চকমকি পাথর বার করলেন। জনসন পকেটে হাত দিল ইস্পাতের টুকরোর জন্যে—ইস্পাতে চকমকিতে ঠোকাঠুকি না হলে তো আগুন জ্বলবে না।

কিন্তু কোথায় ইস্পাত? মুখ কালো হয়ে গেল জনসনের। কখন জানি পকেট থেকে পড়ে গেছে ইস্পাতখণ্ড!

তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল ইগলুর ভেতরে—কম্বলের তলায়—আনাচে-কানাচে। কিন্তু নেই—কোথাও নেই ইস্পাতের টুকরো।

এখন উপায়? আগুন না জ্বললে মৃত্যু অনিবার্য!

হ্যাটেরাস বললেন—"একটা লেন্স পেলেও সূর্যের আলো থেকে আগুন জ্বালিয়ে নেওয়া যেত। কিন্তু টেলিস্কোপ তো নেই সঙ্গে। লেন্সওলা কোনো যন্ত্রই নেই।

সায় দিলেন ডক্টর - "সত্যিই বরাত খারাপ আমাদের "

"আসুন আপাততঃ কাঁচা মাংসই খেয়ে নেওয়া যাক," প্রস্তাব করলেন ক্যাপ্টেন।

অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন ভাবছিলেন ডক্টর। বললেন—"আমার মাথায় কিন্তু একটা মতলব এসেছে।"

"তাই নাকি?" লাফিয়ে উঠল জনসন—"তাহলে তো বেঁচে গেলাম এবারেও!"

"মতলবটা কি?" শুধোলেন ক্যাপ্টেন।

"লেন্স নেই তো কি হয়েছে, বানিয়ে নিলেই হয়।"

"লেন্স বানিয়ে নেবেন!" জনসন তো হতবাক—"কি ভাবে?"

"বরফ কেটে।"

"বরফ কেটে !"

"অসম্ভব কিছু নয়, রোদ্দুরকে একটা বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করার জন্যে স্বচ্ছ ক্রিস্ট্যাল হলেই কাজ চলে যায়—বরফের টুকরো দিয়েও সে কাজ সম্ভব। কিন্তু সে বরফ মিষ্টি জলের বরফ হওয়া চাই—নুন থাকলে চলবে না।"

তৎক্ষণাৎ খুঁজেপেতে এমনি একটা বরফের টিলা বার করে ফেলল জনসন। কালচে রঙ ধরেছে টিলায়—তলায় যেন সবুজের আভা। ফুটখানেক গোলাকার একটা বরফখণ্ড ভেঙে নিলেন ডক্টর। কুঠার দিয়ে কেটে লেন্সের আকার দিলেন, ছুরি দিয়ে চেঁচে মসৃণ করলেন, হাত দিয়ে ঘসে চকচকে করলেন। সবশেষে পাওয়া গেল যেন স্বচ্ছ ক্রিস্ট্যালের তৈরী স্বচ্ছ একটা আতস কাঁচ।

ইগলু থেকে কাঠের টুকরো এনে বরফের লেন্স ধরা হল তার ওপর। সূর্যালোক কেন্দ্রীভূত হল একটি পয়েন্টে—পট পট শব্দে জ্বলে উঠল আগুন।

আলটামণ্ট এখন একটু একটু কথা বলতে পারে। ভাঙা ভাঙা স্বরে সে বললে—আর দু দিনের পথ—তারপরেই পরপয়েজ।

হেসে বললেন ডক্টর—"তা ঠিক। তখন আর কাঠ জ্বালানোর আগুনের অভাব হবে না। আমার বরফ লেন্স শুধু চড়া রোদেই আগুন জ্বালবে—মেরু বিন্দু থেকে চার ডিগ্রী দূরে রোদের তেজ কিন্তু তেমন নয়।"

আলটামণ্ট গভীর শ্বাস নিয়ে বললে—"সেখানে মানুষ আজও যায়নি—আমি ছাড়া।"

হ্যাটেরাস তীব্র কণ্ঠে বলে উঠলেন—"বাজে কথা থাকুক। খেয়েদেয়ে নিয়ে চলো সামনে।"

ভালুকের মাংস নবজীবন এনে দিয়েছিল প্রত্যেকেরই শরীরে। কুকুরগুলো পর্যন্ত ভীমবেগে ধেয়ে চলল সামনে।

ডক্টর কিন্তু হ্যাটেরাসের কথার ধরন দেখে ভাবনায় পড়লেন। জনসনকে আড়ালে ডেকে বললেন ফিস ফিস করে—"আলটামণ্ট আর হ্যাটেরাসকে নিয়ে কিন্তু বিপদে পড়তে হবে আমাদের। দেখেছো তো দুজনের মধ্যে কোনো বাক্যালাপ নেই।"

"দেখেছি। কিন্তু কেন ডক্টর?"

"আলটামণ্ট মেরুর অত কাছে গিয়েছিল কেন? কি মতলবে?"

"ও তো বলল বরফ প্রান্তর ওর জাহাজকে টেনে নিয়ে গেছে।"

"মিথ্যে কথা। কথাটা বলবার সময়ে বিদ্রুপের হাসি হেসেছিল আলটামণ্ট। কেন?"

"তবে কি—"

"হ্যাঁ, জনসন। আলটামণ্টও নিশ্চয় মেরু অভিযানে বেরিয়েছে। সুতরাং দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে টক্কর ঠেকানো যাবে না।"

পথিমধ্যে নতুন কোনো ঘটনা ঘটল না। ডক্টর ক্লবোনি নানারকম রঙ্গপরিহাসের মাধ্যমে পথশ্রম অপনোদন করে চললেন বিরামবিহীন ভাবে। বকতেও পারেন তিনি।

শনিবার সকাল থেকে দেখা গেল জমির চেহারা পালটে যাচ্ছে। মিষ্টি জলের বরফের চেহারা চোখে পড়ছে। যেন কাছাকাছি কোথাও একটা উপকূল আছে।

উত্তেজিত হলেন ডক্টর। হ্যাটেরাস যেমন মেরুবিন্দু পৌঁছোনোর উন্মাদনায় উন্মত্ত, ডক্টর তেমনি নতুন ভূখণ্ড মানচিত্রের বুকে পেন্সিল নিয়ে এঁকে ফেলার উন্মাদনায় উন্মত্ত। নতুন সমুদ্র, নতুন দেশ, নতুন নদীকে মানচিত্রের বুকে স্থান দেওয়ার আনন্দর মত আনন্দ কি আর আছে।

রাত কাটল বরফ প্রান্তরে ইগলুর মধ্যে। পরের দিন রোববার। ভালুকের থাবা দিয়ে উত্তম প্রাতরাশ রাঁধলেন ডক্টর। খেয়েদেয়ে শুরু হল আরো উত্তরে অভিযান।

স্লেজে শুয়ে ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠছে আলটামণ্ট। ক্ষিপ্তের মত মাথা তুলে বারবার দেখছে দিগন্ত। সংক্রামক ব্যাধির মত আত্যন্তিক এই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ছে অন্য চারজনের মধ্যেও।

বেলা দুটোর সময়ে আচমকা স্লেজের ওপর সটান দাঁড়িয়ে উঠল আলটামণ্ট। বহুদূরে একটা বিপুলকায় শ্বেতবস্তুর দিকে আঙুল তুলে বললে আতীক্ষ্ণ কণ্ঠে :

"পরপয়েজ!"

৬॥ পরপয়েজ

২৪শে মার্চ দিনটা উৎসবের দিন। এদিন সারা ইউরোপের পথঘাট ফুল দিয়ে সাজানো হয়, গির্জেতে, ঘণ্টা বাজে, বাতাসে সৌরভ ভাসে।

আজ সেই চব্বিশে মার্চ। বরফপ্রান্তরে নিদারুণ শৈত্যের মাঝে পরমোল্লাসে হৈ-হৈ করে উঠল অভিযাত্রীরা।

দ্রুত হল গতিবেগ। বরফে পুরোপুরি ঢেকে গিয়েছে পরপয়েজ। জাহাজ বলে চেনাই যায় না—যেন একটা হিমবাহ। আলটামণ্ট না চিনিয়ে দিলে সন্ধান পাওয়া যেত না জাহাজের।

কাছে গিয়ে দেখা গেল, কাৎ হয়ে পড়ে আছে পরপয়েজ। মাস্তুল, গলুই সব ঢেকে গেছে বরফে। তলাটা ফেঁসে গেছে। অতিকষ্টে ভেতরে ঢুকলেন ক্যাপ্টেন, ক্লবোনি এবং জনসন। পনেরো ফুট পুরু বরফ কেটে পৌছোলেন ভাঁডার ঘরে।

মেলাই খাবার আর জ্বালানী বয়েছে। বছর দুই নিশ্চিন্ত থাকা যাবে। কিন্তু তলা-ফাঁসা এ-জাহাজে বসবাস করা যাবে না। ইগলু বানিয়ে নিতে হবে।

ডক্টর বললেন—"বরফের কুঁড়ে নয়, এবার বানাবো বরফের প্রাসাদ।"

ভালুকের অবশিষ্ট মাংস খেয়ে সে রাতে ঘুমিয়ে পড়ল সবাই। সকালে উঠে ফের তল্লাসি চালানো হল জাহাজের ভেতরে। খাবারদাবার এবং জ্বালানীর ফর্দ বানিয়ে দেখা গেল আগের দিনের আন্দাজ মিথ্যে নয়। দুদুটো বছর পেট ভরে খেয়ে থাকা যাবে—আগুন জ্বলবে সমানে—ঠাণ্ডায় কিস্সু হবে না।

আলটামণ্ট তখনও দুর্বল। তাই তাকে তারই ভাঙা জাহাজের মধ্যে শুইয়ে রেখে দুঃসাহসীরা বেরোলেন আশপাশ দেখে আসতে। পরপয়েজ জাহাজ যেখানে উল্টে পড়েছে, তার পশ্চিমে নিশ্চয় সমুদ্র ছিল—জমে বরফ হয়ে গিয়েছে। পূবে এবড়ো খেবড়ো উপকূলের চিহ্ন। প্রকৃতি স্বয়ং যেন অগুন্তি বন্দর রচনা করেছেন!

অদূরে একটা পাঁচশ ফুট উঁচু পাহাড়। পাহাড়ের সানুদেশে ২০০ ফুট অঞ্চল দিব্বি সমতল। তিনদিকে খোলা—একদিকে খাড়াই পাহাড়।

প্রাসাদ নির্মাণের উপযুক্ত জায়গা পেয়ে আনন্দে আটখানা হলেন ডক্টর। সোম, মঙ্গল, বুধ—এই তিনদিন হাড়ভাঙা খেটে বরফ সরিয়ে ফেললেন সেখান থেকে। গাঁইতির ঘায়ে ফুলকি ছিটকে এল তলার গ্র্যানাইট ভূমি থেকে।

তুষার প্রাসাদের নক্সা এঁকে ফেললেন ডক্টর। লম্বায় হবে চল্লিশ ফুট, চওড়ায় বিশ ফুট, উচ্চতায় দশ ফুট। সবশুদ্ধ তিনটে ঘর থাকবে ভেতরে। বাঁদিকে রান্নাঘর, ডাইনে শোবার ঘর, মাঝে আড্ডা মারার ঘর।

পাঁচদিন অমানুষিক পরিশ্রমের পর বরফের ওপর নির্মিত হল বরফ-প্রাসাদ। মোটামোটা দেওয়ালে রইল সারি সারি জানলা। মোট চারটে জানলা। বসবার ঘরে দুটো—বাকী দুটো ঘরে একটা করে কাঁচের অভাব পূরণ করা হল স্বচ্ছ বরফের পাত দিয়ে। কায়দাটা এস্কিমোদের। আলো আসবে—বাতাস আসবে না।

বসবার ঘরে দুই জানলার মধ্যে একটা মজবুত দরজা বসানো হল—দরজাটা এল অবশ্য পরপয়েজ জাহাজ থেকে।

পেছনের পাহাড়ের গা থেকে ঢালু ছাদ নামিয়ে আনা হল বাড়ীর ওপর —চিমনী রইল সেইখানেই।

এরপর আরম্ভ হল ফার্নিচার বসানোর পালা। আসবাবপত্র সবই এল পরপয়েজ জাহাজ থেকে।

ডক্টর কিন্তু পুঁথিগত বিদ্যে জাহির করে চললেন হাতে কলমে। কোন কালে উনি একটা বই পড়েছিলেন। তাতে নাকি বর্ণনা ছিল কিভাবে ১৭৪০ সালে সেণ্ট পিটার্সবার্গে একটা বরফ প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল সম্রাজ্ঞী অ্যানের হুকুমে। সেই প্রাসাদের সবকিছুই বরফ দিয়ে তৈরী। এমন কি ছটা কামান বরফের। কামানের গোলাও বরফের, ফুলদানী বরফের, কমলা গাছ বরফের, বিশালকায় হাতী পর্যন্ত বরফ কেটে তৈরী—দিনরাত জলের ফোয়ারা বেরোতো সেইসব হাতীর শুঁড় দিয়ে। বাড়ীর ভেতরে ড্রেসিংটেবিল, আয়না, ঝাড়লণ্ঠন, বিছানা, বালিশ, চাদর, ঘড়ি, চেয়ার, আলমারী পর্যন্ত বরফ কেটে তৈরী।

৩১শে মার্চ পর্যন্ত এইসব কথার মাধ্যমে সাঙ্গ হল বাড়ী সাজানো পর্ব।

সেদিন ঈস্টার সানডে। বিশ্রামের দিন। আড্ডা ঘরে বসে গল্পগুজবে কাটল সারাদিন।

পরের দিন থেকেই আরম্ভ হল ভাঁড়ার ঘর এবং বারুদ ঘর নির্মাণ পর্ব। পরপয়েজ থেকে মালপত্র টেনে এনে রাখা হল এই দুটি ঘরে। গেল আরো সাতটা দিন। বারুদ ঘর রইল তুষার প্রাসাদের ষাট ফুট দক্ষিণে, ষাট ফুট উত্তরে রইল ভাঁড়ার ঘর। খাবার দাবার তেল কয়লা এবং বারুদ টোটা দিয়ে এই দুটি ঘর বোঝাই করতে করতে এসে গেল আটুই এপ্রিল। ভাঁড়ার ঘরের কাছে রইল কুকুর প্রাসাদ—গ্রীনল্যাণ্ড কুকুরদের জন্যে। ডাক ঠাঁই পেল তুষার প্রাসাদে।

এরপর বরফ প্রাকার দিয়ে সব কটা বাড়ী ঘিরে দিলেন ডক্টর। বেজায় পুরু সেই পাঁচিল দিয়ে ঠিক যেন কেল্লা বানিয়ে ফেললেন উনি। বাইরে থেকে উটকো উৎপাত এলে টক্কর দেওয়া যাবে সহজেই। সাত ফুট পুরু পাঁচিল ভাঙবার ক্ষমতা মানুষ কেন, পশুরও নেই। এস্কিমোরা এ অঞ্চলে থাকে না। থাকলে নিশ্চয় চিহ্ন পাওয়া যেত। সুতরাং সেদিক দিয়ে কোনো ভয় নেই। এ তল্লাটে প্রথম পা দিল এই পাঁচজন মানুষ।

কিন্তু যদি জানোয়াররা এসে লুঠ করে খাবার দাবার? তাই অত কষ্টে পাঁচিল দিয়ে কেল্লা বানিয়ে ফেললেন ডক্টর এবং বুক দশ হাত হয়ে গেল বরফ-কেল্লার অপূর্ব বাহার দেখে!

৭ ॥ নামকরণে বিপত্তি

হ্যাটেরাস আর আলটামণ্ট দুজনে দু ধরনের মানুষ। একজন কম কথা বলেন—কিন্তু যা বলেন তা কাজের কথা—অন্তর থেকে বলেন। অপরজন বেশী কথা বলে—কিন্তু অন্তর থেকে কিছুই বলে না এবং সবশেষে দেখা যায় কাজের কথা কিছুই বলেনি। প্রথমজন হ্যাটেরাস, দ্বিতীয়জন আলটামণ্ট।

ডক্টর ক্লবোনি আমেরিকানদের হাঁড়ির খবর রাখতেন। তাই আমেরিকান আলটামণ্টের চরিত্র তাঁকে বিস্মিত করেনি। বরং তিনি তার সঙ্গে বেশী মিশেছেন পেটের কথা বার করার জন্যে। আলটামণ্টও ডক্টরকে বেশী পছন্দ করতেন—হয়ত গুপ্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অথবা হয়ত সত্যি সত্যিই বন্ধু হিসেবে ডক্টরের জুড়ি নেই বলে। লোকটা তো প্যাঁচালো—ঝুড়ি ঝুড়ি কথা বললেও পেটের কথা বাইরে বেরোয় না।

ডক্টর তার গায়ে পড়া আলাপের সুযোগ নিলেন। কিন্তু তিনিও হার মানলেন। বেশ বুঝলেন, আলটামণ্ট যা বলছে তা সত্যি নয়। তাকে নাকি মার্কিন মুলুকের কয়েকজন ধনকুবের কারবারী সমুদ্র অভিযানে পাঠিয়েছিল পরপয়েজ জাহাজে। কিন্তু সত্যিই কি তাই? হ্যাটেরাসের সন্দেহ নিতান্ত অমূলক নয়। নিশ্চয় অন্য কোনো উদ্দেশ্যে দুর্গম মেরু অঞ্চলে পাড়ি জমিয়েছিল আলটামণ্ট।

এই কারণেই বনিবনা নেই দুই ক্যাপ্টেনের মধ্যে। কেউ কারো তোয়াক্কা করে না। কথাও বলে না। কম্যাণ্ডার দুজনেই। একজন নিজের দলবল নিয়ে কম্যাণ্ডার—অপরজন নিজের জাহাজে কম্যাণ্ডার।

ডক্টর ক্লবোনি ঝড়ের সংকেত দেখতে পেলেন দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে। যে কোনো দিন বাক্য সমরে অবতীর্ণ হতে পারে দুজনে।

হলও তাই। সেদিন ১৪ই এপ্রিল। গৃহপ্রবেশ উপলক্ষ্যে ভূড়িভোজের আয়োজন করেছেন ডক্টর। খাওয়া দাওয়ার পর তিনি বললেন—"বন্ধুগণ, দুর্গম গিরি কান্তার মেরু পেরিয়ে এসে আজ আমরা যেখানে পৌঁছেছি। সেখানে শুধুই ধু ধু বরফ। আসুন। এইসব জায়গার একটা করে নাম দেওয়া যাক।"

স্বল্পবাক হ্যাটেরাস শুধু শুনছিলেন। এখন উঠে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ চোখে আলটামণ্টকে দেখে নিয়ে বললেন—"যদি কারো আপত্তি না থাকে, প্রথমেই আমি নাম দিতে চাই এই বাড়ীটার। এ বাড়ীর স্রষ্টা যিনি, তাঁর নামেই হোক বাড়ীর নাম—ডক্টর হাউস।"

"হুররে।" সমস্বরে সমর্থন জানান বেল আর জনসন। 'হিপ হিপ হুররে' করে উঠল আলটামণ্ট।

উচ্ছ্বাস স্তিমিত হলে হ্যাটেরাস বললেন—"এবার নাম দেওয়া যাক এই ভূ-খণ্ডের। মানুষ এর আগে কখনো এখানে আসেনি—"

"ভুল বললেন", তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল আলটামণ্ট। "পরপয়েজ জাহাজ নিশ্চয় ডানা মেলে উড়ে আসেনি?"

"তা ঠিক" বিদ্রূপ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জবাবটা ছুঁড়ে দিলেন হ্যাটেরাস—"যেভাবে আছড়ে তলা ফাঁসিয়েছে পরপয়েজ—"

"ফরোয়ার্ড যেভাবে ফেটে উড়ে গিয়েছে, অনেকটা সেইরকম, তাই না?" আলটামণ্টের কণ্ঠেও মিছরীর ছুরী ঝলসে ওঠে।

চকিত কণ্ঠে জবাব দিতে যাচ্ছেন হ্যাটেরাস—বাধা দিলেন ডক্টর।

বললেন—"আহা হা, আমরা জাহাজ নিয়ে কথা বলছি না—আলোচনাটা হচ্ছে জায়গা জমির নামকরণ সম্পর্কে—"

"আমিও তাই বলছি", বলে উঠল আলটামণ্ট—"জায়গাটার নাম আগে থেকেই ঠিক হয়ে গেছে।"

"কে দিয়েছে, আপনি?" হ্যাটেরাসের প্রশ্ন।

"বলাবাহুল্য। আপনার আগে আমিই তো এসেছি এখানে।"

"তা এসেছেন। কিন্তু আমরা না এলে বিশ ফুট বরফের তলায় মরে পড়ে থাকতেন, সে খেয়াল আছে?"

"আমি না থাকলে আপনারাও খিদে আর ঠাণ্ডায় মরে ভূত হয়ে যেতেন, সে খেয়াল আছে?"

আবার বাধা দিলেন ডক্টর—"কি মুস্কিল। আলটামণ্ট যে আগে এসেছেন। তাতে কোনো সন্দেহ নেই। উনি যদি এ জায়গার নামকরণ করে থাকেন, তা মেনে নিতে হবে বই কি।—কি নাম দিয়েছেন?"

"নিউ আমেরিকা।"

শুনেই চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল হ্যাটেরাসের।

ঝটিতি বলে উঠলেন—"বেশ তো, আলটামণ্ট শুধু দেশটার নামই দিয়েছেন নিউ আমেরিকা—আর কিছুর নাম যখন দেননি, তখন আমি বলব ঐ উপসাগরটার নাম হোক 'ভিক্টোরিয়া' বে

"আর ঐ অন্তরীপটার নাম হোক 'কেপ ওয়াশিংটন'।" ডক্টর থামতে না থামতেই তুবড়ীর মত কথা কয়ে উঠল আলটামণ্ট।

"দূরের ঐ দ্বীপটার নাম হোক জনসন আইল্যাণ্ড।"

"কিন্তু ডক্টর—" ঘাবড়ে গিয়ে বলতে গেল জনসন।

ডক্টর কর্ণপাত না করে তেড়েমেড়ে বলে চললেন—"আর পশ্চিমের পাহাড়টার নাম হোক বেল মাউন্ট।" ডক্টর যেন আলটামণ্টকে আর কথাই বলতে দেবেন না "কিন্তু এই কেল্লার নাম হোক দৈব দুর্গ—কেন না দেব-সহায় না হলে ওয়াশিংটন বা ভিক্টোরিয়ার সাধ্য ছিল না এ-জায়গায় আমাদের এনে ফেলার।"

"চমৎকার নাম!" সোল্লাসে বললে আলটামণ্ট।

এই ভাবেই শেষ হল বিরাট তর্ক-বিতর্কের।

৮॥ ভিক্টোরিয়া বে-র উত্তরে

ডক্টর হাউসের পেছনেই যে পাহাড়, একদিন ক্লবোনি সেই পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করলেন। চূড়োয় পৌঁছে দেখলেন, মাথাটা দিব্বি চ্যাটালো। একটা লাইট হাউস খাড়া করা যায় অনায়াসেই।

নেমে এসে বন্ধুদের বললেন মতলবটা। আলোকস্তম্ভ থাকলে তুষার-ঝটিকার মধ্যেই দূর থেকে আলো দেখে বাড়ী ফেরা যাবে—পথ ভুল হবে না।

আলটামণ্ট বললে—"তাতো বুঝলাম। কিন্তু আলোটা জ্বালবেন কি দিয়ে? সীল মাছের তেল দিয়ে?"

"উঁহু। তেলের আলোয় তেজ হবে না।"

"তবে কি কয়লার গ্যাস দিয়ে?"

"পাগল! গা গরম করার কয়লা পুড়িয়ে আলো জ্বালব?"

জনসন বলে উঠল—"পারার বুলেট, বরফের লেন্স এবং দৈব-দুর্গর পর ডক্টর ক্লবোনি আবার নতুন ভেল্কী দেখাবেন মনে হচ্ছে।"

ডক্টর বললেন—"ব্যাপারটা খুবই সোজা। পরপয়েজ জাহাজে বুনসেন ব্যাটারী ছিল। গাটাপার্চা মোড়া তার, অ্যাসিড সব ঠিক আছে দেখেছি। তাই দিয়েই জ্বালাবো আলোকস্তম্ভর আকাশবাতি।"

তৎক্ষণাৎ দলবল নিয়ে ফের পাহাড়ে উঠলেন ডক্টর। বরফের চাঁই জমিয়ে দশফুট উঁচু স্তম্ভ নির্মাণ করলেন। পরপয়েজ জাহাজের একটা লণ্ঠন বসালেন তার মাথায়। তার টেনে নিয়ে এলেন তুষার-প্রাসাদে—ব্যাটারীটা রইল সেইখানে যাতে বাইরের নিদারুণ ঠাণ্ডায় অ্যাসিড জমে না যায়।

সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন সবাই। অন্ধকার হতেই লণ্ঠনের কার্বন পেন্সিল দুটো মুখোমুখি করতেই তীব্র আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত হল

বরফপ্রান্তর। জমাট সমুদ্রর ওপর ছায়া ছড়িয়ে গেল বহু দূর পর্যন্ত। ঠিক যেন সূর্য উঠল আলোকস্তম্ভে।

হাততালি দিয়ে জনসন বললে—"হুররে! ডক্টর ক্লবোনি রোদ্দুরও তৈরী করতে পারেন!"

এরপর থেকেই ফের গতানুগতিক হয়ে এল দৈনন্দিন জীবন। ১৫ই থেকে ২০শে এপ্রিল পর্যন্ত আবহাওয়া বড় অনিশ্চিত অবস্থায় গেল। শনিবার আকাশ একটু পরিষ্কার ডক্টর, আলটামণ্ট এবং বেল কোমরে ছুরী আর কাঁধে দোনলা বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়ল শিকারের সন্ধানে। যাবার সময়ে ডক্টর আলোকস্তম্ভর বিদ্যুৎবাতি জ্বালানোর ব্যবস্থা করে গেলেন—রাত হলেই যাতে নকল রোদ ঠিকরে যায় দিগন্ত অবধি—এ আলো শুধু ৩০০০ মোমবাতি অথবা ৩০০ গ্যাস জেট দিয়ে সৃষ্টি করা সম্ভব।

হ্যাটেরাস গেলেন না। উপকূলের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য রইলেন বাড়ীতে।

প্রথম তিন ঘণ্টায় পনেরো মাইল পেরিয়ে এসেও শেয়াল বা খরগোসের লেজের চিহ্ন পর্যন্ত দেখতে পেলেন না অভিযাত্রীরা। সীল মাছদের বৃথাই অন্বেষণ করলেন। জমাট সমুদ্রের ওপরকার ছিদ্রপথে ওরা যে বাইরে এসেছিল, সে চিহ্ন দেখা গেল বরফের ওপর। বড় বড় পদচিহ্ন দেখলেই চেনা যায়। নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্যে ওপরে এসেই ফের তলায় নেমেছে।

ডক্টর বললেন—"জায়গাটা চিনে রাখো। গরম পড়লে যখন রোদ উঠবে, তখন আসব সীল শিকারে। কেন না, রোদ পোহাতে ওরা বড় ভালবাসে। তবে হ্যাঁ, ভয় পাইয়ে দিলে কিন্তু চক্ষের নিমেষে মিলিয়ে যাবে গর্তের মধ্যে। আনাড়ি লোকে চেঁচিয়েই ওদের তাড়িয়ে দেয়।"

বেল বললে—"লোকে সীল মারে কেন? চামড়া আর তেলের জন্যে?"

"ইউরোপের লোকেদের মতলব তাই। কিন্তু এস্কিমোরা সীলের চর্বিওলা মাংস খায়—অখাদ্য হলেও খায়। তোমাদেরও সীলের কাটলেট খাওয়াব—একবার খেলে আর ভুলতে পারবে না।"

"যদি সেরকম রান্না করতে পারেন", বলল বেল, "তাহলে আপনার সঙ্গে বাজি রেখে সীল খাব।"

"আমার সঙ্গে বাজিতে জিতলেও গ্রীনল্যাণ্ডারদের কাছে হেরে যাবে। ওদের এক-একজন রোজ কত সীলের মাংস খায় জানো? দশ থেকে পনেরো পাউণ্ড।"

"পনেরো পাউণ্ড! বলেন কি! রাক্ষসের পেট নাকি!"

"মেরু-উদর ঐরকমই হয়। সারাদিন ধরে ডিনার খায় এস্কিমোরা—খাওয়ার পর শরীর এত ফুলে যায় যে চেনা যায় না—নড়তেও পারে না। আসলে কি জানো, মেরু অঞ্চলে এত না খেলে গা গরম রাখা যায় না! স্যার জন রস বলেছেন, বুটিয়াল্যাণ্ডে তাঁর গাইডরা নাকি ষাঁড়ের মাংস ফালি করে কাটত এবং একটু একটু করে ঠাসত মুখের মধ্যে। অজগর যেমন একটু একটু একটু করে ষাঁড় গেলে—অনেকটা সেইভাবে। বাকী মাংস ঝুলত বরফের ওপর।"

বেল বলে উঠল—"ডক্টর ক্লবোনি কিন্তু আমার খিদে বাড়িয়ে দিচ্ছেন।"

"আর আমার ক্ষিদে কমিয়ে দিচ্ছেন।" বললে আলটামণ্ট—"সীলের মাংস দেখলে আর খেতে পারব কিনা সন্দেহ। যাই হোক, বরফের ওপর কি যেন একটা নড়ছে না?"

"সিন্ধুঘোটক!" ফিসফিস করে উঠলেন ডক্টর—"চুপ! একদম শব্দ না হয়।"

পা টিপে টিপে তিনজনে ছড়িয়ে গেল তিনদিকে এবং পালাবার পথ বন্ধ করে একটু একটু করে এগিয়ে এল শিকারের দিকে। বরফের আড়ালে নতজানু হয়ে বসে তিনজনেই গুলি ছুঁড়ল একসঙ্গে।

গুলি খেয়েই খেপে গেল সিন্ধুঘোটক। বরফের চাঙর চুরমার করে ছুটল নক্ষত্রবেগে—কিন্তু কুঠার হাতে পথ অবরোধ করে দাঁড়াল আলটামণ্ট—উপর্যুপরি দুই কোপে কেটে ফেলল পাখনা দুটো। তা সত্ত্বেও মরিয়া হয়ে বরফের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গেল অতিকায় জানোয়ারটা।

অগত্যা গুলি ছুঁড়তে হল নতুন করে। রক্তে লাল হয়ে গেল সাদা বরফ। নিস্পন্দ দেহে কাৎ হয়ে পড়ল সিন্ধুঘোটক।

মেপে দেখা গেল, নাকের ডগা থেকে ল্যাজের প্রান্ত পর্যন্ত পাক্কা পনেরো ফুট। গায়ে এত চর্বি যে বেশ কয়েক পিপে তেল তৈরী হয়ে যেত তা দিয়ে। ডক্টর কেবল সুস্বাদু মাংসটুকু টুকরো টুকরো করে কেটে নিলেন। বাদবাকী দেহটা দাঁড়কাকদের জন্যে রেখে এলেন। পালে পালে দাঁড়কাক উড়ছিল আকাশে—নিমেষে মহাভোজে মত্ত হল ডক্টরের ফেলে আসা প্রসাদের ওপর।

তখন রাত হয়েছে। অন্ধকারে পথ চিনে ফেরা মুস্কিল। ডাক পথ দেখিয়ে অভিযাত্রীদের নিয়ে এল বেশ কিছুদূর। তারপর দূর-দিগন্তে দেখা গেল একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র—বরফ কুজ্ঝটিকা ভেদ করে জ্বল-জ্বল করতে লাগল আলোর তারা।

"আলোকস্তম্ভ!" সোল্লাসে বললেন ডক্টর।

আলোকিত ধূলোর মধ্যে দিয়ে হনহনিয়ে চললেন অভিযাত্রীরা। সুদীর্ঘ ছায়াপাত ঘটল পেছনে। আধঘণ্টা পরে উঠে এলেন দৈবদুর্গে।

৯॥ গরম এবং ঠাণ্ডা

ডক্টর ক্লবোনি বাস্তবিকই রাঁধেন ভাল। এমন খাসা কাটলেট বানালেন সিন্ধুঘোটকের মাংস দিয়ে যে একটাও আর পড়ে রইল না। খাওয়ার পর কফিও বানালেন নিজে। ফুটন্ত কফি কাপে কাপে ঢেলে দিলেন। তাই দেখে আলটামণ্ট বললে "ডক্টর কি সবাইকে পুড়িয়ে মারবেন?"

"মোটেই না," জবাবটা যেন তৈরীই ছিল ডক্টরের মুখে—"আমি ত এমন মানুষদের জানি যারা একশ তিরিশ ডিগ্রী গরম কফি চুমুক দিয়ে খায়।"

"একশ তিরিশ ডিগ্রী।" আলটামণ্ট তো অবাক—"হাতেরও ক্ষমতা নেই ঐ উত্তাপ সইবার।"

"হাতের অনুভূতি যে বেশী তালু আর জিভের চেয়ে। বেশী কথায় কাজ কি, হাতেনাতে দেখিয়ে দিচ্ছি।" বলে, ফুটন্ত কফিতে থার্মোমিটার ডোবালেন ডক্টর। পারা গিয়ে দাঁড়াল ১৩১ ডিগ্রীতে। তারপর বেশ তারিয়ে তারিয়ে চুমুক দিলেন সেই কফিতে।

বেল দেখাদেখি চুমুক দিতে গিয়ে আর্তনাদ করে উঠল বিষম কণ্ঠে—বেচারীর জিভে ফোস্কা পড়ে গেছে।

ডক্টর বললেন "তোমার অভ্যেস নেই—আমার আছে।"

আলটামণ্ট শুধোলো— মানুষ সবচেয়ে বেশী কত উত্তাপ সইতে পারে?"

"কয়েকটা ঘটনা বলছি। ফ্রান্সে একটা রুটির কারখানায় কতকগুলো মেয়ে তিনশডিগ্রী উত্তাপে দশ মিনিট দাঁড়িয়েছিল—ফুটন্ত জলের চাইতে ৮৯ ডিগ্রী বেশী সেই উত্তাপে তাদের কিস্সু হয়নি—অথচ আশেপাশে সেদ্ধ হয়ে গেছে আপেল আর মাংস।"

"সাংঘাতিক মেয়ে তো।"

"১৭৭৪ সালে আমাদের মতই কয়েকজন অভিযাত্রী ২৯৫ ডিগ্রী উত্তাপ সয়েছিল অক্ষত দেহে—অথচ পাশেই ডিম আর মাংস ঝলসে গিয়েছিল সেই উত্তাপে।"

"জানোয়ারদের গা কতখানি গরম ডক্টর?" জনসনের প্রশ্ন।

"সবচেয়ে গা গরম থাকে পাখীদের। হাঁস আর মুরগীর দেহের তাপ

১১০ ডিগ্রী, কিন্তু পেঁচার দেহ ১০৪ ডিগ্রীর বেশী গরম নয়। মানুষের দেহ ১০১ ডিগ্রী গরম—অন্য স্তন্যপায়ীদের দেহ মানুষের দেহের চাইতে সামান্য বেশী গরম। ঘোড়া, খরগোস, হাতী, শুশুক, বাঘের দেহের তাপ মোটামুটি মানুষের দেহের তাপের কাছাকাছি। কিন্তু বেড়াল, কাঠবেড়ালী, ইঁদুর, প্যান্থার, ভেড়া, ষাঁড়, কুকুর, বাঁদর, ছাগলের দেহ ১০৩ ডিগ্রী গরম। শুয়োরদের দেহ তার চাইতে এক ডিগ্রী বেশী গরম।"

"কি লজ্জার কথা!"

"জল অনুসারে মাছের দেহতাপ কমে বাড়ে। সাপের দেহতাপ ৮৬ ডিগ্রীও পৌঁছোয় না, বাঙের ৭০, হাঙরের সাড়ে আটষট্টি, পোকামাকড়দের দেহতাপ জলের বা বাতাসের তাপ যা—তাই।"

হ্যাটেরাস এতক্ষণে কথা বললেন—"গরম নিয়ে অনেক গরম কথাই তো শুনলাম। এবার বলুন ঠাণ্ডা নিয়ে।"

ডক্টর বললেন—"উত্তম কথা। থার্মোমিটারের পারা কখনো শূন্য তাপাংকের ৭২ ডিগ্রী নীচে নামে না—আমরা সয়েছি ৭০ ডিগ্রী পর্যন্ত—আজ পর্যন্ত যা কোনো মানুষে পারেনি।"

"কথাটা ঠিক। ঠাণ্ডায় কাবু না হলে কি বসে থাকি," বললেন হ্যাটেরাস।

"ঠাণ্ডা কাবু করলেও জখম করতে পারবে না যদি হাত-পা ঠাণ্ডায় জমে গেলেই তুষার দিয়ে ঘসা যায়", বললেন ডক্টর। "একটা কথা সবাই খেয়াল রাখবেন,—প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় হাত-পা জমে গেলেও কখনো আগুনের আঁচে যাবেন না—টের পাবেন না, কিন্তু হাত পা পুড়ে যাবে। তখন তা কেটে বাদ দেওয়া ছাড়া আর পথ থাকবে না।"

১০॥ শীতের আনন্দ

বরফের দেশে শীতকাল কাটানো এক মহাঝামেলা। আবহাওয়া অনিশ্চিত, বাইরে দুর্যোগ, ভেতরে কাজ নেই। কঁহাতক আর হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা যায়? বাইরে বেরোনোর পথও তো বন্ধ।

তারই মাঝে প্রায় ষাট ফুট দূরে যেতে হত ভাঁড়ার ঘর থেকে রান্না ঘরে খাবার দাবার আনার জন্যে।

পরপয়েজ জাহাজ থেকে জিনিসপত্র সরিয়ে এনে ভালই করেছিলেন ডক্টর। কেননা উল্টোপাল্টা হাওয়ায় একটু একটু ভেঙে পড়ছিল জাহাজটা। কিছুদিন পড়ে দেখা গেল তক্তা খুলে ছড়িয়ে পড়েছে বরফ প্রান্তরে। ডক্টর মনে মনে

ঠিক করলেন, শীত কাটলেই ঐ তক্তা দিয়ে একটা লম্বা নৌকো তৈরী করবেন ইংলণ্ডে ফেরার জন্যে।

আলসেমিতে পেয়ে বসেছে প্রায় পাঁচজনকেই। হ্যাটেরাস দিনরাত বসে আকাশ পাতাল ভাবেন। আর আলটামণ্ট হয় মদ খায়, নয় ঘুমোয়। দুজনকেই ঘাঁটাতে চান না ডক্টর। কিন্তু সংঘর্ষের যে বেশী দেরী নেই, তা হাড়ে হাড়ে বোঝেন। সাংঘাতিক সংঘ লাগবে শীগগিরই দুজনের মধ্যে—এক জায়গায় দুই ক্যাপ্টেন থাকলে যা হয় আর কি। তার ওপর একজন ইংরেজ জাতকে গৌরব মণ্ডিত করতে চায়—অপর জন চায় মার্কিন জাতকে। ইংরেজ আমেরিকানের মধ্যে জাতিগত বিদ্বেষ নতুন কিছু নয়।

ডক্টর একদিন বললেন—"এভাবে চুপচাপ বসে না থেকে কিছু একটা করলে হয় না।"

"কি করব?" শুধোলো আলটামণ্ট।

"আমাদের পূববর্তী অভিযাত্রীরা যা করতেন।"

"কি করতেন?"

"খবরের কাগজ বার করতেন, নয় তো নাটক অভিনয় করতেন।"

"বলেন কি! বরফে দেশে খবরের কাগজ! আলটামণ্ট তো অবাক।

"নাটক অভিনয়!" বেলের চোখ কপালে গিয়ে ঠেকল।

ডক্টর তখন বুঝিয়ে বললেন কিভাবে শীতের একঘেয়েমি কাটানোর জন্যে নানাবিধ পন্থা উদ্ভাবন করতেন পূর্ববর্তী অভিযাত্রীরা। মজাদার খবর লিখে বার করতেন সংবাদপত্র। তা লিখতে যত না মজা, পড়তে তার চাইতেও বেশী মজা। হু-হু করে কেটে যেত সময়। এ ছাড়াও ছিল হিংটিং ছট জাতীয় অভিনয়। কিছু একটা না করে চুপচাপ বসে থাকা তো যায় না!

হাই তুলে জনসন বললে—"ঘুমোলেই হয়। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বরং স্বপ্ন দেখা যাক সংবাদপত্র আর থিয়েটারের। চললাম- রাত অনেক হয়েছে!"

১১॥ পদচিহ্ন

২৬শে আর ২৭শে এপ্রিল ঝড়ের হুহুংকারে কানে তালা লেগে যাওয়ার উপক্রম হল। তুলনা নেই প্রকৃতির সেই রুদ্রলীলার। ঝড় থামতেই আনন্দে নেচে উঠলেন ডক্টর। কেননা শীত কাটতেও এবার আর দেরী নেহ। বড় জোর ছ-হপ্তা, তার পরেই আসবে বসন্ত।

বাইরে বেরিয়ে চমকে গেলেন অভিযাত্রীরা। অবিরাম তুষারপাতের

ফলে জমি পনেরো ফুট উঁচু হয়ে গিয়েছে এবং দিগন্ত পর্যন্ত সব কিছুই সমতল-ভূমিতে পরিণত হয়েছে।

আবার যদি ঝড় আসে, তাই ঝটপট কিছু খাবার দাবার ভাঁড়ার থেকে এনে রাখা হল রান্নাঘরে। তারপর শাবল গাঁইতি কোদাল নিয়ে সবাই মিলে বরফ কেটে তুষার সরিয়ে পুরু পাঁচিলটাকে ফের খাড়া করলেন কঠিন গ্র্যানাইটের ওপর।

কিন্তু কিছু টাটকা মাংস না হলেই যে নয়। অতএব শিকারে বেরোলেন ডক্টর, আলটামণ্ট এবং বেল। মাইল দুয়েক গিয়ে হঠাৎ দেখতে পেলেন বিস্তর পদচিহ্ন। ভালুকের পায়ের ছাপ। গুনে দেখলেন সবশুদ্ধ পাঁচটা ভালুক যেন প্রদক্ষিণ করেছে দৈবদুর্গকে।

মুখ চাওয়া চাওয়ি করলেন অভিযাত্রীরা। গতিক সুবিধের মনে হচ্ছে নাতো। ডক্টর বললেন—ভালুকরা কিন্তু সব জানোয়ারের চেয়ে বেশী বুদ্ধি ধরে। যদিও আমরা চবি পুড়িয়ে গন্ধ ছড়াইনি, তবুও ওরা আঁচ করতে পেরেছে জ্যান্ত খাবার রয়েছে এখানে। সুতরাং এক কাজ করা যাক।"

"কী?"

"ওরা সত্যিই আমাদের নজরে রেখেছে কিনা বোঝা যাবে পায়ের ছাপগুলো মুছে দিলে। কালকে যদি ফের পায়ের ছাপ দেখি, বুঝব বিপদ আসন্ন।"

তৎক্ষণাৎ দুশ গজ জায়গা অবধি ভালুক পদচিহ্ন মুছে দিল অভিযাত্রীরা। রাত কাটল উদ্বেগের মধ্যে। সকাল বেলা উঠে গিয়ে বরফ প্রান্তর পরীক্ষা করতে গিয়ে আবার দেখা গেল পঞ্চ-ভল্লুকের সারি সারি পদচিহ্ন। এবার আরো কাছে। যেন দূর থেকে দৈবদুর্গর গন্ধ শুঁকে শুঁকে চক্রাকারে প্রদক্ষিণ করছে এবং ক্রমশঃ কাছে এগিয়ে আসছে।

এখন উপায়? ডক্টর বললেন—"আজকেও পায়ের চিহ্ন মুছে দিই। দেখা যাক, কালকেও আসে কিনা।"

তাই করা হল। পরের দিন কিন্তু কোনো পদচিহ্ন দেখা গেল না। মাইল দুই টহল দিয়ে এল অভিযাত্রীরা। ভালুকের ল্যাজের ডগা পর্যন্ত দেখতে পেল না।

মহানন্দে ফিরে এল দৈবদুর্গে। তবুও সাবধানের মার নেই বলে লাইট হাউসে গিয়ে চারদিকে নজর রাখল বেল। কিছুক্ষণ পরে পালা এল আলটামণ্টের। পাহাড়চুড়োয় উঠে সে বেলকে পাঠিয়ে দিলে ডক্টর হাউসে।

ঠিক এই রকম একটা সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলেন ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস।

"তিন সঙ্গীকে এক জায়গায় জড়ো করে বললেন—"বন্ধুগণ, আমেরিকানটা এখানে নেই। এই বেলা আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করে নিই। আর একমাস পরেই শীত বিদায় নেবে। আবহাওয়া অভিযানের অনুকূলে যাবে। বলুন তখন কি করবেন ?"

"আপনি কি করবেন ?"

"আপনারা জানেন আমি কি করব। মেরুকেন্দ্র আবিষ্কারই আমার প্রতি মুহূর্তের ধ্যান।"

"আমাদেরও তাই," সমস্বরে বললেন ডক্টর এবং জনসন।

"বেল, তোমার কি মত ?"

"ইংলণ্ডে ফিরলে হয় না ?"

"বেল, সব চাইতে ঠাণ্ডার জায়গা পেরিয়ে এসেছি অতি কষ্টে—আরো উত্তরে গেলে ঠাণ্ডার প্রকোপে আর কষ্ট পেতে হবে না। আর মাত্র ৩৬০ মাইল গেলেই পৌঁছোবো উত্তর মেরুতে।"

"তাহলে উত্তরেই যাবো।"

"চমৎকার। দলের অধিনায়ক কে হবে ?"

"কেন আপনি ?"

"আমেরিকানটা যদি আমাকে না মানে ?"

"সে দেখা যাবে।"

"তখন কিন্তু হাতাহাতি হয়ে যাবে দুজনের মধ্যে।"

ডক্টর কথাটা ঘুরিয়ে দিলেন—"যাবেন কোন পথে ?"

"উপকূল ঘেঁসে।"

"যদি দেখেন সামনে সমুদ্র, তখন ?"

হ্যাটেরাস চুপ করে রইলেন।

ডক্টর বললেন—"পরপয়েজের ভাঙা কাঠ দিয়ে একটা নৌকো বানিয়ে নেওয়া যাক।"

"না," গর্জে উঠলেন হ্যাটেরাস। "আমেরিকান জাহাজের কাঠ দিয়ে নৌকো বানিয়ে মেরুকেন্দ্রে পৌঁছোবো ? কক্ষনো নয় !"

সেকী তেজ ! ক্লবোনি আর পীড়াপীড়ি করলেন না। আর কথা বলার সুযোগও পেলেন না। আলটামন্ট এসে পড়ায় শুরু হল অন্য কথাবার্তা।

ভালুকরা দেখা দেয়নি। নিশ্চয় চম্পট দিয়েছে।

১২ ॥ বরফ কারাগার

পরের দিন হ্যাটেরাস, আলটামণ্ট এবং বেল শিকার করতে গেল 'বেল পাহাড়ে'র দিকে—ডাক গেল সঙ্গে। ডক্টর গেলেন জনসন আইল্যাণ্ডের দিকে বরফ প্রকৃতি দেখে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে। একা জনসন পাহারায় রইল ডক্টর হাউসে। গ্রীনল্যাণ্ড কুকুরগুলোকে ছেড়ে দিল খাঁচার বাইরে।

আচম্বিতে বন্দুক নির্ঘোষ ভেসে এল বেল পাহাড়ের দিক থেকে। অভিযাত্রীরা তাহলে খুব কাছেই শিকার পেয়েছে—ভাবল জনসন। ভাবনা শেষ হতে না হতেই শোনা গেল উপর্যুপরি আরো দুবার বন্দুক নির্ঘোষ।

বাসরে! খুব শিকার করছে তো বন্ধুরা!

পর পর আরো তিন বার গর্জে উঠল বন্দুক। বন্দুক যেন আর থামতেই চায় না! তবে কি… তবে কি…ভাবতে গিয়ে মাথার চুল খাড়া হয়ে গেল জনসনের। বাড়ী থেকে বেরিয়ে এক দৌড়ে উঠে গেল পাহাড়-চূড়োয়।

কি দেখল?

ভালুক! পাঁচ-পাঁচটা দানবিক ভালুক তাড়া করেছে বেল, আলটামণ্ট, হ্যাটেরাস এবং ডাক-কে! সবার পেছনে রয়েছেন হ্যাটেরাস। বন্দুক ছুঁড়েও জখম করতে পারেননি চারপেয়ে আততায়ীদের। তাই ছুটতে ছুটতে টুপী, দস্তানা, এমন কি হাতের বন্দুকটা পর্যন্ত ছুঁড়ে দিচ্ছেন ভালুকদের দিকে, স্বভাব মত ভালুকরা থমকে দাঁড়িয়ে শুঁকছে বস্তুগুলো—সেই অবসরে বেশ খানিকটা ছুটে আসছে অভিযাত্রীরা।

ডক্টর হাউসে ঢোকবার মুখে আর একটু হলেই ভালুকের থাবা এসে পড়ত ক্যাপ্টেনের ঘাড়ে—বরফ-কাটা ছুরী মেরে কোনো মতে আত্মরক্ষা করলেন ক্যাপ্টেন এবং তিন জনেই সম্পূর্ণ বেদম হয়ে ভেতরে ঢুকে দমাস করে বন্ধ করে দিলেন দরজা।

রুদ্ধশ্বাসে বললেন হ্যাটেরাস—"এবার লাগুক লড়াই পাঁচজন বনাম পাঁচজন।

"পাঁচজন বনাম চারজন," ভয় বিকৃত কণ্ঠে বললে জনসন।

"কেন?"

"ডক্টর দ্বীপে রয়েছেন!"

সর্বনাশ! মুখ শুকিয়ে গেল সবার! ডক্টর যদি বন্দুক নির্ঘোষ শুনে হুঁশিয়ার হন, তাহলেই রক্ষে। আর অতদূরে যদি বন্দুকের আওয়াজ না পৌঁছে থাকে, তাহলেই সর্বনাশ! বেঘোরে মরতে হবে পাঁচ পাঁচটা হিংস্র

ভালুকের থাবার ঘায়ে। ওরা তো লুকিয়ে আছে বরফের আড়ালে—ডক্টর কিছুই জানেন না!

আলটামণ্ট ততক্ষণে ছুরী দিয়ে দেওয়াল কেটে বরফের চাঁই বার করছে আর ভরাট করছে জানলার গোবরাট। বাইরে ভালুকদের গজরানি শুনতে পেয়েই টনক নড়েছে তার। বরফ চাঁই দিয়ে ওদের ঠেকিয়ে রাখা যাবে না জেনেও চেষ্টা করে চলেছে প্রাণপণে। অসুর শক্তি নিয়ে ভালুকরা যদি ইচ্ছে করে সব বাধা ভেঙে ভেতরে ঢুকবে—কিছুতেই আটকানো যাবে না।

দেখাদেখি বাকী তিনজনেও দেওয়াল কেটে বরফ নিয়ে ভরাট করল জানলার গোবরাট। তারপর তিনটে ঘরে বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে রইল পাহাবায়।

কিন্তু ডক্টরকে বাঁচানো যায় কি করে? ভালুকগুলোকে বধ করলেই ল্যাটা চুকে যায় ঠিকই, কিন্তু বধ করার পথ কোথায়? বেরোলেই তো থাবা খেতে হবে।

আলটামণ্টের মাথায় একটা বুদ্ধি এল। দেওয়াল খুঁড়ে ফুটো করল। তারপর যেই বন্দুকের নল গলিয়েছে তার মধ্যে, অমনি আসুরিক হ্যাঁচকা টানে ভালুকরা বন্দুক ছিনিয়ে নিল হাত থেকে—ঘোড়া টেপবারও সময় দিল না!

এত শক্তি ভালুকদের!

গেল আরো দুটি ঘণ্টা। ভালুকবা টহল দিচ্ছে বাইবে—ভেতরে অপরিসীম উদ্বেগে ছটফট করছে অভিযাত্রীরা। জনসন খাবার টেবিলে খাবার পরিবেশন করল—যাতে উদ্বেগ কমে।

খাওয়ার পর হ্যাটেরাস বললেন—"এক কাজ করা যাক, জনসন, আগুন খোঁচাবার ঐ লোহার শিকটা তাতিয়ে লাল করো—দেওয়ালের ফুটো দিয়ে বাইরে বার করো—চেপে ধরলেই হাত পুড়ে যাবে ভালুকদের বন্দুক ছুঁড়বো সঙ্গে সঙ্গে।

ফন্দীটা মন্দ নয়। তৎক্ষণাৎ আগুনরাঙা লোহাব শিক গলিয়ে দেওয়া হল ফুটো দিয়ে—হাত পুড়ে যেতেই বিকট গর্জে উঠল ভালুকদল—সঙ্গে সঙ্গে দমাদম গুলি ছুঁড়ল অভিযাত্রীরা ঐ ফুটো দিয়েই।

আবার তাতিয়ে আনা হল লোহার শিক। আবাব ঢোকানো হল ছিদ্রপথে—এবার কিন্তু কোথায় যেন আটকে গেল শিকটা।

"সর্বনাশ হল!" পাংশু মুখে বলল আমেরিকান।

"কি হল?" শুধোলো জনসন।

"হতভাগা ভালুকরা বরফ দিয়ে ফুটো বন্ধ করে দিয়েছে। কি সর্বনেশে বুদ্ধি দেখেছো! বরফের চাঁই দিয়ে আমাদের পালাবার পথ বন্ধ করছে, হাওয়া যাতায়াতের পথও বন্ধ করছে!"

সত্যিই তাই। লোহার শিক তাই আর বাইরে যাচ্ছে না। এদিকে ঘরে আগুন জ্বলছে, চারজনের শ্বাসপ্রশ্বাসেও অক্সিজেন লাগছে—কিছুক্ষণ পরেই অক্সিজেন ফুরিয়ে যাবে, কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাসে ঘর ভরে উঠবে—শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা পড়বে চারজনে।

হ্যাটেরাস অত সহজে ভেঙে পড়ার মানুষ নন, তিনি বললেন—"ঠিক আছে, রাত হোক। ছাদে ফুটো করব। ফুটো দিয়ে বাতাস আসবে—গুলিও করা যাবে। যা থাকে কপালে, লড়ে যেতে হবে সামনি সামনি।"

কি সঙীন পরিস্থিতি! ভালুকরাও জব্দ করতে পারে মানুষদের!

১৩॥ খনি-বোমা

অসহ্য উৎকণ্ঠার মধ্যে রাত নামল। রেড়ির তেলের পিদিমের মত টিমটিম করে জ্বলছে লণ্ঠন—অক্সিজেন ফুরিয়ে এল বলে।

বন্দুকগুলোয় গুলি ভরা হল। শুরু হল ছাদে ফুটো করা—বেল হিসেবী হাতে ছাদ কাটছে, এমন সময়ে শোবার ঘরের পাহারা ছেড়ে দৌড়ে এল জনসন—মুখ তার ভয়ে বিবর্ণ।

"ক্যাপ্টেন, শোবার ঘরের দেওয়ালে কিসের আওয়াজ হচ্ছে!"

তৎক্ষণাৎ সবাই দৌড়ে এল শোবার ঘরে। সত্যিই তো, খচমচ খচমচ শব্দে বরফ কাটা হচ্ছে বাইরে থেকে। কারা ওরা?

ভালুকরা! রণ কৌশল পালটেছে নিশ্চয়। বরফের চাঙর জমিয়ে দমবন্ধ করে সত্যিই মারা গেল কিনা দ্যাখতে মানুষগুলোকে, দেখবার জন্যে দেওয়ালে সিঁদ কাটছে রাতের অন্ধকারে। শক্তিশালী থাবার ইস্পাত-নখ কচাকচ করে কেটে পথ করে নিচ্ছে বরফ দেওয়ালে।

মরিয়া হয়ে গেল আলটামন্ট—"ধুত্তোর! চোরের মত মরার চাইতে বরং এই ভাল—লড়ে মরা যাক।"

বলে এক হাতে কুঠার, আরেক হাতে ছুরী বাগিয়ে দেওয়ালের ধারে দাঁড়াল ওৎ পেতে—এক-পা সামনে, কুঠার মাথার ওপর। দেখাদেখি একই পোজে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন এবং জনসন। বন্দুক হাতে তৈরী রইল বেল—কুঠার ফসকালেই গুলি চালাবে।

খচমচ খচমচ শব্দ এখনো অব্যাহত রয়েছে। আচমকা ভেতরে ঠিকরে এল বরফের বাধা এবং সেইসঙ্গে গড়িয়ে এল একটা বিপুলকায় কৃষ্ণ পিণ্ড।

তৎক্ষণাৎ পেছনে পিঠ বেঁকিয়ে কুঠারটা নামিয়ে আনতে যাচ্ছে আলটামণ্ট, এমন সময় চিলের মত চেঁচিয়ে উঠল কৃষ্ণপিণ্ডটা—"আরে! আরে! মারবেন নাকি?"

চেনা গলা—ডক্টর ক্লবোনির!

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সকলে। আধো অন্ধকারে গা ঝেড়ে উঠে ডক্টর এক গাল হেসে বললেন—"অত অবাক হবার কি আছে? আমি সব দেখেছি।"

"কি দেখেছেন?" ভীষণ আনন্দে ডক্টরের কাঁধ খামচে ধরে শুধোলেন হ্যাটেরাস।

"পরপয়েজ জাহাজের ধ্বংসাবশেষের কাছে পৌঁছেই যেই শুনলাম গুলি ছোঁড়ার শব্দ, আগে উঠলাম একটা টিলার ওপর। দেখলাম ভালুকদের তাড়া খেয়ে পাঁই পাঁই করে ছুটছেন আপনারা। তার পরেও-দেখলাম, বেটারা বরফ চাপা দিয়ে দমবন্ধ করে মারবার ফিকির করেছে আপনাদের। কি ভাগ্যিস পাহাড়ে উঠে বরফ গড়িয়ে দেয়নি, তাহলে থেঁতলে মরতে হত। যাই হোক, যখন দেখলাম গ্রীনল্যাণ্ড কুকুরগুলোর দিকেও ওদের নজর নেই—আরো সুস্বাদু খাবারের লোভে ঘুর ঘুর করছে বাড়ীর সামনে—আমি গুটি গুটি এলাম বারুদঘরে। সেখান থেকে এই ছুরী দিয়ে সুড়ঙ্গ কেটে তিন ঘণ্টা পরে পৌঁছেছি আপনাদের সামনে। আর বকতে পারছি না—কিছু খেতে দিন আগে।"

সঙ্গে সঙ্গে এল নুন মাখানো মাংস আর বিস্কুট। জনসন সোল্লাসে বললে—"ডক্টর যখন এসেই পড়েছেন, আর ভাবনা নেই। ভালুক বাছাধনদের মজা দেখাচ্ছি।"

"তা দেখাচ্ছি," কোঁৎ করে মুখের গরস গিলে নিয়ে বললেন ডক্টর—"খনি-বোমা ফাটিয়ে পাঁচটাকেই যমালয়ে পাঠাচ্ছি।"

"খনি! বোমা!" আলটামণ্ট তো হতবাক।

ডক্টর বললেন—"আরে মশায়, আমি বারুদ ঘর দিয়ে এসেছি তো এই মতলবেই—নইলে কাছের দেওয়াল খুঁড়লেই পারতাম। বারুদ আনব বারুদ ঘর থেকে সুড়ঙ্গ পথে। রাতের মধ্যেই আর একটা একশ ফুট লম্বা সুড়ঙ্গ কাটব ঐ ঢাল পর্যন্ত। তারপর এই টোপ দিয়ে টেনে আনব ভালুকদের," বলেই দেওয়ালের সুড়ঙ্গ থেকে টেনে আনলেন একটা মরা শেয়াল।

বললেন সবিনয়ে "সকালেই শিকার করেছিলাম, এখন কাজে লাগাব।

"কি ভাবে, ডক্টর, কি ভাবে?"

"দেখতেই পাবেন। এখন আসুন হাতাহাতি করে সুড়ঙ্গটা খোঁড়া যাক।"

একশ ফুট সুড়ঙ্গ খুঁড়তে লাগল দশ ঘণ্টা। ঘণ্টায় দশ ফুট, পালা করে এক একজন একঘণ্টা খুঁড়ল—বাকী চারজন জিরিয়ে নিল সেই অবসরে। সকাল আটটায় শেষ হল সুড়ঙ্গ খোঁড়া। ছাদটা ফুটখানেক পুরু রেখে তলায় কাঠের ঠেকনা দিয়ে ঠেকিয়ে রাখলেন ডক্টর। ঠেকনার মাথায় বাঁধা রইল মরা শেয়াল—তলায় এক পিপে একশ পাউণ্ড বারুদ। চক্ষের নিমেষে বারুদ জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্যে ফিজিক্স পড়া বিদ্যা প্রয়োগ করলেন ডক্টর—আলটামণ্ট পর্যন্ত অবাক হয়ে গেল তাঁর প্রতিভা দেখে।

পলতে নয়—ইলেকট্রিক তার টেনে নিয়ে আসা হল বারুদ পিপে থেকে। ডক্টর হাউস পর্যন্ত, বারুদের মধ্যে দুটো তার মুখোমুখি করা রইল—যাতে স্পার্ক ছিটকে গিয়ে বারুদ জ্বালিয়ে দেয়। তারের অপর প্রান্ত লাগানো রইল ইলেকট্রিক ব্যাটারীতে।

একটা দড়ি বাঁধা রইল খুঁটির গোড়ায়। দড়ির আরেক প্রান্ত হাতে নিয়ে জনসন বসে রইল বারুদঘরে। সেইখান থেকেই দেখতে পেল ভালুকদের ধৈর্য ফুরিয়েছে। বরফ সরাচ্ছে ডক্টর হাউসের দেওয়াল থেকে - সরাসরি আক্রমণ করবে বোধ হয়।

দড়ি ধরে হ্যাঁচকা টান দিল জনসন। ধ্বসে পড়ল একফুট পুরু তুষার ছাদ—খুঁটির মাথায় দৃশ্যমান হল মরা শেয়ালটা।

প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিল ভালুক পাঁচটা। পরক্ষণেই একযোগে লাফিয়ে পড়ল শেয়ালের ওপর।

তৎক্ষণাৎ হাঁক শোনা গেল জনসনের—"ফায়ার!"

ব্যাটারীর পাশেই বসেছিলেন ডক্টর। ইলেকট্রিক কারেণ্ট চালু করে দিলেন সুইচ টিপে। তৎক্ষণাৎ প্রলয়ংকর বিস্ফোরণে থরথরিয়ে কেঁপে উঠল ডক্টর হাউস, বারুদঘর, ভাঁড়ার ঘর। ফাটল ধরল দেওয়ালে। সুড়ঙ্গের প্রান্তে ছত্রাকারে শূন্যে ঠিকরে গেল তালতাল ধোঁয়া।

"হুররে···হুররে·· হুররে' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে বন্দুক হাতে সবাই বেরিয়ে এলেন বাইরে। কিন্তু আর গুলি খরচ করার দরকার হল না। দেখা গেল, চারটি ভালুকের খণ্ডবিখণ্ড বারুদ কালো আগুনে ঝলসানো দেহ ঠিকরে রয়েছে চারিদিকে এবং পঞ্চম ভালুকটা সর্বাঙ্গে দগ্ধক্ষত নিয়ে উল্কাবেগে ছুটছে দিগন্ত অভিমুখে।

"হুররে…হুররে…হুররে!" আবার সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন ডক্টরের চার সঙ্গী। ঘেউ-ঘেউ-ঘেউ-ঘেউ করে গলা মেলালো ডাক।

১৪ ॥ মেরু বসন্ত

পরের দিন ধাঁ করে তাপমাত্রা উঠে গেল শূন্য তাপাংকের পনেরো ডিগ্রী ওপরে। দিন কয়েক অব্যাহত রইল এই তাপমাত্রা। ফলে, বরফে ফাটল ধরল, পাথরের ফাঁক দিয়ে নোনা জলের ফোয়ারা ছিটকে উঠল, দিন কয়েক পরেই প্রচণ্ড বৃষ্টি হল। কুয়াশায় ঢেকে গেল চারিদিক। তার মধ্যে দিয়েই শোনা গেল হরেক রকম পাখীর ডাক। কোথায় ঘাপটি মেরেছিল অ্যাদ্দিন— এখন দলে দলে উড়ছে আকাশে। জমির ওপরেও যেন মন্ত্রবলে আবির্ভূত হল হরেক রকম প্রাণী। মেরু ইঁদুর পর্যন্ত গর্ত দিয়ে উঁকি মারল বাইরে।

নিরীহ প্রাণীদের সঙ্গে হানা দিতে লাগল নেকড়ের দল। মেরু-নেকড়েরা হাঁকডাক দেয় অবিকল কুকুরের গলায়– অভিজ্ঞতা না থাকলে নেকড়ের উদরেই যেতে হত অভিযাত্রীদের। এমন কি ডাক পর্যন্ত পূর্ব অভিজ্ঞতার দরুন যত্র তত্র বিচরণ বন্ধ করে দিল।

দিন পনেরো ভালই গেল টাটকা মাংস খেয়ে। তাপমাত্রা উঠল শূন্য তাপাংকের ৩২ ডিগ্রী ওপরে। তারপরেই আচম্বিতে একদিন ধেয়ে এল উত্তুরে হাওয়া। রাতারাতি তাপমাত্রা নেমে গেল শূন্য তাপাংকের ৮ ডিগ্রী নীচে। বরফ আবরণে ঢেকে গেল দিকদিগন্ত, ভোজবাজীর মত মিলিয়ে গেল পশুপাখীর দল।

"ভয় নেই," অভয় দিয়ে বললেন ডক্টর—"প্রতি বছর ১১ই, ১২ই, ১৩ই মে এমনি করে ধাঁ করে শীত ফিরে আসে—আবার কেটে যায়।"

"কেন?" প্রশ্ন করল আলটামণ্ট।

"কারণ দুটো হতে পারে। হয়ত, বছরের এই দিনে সূর্য আর পৃথিবীর মাঝে এক ঝাঁক গ্রহাণু এসে পড়ে। অথবা বরফ গলতে থাকায় তাপমাত্রা শুষে নিয়ে শীতকে ডেকে আনে।"

২৫শে মে পর্যন্ত কাটল একঘেয়ে ভাবে। এর মধ্যে ডিপথেরিয়া হল বেলের। স্রেফ বরফ চিকিৎসা করে ফোলা টনসিল কমিয়ে দিলেন ডক্টর। ছোট ছোট বরফের টুকরো রাখতেন মুখের মধ্যে—কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠল বেল।

ডক্টর বললেন– "এ জায়গায় ডিপথেরিয়া হয়—চিকিৎসাও হয় এইভাবে।"

ঘরের মধ্যে বন্দী থাকার সময়ে একদিন ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসকে আলাদা ডেকে ডক্টর বললেন—"আপনি যখন আমাকে বন্ধু হিসেবে নিয়েছেন, তখন বন্ধুর মর্যাদা দিন। আমার একটা কথা রাখুন।"

"বলুন।"

"আব দিন কয়েক পরেই বরফ গলে যাবে। শোনা কথা যদি সত্যি হয়, খোলা সমুদ্র পথ আটকে দাঁড়াবে। মেরু বিন্দুতে পৌঁছোতে হলে নৌকো চাই-ই চাই।"

তেলেবেগুনে জলে উঠলেন ক্যাপ্টেন—"আমেরিকান কাঠের নৌকো?"

"ক্যাপ্টেন, আপনাব বাগ তো কাঠেব ওপব নয়—লোকটাব ওপব।"

"তা ঠিক। ও আগাগোড়া মিথ্যে বলছে। ওর মতলব অন্য। দেখলেন না স্বমূর্তি ধরল জায়গা জমির নামকরণেব সময়।"

"তাহলে কি ফিরে যাবো?"

ক্ষণেক নীরব থেকে বললেন হ্যাটেরাস—"ও যদি কাঠ না দেয়?"

আলটামণ্টকে ডাকলেন ডক্টর। এক কথায় সে বললে—"নিশ্চয় দেব। পরপয়েজ দিয়েই নৌকো বানাব। নিউ আমেবিকা কদ্দূর গেছে নইলে দেখব কি করে?"

১৫ ॥ নর্থওয়েস্ট প্যাসেজ

শেষ পর্যন্ত ঝগড়া ঠেকানো গেল না দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে।

মে মাসের শেষের দিকে ঠাণ্ডা কমে গেল, তাপমাত্রা ফের শূন্য তাপাংকের ওপরে উঠল, ফের বরফ গলা জলের ধারা নামল, ফোয়ারা উঠল, ফাটল ধরল বরফে।

এই সময়ে একদিন অভিযাত্রীদের মধ্যে কথা হচ্ছিল আরো উত্তরে অভিযান নিয়ে। আলটামণ্ট বলে বসল—"আমরা যেখানেই যাই না কেন, ফিবে আসার পথের কথাও ভাবতে হবে।"

"ফিরে আসার কথা তো এখন হচ্ছে না", ঝটিতি বললেন হ্যাটেরাস।

"কিন্তু যেখানে যাচ্ছি, সেখান থেকে ফিরতে তো হবেই", আলটামণ্ট বলল ঠাণ্ডা ভাবে।

"সেটা কোথায়?" সটান প্রশ্ন করলেন হ্যাটেরাস এবং এই প্রথম আসল প্রশ্ন নিয়ে মুখোমুখি হলেন আলটামণ্টের।

ডক্টর কাঠ হয়ে গেলেন উৎকণ্ঠায়। আলটামণ্ট সহজভাবে বললে—

"যেখানে যাচ্ছি, সেইখানে। তারপর ফিরতে হবে নর্থওয়েস্ট প্যাসেজ দিয়ে—আজ পর্যন্ত যা অনাবিষ্কৃত।"

"ভুল বললেন," বাধা দিলেন হ্যাটেরাস।

"আপনি যা জানেন না, তা বলবেন না", শক্ত গলায় জবাব দিলে আলটামণ্ট। ইতিহাস থেকে অনেক নজীর তুলে প্রমাণ করে দিল নর্থওয়েস্ট প্যাসেজে আজও কেউ পৌঁছোতে পারেনি। "পারব কেবল আমি—আমার তৈরী লম্বা নৌকো বেয়ে—কারণ সেখানে জল আছে—বরফ নেই।"

আলটামণ্টের অভিপ্রায় বুঝে ডক্টর বললেন—"এ কিন্তু আপনার অন্যায়। ছেলেমানুষের মত কথা বলছেন আপনি।"

"তাতো বলবেনই", সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল আলটামণ্ট। "আপনারা যে চারজন—আমি একা।"

"সুতরাং সেইভাবে কথা বলুন", বললেন হ্যাটেরাস।

"আপনার হুকুমে ?"

"হ্যাঁ, আমার হুকুমে।"

"আমি কি তাহলে আপনার অধীন ?"

"বলাবাহুল্য।"

আলটামণ্ট আর কথা বাড়াল না। শিস দিয়ে আমেরিকাব জাতীয় সঙ্গীত 'ইয়াঙ্কি ডুডল্' গাইতে গাইতে শুয়ে পড়ল বিছানায়। হ্যাটেরাসও আর কথা বললেন না। ঘণ্টাখানেক বাইরেব হাওয়া খেয়ে এসে ঢুকলেন কম্বলের মধ্যে।

১৬॥ মেরু কানন

২৯শে মে সূর্য আর পাটে গেল না। দিগন্ত ঘেঁসে ঘসটে গেল। শুরু হল চব্বিশঘণ্টা ব্যাপী দিনের পালা।

পশুপাখীরা আবার ফিরে এসেছে। আবার কিচির মিচির শুরু হয়েছে। নোনা জলের সঙ্গে বরফ জল মিশে বিচ্ছিরি রকমের প্যাচপেচে কাদায় হাঁটা দায়—মেরু অভিযাত্রীদের ভাষায় এই কাদার নাম স্লাশ। তাপমাত্রা আরো বেড়েছে। ডক্টর শংকিত হলেন একদিন শূন্য তাপাংকের ৫৭ ডিগ্রী উর্ধ্বে পারা উঠতে দেখে। ডক্টর হাউস গলতে শুরু করেছে! মেরামত করতে হচ্ছে যখন তখন।

নৌকো তৈরী নিয়ে ব্যস্ত বেল আর জনসন। ফাঁকে ফাঁকে বল্গা হরিণ

শিকার করছে জনসন মেরুবাসীদের কায়দায়। বুকে হেঁটে এগিয়ে যায় বরফের ওপর দিয়ে—দুহাত তোলা থাকে শূন্যে—এক হাতে বন্দুক। বোকা বল্গা হরিণ ভাবে তাদের জাত ভাই—ছুটে পালায় না। তারপরেই ধমক দেয় বন্দুক—খতম হয় হরিণ।

একদিন সদলবলে সবাই শিকার করতে বেরোলেন। কিন্তু পায়ের কাছে যখন খরগোস এসে লুকোচুরি খেলতে লাগল, ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী ডক্টরের গায়ে মাথায় এসে বসল, বল্গা হরিণরা নিঃশংকচিত্তে মুখ নামিয়ে বরফের ফাঁকে জমা শ্যাওলা খেতে লাগল—মৃগয়ার নেশা ছুটে গেল প্রত্যেকেরই মন থেকে। কি হবে খামোকা প্রাণী হত্যা করে? মাংস তো ঢের রয়েছে। এরা কোনোদিন মানুষ দেখেনি—মানুষ দেখে তাই ভয় পেতেও শেখেনি! ভয় পাইয়ে কোনো লাভ আছে কি?

মনোরম মেরু কাননে তাই বন্দুক কাঁধে সবাই অনাবিল আনন্দ কুড়িয়ে ফিরে এল ডক্টর হাউসে।

১৭॥ আলটামণ্ট প্রতিশোধ নিল

আর একদিন শিকারে বেরিয়ে দূর থেকে ডাক তেড়ে গেল দুটো অদ্ভুত প্রাণীর দিকে। মাটির খাঁজে আটকানো গোলাপী শ্যাওলা খাচ্ছিল চতুষ্পদ জীব দুটো। মাথার শিংজোড়া গোড়ার দিকে বেজায় চওড়া। পশু মুখের মত লম্বাটে মুখ নয় মোটেই। ছোট্ট ল্যাজ। সারা গায়ে পুরু লোম এবং খুব মিহি বাদামী চুল।

দেখেই চিনলেন ডক্টর ক্লবোনি। কস্তূরী-ষণ্ড। যেন দু-ধরনের দুটি প্রাণীর যোগফল। মাংস অতি উপাদেয়—কস্তূরী গন্ধ সুরভিত বলে। কিন্তু ধরা খুব মুস্কিল।

ডাক তেড়ে যাওয়ায় অবাক হয়ে চেয়েছিল ষণ্ড যুগল। এখন দু পেয়ে তিনটে মানুষকে ছুটে আসতে দেখে ভোঁ দৌড় দিল উল্টো দিকে। আলটামণ্টের জিভ বেরিয়ে গেল ছুটতে ছুটতে—খাটো ল্যাজের ডগাও ধরতে পারল না।

হাঁপাতে হাঁপাতে তিনজনে একত্র হয়ে ঠিক করলে, এভাবে হবে না—তিন দিক থেকে ঘিরে ধরে পালাবার পথ বন্ধ করতে হবে কস্তূরী-ষণ্ডর।

মতলব মাফিক তিনজনে তিন দিক দিয়ে পা টিপে টিপে এগিয়ে এল ষণ্ড যুগলের দিকে। তারপরেই হ্যাটেরাস হৈ-হৈ করে একাই তেড়ে গেল সামনে—উদ্দেশ্য ছিল ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে আনা।

কিন্তু ফল হল উল্টো। একজন মাত্র শত্রু দেখে ঘুরে দাঁড়াল একটি ষণ্ড এবং সটান ধেয়ে গেল হ্যাটেরাসের পানে।

উদ্দেশ্য শুভ নয় বুঝে গুলি করলেন হ্যাটেরাস—গুলি কপালে লাগল—তবুও ভীমবেগে ধেয়ে গেল সামনে। দ্বিতীয়বার গুলিবর্ষণ করলেন ক্যাপ্টেন। এবার গুলির আওয়াজে দ্বিতীয় ষণ্ডটিও খেপে গিয়ে একযোগে আক্রমণ করল হ্যাটেরাসকে এবং চক্ষের পলকে তাঁকে পেড়ে ফেলল মাটির ওপর।

দমআটকানো কণ্ঠে বললেন ডক্টর—"সবশেষ!"

কথার সুরে নিঃসীম নৈরাশ্য শুনেই ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মত আলটামণ্ট ছিটকে গেল সামনে—পরক্ষণেই থমকে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবল—পরম শত্রুর বিপদে তার কী? মুহূর্তের মধ্যে মনস্থির করে নিয়ে জ্যামুক্ত তীরের মত ফের ছুটে গেল সামনে।

হ্যাটেরাস দেখলেন যাকে তিনি চোখের বালি এবং পথের কাঁটা মনে করেছেন—সে বায়ু বেগে দৌড়ে আসছে তাঁকে বাঁচাতে। সেই মুহূর্তে ক্ষিপ্ত ষণ্ড দুটি পায়ের ক্ষুর আর মাথার শিং দিয়ে ছিন্নভিন্ন করতে যাচ্ছিল হ্যাটেরাসকে—

এমন সময়ে দড়াম করে একটা শব্দ হল। হ্যাটেরাসের মাথার ওপর দিয়ে শনশন করে গুলি গিয়ে মাটিতে শুইয়ে দিল একটা জানোয়ারকে। তাই দেখে অপর জানোয়ারটা আরো খেপে গিয়ে যেই শিং নামিয়ে গেঁথে ফেলতে যাচ্ছে হ্যাটেরাসকে অমনি লাফ দিয়ে সামনে আবির্ভূত হল আলটামণ্ট। ডানহাতের ছুরী সটান ঢুকিয়ে দিল ষণ্ডের মুখের মধ্যে—বাঁ হাতের কুঠারের এক কোপে দু-ফাঁক করে দিল মাথা। হ্যাটেরাসের পাশেই ধড়াস করে আছড়ে পড়ল গতায়ু কস্তুরী-ষণ্ড।

আচ্ছন্নের মত উঠে দাঁড়ালেন হ্যাটেরাস। হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন অভিভূত কণ্ঠে—"আমার প্রাণ বাঁচালেন আপনি।"

"আপনিও বাঁচিয়েছেন আমার", জবাব দিল আলটামণ্ট।

হাপরের মত হাঁপাতে হাঁপাতে পেছন থেকে ছুটে এলেন ডক্টর—"হ্যাটেরাস, হ্যাটেরাস—আলটামণ্ট আপনার মতই মানুষ—নির্ভীক, বেপরোয়া, ডানপিটে।"

"আমারই মত একই পথের যাত্রী—একই গৌরবের অংশীদার!"

"কিসের গৌরব? সুমেরু পৌঁছোনোর?" শুধোলো আলটামণ্ট।

"হ্যাঁ" বললেন ক্যাপ্টেন।

"তাহলে ঠিকই আঁচ করেছিলাম! অসম্ভবকে সম্ভব করতে চলেছেন আপনি!"

"আপনিও তো সেই পথের পথিক, নয় কী?" ঝটিতি শুধোলেন হ্যাটেরাস।

"আমি?" থমকে গেল আলটামণ্ট। তারপর বললে—"না, আমি বেরিয়েছি নর্থ ওয়েস্ট প্যাসেজের সন্ধানে।"

"আলটামণ্ট," হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন হ্যাটেরাস—"এসো ভাই, একসঙ্গে যাই সুমেরু বিজয়ে, একই গৌরবের অধিকারী হই সবাই।"

সেই দৃশ্য দেখে চোখে জল এসে গেল ডক্টরের। বললেন ধরা গলায় —"এই তো চাই। কি হবে জাতিগত বিদ্বেষ মনে পুষে রেখে? কে আমেরিকান, কে ইংরেজ তা জেনে লাভ কী? আমরা চাই অজানাকে জানতে, অসম্ভবকে সম্ভব করতে।"

উচ্ছ্বাস স্তিমিত হলে 'পর কস্তুরী-ষণ্ডের গা থেকে পাকা শল্যচিকিৎসকের মতো একশ পাউণ্ড সুস্বাদু মাংস কেটে নিয়ে বাড়ী ফিরেই হাঁকডাক দিয়ে বেল আর জনসনকে জড়ো করলেন ডক্টর ক্লবোনি।

বললেন হৃষ্টকণ্ঠে—"শিকারে বেরিয়েছিলাম একজন আমেরিকান আর একজন ইংরেজকে নিয়ে। তাই তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"ফিরে এসেছি দুই ভাইকে নিয়ে।"

পরমানন্দে সবাই করমর্দন করলেন আলটামণ্টের সঙ্গে। ডক্টর সবিস্তারে বললেন প্রাণ তুচ্ছ করেও কিভাবে ইংরেজ হ্যাটেরাসকে বাঁচিয়েছে আমেরিকান আলটামণ্ট।

১৮॥ চরম প্রস্তুতি

ঠিক হল, ২৫শে জুন রওনা হতে হবে—বরফ পুরোপুরি গলে যাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে রাজী নন হ্যাটেরাস।

বিশে জুন আধবেলার জন্যে নৌকো চালিয়ে পরীক্ষা করে এল জনসন। বরফ ফেটে সমুদ্রের মাঝে খাঁড়ি দেখা দিয়েছিল বলেই নৌকো নিয়ে যাওয়া সম্ভব হল। ফেরবার পথে দেখা গেল আশ্চর্য এক দৃশ্য।

বরফের মাঝে একটা গর্তর পাশে ওৎ পেতে বসে আছে একটা ভালুক। এত তন্ময় হয়ে বসে আছে যে নৌকো এবং আরোহীকে দেখতেই পেল না—পেলে অনর্থ ঘটত নিশ্চয়।

গর্তটার মধ্যে নিশ্চয় সীল মাছ ডুব দিয়েছে। দুই থাবা দিয়ে গর্ত ঘিরে ভালুক তাই বসে আছে অনড় দেহে। আচম্বিতে জলপৃষ্ঠ চঞ্চল হল, মুখ তুলল

একটি সীল মাছ। চক্ষের নিমেষে তুই থাবা দিয়ে স্প্রিংয়ের সাঁড়াশীর মত খামচে ধরল মুণ্ডটা এবং হ্যাঁচকা টানে তুলে এনে ফেলল বরফের ওপর।

তারপরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। বুকে পিষেই সীল বধ করল ভালুক এবং মরা সীলকে হাল্কা সোলার মত অবলীলাক্রমে টেনে নিয়ে লাফাতে লাফাতে মিলিয়ে গেল দিগন্তে।

ডক্টর স্লেজ মেরামত করে জিনিসপত্র চাপালেন তাতে। নৌকো, খাবারদাবার, গুলি-বারুদ, যন্ত্রপাতি নিয়ে মোট দেড় হাজার পাউণ্ড বোঝা চাপানো হল। চারটে কুকুর টানবে এই বোঝা। রোজ ১২ মাইল গেলে ৩৬০ মাইল পথ পাড়ি দিতে লাগবে একটি মাস।

১৯॥ উত্তরে যাত্রা

২৪শে জুন সকাল হতে না হতেই বেরিয়ে পড়ল অভিযাত্রীরা। পথ বেশ মসৃণ। সমতলভূমির ওপর কঠিন বরফের আচ্ছাদন। বিনা-বাধায় এগিয়ে চলল স্লেজ।

ডক্টর বার বার কম্পাস দিয়ে দিক নির্ণয়ের ঝামেলা এড়িয়ে গেলেন নতুন একটি পন্থায়। আবহাওয়া পরিষ্কার এবং রাস্তা সমান থাকলে কম্পাস দিয়ে দেখে নিচ্ছেন সোজা উত্তরের বিশেষ কোনো বস্তুকে। তারপর কোনোদিকে না বেঁকে এগোচ্ছেন সেইদিকে। সেখানে পৌঁছে আবার মাইল কয়েক উত্তরে লক্ষ্য করছেন আর একটি বস্তুকে। ফলে এগিয়ে চলেছেন সোজা সরল রেখায়।

তৃতীয় দিনে পথিমধ্যে একটি হ্রদ পড়ল। গ্রীষ্মের গরম এখানে পৌঁছোয় না কোনো কালে। বরফও গলে না। জমাট হ্রদপৃষ্ঠের ওপর দিয়ে স্লেজ নিয়ে এল অভিযাত্রীরা।

ভূপ্রকৃতির চেহারা দেখে ডক্টর বুঝলেন, নিউ আমেরিকা নিছক দ্বীপ—মেরুবিন্দু পর্যন্ত এর বিস্তৃতি নেই। তাই ক্রমশঃ ঢালু হয়ে নামছে নীচের দিকে।

২৮শে জুন তাপমাত্রা পৌঁছোলো ৪৫ ডিগ্রীতে। সেই সঙ্গে নামল প্রচণ্ড বৃষ্টি। স্বস্তির নিঃশ্বেস ফেলল সবাই—বৃষ্টির জলে পথ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে যাবে, কুয়াশা কেটে যাবে।

২৯শে জুন একটা শেয়াল বধ করল বেল।

৩০শে জুন ঝড় উঠল। মড়মড় শব্দে আশপাশে বরফ ভাঙতে লাগল। বরফ ভাঙছে, গলছে, সরে যাচ্ছে।

মেরুঅঞ্চলে হিমবাহের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল অসম্ভব দ্রুত গতি। কামানের গোলার চাইতে দ্রুতবেগে চক্ষের নিমেষে নেমে আসে হিমবাহ—পাল্টে দিয়ে যায় পথপ্রকৃতি। রাতারাতি দৃশ্যপট পালটে যায় দারুণ ঠাণ্ডায়—জল জমে বরফ হয়ে যায়—আয়তনে বেড়ে ফাটিয়ে চৌচির করে দেয় আশপাশের বাধা। কোথাও অকস্মাৎ গরমে পাহাড় মিলিয়ে গিয়ে দেখা যায় সমতলভূমি—এরকম দৃশ্য বার কয়েক ঘটল অভিযাত্রীদের বিস্মিত দৃষ্টির সামনেই।

এত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও কোনো দুর্ঘটনা ঘটল না। ৩রা জুলাই পায়ের তলায় লাল তুষার দেখে বিস্মিত হল অভিযাত্রীরা। অবাক হলেন না কেবল ক্লবোনি। তিনি বললেন, বরফটা আসলে সাদা—কিন্তু একবর্গ সেন্টিমিটারে প্রায় ৪৩০০০টি বিশেষ ধরনের ছত্রাক থাকার ফলে দেখতে লালরঙের। পায়ের তলায় বরফগলা দেখলে মনে হয় যেন রক্ত নদীর ধারা বইছে। ৯ ফুট পুরু লাল বরফ দিয়ে মোড়া মাইল কয়েক অঞ্চল। ছত্রাকের মোট সংখ্যাটা তাহলে নিতান্ত কম নয়।

দু বোতল লাল বরফ তুলে সংগ্রহশালায় রাখলেন ডক্টর ক্লবোনি।

২০ ॥ বরফে পদচিহ্ন

৪ঠা জুলাই যাচ্ছেতাই রকমের কুয়াশায় মন্থর গতিতে পথ চলতে হল অভিযাত্রীদের। ঘন ঘন কম্পাস দেখতে হল পাছে পথ গুলিয়ে যায়। কপাল ভাল, তেমন কিছু দুর্ঘটনা ঘটল না। শুধু যা পাথরে হোঁচট খেয়ে তুষার-জুতো ছিঁড়ে ফেলল বেল এবং সে জুতো শেষ পর্যন্ত ফেলেই দিতে হল।

গাঢ় কালচে কুয়াশার দাপট রইল ৬ই জুলাই পযন্ত। তারপরেই হঠাৎ উত্তরে হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে গেল বিদিগিচ্ছিরি সেই কুয়াশাকে।

পথের হিসেব নিয়ে ডক্টর দেখলেন, কুয়াশার জন্যে দৈনিক ৮ মাইলের বেশী এগোনো যায় নি। সুতরাং ৬ই জুলাই বেশী পথ যাওয়ার জন্যে ভোর হতে না হতেই রওনা হল সবাই। আলটামণ্ট আর বেল ডাককে নিয়ে এগিয়ে গেল মাইল দুই সামনে—রাস্তা দেখবার জন্যে এবং শিকার পেলে বধ করার জন্যে।

পরিষ্কার আবহাওয়ায় দুমাইল পেছন থেকেও ওদের স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন ডক্টর। তাই অবাক হয়ে গেলেন ওদের কিংকর্তব্যবিমূঢ় আচরণ দেখে।

হঠাৎ হেঁট হয়ে জমির ওপর কি যেন দেখল আলটামণ্ট আর বেল। পরক্ষণেই চোখ তুলে দিগন্ত পর্যন্ত চেয়ে রইল কিছু একটা দেখার প্রত্যাশায়।

কিন্তু কেন? কি দেখেছে জমির ওপর আলটামণ্ট?

দৌড়ে গেলেন ডক্টর। গিয়ে যা দেখলেন, তাতে আক্কেলগুড়ুম হয়ে গেল তাঁরও।

জমির ওপব বুটপরা একজোড়া পায়ের ছাপের দাবি এবং সে বুট ইউরোপীয় বুট!

হতভম্ব হয়ে গেলেন অভিযাত্রীরা! বিড় বিড় করতে লাগলেন হ্যাটেরাস। বিজন দেশে কারা এসেছে তাঁর আগে?

পদচিহ্ন অনুসরণ করলেন সবাই। মাইলখানেক গিয়ে পশ্চিমে মোড় নিল বুট পরা পায়ের ছাপ। ডক্টর দ্বিধায় পলেন। আর যাওয়া ঠিক হবে কি?

হেঁকে উঠলেন হ্যাটেরাস—"সামনে চলুন! সামনে চলুন—উত্তরে!"

আচমকা চেঁচিয়ে উঠলেন ডক্টর—"এ কী! এটা কোত্থেকে এল!"

একটা পকেট টেলিস্কোপের লেন্স পড়ে বরফের ওরর!

ভড়কে গিয়ে জনসন বললে—"কোত্থেকে এই আপদ এল কে জানে! মেরুবিন্দু পৌঁছে দেখব আগেভাগেই আর একজন বসে আছে সেখানে।" অস্বস্তিতে ভরে গেল প্রত্যেকেরই মন

রাত্রে আবার সগর্জনে ধেয়ে এল ঝড়। উন্মুক্ত প্রান্তরে ঝড়ে তাঁবু খাটানো সম্ভব নয় বলে একটা খাদের মধ্যে গিঁয়ে তাঁবু খাটিয়ে বসল অভিযাত্রীরা। উৎকণ্ঠায় কাঠ হয়ে থাকতে হল সমস্ত রাত্রি। ঝড়ের গর্জন বেড়ে উঠলেই কথা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল প্রত্যে‍‍কেরই—না জাতি মাথার ওপর কি ভেঙে পড়ে।

ভোর রাতে কমে এল ঝড়। আলো ফুটতেই ডক্টর, হ্যাটেরাস আর জনসন গিয়ে উঠলেন তিনশ ফুট উঁচু একটা পাহাড়ে। চমৎকৃত হলেন দৃশ্যপটের অকস্মাৎ পরিবর্তন দেখে।

কুয়াশা পালিয়েছে। বরফ উধাও হয়েছে। ঝড় ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছে শীতের আবর্জনা—এনেছে বসন্তের সমারোহ। মাটি দেখা যাচ্ছে, খোঁচা খোঁচা ধারালো পাথর দেখা যাচ্ছে, আর দূরে উত্তরে কালচে বাষ্পর মত কি যেন দেখা যাচ্ছে।

"সমুদ্র মনে হচ্ছে," বললেন ডক্টর।

"হ্যাঁ, সমুদ্র," সায় দিল জনসন—"ঐ হল খোলা সমুদ্রের চেহারা। ঐ রকম রঙ আর কোথাও দেখা যায় না।"

উত্তেজিত কণ্ঠে আদেশ দিলেন হ্যাটেরাস—"স্লেজ বার করুন—তাঁবু তুলুন —আর দেরী নয়—চলুন খোলা সমুদ্রে!"

হুড়মুড় করে সবাই নেমে এল খাদের মধ্যে। পথিমধ্যে গতদিনের মত পদচিহ্ন আর চোখে পড়ল না। তিনঘণ্টা পরে অভিযাত্রীরা এসে পৌঁছোলো সমুদ্র উপকূলে।

"সমুদ্র! সমুদ্র!" সেকি চীৎকার সকলের।

"শুধু সমুদ্র নয়—খোলা সমুদ্র!" বললেন ক্যাপ্টেন।

খোলা সমুদ্রই বটে। দ্বীপ বা স্থলভাগের চিহ্ন নেই দূর দিগন্তে। যতদূর চোখ যায় উত্তরে—কেবল জল আর জল। এই সেই বহুশ্রুত মেরু-গামলা—কমলালেবুর মত মেরুবিন্দুতে পৃথিবীটা টেপা থাকায় গামলার মত গহ্বরে সৃষ্টি হয়েছে সমুদ্রের। ডাইনে আর বাঁয়ে দুটো অন্তরীপ সমুদ্রর ভেতর পর্যন্ত সরু হয়ে নেমে গিয়েছে। উত্তাল ঢেউ সগর্জনে আছড়ে পড়ছে সেখানে। কিন্তু দুই অন্তরীপের মাঝের জল শান্ত- যেন একটা উপসাগর। প্রকৃতি নিজে পাথর কেটে একটা জেটিও বানিয়ে রেখেছেন সেখানে। শীতের সময়ে নিশ্চয় বরফ জমেছিল সেখানে—এখন নেই। বড় বড় বরফের টুকরো ভাসছে জলে। ঝড়ের দাপটে নোঙর তুলে যেন হিমশিলারা পাড়ি জমিয়েছে উত্তাল সমুদ্রে।

সারাদিন গেল নৌকো জলে ভাসাতে। বিকেল পাঁচটা নাগাদ মাস্তলের পাল ফুলে উঠল। স্লেজটা টুকরো করে তোলা হয়েছে নৌকোয়—বাকী আছে কেবল তাঁবুটা।

যন্ত্রপাতি নিয়ে উপকূল আর সমুদ্র সম্বন্ধে বিবিধ তথ্য আহরণ করে এলেন ডক্টর।

জেটির নামকরণ করলেন আমেরিকান বন্ধুর নামে— আলটামণ্ট বন্দর!

২১॥ খোলা সমুদ্র

পরের দিন সকাল আটটার মধ্যেই তাঁবু গুটিয়ে তুলে ফেলা হল নৌকোয়। ডক্টরের মন তখনও খুঁত খুঁত করছে রহস্যজনক সেই বুটপরা পদচিহ্ন নিয়ে। পায়ের অধিকারী সমুদ্র উপকূলে হাজির হয়নি তো?

সন্দেহ ভঞ্জন করার জন্যে একাই উঠে গেলেন একটা টিলার ওপরে।

পকেট টেলিস্কোপ চোখে লাগালেন শেষবারের মত চারদিক দেখে নেওয়ার জন্যে। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলেন না—কাছের জিনিসও দেখতে পেলেন না। এ আবার কি রহস্য?

ঘাবড়ে গিয়ে টেলিস্কোপটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেই আঁৎকে উঠলেন ডক্টর। পরক্ষণেই "হ্যাটেরাস, হ্যাটেরাস" বলে চেঁচাতে চেঁচাতে পাঁই পাঁই করে দৌড়ে নেমে এলেন টিলা বেয়ে। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন—"হ্যাটেরাস! হ্যাটেরাস! দিন কয়েক আগে সেই পায়ের ছাপ দেখেছিলাম মনে পড়ে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ।"

"বুটটা কার জানেন?"

"কার?"

"বেলের! আর টেলিস্কোপের লেন্সটা আমার!"

বড় বড় চোখ করে চেয়ে রইলেন হ্যাটেরাস। পরক্ষণেই হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়লেন সকলেই। কুয়াশায় পথ হারিয়ে নিজেরাই এক চক্কর ঘুরে এসেছেন—বেলের পায়ে তুষার-জুতো না থাকায় বুটের ছাপ পড়েছে বরফে—ডক্টরের পকেট টেলিস্কোপের লেন্স খসে পড়েছে তখুনি। পরের দিন উৎকণ্ঠায় খামোকা কাঠ হয়ে গিয়েছেন নিজেরাই।

হাসতে হাসতে উঠে বসল সকলে নৌকোয়। সেদিন ১০ই জুলাই বুধবার। মেরুবিন্দু এখান থেকে আর মাত্র ১৭৫ মাইল উত্তরে।

জলের ছোট ছোট ঢেউ দেখে ডক্টর বললেন—"ছোট সমুদ্র মনে হচ্ছে।"

সায় দিলেন হ্যাটেরাস। বড় সমুদ্র হলে বড় ঢেউ উঠত।

ছোট হলেও সমুদ্রের চেহারা এখানে অদ্ভুত সুন্দর। ঠিক যেন একটা প্রকাণ্ড মৎস্যাধার। অব্যাখ্যাত বৈদ্যুতিক কারণে সমুদ্রতল আলোকিত হয়ে রয়েছে এবং টলটলে জলের সব কিছুই জলের ওপর থেকে দেখা যাচ্ছে। নৌকো যেন একটা নিতল গহ্বরের ওপর শূন্যে ভাসছে।

মাথার ওপর উড়ছে এবং জলের ওপর ডানা ঝাপটাচ্ছে জানা এবং অজানা বিস্তর পাখী। আকারে প্রত্যেকেই বিরাট। ডানা মেললে বিশ ফুট পর্যন্ত বিস্তার এক-একটা পাখীর। তাদের মধ্যে অ্যালবেট্রস আছে, পেঙ্গুইনও আছে—শুধু যা আকারে দানবিক।

জলতলে চোখ নামালেন ডক্টর। তাঁর মত প্রকৃতিবিদও পাখীদের চিনতে পারেন নি। জলের জীবদের দেখেও ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেন। তিরিশ-ফুট জায়গা জুড়ে ভাসতে দেখলেন একটা জেলী ফিশকে—ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে উড়ন্ত পাখীরা। অথচ গ্রীনল্যাণ্ডে সমুদ্রে এই জেলী ফিশরা আকারে এত

শুধু যে ছুই বর্গমাইলে তাদের মোট সংখ্যা ২৩,৮৯৮,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০! সংখ্যাটা কল্পনা করাও কঠিন বলে একজন ইংরেজ তিমি শিকারী বলেছিল, সৃষ্টির শুরু থেকে ৮০,০০০ মানুষ তাদের গুণতে শুরু করলেও গোনা শেষ হত না আজও!

জলের মধ্যে খড়্গ উঁচিয়ে ছুটছে নারহোয়াল। ফোয়ারা ছাড়ছে অগুন্তি তিমি। মন্থরগতি সাদা তিমি মুখব্যাদান করে খেয়ে চলেছে জলজ উদ্ভিদ।

আশ্চর্য এই দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে মরাল গতিতে এগিয়ে চলল নৌকো। ক্রমে রাত নামল। অমনি ভোজবাজীর মত মিলিয়ে গেল আকাশের পাখীরা, থেমে গেল কলরব, সরে গেল জলের জীবরা।

গেল কোথায়? কে জানে!

শান্ত স্তব্ধ সমুদ্রে ভেসে চলল শুধু অভিযাত্রীদের নৌকো।

পরের দিন সকালে পেছনে নিউ আমেরিকার চিহ্ন দেখা গেল না। সামনে ডাঙার চেহারাও দেখা গেল না। হ্যাটেরাস পলকহীন চোখে অপরিসীম ধৈর্য নিয়ে চেয়ে রইলেন সেই দিকে।

২২॥ মেরু বিন্দুর দিকে

অনিশ্চিত অবস্থায় সময় গড়িয়ে চলল অসহ্য উৎকণ্ঠার মধ্যে। ডাঙার চিহ্ন নেই উত্তরে—জল আর আকাশ ছাড়া কিছুই চোখে পড়ছে না। হ্যাটেরাস কিন্তু নিমেষহীন নয়নে চেয়ে আছেন সেইদিকে।

সন্ধ্যে ছটা নাগাদ সহসা আবছা কুয়াশার মত কি যেন দেখা গেল উত্তর দিগন্তে।

আকাশ পরিষ্কার—সুতরাং জিনিসটা মেঘ নয় নিশ্চয়। প্রখর চোখে চেয়ে রইলেন ক্যাপ্টেন। টেলিস্কোপের মধ্যে দিয়ে পুরো একটি ঘণ্টা নিরীক্ষণ করলেন দিগ্‌রেখা।

তারপর হঠাৎ হাত বাড়িয়ে চীৎকার করে উঠলেন গগন বিদারী কণ্ঠে —"ডাঙা! ডাঙা।"

"হ্যাঁ! হ্যাঁ! ডাঙা!" সায় দিলেন ডক্টর। জনসনও।

আলটামণ্ট কিন্তু বললেন—"দূর! মেঘ মনে হচ্ছে।"

"না, না, ডাঙা!" হ্যাটেরাস একরোখা কণ্ঠে চেঁচিয়ে চললেন সমানে। অবশেষে আরো স্পষ্ট হল সেই কুহেলী। মাইল পঁচিশ উত্তরে সত্যিই হয় ডাঙা, নয় ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। সেই সঙ্গে স্ফুলিঙ্গ।

চমকে উঠলেন ডক্টর—"আরে সর্বনাশ! এ যে আগ্নেয়গিরি!"

"সুমেরুতে আগ্নেয়গিরি?" অবিশ্বাসের সুর আলটামণ্টের গলায়।

"অবাক হবার কি আছে? আইসল্যাণ্ড তো আগ্নেয়গিরি দিয়েই তৈরী। জেমস রস কুমেরু গিয়ে এরেবাস আর টেরর নামে দুটো আগ্নেয়গিরি আবিষ্কার করেন নি?"

নৌকো আরো নিকটবর্তী হল। কিন্তু কি বিভীষিকা আছে ঐ আগ্নেয়-পাহাড়ে? কেন ছোট মাছ থেকে আরম্ভ করে বিরাটকায় তিমি পর্যন্ত টলটলে জলের মধ্যে দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাচ্ছে উল্টোদিকে? পাণ্ডববর্জিত এই অঞ্চল ইতর প্রাণীদের পক্ষেও অনুকূল নয় কেন?

হ্যাটেরাসের ইচ্ছে ছিল জেগে থাকার। কিন্তু রাত নামল, নৌকো প্রশান্ত তরঙ্গে দুলতে লাগল দোলনার মত, শান্ত স্তব্ধ সেই পরিবেশে আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়লেন ক্যাপ্টেনের মত অতন্দ্রনয়ন মানুষও।

সেই অবসরে জলপাই রঙের একখণ্ড মেঘ উঠল দিল দিগন্তে এবং দেখতে দেখতে অন্ধকার হয়ে এল সমুদ্রপৃষ্ঠ। সেই সঙ্গে এল দামাল ঝড়। প্রকৃতি যেন রক্ষীদের পাঠিয়ে দিলেন দুর্গমেব অভিযাত্রীদের বাধা দিতে। যেন রুদ্রলীলার মাধ্যমে ওরা বলতে চাইল—আর এগিও না! ওখানে আজও মানুষ যায়নি—কেউ যায় না যেখানে—সেখানে যেও না!

কানে তালা লেগে গেল ঝড়ের হুহুংকারে। মোচার খোলার মত লম্বা নৌকো ছুটতে লাগল উত্তাল জল রাশির ওপর দিয়ে নক্ষত্র বেগে।

সারাদিন ওদের নিয়ে লোফালুফি খেলল ঝড় আর বৃষ্টি। সন্ধ্যে ছটা নাগাদ সহসা শান্ত হল সমুদ্র পৃষ্ঠ, পরিষ্কার হল আকাশ—রুদ্রপ্রকৃতিও যেন নিষিদ্ধ অঞ্চলকে সমীহ করে সরে গেল দূর হতে দূরে।

কুয়াশা এখনো কাটেনি, কিন্তু অদ্ভুত প্রভায় প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। নৌকো যেন ভেসে চলেছে বিদ্যুৎ আলোকে আলোকিত আশ্চর্য সুন্দর সমুদ্রের ওপর দিয়ে, আলো আছে—কিন্তু তাপ নেই। মাস্তুল, পাল, দড়িদড়া সবকিছু কৃষ্ণ-কালো রেখায় ফুটে রয়েছে আলোকময় বাতাসের পটভূমিকায়। যাত্রীরাও যেন আলোক সমুদ্রে অবগাহন করছেন। ঝড়ের কেন্দ্র বলেই বোধহয় এখানে এত আলোর খেলা, সমুদ্রও শান্ত।

হ্যাটেরাস কিন্তু বিহ্বল হয়ে থাকার পাত্র নন। শান্ত সমুদ্রে আলোক-কারাগারে বন্দী থাকার কোনো অভিলাষ তাঁর নেই। বাতাস নেই, পাল ঝুলে পড়েছে; তাই হুকুম দিলেন দাঁড় টেনে বেরিয়ে যেতে—আরো উত্তরে।

দাঁড়ের গায়ে আলোকস্ফুলিঙ্গ ছিটকে এল জল থেকে। দেখতে দেখতে

ফিকে হয়ে এল প্রদীপ্ত কুহেলী—আবার শোনা গেল ঝড়ের গর্জন—ফুলে উঠল পাল।

কম্পাস দেখে সোজা উত্তর অভিমুখে নৌকো চালালেন হ্যাটেরাস। এখনও হাওয়া তাঁকে দক্ষিণে ঠেলছে—উনি হাওয়ার সঙ্গে টক্কর দিয়ে উত্তরে চলেছেন। নৌকো ডুবুডুবু হচ্ছে—তবুও চলেছেন।

উপকূলের চিহ্ন অনুভূত হচ্ছে। বাতাসে অদ্ভুত আলোড়ন টের পাওয়া যাচ্ছে। আচমকা হাওয়ার ঝাপটায় যেন দুফাঁক হয়ে গেল কুয়াশার পর্দা এবং সেই ফাঁক দিয়ে ঝলসে উঠল লেলিহান অগ্নিশিখা—আকাশের দিকে লকলকে জিভ মেলে ধরে লাফ দিচ্ছে কল্পনাতীত অগ্নিদেব।

"আগুন-পাহাড়! আগুন-পাহাড়!" সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল অসহায় যাত্রীরা।

কিন্তু চকিতের জন্য দর্শন দান করেই ফের কুয়াশার জালে অদৃশ্য হয়ে গেল আগুন পাহাড়ের ভয়াবহ রূপ। আচম্বিতে কোত্থেকে ধেয়ে এল পাগলা ঝড়। নৌকোর ঝুঁটি ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল দক্ষিণ পশ্চিম দিকে।

অথচ উপকূল আর মাত্র তিন মাইল দূরে। নিঃসীম হতাশায় বুক চাপড়ানো কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন হ্যাটেরাস।

তৎক্ষণাৎ দাঁড় টেনে হাল ধরে নৌকোকে টেনে নিয়ে যেতে চাইলেন তীর অভিমুখে—কিন্তু ঝড়ের খপ্পর থেকে বেরোনো সম্ভব হল না কিছুতেই। একগাছি খড়ের মত জলের ওপর দিয়ে নক্ষত্রবেগে ডুবু ডুবু হয়ে ছুটল নৌকা।

সহসা অতি ভয়ংকর দৃশ্য দেখে শিহরিত হলেন অভিযাত্রীরা। দশ কেব্‌ল্‌, মানে, প্রায় হাজার ফ্যাদম দূরে একটা হিমবাহ উত্তাল তরঙ্গে ডুবু ডুবু হয়েও ফের লাফিয়ে উঠছে তরঙ্গশীর্ষে—যে কোনো মুহূর্তে উল্টে যাবে মনে হচ্ছে। সংঘর্ষ লাগলেই দেশলাইয়ের বাক্সের মত মচ করে ভেঙে যাবে নৌকো।

কিন্তু সেজন্যে বুক কাঁপেনি কারোর। কেঁপেছে হিমবাহর ওপর ভয়ে জড়োসড়ো এক দঙ্গল ভালুককে দেখে। ঝড়ের রক্ত জল করা গজরানির সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে তাদের গজরানি—রক্ত হিমকরা সেই আওয়াজ শুনলে স্থির থাকা যায় না কোনোমতেই। তার চাইতেও সর্বনেশে সম্ভাবনা হল, হিমবাহটি ডুবে গেলেই ভালুকের দল উঠে আসবে নৌকোর ওপর। মাঝে মাঝে হিমবাহর এত কাছে গিয়ে পৌছোলো নৌকো যে মনে হল এই বুঝি ওরা টুপ করে লাফ দিয়ে নেমে আসে অভিযাত্রীদের মাথায়। ভয়ে সিঁটিয়ে রইল গ্রীনল্যাণ্ড কুকুরগুলো—নির্বিকার রইল কেবল ডাক।

মিনিট পনেরো চলল এই ভয়ংকর সহযাত্রা। পাশাপাশি ছুটে চলল নৌকো আর হিমবাহ—কখনো খুব কাছে এল, কখনো দূরে সরে গেল। আগাগোড়া চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন হ্যাটেরাস এবং আর সকলে। ভয়ে বুক টিপটিপ করলেও করবার তো কিছুই নেই।

তারপর এক সময়ে হিমবাহ সরে গেল দূরে। মিলিয়ে গেল ঝড় আর ভালুক গর্জনের বিচিত্র ঐকতান। সহসা ফের ফুঁসে উঠল ঝড়। যেন চড় মেরে নৌকোটাকে পবনদেব ঠেলে দিল আর একদিকে এবং বন বন করে পাকসাট দিতে লাগল নৌকো।

ঘূর্ণী! সর্বনেশে ঘূর্ণীর মাঝে গিয়ে পড়েছে নৌকো। বন বন করে ঘুরতে ঘুরতে ক্রমশঃ ডুবে যাচ্ছে কেন্দ্রদেশে। সভয়ে উঠে দাঁড়াল পাঁচজনে। নৌকো এত জোরে ঘুরছে যে গলুইয়ের পাশে ফেনাগুলো মনে হচ্ছে স্থির হয়ে ভাসছে। ধীরে ধীরে নিতল গহ্বর থেকে একটা মহাশক্তি টান মেরে ওদের ডুবিয়ে দিচ্ছে অজ্ঞাত সমুদ্রে।

মাথা ঘুরছে সবার। আচম্বিতে পাকসাট খেতে খেতে খাড়া হয়ে গেল নৌকো। ঘূর্ণীর ওপর লম্বভাবে দাঁড়িয়ে গেল জলযান—তখন সেকেণ্ডে হাজার বার পাক খাচ্ছে নৌকো। অকল্পনীয় সেই ঘূর্ণনবেগের বিপুল শক্তিভরে নৌকোটা বৃত্তেব ট্যানজেন্টেব ওপব দিয়ে কামানের গোলাব মত ছিটকে বেরিয়ে গেল কেন্দ্র থেকে বাইরে।

আছড়ে পড়ল আলটামণ্ট, ডক্টর, জনসন আব বেল। উঠে দেখলে হ্যাটেরাস নেই।

তখন রাতদুটো।

২৩॥ ইংলণ্ডের ফ্ল্যাগ

কি দুর্দৈব! মেরুবিন্দুর এত কাছে এসেও জলে তলিয়ে গেলেন হ্যাটেরাস!

বিহ্বল কণ্ঠে কত ডাকাডাকি করলেন সঙ্গীরা, কিন্তু ঝড়ের অট্টহাসি ছাপিয়ে কোনো সাড়া ভেসে এল না। . করুণ কণ্ঠে কত বকম ভাবে মনিবকে ডাকল ডাক, লাফ দিয়ে জলেও পড়তে গেল—বেল জোর করে ধরে রাখল নৌকোর ওপর। বন্দুকের আওয়াজ করলেন ক্লবোনি—গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে গেলেন হ্যাটেরাসের নাম ধরে—কিন্তু বৃথা চেঁচামেচি। হ্যাটেরাস কি আর বেঁচে আছেন? ডাঙায় পৌঁছোনোর মত অবস্থাও তাঁর নেই। সঙ্গে দাঁড়

থাকলেও ধরে ভাসতে পারতেন। আচমকা ঠিকরে পড়েছেন জলে—হয়ত লাশটা গিয়ে ঠেকবে ডাঙায়।

এক ঘণ্টা অনেক খুঁজলেন ক্রবোনি। কিন্তু দলপতিকে পেলেন না। সুগভীর বিষাদে আচ্ছন্ন হল প্রত্যেকের মন। নিশ্চুপ হয়ে গেল প্রত্যেকেই—একা ডাক কেঁউ কেঁউ করে কেঁদে চলল আপন মনে।

ভোর পাঁচটায় সর্বনাশী ঝড় ফুস করে মিলিয়ে গেল। সেদিন ১১ই জুলাই। মাইল তিনেক দূরে দেখা গেল নতুন দেশকে।

দেশ নয়—দ্বীপ। অথবা, আগ্নেয়গিরি। সমুদ্রের ভেতর থেকেই ঠেলে উঠেছে আগ্নেয়গিরির গা—তীর বলে কিছু নেই। দানব যেন ফোঁস ফোঁস করে আগুন নিঃশ্বাস ছাড়ছে এবং নিঃশ্বাসের ছন্দে বিপুলকায় দেহটা থর-থর করে কাঁপছে। কম করেও হাজার ছয়েক ফুট সেই আগুন পাহাড়ে তখন অগ্ন্যুৎপাত চলছে পুরোদমে। সর্পিল রেখায় অগুন্তি লাভাস্রোত তরল অগ্নির আকারে নেচে কুঁদে নামছে পাহাড়ের গা বেয়ে। পাদদেশে অনেকগুলি লাভাস্রোত একত্রে মিলিত হয়ে নদীর আকারে ধেয়ে চলেছে সমুদ্রের দিকে। জল ফুঁসছে, ফুটছে, লাফাচ্ছে জলন্ত গলিত লাভাস্রোতের স্পর্শে। বড় বড় গনগনে পাথর ছিটকে যাচ্ছে আগুনপাহাড়ের একটিমাত্র জ্বালামুখ দিয়ে। পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়া জ্বালামুখের মাথার ওপর থেকে সুদূর আকাশ পর্যন্ত বহুবর্ণ স্তম্ভ রচনা করেছে। স্তম্ভের তলদেশ গাঢ় রক্তবর্ণে রঞ্জিত—ঊর্ধ্বদেশ কৃষ্ণকালো। অদ্ভুত ছাই রঙে ছেয়ে গেছে আকাশ—সূর্য অন্তর্হিত ছাইয়ের আড়ালে।

দ্বীপটার মোট বর্গক্ষেত্র বড় জোর আট থেকে দশ মাইল। সবটাই জুড়ে আছে ঐ পাহাড়। বিধাতার কি বিচিত্রলীলা। উত্তর মেরুর কেন্দ্রস্থল এই পাহাড়—সম্ভবতঃ ভূগোলকের অক্ষরেখা বিদীর্ণ করে গিয়েছে পর্বতের শিখরদেশ।

নৌকো আরো এগোলো সামনে। স্তম্ভিত বিস্ময়ে ভয়ংকর সুন্দর আগুন-পাহাড়ের পানে চেয়েছিল সবাই—হঠাৎ চোখে পড়ল পাথরের গায়ে ছোট একটা খাঁজ—নৌকোটাকে নিরাপদে রাখার প্রাকৃতিক আশ্রয়।

সেইদিকেই ভেসে চলল নৌকো। বহু প্রতীক্ষিত উত্তর মেরুতে পা দিল কিন্তু ডাক—সবার আগে। লাফ দিয়ে নামল ডাঙায় এবং ঘেউ ঘেউ করে ডাকতে ডাকতে ছুটে গেল ভেতর দিকে।

"ডাক····· ডাক!" পেছন থেকে কত ডাকল অভিযাত্রীরা—কিন্তু শুনল না ডাক!

নৌকোটাকে ভালভাবে পাথরের খাঁজে আটকে রেখে সবাই নেমে এল

থর-থর কম্পমান আগুনপাহাড়ের পাদদেশে। পাহাড়ের শীর্ষদেশ এগারো ডিগ্রী কোণ করে উঠে গেছে আকাশের দিকে। কি এক রহস্যজনক কারণে আগুন-বমির সঙ্গে সঙ্গে ঘন ঘন বিদ্যুৎও চমকে উঠছে জ্বালামুখে। কী অদ্ভুত সুন্দর সেই দৃশ্য!

সহসা ডাকের ব্যাকুল ডাক শোনা গেল দূরে—এবার যেন কাঁদছে না—অদ্ভুতভাবে ডেকে চলেছে···ঘেউ···ঘেউ···ঘেউ·· ঘেউ···ঘেউ···ঘেউ!

তবে কি ··তবে কি···!

পড়ি কি মরি করে অভিযাত্রীরা দৌড়োলেন শব্দ লক্ষ্য করে। পাথর, নালা, লাভাস্রোত ডিঙে পৌছোলেন একটা নিস্পন্দ নিষ্প্রাণ দেহের পাশে—সারা গায়ে তার ইংলণ্ডের পতাকা জড়ানো, পাশে বসে সমানে ডেকে চলেছে ডাক।

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের দেহ!

হেঁট হয়ে দেহ স্পর্শ করেই আনন্দে শিউরে উঠলেন ক্লবোনি। দেহ তো নিস্পন্দ নয়, নিষ্প্রাণ নয়—হ্যাটেরাস মরেন নি—বেঁচে আছেন!

"বেঁচে আছেন! বেঁচে আছেন! হ্যাটেরাস বেঁচে আছেন!" সেকী উল্লাস ক্লবোনির।

"হ্যাঁ, বেঁচে আছি।" ক্ষীণ কণ্ঠে সাড়া দিলেন হ্যাটেরাস—"শুধু বেঁচে আছি নয়—উত্তর মেরুতে প্রথম পা দিয়েছি আমিই।"

কি আশ্চর্য মানুষ! এত কষ্টের মধ্যেও বিস্মৃত হন নি অন্তরের বাসনাকে।

কিন্তু কি করে অক্ষত দেহে ডাঙায় পৌছোলেন হ্যাটেরাস? ক্রমে ক্রমে শোনা গেল সেই আশ্চর্য কাহিনী।

জলে ছিটকে পড়ে স্রোতের টানে তীরে এসে আছড়ে পড়েছিলেন হ্যাটেরাস—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঢেউ টেনে নিয়ে গিয়েছে ফের জলের মধ্যে। বার বার ঢেউ আছাড় মেরেছে পাথরের গায়ে—কিন্তু ফের নামিয়ে নিয়েছে জলের মধ্যে। বেদম হয়ে পড়েছিলেন হ্যাটেরাস। অবশেষে বিধাতা কৃপা করলেন। হাতে ঠেকল একটা পাথরের খোঁচ। সর্বশক্তি দিয়ে আঁকড়ে ধরলেন সেই অবলম্বনটুকু। তারপর পাগল ঢেউকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে একটু একটু করে উঠে এলেন নিরাপদ জায়গায়। কিন্তু আর শক্তি না থাকায় জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন সেইখানেই।

খাবার-দাবার সাজিয়ে ফেলল জনসন আর বেল। বেলা এগারোটায় প্রাতরাশ মুখে তুলতে গিয়েও বাধা পড়ল হ্যাটেরাসের চীৎকারে।

—"না, না! আগে মেপেজুপে দেখুন উত্তর মেরু ঠিক কোনখানে।"

নিরুপায় হয়ে যন্ত্রপাতি বার করলেন ক্লবোনি। দেখলেন, মাত্র পঁয়তাল্লিশ সেকেণ্ড দূরে অর্থাৎ প্রায় পৌণে এক মাইল দূরে আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের মধ্যে দিয়েই গিয়েছে ভূগোলকের অক্ষরেখা—নব্বই ডিগ্রী সেইখানেই।

অদ্ভুত! অদ্ভুত! সত্যিই অদ্ভুত! এই বৃত্তান্ত তক্ষুনি একটা কাগজে লেখা হল এবং পর্বতগাত্রের ছিদ্রে সযত্নে রক্ষা করা হল উত্তরকালের অভিযাত্রীদের জন্যে—কাগজে সই করলেন ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস।

২৪॥ মেরু বিবরণ

পাথরের ওপর খাবার বিছিয়ে নীরবে আহার সমাধা করল অভিযাত্রীরা। মাথার ওপর গম্ভীর গর্জন করতে লাগল আগুনপাহাড়, পায়ের তলায় কাঁপতে লাগল পাথর।

কল্পনাতীত কষ্ট সইতে হয়েছে পথিমধ্যে, হারাতে হয়েছে প্রিয় সঙ্গীকে, চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সবচেয়ে বিশ্বাসভাজন সঙ্গীরা, চূড়ান্ত বিপদের খড়্গ মাথার ওপর নেমে এসেছে কতবার—তবেই না আসা গিয়েছে নর্থ পোলে।

আনন্দে তাই মূক হয়ে গিয়েছিল সবাই। ভেতরে ভেতরে বিষম উত্তেজিত হলেও দারুণ গম্ভীর হয়ে গিয়েছেন হ্যাটেরাস।

কিন্তু কথার ধোকড় ডক্টর ক্লবোনির পক্ষে বেশীক্ষণ বোবা হয়ে বসে থাকা সম্ভব নয়। তাই তিনি হঠাৎ নানাবিধ জ্ঞান দিতে শুরু করলেন নর্থ পোল সম্পর্কে। জনসনকে বললেন—"ওহে, তুমি কিন্তু আর নড়ছনা।"

"মানে?"

"মানে, পৃথিবীটা তো ঘুরছে, সেই ঘোরার সঙ্গে পৃথিবীবাসীরাও ঘুরছে বন-বন করে—এখানে ছাড়া; কারণ পৃথিবী এখানে ঘুরছে না। তুমিও নড়ছ না।"

"একটু নড়ছি বৈকি," অদ্ভুত গম্ভীর স্বরে বললেন হ্যাটেরাস—"সত্যিকারের নর্থপোল এখনো পৌণে এক মাইল দূরে।"

"ঐ হল গিয়ে," সোল্লাসে বললেন ডক্টর—"মেরুবিন্দু নিয়ে কত গুজবই না শোনা গিয়েছিল এককালে। কেউ বলত, নর্থ পোল আর সাউথ পোলে ফুটো ডাণ্ডা রেখে পৃথিবীটাকে ঘোরানো হচ্ছে। কেউ বলত, প্লেটো যাঁদের কথা বলেছেন, সেই আটলান্টিকবাসীরা নাকি এইখানেই থাকতেন। আবার কেউ বলত, মেরুবিন্দুতে মস্ত ফুটো আছে—মেরুজ্যোতি সেই ফুটো দিয়েই

আকাশে ঠিকরে আসে। আর একদল লোক বলত, সেই ফুটো দিয়ে নাকি পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত যাওয়া যায় এবং যাবার পথে পর-পর আরো দুটো গ্রহ পড়বে, তাদের নাম প্লুটো আর প্রোসারপিন!"

"আরে হ্যাঁ, সেকেলে গালগল্পের কি আর শেষ আছে। মেরুবিন্দু দুটো অবশ্য ভেতর দিকে ঢোকা বলে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে পাঁচ লীগ এগিয়ে আছে। মানে নিরক্ষরেখার ওপর দিয়ে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে যাত্রা করলে পাঁচ লীগ বেশী যেতে হবে—এখান দিয়ে গেলে সেই পাঁচ লীগ পথশ্রম বেঁচে যাবে।"

নির্নিমেষে পাহাড়-চূড়োর দিকে চেয়ে রইলেন ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস।

২৫॥ মাউন্ট হ্যাটেরাস

গল্পগুজবের পর গুহায় ঢুকে ঘুমিয়ে পড়লেন সকলে—হ্যাটেরাস ছাড়া। একা তিনি জেগে রইলেন সমস্ত রাত। অতীব্র উত্তেজনায় টানটান হয়ে রইল প্রতিটি স্নায়ু। বিশ্বের কেউ যা পারেনি আজও, তিনি তা করেছেন। অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। তবু কেন এই অস্থিরতা? এই নিদ্রাহীনতা? কেন শান্ত নয় তাঁর চিত্ত, স্নিগ্ধ নয় স্নায়ুমণ্ডলী? কিসের আবেগে জ্বালাময় চোখে বারবার তাকাচ্ছেন ধূমায়িত পর্বতশিখরেব পানে, লেলিহান অগ্নিশিখার দিকে?

ভোরবেলা ঘুম ভাঙল সকলের। দেখল, হ্যাটেরাস নেই।

ছুটে বেরিয়ে এল বাইরে। অদূরে পাথরের ওপর যন্ত্রপাতি হাতে দাঁড়িয়ে আছেন হ্যাটেরাস—তীব্র চাহনি নিবদ্ধ আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের ওপর। যেন ধ্যানমগ্ন ঋষি।

কাছে গেলেন ডক্টর। ডাকলেন, কথা বললেন। কিন্তু শুনতে পেলেন না হ্যাটেরাস—সাড়াও দিলেন না।

শেষকালে বললেন ক্লবোনি—"আসুন, শেষবারের মত দ্বীপটাকে ঘুরে দেখে নিই।"

নিমেষে ঘোর কেটে গেল হ্যাটেরাসের—যেন মোহনিদ্রা থেকে জেগে উঠলেন ধীরে ধীরে। বললেন অদ্ভুত প্রশান্ত কণ্ঠে—"হ্যাঁ, শেষবারের মত!"

আলটামণ্ট, জনসন আর বেল ততক্ষণে তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ওদের দেখলেন ক্যাপ্টেন। বললেন সেই বিচিত্র প্রশান্ত কণ্ঠে—"বন্ধুগণ, আপনারা অনেক করেছেন। এই গৌরবের অধিকারী আপনারা প্রত্যেকেই।

এমন কি যারা আমাকে পরিত্যাগ করেছে—তারাও। প্রতিশ্রুতিমত তাদের পাওনা টাকা দেওয়া হবে ইংলণ্ডে—যদি তারা ফিরতে পারে দেশে।"

জনসন কাষ্ঠ হেসে বললে—"ক্যাপ্টেন, আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে যেন উইল করে যাচ্ছেন।"

"হয়ত করছি!"

"আপনার জীবন এখুনি তো ফুরোচ্ছে না।"

"কে জানে?"

এরপর কেউ আর কথা বলতে পারল না। মূক বিস্ময়ে চেয়ে রইল ক্যাপ্টেনের পানে। ক্যাপ্টেন কিন্তু অচিরেই ব্যক্ত করলেন তাঁর মনস্কামনা।

বললেন—"আমরা মেরুদ্বীপে পৌঁছেছি ঠিকই, মেরুবিন্দুতে তো পৌঁছোইনি!"

"তফাৎটা কোথায়?" অবাক হয়ে গেল আলটামণ্ট। ডক্টরও সায় দিলেন আলটামণ্টের কথায়।

কিন্তু বাধা পেয়ে যেন আরো ফুঁসে উঠলেন হ্যাটেরাস। বললেন কড়া গলায়—"পৃথিবীর মেরুবিন্দুতে প্রথম পা দেবে একজন ইংরেজ—এই সংকল্প নিয়েই বেরিয়েছিলাম ইংলণ্ড ছেড়ে। এখনো তা তো হয়নি।"

"তার মানে!" ডক্টর যেন নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারলেন না।

"মেরুবিন্দু এখনো পঁয়তাল্লিশ সেকেণ্ড দূরে। সেখানকার চেহারা এখনো আমি দেখিনি—কাজেই আমাকে পা রাখতেই হবে মেরুবিন্দুর ওপরে," উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল হ্যাটেরাসের উত্তেজনা।

"কোথায় পা রাখবেন? আগ্নেয়গিরির মাথায়?"

"আমি যাবোই।"

"কি করে উঠবেন? ও পাহাড়ে তো ওঠা যায় না!"

"আমি যাবোই।"

"জ্বালামুখে দাউ দাউ আগুন জ্বলছে দেখেছেন?"

"আমি যাবোই।"

গোঁয়ার হ্যাটেরাসকে যেন মেরু উন্মত্ততায় পেয়ে বসেছে। কত বোঝালেন ডক্টর। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। বরং ধাপে ধাপে চড়তে লাগল তাঁর উত্তেজনা। এ-লোককে আটকাতে হলে এখন শক্তিপ্রয়োগ ছাড়া আর পথ নেই। কিন্তু সেটা চরম মুহূর্তের জন্যে তোলা থাকুক—আপাততঃ বেশী পীড়াপীড়ি না করাই ভাল।

তাই সুর পাল্টে ডক্টর বললেন—"বেশ তো, আপনার সঙ্গে আমরাও যাবো।"

"যাবেন তো বটেই," চটপট জবাব দিলেন হ্যাটেরাস—"কিন্তু মাঝপথ পর্যন্ত। মেরুবিজয়ের সংবাদ নিয়ে ইংলণ্ডে ফিরতে হবে তো আপনাদেরই!"

"কিন্তু—"

"কোন কথা নয়। বন্ধুর অনুরোধ যখন শুনছেন না, ক্যাপ্টেন হিসেবে হুকুম করছি—যা বললাম তার নড়চড় হবে না।"

এ-হেন বাতুলের সঙ্গে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই জেনে পাহাড়ে ওঠার তোড়জোড় শুরু করলেন ডক্টর। মিনিটকয়েক পরেই ডাককে সামনে রেখে রওনা হল অভিযাত্রীরা জলন্ত গিরিচূড়া অভিমুখে। ডাকের সঙ্গে রইল হ্যাটেরাস। পেছনে আর সবাই। তখন সকাল আটটা। আকাশ ঘন নীল। তাপমাত্রা ৫২ ডিগ্রী।

"আমার ভয় করছে", ফিসফিস করে বলল জনসন।

"ভয় কিসের? কোনো ভয় নেই," মিছেই প্রবোধ দিলেন ডক্টর।

ভূতাত্ত্বিকরা এ-পাহাড় দেখেই কিন্তু বলে দিতেন এর বয়স খুবই কম। একেবারে নবজাতক বললেই চলে। আলগা আলগা পাথর ওপর থেকে পড়েছে, ওপর ওপর জমা হয়েছে। কোথাও ঘাসের কণা পর্যন্ত নেই, নেই শ্যাওলা জাতীয় ছত্রাক। কীটপতঙ্গ পর্যন্ত অদৃশ্য পাথরের আনাচেকানাচে। জলের মধ্যেও নেই মাছ বা পতঙ্গ। পর্বতনিঃসৃত কার্বন ডায়অক্সাইডের সঙ্গে জলের হাইড্রোজেনের অথবা মেঘের অ্যামোনিয়ার মিলন ঘটলে সূর্য কিরণের কারসাজিতে জৈব পদার্থ জন্ম নিত ঠিকই—কিন্তু সে সময়ও বুঝি পাওয়া যায়নি।

পৃথিবীর ওপর বহু পর্বতের জন্ম হয়েছে এইভাবেই। অগ্ন্যুৎপাত থেকেই গড়ে উঠেছে আগ্নেয়গিরি অথবা আগ্নেয়দ্বীপ। ভূগর্ভনিক্ষিপ্ত প্রস্তররাশি জমে উঠেছে বিভিন্ন জায়গায়—প্রকৃতি রুদ্রলীলার মাধ্যমে পাহাড় গড়েছেন—কখনো ফাটিয়ে চৌচির করে উড়িয়ে দিয়েছেন। ঠিক এইভাবেই মাউণ্ট এটনা থেকে এত লাভা বেরিয়েছিল আয়তনে যা মাউণ্ট এটনার চাইতেও বেশী। নেপলস-য়ের কাছে মঁনুযোভো গড়ে উঠেছিল মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে—স্রেফ আগ্নেয় ছাই জমে।

মেরু দ্বীপের নামকরণ পর্ব আগেই সাঙ্গ হয়েছিল। হ্যাটেরাসই নাম দিয়েছিলেন—রাণীর দ্বীপ।

পৃথিবীটা যেন একটা বর্তুলাকার ফুটন্ত কটাহ। নিরন্তর বাষ্প ঠেলা

মারছে ভেতর থেকে বাইরে। প্রচণ্ড চাপে ভূত্বক বিদীর্ণ হয়ে বেরিয়ে আসছে আগুন, লাভাস্রোত, ছাই। যদি না বেরোতো, পৃথিবী কোনকালে বোমার মত ভুম করে ফেটে মহাশূন্যে মিলিয়ে যেত। বাষ্পর এই নির্গমন মুখগুলির নামই আগ্নেয়গিরি। কখনো মুখবন্ধ হয়ে যায়—আগুন পাহাড় নিভে যায়। কিন্তু আর এক জায়গায় জেগে ওঠে নতুন আগ্নেয়গিরি। মেরু অঞ্চলে ভূত্বক অপেক্ষাকৃত পাতলা বলেই বাষ্পচাপে এখানে আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি খুবই স্বাভাবিক।

রাণীর দ্বীপও সদ্য জন্ম নিয়েছে। তাই মাটির স্তর এখনো কোথাও নেই। জল পর্যন্ত নেই। কয়েক শতাব্দী বয়স হলে নিশ্চয় উষ্ণ জলের ফোয়ারা দেখা যেত এখানে সেখানে—সব আগ্নেয়গিরির ধারে কাছে এমনি ফোয়ারা ফুটিফাটা মাটি ভেদ করে তেড়েফুঁড়ে উঠে আসে ওপরে। কিন্তু এখানে সে সবের চিহ্ন নেই। এমন কি তরল লাভাস্রোতেব ওপরে ভাসমান বাষ্পকুণ্ডলী পর্যন্ত জলকণাবিহীন।

পাহাড়ে উঠতে উঠতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এইসবই দেখতে লাগলেন ডক্টর। বেশ বুঝলেন, রাণীব দ্বীপ বাতারাতি জন্ম নিয়েছে কিছুদিন আগে—রাতারাতি মিলিয়ে যাবে যে কোনো মুহূর্তে।

ক্রমশঃ পর্বতারোহণ কঠিন হয়ে উঠছে। জলন্ত পাথর ছিটকে পড়ছে আশেপাশে, ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসছে, ছাইয়ের মধ্যে দিয়ে ভালভাবে কিছু দেখাও যাচ্ছে না। এ ছাড়াও রয়েছে সর্পিল বেখায় প্রবহমান অগুন্তি লাভাস্রোত। এত বিপদের মধ্যেও কিন্তু ঘাড উঁচিয়ে দ্রুতবেগে ওপরে উঠে চললেন হ্যাটেরাস।

অবশেষে একটা চক্রাকার শিলা-চত্বরে পৌঁছে থমকে দাঁড়ালেন হ্যাটেরাস। দশ ফুট চওড়া পাথুরে চাতাল ঘিরে তাথৈ তাথৈ নাচতে নাচতে ছুটছে কালান্তক লাভাস্রোত। মাঝখান দিয়ে সঙ্কীর্ণ একটা পথ উঠে গেছে চূড়া অভিমুখে। অংকের হিসেবে আর মাত্র ছশ ফুট দূরে মেরুবিন্দু—কার্যতঃ পনেরশ ফুট চড়াই ভাঙতে হবে সেখানে পৌঁছোতে গেলে।

থমকে দাঁড়িয়ে মনে মনে সেই হিসেবই করলেন ক্যাপ্টেন।

তিন ঘণ্টা হয়ে গেছে, ক্যাপ্টেন একনাগাড়ে পাহাড়ে উঠছেন দলবল নিয়ে—সঙ্গীদের দম ফুরিয়েছে—তাঁব ফুরোয়নি। পথের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে অগ্নিপরিবৃত ঐ শিখরদেশে পৌঁছোনো যাবে না কোনোমতেই। এবার যেভাবেই হোক আটকাতে হবে তাঁকে। মনস্থির করে ফেললেন ডক্টর। এই তিন ঘণ্টা তিনি যতবার বোঝাতে গেছেন, ততবারই আরো গোঁ চেপেছে

ক্যাপ্টেনের। বুদ্ধি বিবেচনা সবই লোপ পেয়েছে ভদ্রলোকের—যত ওপরে উঠছেন, ততই উন্মাদ আবেগে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে যাচ্ছেন। ওঁকে দেখে আর ইহলোকের মানুষ মনে হচ্ছে না। চোখমুখের চেহারা পালটে গিয়েছে। মানুষ নন—যেন নিজেই একটা আগ্নেয়গিরি।

"হ্যাটেরাস," শক্ত গলায় বললেন ডক্টর—"ঢের হয়েছে, আর উঠতে পারব না আমরা।"

"তাহলে বসে পড়ুন। আমি উঠব," অদ্ভুত স্বরে বললেন হ্যাটেরাস।

"না, আর উঠতে পারবেন না! কেন মিছে বিপদকে ডেকে আনছেন?… মেরুবিন্দুতেই তো রয়েছেন এই মুহূর্তে!"

"না, না, মেরুবিন্দু আরো উঁচুতে!"

"হ্যাটেরাস, আমি ক্লবোনি বলছি, আপনার বন্ধু আমি। চিনতে পারছেন না?"

"উঁচুতে উঁচুতে…আরো উঁচুতে!" বদ্ধ উন্মাদের স্বরে বললেন হ্যাটেরাস।

"বেশ, তাহলে আমরা জোর করে আপনাকে—"

ডক্টরের মুখের কথা শেষ হওয়ার আগেই ওঁর মনের ভাব আঁচ করলেন হ্যাটেরাস এবং অতি-মানবিক প্রচেষ্টায় এক লাফ দিয়ে লাভাস্রোত টপকে উধাও হলেন সঙ্গীদের নাগালের বাইরে। নিঃসীম হতাশায় বুকফাটা চীৎকার করে উঠল সবাই। মনে হল যেন আগুনের বেড়াজালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। কিন্তু আগুনের ছোঁয়া গায়ে লাগার আগেই নিরাপদ স্থানে পৌঁছে গেলেন ডান—পেছন পেছন এল ডাক। ধূম্রপুঞ্জের মধ্যে হারিয়ে গেলেন পর মুহূর্তেই—যবনিকার অন্তরাল থেকে কেবল ভেসে এল তাঁর উন্মত্ত চীৎকার—"চলো যাই উত্তরে!… আরো উত্তরে!…মাউণ্ট হ্যাটেরাসের মাথায়! মাউণ্ট হ্যাটেরাস! মাউণ্ট হ্যাটেরাস! মনে থাকে যেন, মাউণ্ট হ্যাটেরাস!"

পেছন পেছন ছুটে যাওয়া সম্ভব নয় কোন মতেই। শুধু আগুনের বেড়াজাল নয়, লাভা স্রোত বইছে পায়ের তলায়। লম্বা লাফ দিয়ে পেরোতে গিয়ে হিসেবে সামান্য ভুলচুক হলেই নিমেষে মরতে হবে তরল অগ্নিস্রোতে। তা সত্ত্বেও আলটামণ্ট লাফ দিতে গিয়েছিল—গায়ে ফোস্কা পড়াই সার হল—সঙ্গীরা প্রাণপণে ঝাপটে তাকে টেনে আনল আগুন থেকে দূরে।

আকুল কণ্ঠে ডেকে উঠলেন ডক্টর—"হ্যাটেরাস! হ্যাটেরাস!"

জবাব দিলেন না ক্যাপ্টেন। পাহাড়ের ডগা থেকে কেবল ভেসে এল ডাকের ক্ষীণ ঘেউ-ঘেউ চীৎকার। তাল তাল ধোঁয়া, বৃষ্টির মত ঝরে

পড়া ছাই আর অঙ্গারের আড়াল থেকে মাঝে মাঝে আবির্ভূত হলেন ক্যাপ্টেন। কখনো দেখা গেল বাহু, কখনো মাথা। পরক্ষণেই বিলীন হলেন সর্বনাশা ধোঁয়া আর পাথর বৃষ্টির ঘূর্ণবাত্যার মধ্যে। অনেকক্ষণ পরে যখন ফের দেখা গেল, তখন তিনি আরো উঁচুতে উঠে গেছেন এবং উঠছেন পাথর ধরে ধরে। ফ্যানটাসটিক স্পীডে উর্ধ্বারোহণের দরুন দ্রুত ক্ষুদ্র হয়ে আসছে তাঁর অবয়ব। তিরিশ মিনিট পরে মনে হল তিনি আকারে অর্ধেক হয়ে গেছেন।

বাতাস মুখর হয়ে উঠেছে ভলক্যানোর গুরুগম্ভীর গর্জনে। অতিকায় চুল্লীর মত গোটা পাহাড়টা গুমগুম করে কাঁপছে আর সোঁ সোঁ শব্দে গজরাচ্ছে। ডাককে পেছনে নিয়ে হ্যাটেরাস তবুও উঠে চলেছেন···চলেছেন·· চলেছেন!

মাঝে মাঝে আলগা পাথর খসে পড়ছে পেছনে—পাহাড়ের গা বেয়ে স্খলিত শিলা দুমদাম শব্দে ঠিকরে গিয়ে ঝপাস করে আছড়ে সাগরের জলে।

কিন্তু ফিরেও তাকাচ্ছেন না হ্যাটেরাস। পাহাড়ে ওঠার লাঠিটায় ইংলণ্ডের পতাকা বেঁধে নিয়েছেন এবং নাড়তে নাড়তে এগিয়ে চলেছেন জ্বলন্ত মৃত্যু যেখানে ওৎ পেতে আছে—সেইখানে। আকারে তিনি এখন বিন্দু সমান—ডাককে মনে হচ্ছে যেন একটা পুঁচকে ইঁদুর।

সহসা হাওয়ার ঝাপটায় আগুন হেলে পড়ল দুজনের মাথার ওপর। অগ্নিস্রোত যেন গিলে ফেলল দুজনকেই—বিষম যাতনায় চেঁচিয়ে উঠলেন ক্লবোনি—পরক্ষণেই ফের দেখা গেল হ্যাটেরাসকে—ফ্ল্যাগ নাড়তে নাড়তে চলেছেন··· !

ঝাড়া একঘণ্টা ধরে দেখা গেল পর্বতারোহণের এই ভয়ংকর দৃশ্য। আলগা পাথর আর ছাইয়ের স্তূপের সঙ্গে অসম্ভব লড়াইয়ের অবিশ্বাস্য দৃশ্য। কখনো ছাইয়ের স্তূপে কোমর পর্যন্ত ডুবে গেলেন ক্যাপ্টেন। কখনো চোখা পাহাড় ধরে ঝুলতে লাগলেন পাহাড়ের গা বেয়ে বিপজ্জনক ভাবে। কখনো ঝড়ে নুয়ে পড়া বৃক্ষপত্রের মত সঙীন অবস্থায় দুলতে লাগলেন নড়বড়ে পাথরের মাথায়।

অবশেষে পৌছোলেন পর্বত চুড়ায়—আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে। এবার নিশ্চয় ফিরবেন, এই আশায় ব্যাকুল কণ্ঠে ডাক দিলেন ডক্টর—"হ্যাটেরাস: হ্যাটেরাস!"

ডক্টরের হাহাকার তীরের মত গিয়ে বিঁধল আলটামণ্টের মর্মস্থলে। "আমি বাঁচাব ক্যাপ্টেনকে!" বলেই প্রচণ্ড লাফ মেরে ডিঙে গেল লাভা

আর আগুনের বেড়াজাল—ডক্টর বাধা দেওয়ার সময়ও পেলেন না। চকিতের মধ্যে পাথরের আড়ালে অদৃশ্য হল তার ক্ষিপ্র মূর্তি।

হ্যাটেরাস এখন জ্বালামুখের ওপর দিয়ে হাঁটছেন। আশপাশে বৃষ্টির মত পড়ছে জ্বলন্ত শিলা। হ্যাটেরাস তবুও হাঁটছেন একটা ঝুলন্ত পাথরের ওপর দিয়ে। পর্বতশীর্ষ যেখানে মুখব্যাদান করে আগুন বমি করছে, ঝুলন্ত পাথরটা এগিয়ে রয়েছে তারই ওপর। হ্যাটেরাস এগোচ্ছেন সেই পাথরের ওপর দিয়ে। পেছন পেছন চলেছে ডাক। একহাতে ফ্ল্যাগ নাড়ছেন ক্যাপ্টেন, আরেক হাতে তর্জনী সংকেতে নির্দেশ করছেন খ-বিন্দু— মাথার ঠিক ওপরে ব্রহ্মাণ্ডের মেরুবিন্দু যেখানে—দেখাচ্ছেন সেই স্থান। গাণিতিক মেরুবিন্দু সম্বন্ধে এখনো যেন তিনি সন্দিহান, যেখানে সব দ্রাঘিমার সঙ্গমস্থল, সেই বিন্দু যেন এখনো তাঁর নাগালের বাইরে—তাই পা রাখতে চলেছেন ঠিক সেই বিন্দুর ওপরে।

আচম্বিতে টলে উঠল পায়েব তলায় পাথর। বিষম কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল ক্লবোনি, জনসন, বেল। সেকেণ্ড কয়েকের জন্যে মনে হল—সবশেষ! দুর্দান্ত হ্যাটেরাসকে শেষ পর্যন্ত বুঝি গিলে খেল জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি।

কিন্তু না! ঠিক সময়ে আলটামণ্ট পৌঁছে গেছে সেখানে- সঙ্গে ডাক! নিতল গহ্বরে মিলিয়ে যাওয়ার ঠিক পূর্বমুহূর্তে কুকুর এবং মানুষ দুজনে মিলেই আঁকড়ে ধরেছে হ্যাটেরাসকে। আধঘণ্টা পরে তাঁকে ফিরিয়ে এনে ক্লবোনির দুই বাহুর মধ্যে সঁপে দিল আলটামণ্ট।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন হ্যাটেরাস। বোবা বেদনায় তাঁর চোখে চোখ রাখলেন ডক্টর। হ্যাটেরাসের চোখের পাতা পড়ল না - যেন কিছু দেখতেও পেলেন না।

"অন্ধ হয়ে গেলেন নাকি?" স্তম্ভিত কণ্ঠ জনসনের।

ক্লবোনি বললেন—"না, জনসন। চোখ ওঁর আছে, দৃষ্টিশক্তিও আছে—নেই কেবল চেতনা। আত্মাকে উনি চিরতরে রেখে এলেন আগুন পাহাড়ের মাথায়। জনসন, ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস পাগল হয়ে গিয়েছেন! ওঁর মন মরে গিয়েছে!"

"পাগল হয়ে গিয়েছেন!"

"হ্যাঁ, বন্ধু, জন্মের মত পাগল হয়ে গিয়েছেন!" বলতে বলতে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন ডক্টর ক্লবোনি।

২৬॥ দক্ষিণে ফেরা

তিনঘণ্টা পরে পর্বতমূলের গিরিকন্দরে ফিরে এল অভিযাত্রীরা। মুখে কারো কথা নেই। অবশেষে ডক্টর বললেন—"কালকেই আমরা বেরিয়ে পড়ব এখান থেকে। যাবো দৈবদুর্গে। শীতকালটা সেইখানেই কাটাবো—খাবার দাবারের অভাব হবে না। গরম পড়লে ফিরে যাবো ইংলণ্ডে।"

পরামর্শ মনে ধরল সকলেরই। সেই দিনই মেরুবিন্দু বিজয়ের স্মৃতিরক্ষার্থে রানীর দ্বীপে নির্মিত হল একটা স্তূপ। ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস যেখানে নেমেছিলেন সমুদ্র থেকে, ঠিক সেইখানেই তৈরী হল স্তূপটি। গায়ে খোদাই করা রইল শুধু দুটি লাইন—

"জন হ্যাটেরাস

১৮৬১"

ভেতরে রইল একটা টিনের বাক্সর মধ্যে মেরুবিন্দু বিজয়ের পূর্ণ বিবরণ। ভবিষ্যতে যদি কেউ পা দেয় রানীর দ্বীপে, স্তূপ খুঁড়লেই জানতে পারবে তার আগেই জন হ্যাটেরাস এই অসাধ্য সাধন করে গিয়েছেন।

১৩ই জুলাই পাগল হ্যাটেরাসকে নৌকোয় চাপিয়ে অভিযাত্রীরা পাড়ি জমাল সমুদ্রে। আকাশ পরিষ্কার। হাওয়া অনুকূল। তাই ১৫ই জুলাই পৌঁছোলো আলটামণ্ট বন্দরে। কিন্তু বাকী পথটা স্লেজে না গিয়ে উপকূল ঘেঁসে জলপথেই তরতরিয়ে ছুটে চলল সবাই—পনের দিনের পথ সাতদিনেই পাড়ি দিয়ে হাজির হল ভিক্টোরিয়া বে তে। তারপর দৈবদুর্গে।

গিয়ে কি দেখল?

বরফ গলে গিয়েছে সূর্যের তাপে। প্রাকার গলেছে, ডক্টর হাউস নিশ্চিহ্ন হয়েছে, বারুদঘর অদৃশ্য হয়েছে, ভাঁড়ার ঘর জমিতে মিশেছে। খাবার দাবার লুঠ করেছে হিংস্র জন্তুরা। কিছুই আর নেই!

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল সবাই। সঙ্গের খাবার প্রায় নিঃশেষিত—দৈবদুর্গে সঞ্চিত খাবারের ভরসাতেই এতদূর ছুটে আসা। এখন উপায়?

প্রমাদ গুনলেন ডক্টর। কুড়িয়ে বাড়িয়ে যেটুকু খাবার দাবার পেলেন, তা দিয়ে বড় জোর ছ হপ্তা খাওয়া যাবে। ভেবে দেখলেন, এখুনি যদি জলপথেই বেরিয়ে পড়া যায়, এই ছ হপ্তায় পৌঁছোনো যাবে বাফিন উপসাগরে। সেখান থেকে ড্যানিশ উপনিবেশে পৌঁছোনো খুব কঠিন হবে না।

২৪শে জুলাই দুরু-দুরু বুকে অভিযাত্রীরা ফের উঠে বসল নৌকোয়। শীত

এসে সমুদ্রের বরফ জমিয়ে দেওয়ার আগেই পৌঁছোতে হবে গন্তব্য স্থানে। তাই প্রতিদিন ষাট পঁয়ষট্টি মাইল ছুটে চলল নৌকো—দিনেরাতে এক মুহূর্তের জন্যেও নোঙর ফেলল না। তা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে কমতে লাগল তাপমাত্রা। জমতে লাগল জল। ভাসমান হিমবাহ থেকে খাবার জল সংগ্রহ করল অভিযাত্রীরা—পাখী মেরে সংগ্রহ করল মাংস। তা সত্ত্বেও আধপেটা খেয়ে থাকতে হল দিনের পর দিন। বরফ ঠেলে এগুতে গিয়ে কতবার যে নৌকো ভাঙতে ভাঙতে বেঁচে গেল তার ইয়ত্তা নেই।

শেষকালে কিন্তু আর এগোনো গেল না। বরফ পথ আটকে দিল বেশ ভাল করেই। সেদিন ১৫ই অগাস্ট। স্লেজ নামিয়ে ছুটে চলল সবাই। পেটে খাবার নেই, গায়ে জোর নেই—এ অবস্থায় কাঁহাতক অসম্ভবের সঙ্গে লড়াই করা যায়? একদিন আর শয্যা ছেড়ে ওঠবারও ক্ষমতা রইল না কারোর।

একা আলটামণ্ট স্রেফ মনের জোরে ডাককে নিয়ে বেরোলো শিকারে। কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এল বিকট স্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে। দুই চোখে তার বিমূর্ত বিভীষিকা।

পেছন পেছন ছুটে গেল সবাই। গিয়ে দেখল সেই বীভৎস দৃশ্য। বরফে আধচাপা পড়েছে বিস্তর মৃতদেহ। মানুষের দেহ। মরবার মুহূর্তেও কামড়া-কামড়ি করে খেয়েছে পরস্পরের মাংস। নরমাংস খেয়েও প্রাণে বাঁচেনি কেউ। বিধাতা বিশ্বাসঘাতকদের ক্ষমা করেন না।

হ্যাঁ, এরা তারাই। শানডন, পেন এবং কৃতঘ্ন সাঙ্গপাঙ্গরা। বরফের সংঘাতে নিশ্চয় নৌকো গুঁড়িয়েছে, খাবার ফুরিয়েছে। তারপর···!

২৮॥ উপসংহার

বিশ্বাসঘাতক সঙ্গীদের মৃতদেহ আবিষ্কারের পর থেকে কিভাবে দিন কেটেছিল, কল্পনাতীত সেই পথ কষ্টের বিবরণ দিয়ে আর লাভ আছে কি?

নউই সেপ্টেম্বর ডেভন দ্বীপের প্রান্তে পৌঁছোল হ্যাটেরাসের দল। পুরো দুটি দিন অনাহারে থেকে জনসন মুমূর্ষু, বেল উত্থানশক্তি রহিত। দুদিন আগে শেষ খাওয়া খেয়েছে সবাই সর্বশেষ এস্কিমো কুকুরটিকে বধ করে।

সামনেই বাফিন উপসাগর। কিছুটা জমে বরফ হয়ে গিয়েছে। ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে বরফ উপকূলে। ওরা ব্যাকুল নয়নে চেয়ে রইল দূর সমুদ্রের পানে তিমিজাহাজের প্রত্যাশায়। কিন্তু তিমিজাহাজ তো অষ্টপ্রহর টহল দেয় না এসব অঞ্চলে। সুতরাং আশা খুব ক্ষীণ।

কিন্তু বিধাতা মুখ তুলে চাইলেন। পরের দিন দূরদিগন্তে পাল দেখতে

গেল আলটামণ্ট। পড়ি কি মরি করে দলবল নিয়ে বরফ টপকে প্রাণ হাতে নিয়ে জলের ধারে এসে পৌছোলেন ক্লবোনি। কত ডাকাডাকি করলেন। কিন্তু জাহাজটা দূরে সরে যেতে লাগল আস্তে আস্তে।

নিঃসীম হতাশায় ককিয়ে উঠল সবাই—ক্লবোনি বাদে। সত্যিই উর্বর তাঁর মস্তিষ্ক। মুমূর্ষু সঙ্গীদের টেনে নিয়ে উঠলেন একটা ভাসমান হিমশিলায়। স্লেজের তলা থেকে লোহার পাত খুলে নিয়ে মাস্তুলের মত গাঁথলেন হিমশিলার মাথায়। তাবু ছিঁড়ে পাল বানিয়ে নিয়ে বাঁধলেন মাস্তুলের ডগায়। হাওয়ার ধাক্কায় তাঁর বরফ মাচ তরতরিয়ে ভেসে গেল গভীর সমুদ্রে।

দুঘণ্টা আশা নিরাশায় দোলবার পর ওরা উঠে এল জাহাজে। ড্যানিশ জাহাজ। তিমি ধরতে এসেছে। প্রেতমূর্তির মত মানুষ ক'জনকে সেবা শুশ্রূষা করে চাঙা করে তুললেন ক্যাপ্টেন। উপবাসে, পথশ্রমে, ভাবনা চিন্তায় মানুষ বলে ওদের আর চেনাই যাচ্ছিল না।

তেরোদিন পর দুঃসাহসী পাঁচজন ফিরে এল লণ্ডনে ডক্টর ক্লবোনি আগে গেলেন রয়াল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটিতে। সেখানে এক বিশেষ অধিবেশনে বর্ণনা করলেন জন হ্যাটেরাসের সুমেরুতে পদক্ষেপের আপাতঃ অলীক উপাখ্যান।

জন হ্যাটেরাস কিন্তু পাগল হয়েই রইলেন—সেই সঙ্গে হারালেন বাকশক্তি। একদম কথা কইতেন না। লিভারপুলের একটি মানসিক চিকিৎসালয়ে তাঁকে রেখেছিলেন ডক্টর। রোজ দেখতেন বিশেষ একদিকে হেঁটে যান হ্যাটেরাস—পেছনে পেছনে ডাক। ডাক ছাড়া আর কাউকে বন্ধুরূপে মানতে পারতেন না হ্যাটেরাস। গলির শেষ প্রান্তে পৌঁছে ফের ফিরে আসতেন সেই পথেই। পথে কেউ বাধা দিলে আঙুল তুলে দেখাতেন আকাশের বিশেষ একটি স্থান—কেউ কথা বললে বিরক্ত হতেন—ডাকও রেগে গিয়ে ঘেউ ঘেউ করে উঠত।

দিনের পর দিন জন হ্যাটেরাসের এ-হেন বোবা বিচরণ নিরীক্ষণ করে একদিন মূল রহস্যটা আবিষ্কার করলেন ক্লবোনি। হ্যাটেরাস যেন চুম্বকের টানেই প্রতিদিন একই দিকে যান আর আসেন।

কারণ, ক্যাপ্টেন জন হ্যাটেরাস আজও এগিয়ে চলেছেন উত্তর অভিমুখে!

সম্পাদকীয় পুনশ্চ

এই কাহিনী লেখার আগে জুল ভের্ণ যদি নিজের জাহাজে সমুদ্র পাড়ি দিতেন, তাহলেই জানতে পারতেন সে যুগে এত নিখুঁত ভাবে সুমেরু নির্ণয় সম্ভব ছিল না। সেরকম যন্ত্রপাতিও ছিল না। আগ্নেয়গিরির ঠিক কেন্দ্রে মেরুবিন্দু আবিষ্কারের নাটকীয় ক্লাইমাক্সটা তাহলে নতুন করে লিখতেন।